রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা

দুই খণ্ড একত্রে দশটাকা

রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা

প্রথম খণ্ড

নীহাররঞ্জন রায়
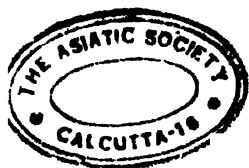
১৩৫৮

দি বুক এম্পোরিঅম লিমিটেড

"তপোভঙ্গ-দূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুদ্র সন্ন্যাসী,
স্বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি যুগে যুগে আসি
তব তপোবনে।
দুর্জয়ের জয়মালা
পূর্ণ করে মোর ডালা,
উদ্দামের উতরোল বাজে মোর ছন্দের ক্রন্দনে।

ব্যথার প্রলাপে মোর গোলাপে গোলাপে জাগে বাণী,
কিশলয়ে কিশলয়ে কৌতূহল-কোলাহল আনি
মোর গান হানি।"

শ্রীমতী মণিকা দেবী

করকমলে

"সমস্ত জীবনভোর

দিনে দিনে দিব তার হাতে তুলি

স্বর্গের দাক্ষিণ্য হতে আসিবে যে শ্রেষ্ঠ দিনগুলি ;

কণ্ঠহারে

গেঁথে দিব তা'রে

যে-দুর্লভ রাত্রি মম

বিকশিবে ইন্দ্রাণীর পারিজাত সম।"

নিবেদন

আশাতীত স্বল্প সময়ের মধ্যে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণও নিঃশেষিত হয়। তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশেও অনিবার্য কারণে কিছু বিলম্ব ঘটিল। যাহা হউক আবার বাঙালী পাঠকদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

তৃতীয় সংস্করণে পূর্ব পরিকল্পনা মতো সাতটি নূতন অধ্যায় যোজনার ইচ্ছা ছিল; সেজন্য আর একটি খণ্ডের প্রয়োজন হইত। কিন্তু অন্যদিকে নানাকর্মে লিপ্ত থাকায় এদিকে মনঃসংযোগের তেমন সুযোগ আমি আমি পাই নাই; কবে যে সে-সুযোগ পাইব, তাহাও জানি না। কাজেই, আমার সহৃদয় পাঠকদিগকে কোন প্রতিশ্রুতিই আমি দিতে পারিলাম না। আশা করি তাঁহারা আমার অনিচ্ছাকৃত এই অপরাধ মার্জনা করিবেন। ইতি ২২শে শ্রাবণ, ১৩৫৩।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বিনয়াবনত

নীহাররঞ্জন রায়

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

প্রায় সাড়ে তিন বৎসর পরে এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। প্রথম সংস্করণ ছয় মাসের মধ্যেই সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। সুদীর্ঘ আড়াই বৎসরের মধ্যে নূতন আর একটি সংস্করণ প্রকাশ করা নানা কারণেই সম্ভব হয় নাই। বাঙালী পাঠক এই ধরনের গ্রন্থ পাঠ ও আলোচনায় এতটা আগ্রহ দেখাইবেন, এই আশা আমার ছিল না। বস্তুত, প্রসিদ্ধনামা লেখকের গল্প-উপন্যাস ছাড়া বাংলা সাহিত্যে অন্য কোনও গ্রন্থের এতটা সৌভাগ্য হইতে পারে বলিয়া আমার জানা ছিল না। আমি জানি, ইহার কারণ আমার রচনার গুণাগুণ নয়, যথার্থ কারণ আমার রচনার বিষয়বস্তু। যে-গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র-সাহিত্য সে-গ্রন্থ বাঙালী পাঠকের আগ্রহের বস্তু যদি হইয়া থাকে, তাহাতে আমার কৃতিত্বের কিছু নাই। তবু, বাঙালী পাঠক রবীন্দ্রনাথকে উপলক্ষ করিয়া আমার গ্রন্থের প্রতি যে আশাতিরিক্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, এজন্য তাঁহাদের প্রতি আমার সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

বাংলা দেশের প্রায় সকল বাংলা ও ইংরেজী দৈনিক মাসিক ও অন্যান্য সাময়িক পত্রিকায়ই এই গ্রন্থের সুদীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে; কেহ কেহ সম্পাদকীয় অথবা বিশেষ প্রবন্ধ দ্বারাও এই গ্রন্থকে সম্মানিত করিয়াছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমালোচকেরা অকুণ্ঠিত প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, এবং সেই প্রসঙ্গে এমন উক্তিও করিয়াছেন যাহা আমি অত্যুক্তি বলিয়াই মনে করি। একাধিক সমালোচক আমার কোনও কোনও মতামত সম্বন্ধে আপত্তিও জানাইয়াছেন; বর্তমান সংস্করণে যথাস্থানে আমি তাঁহাদের

বিচারযোগ্য বক্তব্যগুলির আলোচনা এবং আমার বক্তব্যের পুনর্বিচার করিয়াছি। মাত্র একটি মাসিক পত্রিকার সমালোচনায় লেখকের কিছু শ্রদ্ধা ও দায়িত্ববোধের অভাব লক্ষ্য করিয়াছিলাম। তাঁহার অশ্রদ্ধেয় উক্তিগুলির কোনও আলোচনা আমি করি নাই, সে সব উক্তি ও মতামত আমার দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচার পদ্ধতির বাইরে। তাহা ছাড়া, যেখানে শ্রদ্ধার অভাব, সেখানে আলোচনার কোনও মূল্য আছে বলিয়া মনে করি না। ভাল হউক, মন্দ হউক, সমালোচকদের কোনও দায়িত্বসম্পন্ন উক্তিই আমি উপেক্ষা করি নাই; সকলের সকল উক্তিই আমার কাজে লাগিয়াছে, এবং প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে আমি উপকৃত হইয়াছি। ইঁহাদের সকলের প্রতিই আমি কৃতজ্ঞ। সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে মতের অমিল বড় কথা নয়; তাহাতে আমার দুঃখ কিছু নাই। বরং এই গ্রন্থ এবং গ্রন্থবিবৃত সাহিত্য সমালোচনার সূত্রে, প্রসঙ্গ ও পদ্ধতি অবলম্বনে সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য, বিশেষভাবে রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচনায় যে সজাগ প্রয়াস আরম্ভ হইয়াছে, তাহা আমার পক্ষে আত্মপ্রসাদের বস্তু।

এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ যেদিন প্রকাশিত হইয়াছিল সেদিন পঁচিশে বৈশাখ, রবীন্দ্রনাথের জীবিত কালের শেষ জন্মদিন। সেদিন একখণ্ড গ্রন্থ তাঁহার হাতে সমর্পণ করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল; আজ সে সৌভাগ্য পুনরাবর্তনের কোনও উপায় নাই! প্রথম সংস্করণে রবীন্দ্র-সাহিত্যের যে কয়টি প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করিয়াছিলাম, তাহার প্রত্যেকটিই ছিল অসম্পূর্ণ: রবীন্দ্রবৃত্ত তখনও পূর্ণ হয় নাই, একটু দূর হইতে সে-বৃত্তটি সম্পূর্ণ দেখিবার সুযোগও ছিল না। আজ সে-বৃত্ত পূর্ণ; তাহাকে সম্যক্ সম্পূর্ণ দেখিতে পাইতেছি, একথা বলা এখনও কঠিন, হয়ত এখনও অসম্ভব। তবু আমার প্রসঙ্গ ক'টি অসম্পূর্ণ রাখিবার যুক্তি অনেকটা শিথিল হইয়া গিয়াছে। এই

কারণে বর্তমান সংস্করণে কাব্য, নাটক, গল্প, উপন্যাস এই চারিটি প্রসঙ্গেই কবিগুরুর আমৃত্যু সমগ্র সৃষ্টি আমার আলোচনাগত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। শুধু তাহাই নয়, প্রথম অধ্যায়ে তাঁহার কবি-মানসের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য, দ্বিতীয় অধ্যায়ে জীবন-দেবতা প্রত্যয়ের যথার্থ প্রকৃতি, এবং অন্য চারিটি অধ্যায়ে নানাসূত্রে, নানা প্রসঙ্গে তাঁহার সৃষ্টিমানসের রহস্যপ্রকৃতি আরও বিস্তৃতভাবে উদ্‌ঘাটিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই সব কারণে গ্রন্থের কলেবর অনেক বাড়িয়া গিয়াছে, এবং তাহার ফলে দ্বিতীয় সংস্করণ দুইটি পৃথক পৃথক খণ্ডে প্রকাশ করা প্রয়োজন হইল। বলা বাহুল্য এত শীঘ্র দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না ; ইচ্ছা ছিল যদি কোনও দিন দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিতে হয়, একেবারে নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজাইয়া গুছাইয়াই করিব ; কিন্তু যতটা সময় ও সুযোগ পাইলে তাহা সম্ভব হইত নানা বিচিত্র কর্মবিপাক ও বৈপরীত্যে তাহা হইল না। যতটুকু পারিয়াছি তাহাই পাঠকের হাতে তুলিয়া দিলাম। তবু, রবীন্দ্র-সৃষ্টিমানসের একটা সমগ্র পরিচয় পাওয়ার সহায়তা খানিকটা ত হইবে।

আমি জানি, এবং অনেক সমালোচকও ইঙ্গিত করিয়াছেন যে আমি সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যকে আমার আলোচনার বিষয়ীভূত করি নাই ; আমার গ্রন্থে তাঁহার গান, শিশু-সাহিত্য, প্রবন্ধাবলী, চিঠিপত্র ইত্যাদির আলোচনা করা উচিত ছিল। এই অভাব অস্বীকার করিবার উপায় নাই ; এবং সে সম্বন্ধে প্রথম হইতেই যথেষ্ট সজাগও ছিলাম ; কিন্তু একটি খণ্ডে সুবিপুল রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমস্ত প্রসঙ্গ আলোচনার স্থান এবং সুযোগ ছিল না। প্রথম সংস্করণ বাহির হইবার পর ইচ্ছা ছিল আর একটি খণ্ডে এই সব প্রসঙ্গের আলোচনা উত্থাপন করিব ; কিছু কিছু প্রয়াস আরম্ভও করিয়াছিলাম, কিন্তু ইতিমধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজন হইল, এবং তাহাই দুইখণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে।

কাজেই তৃতীয় আর একটি খণ্ডের প্রয়োজনীয়তা এখনও রহিল। সে-খণ্ড রচনাধীন। তাহাতে থাকিবে; (১) প্রবন্ধমালা; (২) চিঠিপত্র; (৩) শিশু-সাহিত্য; (৪) গীত-বিতান; (৫) কাব্যের আঙ্গিক; (৬) গদ্য বিকাশের ধারা; (৭) রবীন্দ্র-সাহিত্য ও বাঙালী সমাজ। তবে, কবে এই তৃতীয় খণ্ড পাঠকের হাতে পৌঁছাইতে পারিব তাহার প্রতিশ্রুতি আজ কিছুতেই দেওয়া সম্ভব নয়।

প্রথম সংস্করণের কোনও কোনও সমালোচনায় লক্ষ্য করিয়াছিলাম, এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য কেহ কেহ ভুল বুঝিয়াছিলেন। হয়ত, আমিই আলোচনা প্রসঙ্গে তাহা সুস্পষ্ট করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে পারি নাই। এক কথায়, আমার উদ্দেশ্য, দেশ ও কালের পটভূমিকায় রবীন্দ্র-মানসের প্রকৃতি উদ্‌ঘাটন। তাহা করিতে গিয়া বিরাট রবীন্দ্র-সাহিত্যকে আমার আলোচনার বিষয়ীভূত করিতে হইয়াছে, এবং সে আলোচনাও আবার একটি বিশেষ রীতি-পদ্ধতি অনুযায়ী। এই উদ্দেশ্য ও আলোচনার রীতিপদ্ধতি সম্বন্ধে বর্তমান সংস্করণে 'কাব্যপ্রবাহ' নিবন্ধের গোড়াতেই একটু বিস্তৃততর ব্যাখ্যা করিয়াছি। সবিনয়ে তাহার প্রতি পাঠক-পাঠিকাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই।

বর্তমান সংস্করণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপাখানায় ঢুকিয়াছিল দুই বৎসর আগে মুদ্রণকার্য অনেকদূর অগ্রসর হইবার পর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পক্ষেও কাগজ সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিল। ঠিক এই সময় রাজরোষে আমি কারাগারে বন্দী হইলাম, এবং প্রায় এক বৎসর কাটিল বন্দীদশায়। মুক্তিলাভের পর বিশ্ববিদ্যালয় আবার কাগজ সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াও যখন ব্যর্থকাম হইলেন তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আমার প্রার্থনাক্রমে অন্যত্র গ্রন্থপ্রকাশের ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুমতি দান করিলেন। স্বল্পকালের

মধ্যেই "দি বুক এম্পরিঅম লিমিটেড" ও তাহার সুযোগ্য কর্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় সাগ্রহে ও সোৎসাহে এই সুদীর্ঘ গ্রন্থপ্রকাশের ভার গ্রহণ করেন, এবং কাগজের এই দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যতার দিনেও কয়েকমাসের মধ্যে মুদ্রণ ও গ্রন্থন-কার্য সম্পন্ন করিয়া দেওয়াতে আজ আমার পক্ষে দ্বিতীয় সংস্করণ আমার সহৃদয় পাঠকবর্গের হাতে তুলিয়া দেওয়া সম্ভব হইল। "দি বুক এম্পরিঅম লিমিটেড" গ্রন্থপ্রকাশব্যাপারে ইতিমধ্যেই সুরুচি ও প্রশংসনীয় উদ্যমের পরিচয় দিয়া লেখক ও প্রকাশক সমাজে বিশিষ্টতা অর্জন করিয়াছেন। তাঁহারা আমার ধন্যবাদার্হ।

বর্তমান সংস্করণ প্রকাশে আমি সর্বতোভাবে যাঁহার কাছে সহায়তা ও উৎসাহ লাভ করিয়াছি তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম কর্ণধার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। আমার সকল প্রকার সাহিত্য-প্রচেষ্টায় তাঁহার উৎসাহ আমি কিছুতেই ভুলিতে পারি না। বস্তুত, তাঁহার ঋণ অপরিশোধ্য, এবং তাঁহার প্রতি কোনও কৃতজ্ঞতা প্রকাশই যথেষ্ট বলিয়া আমি মনে করি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ও আমার প্রতি সর্বদাই যথেষ্ট স্নেহ ও আনুকূল্য প্রকাশ করিয়াছেন; তাঁহার প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নাই।

মুদ্রণ পরীক্ষা কার্যে আমি অত্যন্ত অপটু। প্রকাশকের যথেষ্ট ও যথাসাধ্য সাহায্য ও আনুকূল্য সত্ত্বেও এবারও কিছু কিছু ভুল থাকিয়াই গেল; তবে আশা করি কোনটাই খুব কিছু মারাত্মক নয়। এই সংস্করণের নাম-সূচী সংকলন করিয়াছেন আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান সুধীররঞ্জন দাস। তাঁহাকে সস্নেহ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

যে-শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠায় আমি এই রবীন্দ্র-পূজা করিয়াছি, এই গ্রন্থ যদি সেই শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার কিছুমাত্র অংশও পাঠকচিত্তে সঞ্চার করিতে পারে,

তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ বোধ করিব। ইতি, ২২শে শ্রাবণ, ১৩৫১

বিনয়াবনত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নীহাররঞ্জন রায়

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

রবীন্দ্রনাথের আশি বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল। বাঙালী ও ভারতবাসীর পরম সৌভাগ্যের বিষয়, তিনি আজও আমাদের মধ্যে বর্তমান। জরা তাঁহার বলিষ্ঠ মন ও চিত্তকে জীর্ণ করিতে পারে নাই; ক্ষীয়মাণ দেহের শাসন-নাশন উপেক্ষা করিয়া তাঁহার বুদ্ধি ও কল্পনা থাকিয়া থাকিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেছে।

পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া এই দুর্জয় প্রদীপ্ত প্রতিভা বাংলা সাহিত্যের চক্রবর্তিক্ষেত্রে জ্যোতি বিকিরণ করিতেছে; শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনের সকল স্তরের সকল জ্ঞান ও কর্মে ধ্যান ও ধারণায় চিন্তা ও আদর্শে, আচার ও ব্যবহারে তাঁহার অপরিমেয় দান ও প্রদীপ্ত প্রতিভার চিহ্ন সুপরিস্ফুট। একথা আজ আর কোনও প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

আমার এই গ্রন্থ সেই দান ও সেই সূর্যকরোজ্জ্বল কবিপ্রতিভার সমগ্র পরিচয় দিবার স্পর্ধা রাখেনা। রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠে যাঁহারা আনন্দলাভ করেন, যেই সাহিত্য-তীর্থে পরিক্রমা করিয়া যাঁহারা অন্তরে তৃপ্তিলাভ করেন, আমি সেই সহস্রের একজন। যে চংক্রম-পথ ধরিয়া আমি এই তীর্থ-পরিক্রমা করিয়াছি, সে-পথই একমাত্র পথ এ-দাবি

করিবার মতন স্পর্ধাও আমার নাই। তবু, এই পথ ধরিয়া তীর্থ-দেবতার সন্ধান পাইয়াছি বলিয়া আমার মনে হইয়াছে। গত পনের বৎসর ধরিয়া নানাস্থানে নানাভাবে আমি আমার এই পথশ্রমের আনন্দ, তীর্থ-সান্নিধ্যের আনন্দ কিছু কিছু ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। কিছু ছাপার অক্ষরে পাঠকজনের গোচর হইয়াছে নানা সাময়িক পত্রের পাতায়, কিন্তু অধিকাংশই পাণ্ডুলিপি অবস্থায় গোপন ছিল। আজ দীর্ঘকাল পর কবি যখন জরায় আক্রান্ত তখন মনে হইল, রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভাণ্ডার হইতে যত আনন্দ প্রতিদিন আহরণ করিয়াছি, এখনও করিতেছি সেই অপরিমেয় আনন্দের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোনও চেষ্টাই করা হয় নাই। এই গ্রন্থ আমার সেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষীণতম প্রয়াস মাত্র।

রবীন্দ্র-সাহিত্যসাধনার সকলদিক এই গ্রন্থে আলোচিত হয় নাই। যে-সব দিক আলোচিত হইয়াছে তাহাও অসম্পূর্ণ, কারণ একান্ত অধুনাতন রচনাগুলি ইচ্ছা করিয়াই আমি এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করি নাই। কাব্যপ্রবাহের আলোচনায় "পূরবী"তে (১৩৩১), ছোটগল্পে 'নামঞ্জুর গল্পে' (১৩৩২), নাটকে "রক্তকরবী"তে (১৩৩১) এবং উপন্যাসে "শেষের কবিতা"য় (১৩৩৫) পৌছিয়াই ছেদ টানিয়াছি। কোনও ক্ষেত্রেই এই ছেদের বিশেষ কোন অর্থ বা উদ্দেশ্য নাই; সাধারণভাবে এইটুকুই শুধু বলিতে পারি, একান্ত সাম্প্রতিক রচনাগুলি সম্বন্ধে সমসাময়িক মানস-দৃষ্টি কতকটা আচ্ছন্ন থাকা একেবারে অসম্ভব নয়। সেই আশঙ্কায় আমি সে-চেষ্টা করি নাই। "কবি রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধটি আমি সূচনায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছি এই কারণে যে, এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় সমস্ত গ্রন্থের কুঞ্চিকা বলিয়া আমি মনে করি। "রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বজীবন" প্রবন্ধটি এই গ্রন্থে না থাকিলেই ভাল হইত, বন্ধুপ্রীতির দাবিতে ইহাকে স্থান দিতে হইয়াছে। অন্য চারিটি

ছোট বড় অধ্যায়ে রবীন্দ্র-সাহিত্যের যে কয়টি দিক আলোচিত হইয়াছে, তাহার দৃষ্টি ভঙ্গির প্রতি সবিনয়ে পাঠকবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করি। আমার আলোচনা কালানুক্রমিক; রবীন্দ্র-মানসের ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিবর্তন এই কালানুক্রমিক পাঠ ও আলোচনা ছাড়া সম্পূর্ণ বুদ্ধিগোচর হয়না বলিয়া আমার বিশ্বাস। দ্বিতীয়ত, আমি সর্বত্রই রবীন্দ্র সাহিত্যকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি, কবির ব্যক্তিজীবন ও সমসাময়িক সমাজেতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে। আমার ধারণা, এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া দেখিলে রবীন্দ্র-মানস ও রবীন্দ্র-সাহিত্য বুঝিবার সুবিধা হয়। কলাকৌশলের আলোচনা আমি ততটুকুই করিয়াছি যতটুকু রবীন্দ্র-কবিমানসকে বুঝিবার জন্য প্রয়োজন, যতটুকু রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভাব ও রসানুভূতির সহায়তা করে।

এই সুদীর্ঘ গ্রন্থ-রচনায় জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে অনেকের নিকট হইতেই ঋণগ্রহণ করিয়াছি। রবীন্দ্র-সাহিত্য লইয়া কতদিন কতজনের সঙ্গে কতরকম আলোচনা হইয়াছে; কাহার কোন্ চিন্তা ও ধারণা কি ভাবে আত্মসাৎ করিয়াছি তাহার হিসাব রাখি নাই; প্রত্যক্ষ ঋণ যাহাদের নিকট লইয়াছি, সবত্রই তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহাদিগকে, এবং পরোক্ষ ঋণ যাঁহাদের নিকট লইয়াছি তাঁহাদের সকলকে আমার সবিনয় কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

এই গ্রন্থের 'প্রুফ' দেখিতে সাহায্য করিয়াছেন শ্রীমতী মণিকা দেবী। তিনিই বিষয়-সূচী এবং নামসূচীও সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে আমার যে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ তাহাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোনও অবকাশ নাই।

অনেকগুলি ভুল ত্রুটি রহিয়া গেল; তাহার কিছু অনবধানতা বশত, কিছু হয়ত অজ্ঞতায়। স্বল্পজ্ঞান লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়-নির্ধারিত বানান-পদ্ধতি অনুসরণ করিতে গিয়াও কিছু গোলমাল করিয়া

ফেলিয়াছি। ভাষার শৈথিল্যও হয়ত স্থানে স্থানে প্রকাশ পাইয়াছে। এই সব ভুলের সমস্ত অপরাধই আমার, এবং তাহার জন্য পাঠকের তিরস্কার সহ্য করিতেই হইবে, সমালোচকের ত কথাই নাই। তবে আশা করি, এই জাতীয় ভুল যাহা আছে তাহার কোনটিই খুব মারাত্মক নয়, এবং আমার বক্তব্য তাহাতে আহত বা আচ্ছন্ন হয় নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও রেজিস্ট্রার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আনুকূল্য ছাড়া এই গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইবার গৌরব লাভ করিতে পারিত না। ইঁহাদের উভয়ের নিকট আমি স্নেহঋণে আবদ্ধ, একথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

শ্রীসরস্বতী প্রেসের কর্মাধ্যক্ষ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ গুহরায় দুই বৎসর ধরিয়া আমার অনেক উৎপাত সহ্য করিয়াছেন। তাঁহাকেও সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাইতেছি। ইতি, ১লা বৈশাখ, ১৩৪৮

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বিনয়াবনত
নীহাররঞ্জন রায়

প্রথম খণ্ডের

বিষয়-সূচী

'উর্বশী'—'১৪০০ শাল'—'এবার ফিরাও মোরে'—কবিমানসের অপরূপ পরিণতি—প্রেম ও সৌন্দর্যময় জীবন-পর্যায়ের পরিপূর্ণতা—"চিত্রা" "সোনার তরী" অপেক্ষা আরও গাঢ় ও সংহত ও গভীরতর অনুভূতির কাব্য—"সোনার তরী" "চিত্রার" ভূমিকা—'নদী'—'বিদায় অভিশাপ' ও প্রকাশভঙ্গির নূতনত্ব—"চৈতালি"তে জীবনান্তরের আভাস—চতুর্দশ-পদী কবিতা—মানব-মহিমার পূজা—"চৈতালি" "নৈবেদ্য"-গ্রন্থের ভূমিকা—(৫) জীবনসন্ধি যুগ—জীবনকে গভীর ভাবে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা—"কথা", "কাহিনী" প্রভৃতি গ্রন্থের উপাদান এবং কবিচিত্তে ভারতীয় ঐতিহ্যের আবেদন—মানব-মহিমার ভারতীয় রূপের ও ধর্মের প্রতি কবিচিত্তের বিশেষ আকর্ষণ—ঐতিহ্য অবগাহন—সমসাময়িক সমাজ মানস—"কল্পনা"য় কবিচিত্তের দুই ধারা—কবির সৃষ্টি-প্রচেষ্টাকে নামাঙ্কিত করিবার বিপদ—গভীর জীবনদ্বন্দ্ব—নূতন মহাজীবনের আহ্বানের স্বীকার—'বর্ষশেষ' 'রাত্রি' প্রভৃতি কবিতা—"ক্ষণিকা"য় ক্ষণিককালের সহজ সাধনা—দুইদিকের টানে স্পর্শকাতর চিত্তের বেদনা—"ক্ষণিকা"র ছন্দরূপ—প্রেম ও সৌন্দর্য-তন্ময় জীবন হইতে একান্ত বিদায়—(৬) "নৈবেদ্য"-গ্রন্থে ভারতীয় মহিমা গভীরতর প্রকাশ—স্বদেশ-চেতনা—অধ্যাত্ম-চেতনা ও অধ্যাত্মাদর্শ—সংসার-নিরপেক্ষ সাধনা নয়—সহজ উপলব্ধির সূচনা—ভাবোন্মাদ মত্ততাব প্রতি বিরাগ—বীর্য ও জ্যোতি, জ্ঞান ও কর্মময় ভক্তি—মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ আদর্শের সাধনা—বৈষ্ণব ভক্তি-সাধনার সঙ্গে পার্থক্য—"স্মরণ" ব্যক্তিগত শোকের নৈর্ব্যক্তিক অভিব্যক্তি—মৃত্যুর মাধুরী জীবনের মধ্যে বিস্তৃত—"শিশু"র কবিতা শিশুর মুখের বা মনের কথা নয়, শিশুর মনের সহজ খেয়াল কবির মনে তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসায় পরম রহস্যে রূপান্তরিত—"উৎসর্গ"—"খেয়া" ও সমসাময়িক বাংলার সমাজ ও রাষ্ট্র—পারিবারিক জীবনে মৃত্যুর হানা—"নৈবেদ্য"-গ্রন্থের

আহ্বান—"পলাতকা"য় মাটির স্বর্গের ঠিকানা—পুরাতন জীবনের নূতন অভিব্যক্তি—সমাজ-চেতনার পরিচয়—"শিশু ভোলানাথ" ও মানসিক নির্লিপ্ততা—"লিপিকা" এবং কাব্যের নূতনরূপ—"শিশু ভোলানাথ" ও "লিপিকা"র কাব্য-মূল্য—(৯) "পূরবী"র সৃষ্টিউৎস—"পূরবী"র মূল সুর —হারাইয়া যাওয়া দিনগুলির জন্য দুঃখবোধ—'মাটির ডাক', 'লীলা সঙ্গিনী', 'বকুল বনের পাখি'—'তপোভঙ্গ' কবিতায় কবির নিজের তপস্যা-ভঙ্গ—"পূরবী"র ছন্দজগৎ—'ক্ষণিকা', 'কৃতজ্ঞ', 'বৈতরণী'—"লেখন"—"বৈকালী"—"মহুয়া"র উৎস—"মহুয়া"র উন্মাদন গন্ধ—প্রেম ও প্রণয়ের কবিতার দুই দিক—নারীর নূতন রূপ-কল্পনা—"বনবাণী" নিসর্গ-বিশ্ব ও উদ্ভিদ-জীবনের প্রশস্তিকাব্য—নিসর্গ-বিশ্বের এক নূতন অর্থগভীর পরিচয়—রবীন্দ্রনাথের কল্পদেবতা কি শিব ?—শিব-ঐতিহ্যের নূতন অর্থনির্দেশ, নূতনতর ব্যঞ্জনা—(১০) কবিজীবনের শেষ-অধ্যায়ের ভূমিকা—রবীন্দ্র-জীবনের সামাজিক পটভূমি—রবীন্দ্র-সৃষ্টির সচেতন প্রাণবান গতিধর্ম—রবীন্দ্র-রোম্যান্টিক মনোধর্মের বিশেষ প্রকৃতি—শেষ দশকের আন্তর্জাতিক সামাজিক পটভূমি—মৃত্যুর অগ্রসরমান মূর্তি—কবিচিত্তে ইহাদের প্রতিক্রিয়া—বস্তুধর্মের গভীরতা বোধ—ঐতিহাসিক বোধের প্রথম সূচনা—মৃত্যুকল্পনার পৌনঃপুনিক উপস্থিতি —নূতন সুগভীর প্রজ্ঞা—গভীর পরিব্যাপ্ত বিশ্বাস—জগৎ ও জীবন, মাটি ও মানুষের প্রতি সুগভীর মমত্ববোধ—ঐতিহাসিক চেতনায় কবি-মানসের নবজন্ম—(১১) শেষ-অধ্যায়ে রবীন্দ্র-রচনার প্রাচুর্য—"পরিশেষ" আত্মবিশ্লেষণের, আত্মপরিচয়ের কাব্য—বিশ্বজীবনের প্রতি গভীর প্রীতি ও ভালবাসা নূতন শক্তি ও উদ্দীপনায় সঞ্জীবিত—বিশ্ব-সত্তার গভীরতর পরিচয়—নূতন জীবন, নূতন সম্ভাবনার ইঙ্গিত—সমসাময়িক রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিবেশ—"বিচিত্রিতা"য় ছবির সূত্র ধরিয়া মনন কল্পনার প্রসার—গগনেন্দ্রনাথের শিল্পপ্রতিভার প্রতি

সম্মান—"বীথিকা" অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ—"বীথিকা"র কবিমানস অতি গভীরে প্রসারিত, গভীর গম্ভীর জীবন-জিজ্ঞাসায় রূপান্তরিত—প্রেমের কবিতাগুলি পুরাতন স্মৃতিবহ—আখ্যানবাহী লীলাচপল কবিতা—মৃত্যুর পদচিহ্ন—(১২) "পুনশ্চ-শেষসপ্তক-পত্রপুট-শ্যামলী"-কাব্যে নূতন রীতির প্রবর্তনা—ঋতুপরিবর্তন হইয়াছে বলিয়াই রীতি পরিবর্তন অনিবার্য হইয়াছে—ঋতুপরিবর্তনের প্রমাণ দৃষ্টিভঙ্গির নূতনত্ব—"পুনশ্চ"র প্রথম তিনটি কবিতায় নূতন রীতির ব্যাখ্যা—"শেষ-সপ্তকে"র তিনটি কবিতা—কবিপ্রেরণা সার্থকতা লাভ করিয়াছে কি?—কাব্যে গদ্যরীতির সার্থকতা—কাব্যসাধনার অপূর্ণতা আত্মসম্ভোগ ও নিসর্গ সম্ভোগ—গভীর গম্ভীর তত্ত্ব ও অধ্যাত্মজিজ্ঞাসা—মৃত্যু ও মহাকাল সম্বন্ধে কবির মনন-কল্পনা-"শ্যামলী"র লিরিক কবিতাপুঞ্জ—"পত্রপুট" বিশিষ্ট ও মহৎকাব্য—(১৩) "প্রান্তিকে" দুই ধারা—সমাজ-চেতনার পরিচয়-"আকাশ-প্রদীপে" বক্তব্যের দ্বিধা—নূতন জীবন-দৃশ্যের চেতনা—"আকার-প্রদীপে"র কবিতা স্বপ্নময় ও স্মৃতিবহ—ব্যক্তিগত জীবনের অতীত-অনুধ্যান—পরিণত মননশীলতার পরিচয়—নারীসম্বন্ধগত সংস্কার—"সেঁজুতি" সার্থকনামা কাব্য—সন্ধ্যাবাতি জ্বালাইয়া জীবন-দিবার হিসাব নিকাশ—'আজ মম জন্মদিন'—মাটির কাছে ঋণ-স্বীকার—"প্রহাসিনী" অম্লমধুর ক্ষণিক হাস্যপরিহাসের কাব্য—"নবজাতকে" নূতন ঋতুর সূচনা ও পরিচয়—নূতন সমাজবোধ ও ইতিহাস-চেতনা—রবীন্দ্রনাথের 'বাস্তব'—নিরলংকার বিরল-সৌষ্ঠব স্বল্পভাষিতার সূত্রপাত—বিষয়বস্তুর নূতনত্ব—নূতন সৃষ্টিতে বিশ্বাস—'হিন্দুস্থান' ও 'রাজপুতানা'—ব্যক্তিগত জীবন-বিশ্লেষণ ও হিসাব-নিকাশ—মৃত্যুকল্পনার দীপ্তি—"সানাই"র প্রেমময় আবেশময় স্মৃতি-সৌরভ—বহুদিনের পুরাতন সুর রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে—ব্যথিত ঔদাসীন্য ও আনন্দবেদনার অঞ্জলি—কিন্তু আর কি তাহা সম্ভব?—চৈত্রের ছড়ান

নেশা বোমার বর্ষণে একমুহূর্তে চূর্ণ হইয়া যায়—রবীন্দ্র-ভাবকল্পনার প্রকৃতি ও তাহার পুনরুদ্‌ঘাটন—(১৩) মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয়—"রোগ-শয্যায়" দেশহীন কালহীন আদি জ্যোতির ধ্যান—শেষ চারিটি কাব্যের আশ্রয় সমস্ত মানব-সংসার—"রোগশয্যায়" ও "আরোগ্য-গ্রন্থে গভীরতর জীবনদর্শন, দৃষ্টির সহজ স্বচ্ছতা—কবিতার নূতন রূপ ও ভঙ্গি—দুর্বল রোগজীর্ণ দেহে সবল প্রাণ অপরাজেয় আত্মার স্ফুরণ—আন্তর্জাতিক সমাজচেতনা—নিরাসক্তমোহমুক্ত দৃষ্টি—সৃষ্টির অন্তহীনতায় সবল প্রাণের সুগভীর বিশ্বাস—গভীর পরিব্যাপ্ত বিশ্বাসের আকাশ শেষচারিটি কাব্যে বিস্তৃত—জীবন ও মৃত্যুর মুখোমুখি রূপ—মধুময় পৃথিবীর ধূলি—চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে জীবনের উপেক্ষিত ছবির পুনরাবর্তন—গভীর সাম্প্রতিক চেতনা ও জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি—মৃত্যুর অমৃতরূপে "আরোগ্য"র কবিতগুলি উদ্ভাসিত—মাটির ধরণী ও মাটির মানুষের প্রতি গভীর প্রীতি ও ভালবাসা—"জন্মদিনে" জন্ম-মৃত্যুর মিলন-মোহানার কাব্য—মৃত্যুর মহা আবির্ভাব—গভীর মর্মানুভূতি—সাম্প্রতিক চেতনা—মহা-মানবে বিশ্বাস না মানব-মহিমারই দেশকালধৃত বিশিষ্টরূপে বিশ্বাস—জীবনের অসম্পূর্ণতার বেদনার পুনশ্চেতনা—কবিমানসের নূতন পরিচয়—"শেষ লেখা"র ঔপনিষদিক বাণীরূপ—কবিতা না মন্ত্র, চরম অভিজ্ঞতার পরমতম বাণী—স্বচ্ছ জ্যোতির্ময় আত্মার যথার্থ বাণীদেহ—দ্রষ্টা-ঋষির বিস্মিত মন্ত্র—মৃত্যু-রাহুর ক্ষমতা নাই জীবনের স্বর্গীয় অমৃত গ্রাস করিবার—ভয় আর বিভীষিকার অন্ধকারে মৃত্যুর নিপুণ শিল্পকার্য বিকীর্ণ, ইহার ছলনা এড়াইয়া অক্ষয় শান্তির অধিকার—পরম ঔদাসীন্য, অসীম বৈরাগ্য—ইহাই কি পরম পরিণতি, dust unto dust ? তবু, মধুময় এই পৃথিবী, মধুময় এই পৃথিবীর ধূলি, মধুময় এই পৃথিবীর ধূলির গড়া মানুষ।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা

কবি রবীন্দ্রনাথ

(১)

বহুদিন আগে বাংলা দেশের এক প্রতিভাবান মনীষীর বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি কথা শুনিয়াছিলাম। সে কথাটি এখন আর যথাযথ মনে নাই; মোটামুটি তিনি এই ধরনের একটি কথা বলিয়াছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথ কবি, রবীন্দ্রনাথ প্রতিভাবান সুলেখক, রবীন্দ্রনাথ চিন্তাশীল দার্শনিক, রবীন্দ্রনাথ সুপণ্ডিত, রবীন্দ্রনাথ আদর্শ নৈষ্ঠিক গৃহস্থ, সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ ঋষি।' যথাযথভাবে কথাটি আমি উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্রতিভার কথা বলিতে গিয়া লেখক তাঁহার ঋষিত্বকেই সকলের চেয়ে বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল, এই কথাটা মনে আছে। ইহা কিছু অস্বাভাবিকও নয়। কারণ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র রবীন্দ্রনাথ, উপনিষদের ভাবরসপুষ্ট রবীন্দ্রনাথ, "গীতাঞ্জলি"র রবীন্দ্রনাথ, অসংখ্য ধর্মসংগীতের রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ, "মানুষের ধর্ম"-রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ, এবং পরম সুরসিক তত্ত্বজ্ঞ রবীন্দ্রনাথকে ঋষি বলিয়া মনে হইবে, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। যে আত্মমগ্ন ধ্যান-দৃষ্টি, যে পরম জ্ঞান ও প্রতিভা, যে দিব্য বৈরাগ্য, এবং সর্বোপরি যে বিরাট ব্যক্তিত্ব আমাদের ভারতীয় ঋষিত্বের আদর্শকে মহীয়ান করিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অল্পবিস্তর সঞ্চারিত হইয়াছে। সত্যই,

রবীন্দ্রনাথকে ঋষি বলিলে অত্যুক্তি কিছু করা হয় না। তবু, বলিতে ইচ্ছা হয়, সব কিছু ছাড়িয়া, সব কিছুর উপরে, সব কিছুর মূলে রবীন্দ্রনাথ কবি। তাঁহার প্রতিভা সর্বতোমুখী, একথা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যতখানি সত্য, বর্তমান জগতে আর কোনও মানুষের পক্ষেই হয়ত ততখানি সত্য নয়, কিন্তু তাঁহার প্রতিভার সকল দিক ছাড়াইয়া উঠিয়াছে তাঁহার কবি প্রতিভা। পণ্ডিত রবীন্দ্রনাথ, ঋষি রবীন্দ্রনাথকেও ম্লান করিয়াছেন কবি রবীন্দ্রনাথ।

বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের সকল প্রকার চিন্তা ও কর্মপ্রচেষ্টা তাঁহার অন্তর্নিহিত সত্তার আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা ছাড়া আর কিছু বলিয়া মনে করিতে পারি না। কাব্যে-সংগীতে-গল্পে-নাট্যে-উপন্যাসে তিনি যেমন করিয়া আপনার আনন্দের ব্যাকুলতাকে প্রকাশ করিয়াছেন, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্মপ্রচেষ্টায়, শিক্ষাদান ও প্রচারে, তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও ব্যাখ্যায়, অধ্যাত্মবোধ এবং তাহার প্রচারেও তিনি তেমন করিয়াই নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রকাশ কোনও নূতন জ্ঞানলাভের প্রেরণায় বা প্রয়োজনের তাড়নায় নয়। বিশ্বজীবনের বিচিত্র বিকাশের সঙ্গে মানুষের একটা নিবিড় যোগ আছে ; বুদ্ধির সাহায্যে, জ্ঞানের প্রেরণায় এ-সম্বন্ধকে কেহ জানিতে চায়, প্রয়োজনের তাড়নায় এ-সম্বন্ধকে কেহ দৃঢ় করিয়া বাঁধিতে চায়। কিন্তু এই জাতীয় চেষ্টার বাহিরেও একটা চেষ্টা মানুষের আছে ; মানুষ চায় এই সম্বন্ধটিকে, এই নিবিড় সংযোগের রসটিকে ভোগ করিতে, জানিতে নয়—অনুভব করিতে। এই ভোগের ক্ষুধা, অনুভূতির প্রেরণাই কবি ও শিল্পীকে রূপসৃষ্টি, রসসৃষ্টির কাজে প্রবৃত্ত করে, তাঁহার নিদ্রিত চৈতন্যকে প্রকাশের তাড়নায় ব্যাকুল করিয়া তোলে। নানা যুগের নানা দেশের ইতিহাস যে কাব্যে-সংগীতে-চিত্রে-ভাস্কর্যে পুষ্পিত ও অলংকৃত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে এই অনুভূতির আবেগ, প্রকাশের প্রেরণা, নিজের

সত্তার আনন্দবোধকে বিকশিত করিবার ব্যাকুল প্রয়াস। এই যে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজীবনের বিচিত্র প্রকাশের রসকে ভোগ করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহার মনে যে অনুভূতির আবেগ জাগিয়াছে, তাহারই ফলে তিনি অদ্বিতীয় রূপস্রষ্টা, অদ্বিতীয় কবি। তাঁহার এই কবি-মানস, বস্তুত সকল প্রকার রূপ-মানসের মূলে আছে এই রসভোগের ইচ্ছা, অনুভূতির প্রেরণা, প্রকাশের প্রেরণা,—জ্ঞানের প্রেরণা নয়, প্রয়োজনের তাড়না নয়।

একদিন রবীন্দ্রনাথ—তখন তাঁহার বয়স কুড়ি কি একুশ বৎসর হইবে—কলিকাতায় সদর স্ট্রীটের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়াইয়া এক অপূর্ব সুমহান প্রত্যয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়াছিলেন। সেই সকাল বেলায় এক জ্যোতির্ময় মুহূর্তে মানুষের সঙ্গে বিশ্বজীবনের, বিশ্বপ্রকৃতির সত্য সম্বন্ধটিকে তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন; পরবর্তী জীবনে কাব্যে-গানে-কর্মে-চিন্তায় এই প্রত্যয়টি কত ভাবে ও কত রূপে যে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রত্যয়-ভাবনার দিক হইতে, অধ্যাত্ম-বোধের দিক হইতে এই প্রত্যয়টির একটি বিশেষ মূল্য আছে, এবং ইহা চিন্তাজগতের একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। অথচ রবীন্দ্রনাথের এ-প্রত্যয় কিছু তত্ত্বচিন্তা অথবা অধ্যাত্মবোধের ফল নয়, একটি অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিক অনুভূতির ফলেই এই সত্যকে তিনি জানিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার কাছে কিছু "তত্ত্বও নয়, বিজ্ঞানও নয়, কোন প্রকার কাজের জিনিসও নয়, তাহা চোখের জল ও মুখের হাসির মত অন্তরের চেহারা মাত্র। তাহার সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞান, বিজ্ঞান কিংবা আর কোনো বুদ্ধিসাধ্য জিনিস মিলাইয়া দিতে. পার তো দাও, কিন্তু সেটা গৌণ" ("জীবনস্মৃতি")। কবিধর্মের, সৃজন-প্রতিভার ইহাই স্বরূপ; এবং এই স্বরূপটিই রবীন্দ্রনাথের সকল

প্রকার চিন্তা ও কর্মপ্রচেষ্টায় ব্যক্ত হইয়াছে। বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের এই কবি-মানস কি ভাবে অঙ্কুর ফুঁড়িয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, "জীবন স্মৃতি" হইতে রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায় একটু উদ্ধৃত করিলেই ইহার স্বরূপটি বুঝা যাইবে—

"নূতন ব্রাহ্মণ হওয়ার পরে গায়ত্রী মন্ত্রটা জপ করার দিকে খুব একটা ঝোঁক পড়িল। আমি বিশেষ যত্নে এক মনে ঐ মন্ত্র জপ করিবার চেষ্টা করিতাম। মন্ত্রটা এমন নহে যে, সে-বয়সে উহার তাৎপর্য আমি ঠিকমত গ্রহণ করিতে পারি। আমার বেশ মনে আছে, আমি "ভূর্ভুবঃস্বঃ" এই অংশকে অবলম্বন করিয়া মনটাকে খুব করিয়া প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতাম। কী বুঝিতাম, কী ভাবিতাম, স্পষ্ট করিয়া বলা কঠিন, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, কথার মানে বোঝাটাই মানুষের পক্ষে সব চেয়ে বড়ো জিনিস নয়। শিক্ষার সকলের চেয়ে বড়ো অঙ্গটা—বুঝাইয়া দেওয়া নহে—মনের মধ্যে ঘা দেওয়া। সেই আঘাতে ভিতরে যে-জিনিসটা বাজিয়া উঠে যদি কোনো বালককে তাহা ব্যাখ্যা করিতে বলা হয় তবে সে যাহা বলিবে সেটা নিতান্তই ছেলেমানুষি কিছু। কিন্তু যাহা সে মুখে বলিতে পারে, তাহার চেয়ে তাহার মনের মধ্যে বাজে অনেক বেশি * * * আমার মনে পড়ে ছেলেবেলায় আমি অনেক জিনিস বুঝি নাই, কিন্তু তাহা অন্তরের মধ্যে খুব একটা নাড়া দিয়াছে।"

শুধু ছেলেবেলায়ই নয়, পরবর্তী সমগ্র জীবনেও তাঁহার এই বিশিষ্ট কবিপ্রকৃতিই জয়যুক্ত হইয়াছে। এক একটা জিনিস এক এক সময়ে তাঁহার অন্তরের মধ্যে খুব একটা নাড়া দিয়াছে, এবং তাহারই ফলে তিনি সেই জিনিসকে ভোগ করিয়াছেন, পাইয়াছেন, অনুভব করিয়াছেন; বুদ্ধি দ্বারা, চিন্তা দ্বারা তাহাকে জানিতে অথবা প্রয়োজনের খাতিরে তাহাকে একান্ত করিয়া তুলিতে চাহেন নাই। নিজেই তিনি বলেন, "অন্তরের অন্তঃপুরে যে কাজ চলে, বুদ্ধির ক্ষেত্রে তাহার সকল খবর আসিয়া পৌঁছায় না।" আসল কথা রবীন্দ্রনাথের ভিতরকার গড়নটা কবির গড়ন, সাহিত্যিকের গড়ন; যখনই বিশ্বজীবনের কোনও কিছু তাঁহার অন্তরকে স্পর্শ করিয়াছে, তখনই তিনি কাব্যে, গানে,

বিচিত্র কর্মে ও চিন্তায় আপনাকে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন, আর কিছুরই অপেক্ষা রাখেন নাই। রবীন্দ্রনাথ তাই কবি, রূপকার, রসস্রষ্টা; তাঁহার সমগ্র জীবনের দৃষ্টি কবির দৃষ্টি। জগৎ ও জীবনকে তিনি দেখিয়াছেন, ভোগ করিয়াছেন—কোনও বিশিষ্ট-প্রত্যয়ভাবনা অথবা চিন্তাধারার ভিতর দিয়া ততটা নয়, যতটা নিজের অন্তরের অনুভূতি দিয়া। তাঁহার অসংখ্য গান ও কবিতার কথা ছাড়িয়া শান্তিনিকেতনের উপাসনা ও উপদেশ, নানান তত্ত্ব ও চিন্তাধারাকে অবলম্বন করিয়া যে বিশিষ্ট সাহিত্যরাজ্যটি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে বিহার করিলেও সহজেই বুঝা যায়, দৃশ্য ও অদৃশ্য জগৎ ও জীবনের মধ্যে যাহা রসের, যাহা অনুভূতির সেইদিকেই তাঁহার কবিচিত্তের সহজ গতি। অনেক সুমহান সত্যের ইঙ্গিত হয়ত তিনি পাইয়াছেন, তাঁহার রচিত বিভিন্ন সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে তাহা প্রকাশও পাইয়াছে; কিন্তু এই পাওয়া বা প্রকাশ কোন চিন্তাধারার অনুসরণ করিয়া অথবা তত্ত্বের তন্তুজাল বুনিয়া বুনিয়া নয়, জ্ঞানের সুদুর্গম পথের যাত্রী হইয়া নয়—অন্তরের সহজ অনুভূতির বিপুল ঐশ্বর্য দিয়া, রসিকচিত্তের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়া। যে-যুক্তিপর্যায়, যে-প্রমাণমালা, যে-বিচারের ভিতর দিয়া একটি তত্ত্বের, একটি সত্যের সন্ধান আমরা পাই, রবীন্দ্রনাথ তেমন করিয়া তাহার সন্ধান পান নাই। অথচ বিশ্বজীবনের অনেক নিগূঢ় রহস্যই, অনেক দুর্লভ দুরধিগম্য সত্যই তাঁহার নিকট উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, এবং তিনি তাঁহার অননুকরণীয় কবিজনোচিত ভাবে ও ভাষায় তাহা প্রকাশও করিয়াছেন। যুক্তি-শৃঙ্খলা বলিতে যাহা বুঝি, মনন-ক্রিয়ার পারম্পর্য বলিতে যাহা বুঝি, তাঁহার প্রকাশের মধ্যে হয়ত সর্বত্র তাহা নাই, যে সরস উপমা-সাদৃশ্য তাঁহার রচনার একটা বিশেষ ভঙ্গি, তাহা সর্বত্র সত্যও নয়, অকাট্য যুক্তি দিয়া হয়ত সব সময় তাহার প্রতিষ্ঠাও করা যায় না; কিন্তু সমস্ত যুক্তিকে অতিক্রম করিয়া হৃদয়ের মধ্যে যাহার

অনুভূতি ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎস্ফুরণের মত দেখা দেয়, যাহার বোধ কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, অন্তরের মধ্যে যাহার স্পর্শ সূর্যালোকের মত স্পষ্ট, সেখানে তাহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কবির অন্তরকে যাহা নাড়া দিয়াছে, পাঠকের অন্তরকেও তাহা নাড়া না দিয়া পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের যে-কোনও বিশিষ্ট চিন্তাধারার পরিচয় লইলেই বুঝা যাইবে, এই কবিপ্রকৃতির প্রকৃত রূপটি কি ?

সৌন্দর্যের মূল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটা বিশেষ প্রত্যয় আছে : যে-কেহ তাঁহার সাহিত্য ভাল করিয়া পড়িয়াছেন তিনিই এই বিশেষ প্রত্যয়টির খবর জানেন। "প্রভাত সংগীত" রচনার সঙ্গে সঙ্গে ইহার খবর সর্বপ্রথম আমরা পাই ; সূচনাটি কি করিয়া হইল, রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাহা বলিতেছেন,

"সামান্য কিছু করিবার সময়ে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যে গতি বৈচিত্র্য প্রকাশিত হয় তাহা আগে কখনও লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই—এখন মুহূর্তে মুহূর্তে সমস্ত মানবদেহের চলনের সংগীত আমাকে মুগ্ধ করিল। এ-সমস্তকে আমি স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতাম না, একটা সমগ্রকে দেখিতাম। এই মুহূর্তেই পৃথিবীর সর্বত্রই নানা লোকালয়ে, নানা কাজে, নানা আবশ্যকে কোটি কোটি মানব চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে, সেই ধরণীব্যাপী সমগ্র মানবের দেহচাঞ্চল্যকে সুবৃহৎভাবে এক করিয়া দেখিয়া আমি একটি মহাসৌন্দর্যনৃত্যের আভাস পাইতাম। * * * এতদিন জগৎকে কেবল বাহিরের দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছি, এইজন্য তাহার একটি সমগ্র আনন্দরূপ দেখিতে পাই নাই। একদিন হঠাৎ আমার অন্তরের যেন একটা গভীর কেন্দ্রস্থল হইতে একটা আলোকরশ্মি মুক্ত হইয়া সমস্ত বিশ্বের উপর যখন ছড়াইয়া পড়িল তখন সেই জগৎকে আর কেবল ঘটনাপুঞ্জ বস্তুপুঞ্জ করিয়া দেখা গেল না, তাহাকে আগাগোড়া পরিপূর্ণ দেখিলাম। ইহা হইতেই একটি অনুভূতি আমার মনের মধ্যে আসিয়াছিল যে, অন্তরের কোন একটি গভীরতম গুহা হইতে সুরের ধারা আসিয়া দেশে কালে ছড়াইয়া পড়িতেছে—এবং প্রতিধ্বনিরূপে সমস্ত দেশ কাল হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া সেইখানেই আনন্দস্রোতে ফিরিয়া যাইতেছে।" ("জীবনস্মৃতি")

এই উদ্ধৃত অংশটুকুর মধ্যে যাহা অস্পষ্ট, সেই অনুভূতিই ক্রমে রবীন্দ্রনাথের অন্তরে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া একটা বিশেষ তত্ত্বের রূপ ধারণ করিয়াছে। ইহাই পরবর্তী জীবনের 'ক্রিয়েটিভ য়ুনিটি'। পরবর্তী জীবনে সমস্ত সৃষ্টির মূলে এক বিরাট সৌন্দর্যময় ঐক্যানুভূতির কথা তিনি বহুবার বলিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্যধর্মের মূলেও রহিয়াছে এই সৌন্দর্যময় ঐক্যানুভূতি—'ক্রিয়েটিভ য়ুনিটি'র কথা। ইহাকে এখন আপাতদৃষ্টিতে আমরা কবির সুদীর্ঘ চিন্তাধারাপ্রসূত একটা বিশেষ মতবাদ বলিয়া দেখি। এ মতবাদ সত্য কি না, ইহার বিরুদ্ধ মতবাদ কিছু আছে কি না, ইহা বিচারগ্রাহ্য কি না, সে বিচার স্বতন্ত্র। কিন্তু একটা বিশেষ মতবাদ বলিতে আমরা যাহা বুঝি, যে বিশেষ জ্ঞান ও তত্ত্বচিন্তার ফল বলিয়া জানি, রবীন্দ্রনাথের এই সৌন্দর্যরহস্য, এই সৃষ্টি-রহস্যকে আমি তেমন কিছু মতবাদ বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। একথা সত্য, রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে এই অনুভূতিলব্ধ প্রত্যয়কে নানা যুক্তি নানা বিচারের সাহায্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন; কিন্তু মূলত ইহা একটা আনন্দানুভূতি ছাড়া আর কিছুই নয়, প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যকে দেখিবার একটা সহজ দৃষ্টি, বিশ্বজীবনের রসকে ভোগ করিবার একটা বিশেষ ভঙ্গি, নিজের মধ্যকার সৌন্দর্যের ব্যাকুলতাকে প্রকাশ করিবার একটা বিশেষ রীতি।

সীমার সঙ্গে অসীমের, খণ্ডের সঙ্গে পূর্ণের, ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে বিশ্বজীবনের যোগের মধ্যে একটি নিগূঢ় সুনিবিড় সম্বন্ধের অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের কাছে অত্যন্ত সত্য, এবং এই অনুভূতিও রবীন্দ্রনাথের জীবনে একটা বিশেষ মতবাদের রূপ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। ইহা যে একান্তই কবিগুরুর নিজস্ব তাহা নহে; আমাদের দেশের প্রাচীন মননধারার মধ্যে হয়ত এই প্রত্যয়ের পরিচয় আছে। তৎসত্ত্বেও রবীন্দ্র-

নাথের মধ্যে যে ইহা একটা বিশেষ ও সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করিয়াছে, এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিচার্য তাহা নহে। এই মতবাদের সঙ্গেই আবার রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার রহস্যও জড়িত; কিন্তু তাহাও আলোচ্য নয়। বলিবার কথা এই যে, এই সীমা-অসীমের সম্বন্ধ, এই জীবনদেবতার রহস্য, রবীন্দ্রনাথের কাছে ইহা কিছু তত্ত্ব বা মতবাদ নয়, কোন প্রকার ধর্মের সূত্র নয়, শুদ্ধ অনাবিল অনুভূতি মাত্র। অসীম আকাশ আঙিনার ক্ষুদ্র আকাশের মধ্যে ধরা দেয়, ততটুকুর মধ্যেই তাহার বিচিত্র রূপ ফুটিয়া উঠে; আবার এই খণ্ড বিচ্ছিন্ন আকাশই সুবিস্তৃত আকাশের মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করিয়া দিয়া পরিপূর্ণতা লাভ করে। বিশ্বজীবন আমার ব্যক্তিজীবনের মধ্যে ধরা দিয়া তবে তাহার বিশেষ অভিব্যক্তি লাভ করে, সেই আমার ব্যক্তিজীবনই আবার বিশ্বজীবনের মধ্যে নিজেকে বিসর্পিত করিয়া নিজের সার্থকতা খুঁজিয়া পাইতে চায়। এমনি করিয়াই সীমায় অসীমে, খণ্ডে পূর্ণে, ব্যক্তিজীবনে বিশ্বজীবনে একটি অশেষ অপরূপ চিরন্তন লীলা চলিয়াছে; এই লীলাই সৃষ্টির সৌন্দর্য, ইহাই আনন্দ। এই সৌন্দর্য, এই আনন্দ, ইহার পরিপূর্ণ রসটিকে রবীন্দ্রনাথ আকণ্ঠ পান করিয়াছেন, ভোগ করিয়াছেন, একটি অপূর্ব সুগভীর রহস্যরূপে অনুভব করিয়াছেন। তত্ত্ব হয়ত ইহার মধ্যে আছে, তত্ত্বের আকারে রবীন্দ্রনাথ তাহাকে একাধিকবার ব্যক্তও করিয়াছেন; কিন্তু, আমার ধারণা, সে শুধু তাঁহার কবিপ্রকৃতির সহজ বোধ ও অনুভূতিকে যুক্তি ও প্রমাণের মধ্যে জ্ঞানের চিন্তার মধ্যে প্রতিষ্ঠা দান করিবার জন্য। তাহা তাঁহার নিজের জন্য ততটা নহে, যতটা পরের কাছে এই অনুভূতিকে বোধ্য ও জ্ঞানলভ্য করিবার জন্য। তাঁহার জীবনদেবতার রহস্যও মূলত এইরকম একটি ভাবানুভূতি এবং তাহাকেই তিনি নিজের 'অন্তরের মধ্যে পরম রমণীয় করিয়া রসের আধার করিয়া পাইয়াছেন, ভোগ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম ও

সুগভীর অধ্যাত্মবোধের মূলেও আছে এই বিশেষ কবিপ্রকৃতি—রসের ক্ষুধা, ভোগের ক্ষুধা, অনুভূতির ক্ষুধা। তিনি যে এক শুভ্র নিরঞ্জন অদ্বিতীয় দেবতার স্পর্শ বারংবার হৃদয়ের মধ্যে লাভ করিয়াছেন, যাহার লীলায় তাঁহার কবিজীবন অপূর্ব ভাবরসে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং যাঁহার প্রকাশ তাঁহার অন্তরের মধ্যে সূর্যালোকের মত উজ্জ্বল, সেই শুভ্র নিরঞ্জন দেবতাকেও তিনি পাইয়াছেন তাঁহার কবিহৃদয়ের অনুভূতির মধ্যে, নানা ভাবে, নানা রূপে—কখনও তিনি দেবতা, কখনও বন্ধু, কখনও সখা, কখনও লীলাসাথী। যৌগিক সাধনার বন্ধুর দুর্গম পথে তাঁহার দেবতা আসেন নাই, কোন বিশেষ ধর্মাচরণের অপেক্ষাও তিনি রাখেও নাই, বহু শাস্ত্রচর্চা, বহু ধ্যান-নিদিধ্যাসন, বহু জ্ঞানের পথেও সে-দেবতার পদচিহ্ন পড়ে নাই, 'ন মেধয়া, ন বহুধা শ্রুতেন,' তিনি আসিয়াছেন তাঁহার সহজ অনুভবের মধ্যে। দেবতাকে রবীন্দ্রনাথ জানিয়াছেন বলিব না,—বলিব তাঁহাকে তিনি পাইয়াছেন, ভোগ করিয়াছেন, প্রকাশ করিয়াছেন। উপনিষদের অনুরক্ত রসিক পাঠক রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ্-তত্ত্বের মধ্যে বিচরণ করিবার আগ্রহ বড় দেখি না; দেখি, তিনি ডুব দিয়াছেন রসসমুদ্রের অতলে, সেখানে কোন তত্ত্ব নাই, কোন বিচার নাই, বিরোধ নাই। সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথ যখন উপনিষদ্ ব্যাখ্যা করেন, তখন সে-ব্যাখ্যায় উপনিষদ্-তত্ত্ব ততটা পাই না, যতটা পাই উপনিষদের আপ্তবাক্যকে উপলক্ষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের নিজের মর্মের উপলব্ধির কথা। উপনিষদের ঋষিবাক্য তখন রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ও ভাবে রূপান্তরিত হইয়া, অনুভূতি দ্বারা প্রাণবন্ত হইয়া অপূর্ব কাব্য হইয়া উঠে। জ্ঞানের সমস্ত পুঁজি নাড়িয়া বিচার করিয়া, বিবেচনা করিয়া যাহার সন্ধান আমাদের কাছে কিছুতেই স্পষ্ট হইয়া উঠে না, তাহা তাঁহার কাছে ধরা দেয় অত্যন্ত সহজে, তাহা এক মুহূর্তে তাঁহার রসের ক্ষুধা, ভোগের ক্ষুধা, অনুভূতির ক্ষুধাকে

তৃপ্তিতে ভরিয়া দেয়, আর সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রকাশ জীবনের মধ্যে অপূর্ব রসে ও সৌন্দর্যে বিচ্ছুরিত হইতে থাকে।

একদিন রবীন্দ্রনাথ বাংলা দেশের, তথা ভারতবর্ষের, রাষ্ট্রীয় জীবন-যজ্ঞে পৌরোহিত্যের কাজ করিয়াছিলেন, স্বদেশী-মন্ত্রের তিনিই ছিলেন উদ্‌গাতা। বাংলা দেশে তখন একটা সুবৃহৎ ভাবের জোয়ার আসিয়াছিল, তেমন জোয়ার বুঝি এ-দেশে ইতিপূর্বে কখনও আসে নাই, তেমন ভাবে বাংলা দেশ বুঝি আর কখনও আন্দোলিত হয় নাই। সমস্ত বাঁধ ভাঙিয়া গেল, রবীন্দ্রনাথ ভগীরথের মত বাংলা দেশের উপর দিয়া ভাগীরথীর ধারা বহাইয়া দিলেন। বিজয়ার দিনের আহ্বান শুনিয়া সমস্ত দেশ মাতিয়া উঠিল, দেখিতে দেখিতে স্বদেশী-সমাজ গড়িয়া উঠিল, ভিক্ষুকবৃত্তি ছাড়িয়া দেশ নিজের দিকে মুখ ফিরাইল; এ-সমস্ত তাঁহারই প্রেরণা পাইয়া। গানে-কবিতায়-প্রবন্ধে-বক্তৃতায় বাংলা দেশ যেন তাঁহার মুখে ভাষা পাইল। কিন্তু, কেন তিনি এমন করিলেন, কেন তিনি নিজের ঘরে শান্তি ও সমৃদ্ধির মধ্যে তৃপ্ত হইয়া রহিলেন না, এ-কথাটা বোঝা প্রয়োজন। আমি কিছুতেই মনে করিতে পারি না, কোনও প্রয়োজনের তাড়নায় রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয়-যজ্ঞে পৌরোহিত্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। আগেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের সকল প্রকার চিন্তা ও কর্মপ্রচেষ্টা তাঁহার অন্তর্নিহিত আবেগ-সত্তার আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা মাত্র। তাঁহার জীবনের মূলে আছে অনুভূতির আবেগ, প্রকাশের চেষ্টা, নিজের আনন্দবোধকে বিকশিত করিবার ব্যাকুল প্রয়াস। বাংলা দেশের স্বদেশী-যজ্ঞ এক সময় তাঁহার অন্তরকে খুব একটা নাড়া দিয়াছিল, বিশ্বজীবনের এই খণ্ড ও সাময়িক বিকাশটি তাঁহার অন্তরকে গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছিল, এবং তাহার ফলে তিনি অন্তরের মধ্যে সুবৃহৎ আনন্দ অনুভব করিয়া-

ছিলেন। তাহাতে তাঁহার রসের ক্ষুধা, ভোগের ক্ষুধা, অনুভূতির প্রেরণা এবং অন্তরের আনন্দবোধকে প্রকাশ করিবার ব্যাকুল আগ্রহ মনের মধ্যে জাগিয়াছিল। এই হিসাবে স্বদেশী-যজ্ঞে রবীন্দ্রনাথের পৌরোহিত্য তাঁহার আত্মপ্রকাশের ইচ্ছার একটা কর্মরূপ। যেদিন এই অনুভূতির আবেগ মিটিয়া গেল, আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা তৃপ্তিলাভ করিল, সেদিন তিনি এক মুহূর্তেই যজ্ঞের পৌরোহিত্য-পদ পরিত্যাগ করিলেন। একথা বলা চলিবে না যে, রাষ্ট্রান্দোলনের ক্ষেত্রে দেশের সেবায়, দেশের শৃঙ্খলমোচনে তাঁহার সাহায্যের আর প্রয়োজন ছিল না; সে-প্রয়োজন তখনও যেমন ছিল, এখনও তেমনই আছে; কিন্তু রবীন্দ্র-নাথ ত সে-প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য ত্যাগ ও ক্ষতি স্বীকার করেন নাই,—নিজের সৃষ্টির আনন্দকে, আত্মপ্রকাশের ইচ্ছাকেই রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন।

আজ পূর্ণ এক যুগ ধরিয়া দেশে আবার আর এক জাতীয়-যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে, বহু লোক জীবন দিয়া, সেবা দিয়া, ক্ষতি দিয়া, অর্থ দিয়া, প্রাণ দিয়া যে- যজ্ঞে আহুতি দিয়াছে। সকলেই জানেন, এই নূতন জাতীয়-যজ্ঞে রবীন্দ্রনাথের যোগ তেমন নাই; তাঁহার অন্তরাত্মা ইহাকে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণও করিতে পারে নাই। অনেকেই ইহাতে আশ্চর্য-বোধ করেন, অনেকেই এ-জন্য তাঁহার ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, দুঃখবোধ করিয়াছেন; দেশকে স্বদেশমন্ত্রে একদিন যিনি দীক্ষা দিয়াছিলেন, তাঁহার এই ব্যবহার শোভা পায় না এ-কথাও কেহ কেহ বলিয়াছেন। আমার মনে হয়, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই; এবং এই ব্যবহার কিছু অশোভনও নয়। নিজের কাছে এ ব্যাপারে তিনি একান্তভাবে খাঁটি, মিথ্যাচরণের লেশমাত্র কোথাও নাই। আমি এইমাত্র বলিয়াছি, স্বদেশী-যজ্ঞের পৌরোহিত্য রবীন্দ্রনাথ যে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা দেশের কিছু প্রয়োজনে ততটা না, দেশের হিতসাধন যদি কিছু

হইয়া থাকে, তবে তাহা গৌণ; কিন্তু মূলে ছিল তাঁহার আত্মবিকাশের ইচ্ছা, প্রকাশের প্রেরণা, অন্তরের আনন্দবোধকে প্রকাশ করিবার ব্যাকুল আগ্রহ। কবিপ্রকৃতির ইহাই স্বরূপ। স্বদেশী-যজ্ঞ তাঁহার নিজেকে ব্যক্ত করিবার একটা সুমহান সুযোগ দান করিয়াছিল; সেইজন্যই সেই যজ্ঞকে উপলক্ষ মাত্র করিয়া রবীন্দ্রনাথের তখনকার জীবনে এক সাড়া পড়িয়াছিল, কাব্যে-গানে-গল্পে-প্রবন্ধে-বক্তৃতায় তাঁহার প্রতিভা তখন বাঁধ-ভাঙা দুকূলহারা নদীর মত ছাপাইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সে-অনুভূতির প্রেরণা বহুদিন মিটিয়াছে, রাষ্ট্রীয় জীবন-যজ্ঞে আহুতি দিয়া আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা বহুদিন তৃপ্তিলাভ করিয়াছে, এবং তাহার আনন্দ জীবনকে নূতনরূপে নূতনভাবে অভিব্যক্তিও দান করিয়াছে। আজ আর সেই অনুভূতির প্রেরণা, সেই প্রকাশের ইচ্ছাকে ভোগ করিবার আগ্রহও তাঁহার নাই, বিশ্বজীবনের সেই ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশের ইচ্ছাও আর তিনি অনুভব করেন না। সেইজন্যই আজিকার অসহযোগ-যজ্ঞ তাঁহার অন্তরকে স্পর্শ করিতে পারিল না, তাঁহার অন্তরের সত্তাকে নূতন চৈতন্যে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিল না, সে-চৈতন্য বহুদিন আগে হইতেই উদ্বোধিত হইয়া গিয়াছে। আজ তিনি বিশ্বজীবনের অন্যতর বৃহত্তর বিস্তৃততর ক্ষেত্রে অনুভূতির ক্ষুধা মিটাইতেছেন, আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা অন্যতর যজ্ঞক্ষেত্রে তৃপ্তিলাভ করিতেছে; আনন্দের রসভোগের ক্ষেত্র আজ আর রাষ্ট্রীয় যজ্ঞক্ষেত্র নয়। পঁচিশ বৎসর আগেকার ররীন্দ্রনাথকে আজ পঁচিশ বৎসর পরে ফিরিয়া পাইতে চাহিলে আমাদের মূঢ়তাই প্রকাশ পাইবে। কারণ, কবিধর্মের স্বরূপই এই যে, কবি একবার যে-রস, যে-রহস্য, যে-ভাবে আস্বাদন করিয়াছেন, ঠিক সেই রস, সেই রহস্য সেই ভাবেই আবার আস্বাদন করিবার আগ্রহ আর তাঁহার জাগে না। সেই Heraclitusএর কথা – "a man cannot bathe twice in the same river." অথচ এ-কথা বলিতে পারিব

না যে, বাংলা দেশের স্বদেশী-যজ্ঞের চেয়ে আজিকার নিখিল ভারতের অসহযোগ-যজ্ঞ কিছু ছোট জিনিস ; আদর্শের দিক হইতে, ত্যাগের দিক হইতে, মর্মবেদনার গভীরতার দিক হইতে, সংগ্রামের কঠোরতার দিক হইতে এই অসহযোগ-যজ্ঞ বাংলার স্বদেশী যজ্ঞ অপেক্ষা কিছু কম শ্রদ্ধেয় নয় ; আন্দোলনের ব্যাপ্তির দিক হইতে দেখিতে গেলে সমগ্র ভারতবর্ষ —আসমুদ্র হিমাচল—এমন করিয়া পূর্বে আর কখনও আন্দোলিত হইয়াছে, ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত নাই। সাধারণ যুক্তির দিক হইতে দেখিতে গেলে, এ-যজ্ঞে পৌরোহিত্য করিবার অধিকার কাহারও যদি থাকিয়া থাকে তবে তাহা রবীন্দ্রনাথেরই ; তিনিই ত তাঁহার 'স্বদেশী-সমাজে' সর্বপ্রথম অসহযোগ-মন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন, গুর্জর-সিংহের গর্জন তখনও শুনা যায় নাই। কিন্তু, এ ত আমাদের সহজবুদ্ধি, স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তির কথা নয় ; ইহা কবিপ্রকৃতির স্বরূপটিকে, রবীন্দ্র-নাথের কবিমানসটিকে বুঝিবার কথা। মতামতের কোনও অমিল অথবা বিরোধের জন্য তিনি এ-যজ্ঞে ঘৃতাহুতি দেন নাই, এই দেশব্যাপী সুবৃহৎ জীবনান্দোলন হইতে দূরে রহিয়াছেন, এ-কথা আমি মনে করিতে পারিতেছি না। তিনি নিজে অবশ্য একাধিকবার বলিয়াছেন, খদ্দর ও চরকার মন্ত্র তাঁহার ভাল লাগে নাই ; নেতিবাচক এই আন্দোলনের প্রারম্ভিক সন্ন্যাস-কাঠিন্যও হয়ত তিনি প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই কিন্তু এ-সমস্তই গৌণ ভাবনা, উত্তর ধারণা ; আসল কথা, স্বদেশী-যজ্ঞের রবীন্দ্রনাথ আর উত্তরজীবনের রবীন্দ্রনাথ এক মানুষ নহেন, এক রবীন্দ্রনাথ আর এক রবীন্দ্রনাথকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন, পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছেন।

আশঙ্কা হয়, এইখানে ভুল বুঝিবার একটু অবসর হয়ত থাকিয়া গেল। অনেকে হয়ত বলিবেন, রবীন্দ্রনাথ যে স্বদেশী আন্দোলন হইতে একদিন সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহার কারণ দেশব্যাপী উগ্র-

স্বাদেশিকতার বিস্তার, স্বদেশী আন্দোলনের শোচনীয় পরিণতি। আপাতদৃষ্টিতে এই ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত বলিয়াই মনে হয়। উগ্র-স্বাদেশিকতার পক্ষপাতী রবীন্দ্রনাথ কোনও দিনই ছিলেন না; কবির কৈশোরকালের রচনাতেও তাহার প্রমাণ আছে। অথচ স্বদেশ-সাধনা এবং স্বদেশের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার জীবনকে জ্যোতির্দীপ্ত করিয়া রাখিয়াছে, সে-জীবনকে অপূর্ব গৌরব ও মহিমা দান করিয়াছে। সেই হেতু, একথা আমি কখনও বলিতেছি না, পরবর্তী জীবনে স্বদেশ-সাধনার ক্ষেত্র তিনি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন কিংবা স্বদেশ-সাধনার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগে কখনও তিনি বিরত ছিলেন। তৎসত্ত্বেও একথা সত্য, স্বদেশী যুগের পরে জীবনে আর তিনি কখনও রাষ্ট্র-যজ্ঞে আহুতি দান করেন নাই, কিংবা আমাদের দেশের পরবর্তী কোনও রাষ্ট্রসাধনাই অন্তরকে উদ্বুদ্ধ করিয়া আত্মপ্রকাশের ইচ্ছায় তাঁহাকে ব্যাকুল করে নাই, যে-ভাবে করিয়াছিল স্বদেশী যুগের রাষ্ট্রসাধনা। ইহার প্রমাণের জন্য খুব বেশি অনুসন্ধানের প্রয়োজন নাই! একটু মনোযোগের সহিত যদি সেই যুগের রবীন্দ্রনাথের কর্ম ও রচনাসূচী এবং ভাব ও কল্পনাপ্রকৃতির দিকে লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইলেই দেখা যাইবে, অসহযোগ-যজ্ঞ যুগের অথবা তাহারও পরবর্তী সংঘর্ষ যুগের রবীন্দ্র-রচনাসূচী এবং ভাবপ্রকৃতি ও আবেগ-গভীরতা তুলনায় কত বিভিন্ন, কত স্বল্প ও সংক্ষিপ্ত। রাষ্ট্রীয় যজ্ঞক্ষেত্র স্বদেশী যুগে যে-ভাবে তাঁহার বোধ ও বুদ্ধিকে উদ্রিক্ত করিয়াছিল, ভাবকল্পনাকে উৎসারিত করিয়াছিল, পরবর্তী যুগে আর কখনও তাহা করে নাই, এ-কথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। রবীন্দ্র-রচনাবলীই তাহার সাক্ষ্য দিবে, রাষ্ট্রীয় কর্মকৃতির তুলনার কথা না-ই তুলিলাম। সেই জন্যই বলিয়াছি, রাষ্ট্রীয় জীবন-যজ্ঞে আহুতি দিয়া আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা সেই একবারই তাহার পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে; পরবর্তী

জীবনে দ্বিতীয়বার আর সেই অভিজ্ঞতার প্রবাহে স্নান করিবার ইচ্ছা কবির হয় নাই ; তিনি তাহা হইতে বারবার দূরে থাকিতেই চাহিয়াছেন, যদিও কখনও কখনও বাহিরের প্রয়োজনে তাঁহাকে রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম-প্রবাহের ঘাটে পদক্ষেপ করিতে হইয়াছে। তাহা হইলেও পরমুহূর্তেই আবার তিনি সরিয়াও দাঁড়াইয়াছেন। তবে এ-কথার অর্থ এই নয় যে তিনি স্বদেশ-সাধনার ক্ষেত্রই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ; আমি আগেই বলিয়াছি, সে-সাধনার বিরতি জীবনে কখনও হয় নাই। যাহাই হউক রাষ্ট্রীয় জীবন-যজ্ঞে আর আমরা তাঁহাকে পাই নাই বলিয়া দুঃখ করা মূর্খতা মাত্র এবং তাঁহাকে এ-জন্য দোষী করা একান্ত অন্যায়ও বটে। রবীন্দ্রনাথের সত্য ও যথার্থ কবিপ্রকৃতির কথা জানিলে আমরা হয় ত তাহা করিতামও না। কারণ, কবিপ্রকৃতির স্বরূপই এই প্রকার। কবি হইতেছেন বিচিত্রের দূত, চঞ্চলের লীলা-সহচর। এক যজ্ঞক্ষেত্রে হইতে অন্য যজ্ঞক্ষেত্রে, এক রূপ হইতে অন্যরূপে, এক ভাব হইতে অন্য ভাবে এক রহস্য হইতে অন্য রহস্যে তাঁহার চিরন্তন লীলাভিসার চলিয়াছে। চলিষ্ণু সেই প্রকৃতি এক রসের আধার হইতে অন্য রসের আধারে ডুব দিয়া তাহার চিরন্তন সম্ভোগের ক্ষুধা, অনুভূতির আবেগ, প্রকাশের কামনা মিটাইতেছে, এবং তাহার আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা বিচিত্র সৃষ্টিতে রূপায়িত হইতেছে।

আর একদিন রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতের তপোবনে শিশু বালকদের শিক্ষার জন্য এক আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ; আজ তাহা শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ অতিক্রম করিতে চলিল। অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকবালিকাদের শিক্ষাব্যাপারে এমন 'এক্স্‌পেরিমেণ্ট' বাংলা দেশে আর কোথাও হয় নাই, ভারতবর্ষেও খুব বেশি হইয়াছে বলিয়া জানি না। প্রকৃতির অবাধ উন্মুক্ত লীলার মধ্যে প্রকাশের অপূর্ব বৈচিত্র্যের

মধ্যে সুকুমার প্রাণগুলি যে স্বেচ্ছা-বিকাশের আনন্দ লাভ করে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার আকাঙ্ক্ষার প্রথম সূচনা কত সহজ, কত স্বাভাবিক, জীবনের বিকাশ কত সুন্দর। তিনি বালকবালিকাদের জন্য এক সময় 'সিলেবাস'ও হয়ত প্রণয়ন করিয়াছেন, নিজে পড়াইয়াছেন, এমন কি পাঠ্যপুস্তক লিখিয়াছেন, প্রশ্নপত্রও প্রণয়ন করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার এই কর্মপ্রচেষ্টার মূলে ইহারা অত্যন্ত গৌণ; মূলত তিনি বিশ্বজীবনের লীলার মধ্যে তরুণ মনের যে প্রথম আনন্দ সেইটিই ভোগ করিতে চাহিয়াছেন। বুদ্ধির উষার সঙ্গে সঙ্গে এই বালকবালিকা তরুণতরুণীদল যে প্রকৃতির ছন্দে ছন্দ মিলাইয়া বিচিত্রভাবে নিজেদের প্রকাশ করিতেছে, তাহাতে কবির চিত্তই আনন্দে উদ্বোধিত হইয়াছে। এইখানেও তাঁহার কবিপ্রকৃতিরই জয়। ইহাদের সম্মিলিত জীবনধারাকেও তিনি একটি সমগ্র কবিতা করিয়া রচনা করিয়াছেন। এই যে আশ্রমপ্রাঙ্গণে নৃত্যগীত ও বিচিত্র উৎসবের লীলায় ঋতুতে ঋতুতে প্রাণের উৎসবে ইহারা মাতিয়া উঠে, ইহাদের জীবনের প্রকাশের যে এই সুন্দর সুঠাম রূপ, ইহার মধ্যেও ত রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রকৃতির অভিব্যক্তিই আমি দেখিতে পাই। শিক্ষাসমস্যার কি মীমাংসা এখানে হইয়াছে বা হয় নাই, শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয় সম্বন্ধে এ-বিচার অত্যন্ত গৌণ। শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রাণের একটি অপূর্ব প্রকাশ; বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র আনন্দলীলাকে শিশুজীবনে কি করিয়া সঞ্চারিত করিয়া দেওয়া যায়, তাহাদের আনন্দকে উদ্দীপ্ত করিয়া দিয়া নিজের অন্তরের রসভোগের ক্ষুধাকে, আনন্দ-প্রকাশের ব্যাকুলতাকে, অনুভূতির অতৃপ্তিকে সৃষ্টির কার্যে উদ্বুদ্ধ করা যায়, শান্তিনিকেতন তাহারই পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিতেছেন,

"এই আশ্রমের কর্মের মধ্যেও যেটুকু প্রকাশের দিক তাই আমার; এর যন্ত্রের দিক যন্ত্রীরা চালনা করেছেন। মানুষের আত্মপ্রকাশের ইচ্ছাকে আমি রূপ দিতে

চেয়েছিলাম। সেই জন্যেই তার রূপভূমিকার উদ্দেশে একটি তপোবন খুঁজেছি। নগরের ইটকাঠের মধ্যে নয়, এই নীলাকাশ উদয়াস্তের প্রাঙ্গণে, এই সুকুমার বালকবালিকাদের লীলা-সহচর হতে চেয়েছিলাম। এই আশ্রমে প্রাণসম্মিলনের যে কল্যাণময় সুন্দর রূপ জেগে উঠেছে, সেটিকে প্রকাশ করাই আমার কাজ। এর বাইরের কাজও কিছু প্রবর্তন করেছি, কিন্তু সেখানে আমার চরম স্থান নয়, এর যেখানটিতে রূপ সেইখানটিতে আমি। * * * এখানে আমি শিশুদের যে ক্লাস করেছি, সেটা গৌণ—প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে শিশুদের সুকুমার জীবনের এই যে প্রথম আরম্ভরূপ, এদের জ্ঞানের অধ্যবসায়ের আদি-সূচনায় যে উষারুণ দীপ্তি, যে নবোদ্গত অঙ্কুর, তাকেই অবারিত করবার জন্য আমার প্রয়াস না হলে আইনকানুনের জঞ্জাল নিয়ে আমায় মরতে হতো। এই সব বাইরের কাজ গৌণ। * * * কিন্তু লীলাময়ের লীলায় ছন্দ মিলিয়ে এই শিশুদের নাচিয়ে গাইয়ে কখনো ছুটি দিয়ে এদের চিত্তকে আনন্দে উদ্‌বোধিত করবার চেষ্টাতেই আমার আনন্দ, আমার সার্থকতা।" ("প্রবাসী," ক্রোড়পত্র, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮; সপ্ততিতম জন্মোৎসবে কবির অভিভাষণ।)

ঠিক এই ভাবেই বিশ্বভারতীতে ও শ্রীনিকেতনে সকল নিয়মকানুন, কাজকর্ম সব কিছুর বাইরে যেটুকু প্রকাশের দিক, সেইখানেই রবীন্দ্রনাথ, 'যেখানটিতে রূপ সেইখানে তিনি'। বিশ্বভারতীতে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে তিনি সর্বদেশের সর্বজাতির, মহামানবের মিলনতীর্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁহার বহুদিনের একটি আনন্দস্বপ্নকে সেখানে রূপ দিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার এই কর্মচেষ্টা কতখানি সার্থক হইয়াছে বা হয় নাই সে-বিচারের কোন প্রয়োজন নাই; কিন্তু যে-স্বপ্ন, যে আদর্শকে তিনি বিশ্বভারতীতে রূপ দিতে চাহিয়াছেন, তাহা যে প্রকাশের প্রেরণায় ব্যাকুল, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সমগ্র বিশ্বের শিক্ষার ও সংস্কৃতির যাঁহারা গুরু. তাঁহারা সকলে আসিয়া একটি যজ্ঞক্ষেত্রে মিলিতেছেন, মন্ত্র দিতেছেন—মহামানবের কত বড় আনন্দের ইহা প্রকাশ। এই আনন্দকেই রবীন্দ্রনাথ রূপ দিতে চাহিয়াছেন, এবং

মহামানবের এই আকুলতা প্রকাশ করিয়া তাঁহার নিজের আনন্দও ব্যক্ত হইতেছে। এখানে প্রাচ্যবিদ্যার যে-আলোচনা হইতেছে, এখানে কলাভবনে যে-স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রদীপটি জ্বালা হইয়াছে, যে-বিচিত্র গ্রন্থরাজি এখানে আহৃত হইয়াছে, সে-সমস্তই বিশ্বমানবের বিচিত্র আনন্দাভি-ব্যক্তির রূপ। ইহার বিচিত্র বিচ্ছিন্ন পৃথক পৃথক অঙ্গ ও অনুষ্ঠানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নাই, কিন্তু পশ্চাতে যে একটি সমগ্র রূপ আছে, সেইখানেই রবীন্দ্রনাথ। এই রূপটির মূলে আছে তাঁহার মহামানবের ঐক্যানুভূতির ক্ষুধা, রসভোগের ক্ষুধা, প্রকাশের ক্ষুধা। শ্রীনিকেতনেও তাই। এখানকার পশুশালায়, শস্যক্ষেত্রে, মাঠের ঐশ্বর্যের ভাণ্ডারে হয়ত রবীন্দ্রনাথ নাই, কিন্তু ইহার সব কিছুর পশ্চাতে একটি সমগ্র রূপ আছে, সে-রূপ শ্রীর, লক্ষ্মীর; এই লক্ষ্মীর রূপই রবীন্দ্রনাথের কবিহৃদয়ের আনন্দকে উদ্‌বোধিত করিয়াছে। মাটির মধ্যে গাছের মধ্যে বিশ্ব-জীবনের মাধুর্য ও আনন্দের প্রকাশ তিনি অনুভব করিয়াছেন, তাহাকেই তিনি এখানে রূপ দান করিয়াছেন। গাছের বীজ মাটি ফুঁড়িয়া বাহির হয়; বীজের মধ্যে আত্মপ্রকাশের যে-ব্যাকুলতা আছে, তাহাই তাহাকে গাছে রূপান্তরিত করে। শ্রীনিকেতনে যে-জিনিসটি রূপ পাইয়াছে—পল্লীশ্রীর রূপ, গ্রামলক্ষ্মীর রূপ—তাহার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ এই আত্মপ্রকাশের ব্যাকুলতা অনুভব করিয়াছিলেন, এবং এই অনুভূতির প্রেরণাই এই ভাবে নিজকে ব্যক্ত করিয়াছে। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে স্নিগ্ধ মঙ্গলানুষ্ঠানের ভিতর আশ্রমে যে বৃক্ষরোপণ উৎসব, হলকর্ষণ উৎসব ইত্যাদি তিনি করিয়া থাকেন, তাহার অনুষ্ঠানের সৌন্দর্যই যে শুধু উপভোগ্য তাহা নয়, রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতির এই সবিশেষ পরিচয়টিও তাহার মধ্যে আছে।

রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র চিন্তা ও কর্মপ্রচেষ্টার দুই চারিটির মূলে তাঁহার

কবিপ্রকৃতির স্বরূপটি ধরিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তাঁহার এই কবিমানস যে শুধু তাঁহার চিন্তা ও কর্মচেষ্টার মধ্যেই জয়যুক্ত হইয়াছে তাহা নয়। তাঁহার সর্বপ্রকার রচনায়, কি 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা'য়, কি সমাজ ও রাষ্ট্রবিষয়ে বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে, কি 'বাতায়নিকের পত্রে', কি 'কর্তার ইচ্ছায় কর্মে', কি চিঠিপত্রে, কি তত্ত্বব্যাখ্যায়, কি সাহিত্য-বিচার ও ব্যাখ্যানে, সর্বত্রই ভাবে, ভাষায় ও ভঙ্গিতে তাঁহার বিশেষ কবিপ্রকৃতিই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়কে যুক্তি দ্বারা, প্রমাণের সাহায্যে তিনি বুঝাইতে বা উপস্থিত করিতে চেষ্টা ততটা করেন না, যতটা করেন তাঁহার সহজ বোধ-শক্তিকে, অনুভূতিকে, অন্তর্ভেদী দৃষ্টিকে তাঁহার অপূর্ব ভাবের অপরূপ ভাষার জাদুর সাহায্যে শ্রোতা ও পাঠকের একেবারে অন্তরের অন্তঃপুরে ঠেলিয়া দিতে ; মনে হয়, ইহাই ত যুক্তি, ইহাই ত প্রমাণ ! বুদ্ধি যেন স্তব্ধ হইয়া যায়, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে সাড়া পাইতে দেরি হয় না—সমস্ত ব্যাপারটা যেন একেবারে প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়াই মনে হয়। সরস ও অনায়াসলব্ধ উপমা এবং অপরূপ পরিবেশ সৃষ্টিতে তাঁহার মত কৃতিত্ব আর কাহারও আছে বলিয়া জানি না ; ইহারাই যেন সমস্ত যুক্তি-প্রমাণের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া বুদ্ধিকে নিরস্ত্র করিয়া দেয় ! সুগভীর চিন্তাশীল রচনায় এমন কাব্যগুণের পরিচয় বোধ হয় অতুলনীয়। যে-কোনও রচনা পড়িলেই একথা বুঝিতে বাকি থাকে না যে ইহার লেখকের ভিতরকার গড়ন সাহিত্যিকের গড়ন, ভিতরকার রূপ কবির রূপ।

কিন্তু দৃষ্টান্ত উল্লেখের আর প্রয়োজন নাই। তবে, ভয় হয়, একটু ভুল বুঝিবার কারণ হয়ত থাকিয়া গেল। একথা যেন কেহ মনে না করেন, রবীন্দ্রনাথ কবি, কবিকুলগুরু ছাড়া আর কিছুই নহেন। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, তাঁহার প্রতিভা সর্বতোমুখী—এ-কথা রবীন্দ্রনাথ

সম্বন্ধে যতখানি সত্য, আজিকার পৃথিবীর আর কোনও সাম্প্রতিক মানুষের পক্ষেই তাহা ততখানি সত্য হয়ত নয়। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের সুবিপল সর্বতোমুখী প্রতিভার সম্মুখে শুধু স্তব্ধ হইয়া যাইতে হয়। কত বিচিত্র দিকে তাঁহার প্রতিভা বিকাশ লাভ করিয়াছে, কোন্ দিক ছাপাইয়া কোন্ দিকটি যে বড় হইয়া উঠিয়াছে, তাহা হঠাৎ কিছু ধারণাই হয়ত করা যায় না। একথা সত্য যে কোনও নির্দিষ্ট এক এক দিকে কাহারও প্রতিভার দীপ্তি হয়ত রবীন্দ্রনাথকেও ম্লান করিয়াছে, কিন্তু সৃষ্টি, চিন্তা ও কর্মের সকল দিকে কাহারও প্রতিভা এমন অম্লান দীপ্তি লাভ করিয়াছে, পৃথিবীতে এমন দৃষ্টান্ত বর্তমান কালে আর ত দেখি না। প্রতিভার এই সুবিপুল ঐশ্বর্য শুধু রবীন্দ্রনাথের। বাংলা দেশের সমতলক্ষেত্রে তিনি যেন উত্তুঙ্গ গৌরীশংকরের সূর্যকরোজ্জ্বল শুভ্র শিখরের মত দাঁড়াইয়া আছেন; সে-শিখরের উচ্চতাকে খর্ব করিতে পারে, এমন আর কেহ নাই। সেই দুরারোহ শিখরের তলদেশে দাঁড়াইয়া আমরা শুধু পুলকে, স্তব্ধ-বিস্ময়ে তাকাইয়া থাকি। আমাদের জাতীয় জীবনে, বিশেষ করিয়া আমাদের বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত জীবনধারায় তিনি ভাগীরথী-প্রবাহের সঞ্চার করিয়াছেন। যে-জীবন ঘরের দাওয়ায়, পুকুরপাড়ে, বটের ছায়ে কাটিতেছিল, বৃহৎ পৃথিবীর জীবনস্রোতের সঙ্গে তিনি তাহার সংযোগ সাধন করিয়াছেন। তিনি বাংলা-ভাষা-সরস্বতীর লজ্জা ও জড়তা ঘুচাইয়া তাহার মধ্যে সুনিপুণ নৃত্যের গতি ও শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন, এবং বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে স্থান পাইবার মত মর্যাদা দান করিয়াছেন। কিন্তু ইহাই শুধু নয়। বাঙালীর জীবনে একটি সুকুমার রুচি ও অনুভূতি, একটি শ্রী ও সৌন্দর্যের চেতনা, এবং তাহার প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় একটি সুকুমার সৌষ্ঠব সৃষ্টির সচেতন চেষ্টা তিনি জাগাইয়াছেন। কিন্তু এ ত গেল বাংলা দেশের কথা। সমগ্র ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনেও তাঁহার

প্রভাবের পরিমাণ কম নয়। আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রজীবনের নবজাগ্রত চৈতন্যের মূলে রহিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ, একথা সকলেই জানেন; আমিও আগেই ইঙ্গিত করিয়াছি। আর ভারতবর্ষের শিক্ষা, সাধনা, ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে তিনি যেমন করিয়া তাঁহার জীবনে ও কর্মে রূপদান করিয়াছেন, এমন আর কে করিয়াছে? ভারতবর্ষের বাহিরে বিশ্ব-সভ্যতায়ও তিনি যাহা দান করিলেন, তাহার মূল্য কিছু কম নয়। কিন্তু এইখানেই তাঁহার কর্মপ্রচেষ্টা ও প্রতিভার বিকাশ শেষ হইয়া যায় নাই; আমাদের দেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, পল্লীশ্রীর সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে, দেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে এবং অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার দানের কথা সকলেই জানেন। ভারতবর্ষের সাধনা ও ইতিহাসের মর্মস্থলকে তিনি আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন, সুকঠিন দার্শনিকতত্ত্বের রহস্য তিনি আমাদের কাছে নিকটতর করিয়াছেন, মানুষের সঙ্গে বিশ্বজীবনের নিগূঢ় আত্মীয়তার সম্বন্ধকে তিনি আমাদের কাছে সহজ করিয়াছেন, এবং সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক দৃষ্টির সাহায্যে সৃষ্টির বিচিত্রতাকে একান্তভাবে উপভোগ করিয়াও তাহাকে এক শুভ্র নিরঞ্জনের মধ্যে উপলব্ধি করিবার যে-রহস্য, তাহা আমাদের কাছে নিকটতর করিয়াছেন। কিন্তু এই যে বিচিত্র চিন্তা ও কর্মের প্রবাহ, বিচিত্র প্রকাশ, রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কর্মকে যখন একটু দূর হইতে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখি, কেবলই মনে হয়, এই সব-কিছুর মধ্যে একটিমাত্র রবীন্দ্রনাথের পরিচয় যেন পাই—তিনি কবি, কবিকুলচূড়ামণি রবীন্দ্রনাথ। আমার কেবলই মনে হয়, কবি রবীন্দ্রনাথই তাঁহার বিচিত্র চিন্তা ও কর্মপ্রচেষ্টার জনক। যেদিক হইতে তাঁহাকে দেখি, সেইদিক হইতেই মনে হয়, সকলের ঊর্ধ্বে কবি রবীন্দ্রনাথের শুভ্র সুউন্নত শির। তাঁহার জ্ঞানরাজ্যের বিপুল ঐশ্বর্য, তাঁহার বুদ্ধি ও চিন্তার দীপ্তি বর্তমান পৃথিবীর জ্ঞান ও চিন্তার জগৎটিকে আলোকিত করিয়াছে। কর্মের

ক্ষেত্রেও তাঁহার মত অক্লান্তকর্মী কয়জন? পরিণত বার্ধক্যেও কি তাঁহার কর্মচেষ্টার কোন বিরাম কেহ দেখিয়াছে? আর এই কর্ম-প্রচেষ্টাও ত কিছু গতানুগতিক পথ ধরিয়া নয়, এখানেও তাঁহার দুর্জয় প্রদীপ্ত প্রতিভার চিহ্ন সুপরিস্ফুট। কিন্তু, আমি চেষ্টা করিলাম তাঁহার জীবন ও কর্মকে একটা সমগ্র দৃষ্টিতে দেখিতে—সকল বিচ্ছিন্ন চিন্তা ও কর্মকে দূর হইতে এক করিয়া। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিতেছেন,

"নিজের সত্য পরিচয় পাওয়া সহজ নয়। জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতরকার মূল ঐক্যসূত্রটি ধরা পড়তে চায় না। * * * নানা থানা ক'রে নিজেকে দেখেছি, নানা কাজে প্রবর্তিত করেছি, ক্ষণে ক্ষণে * * * আপনার অভিজ্ঞান আপনার কাছে বিক্ষিপ্ত হয়েছে। জীবনের দীর্ঘ চক্রপথ প্রদক্ষিণ করতে করতে বিদায়কালে আজ সেই চক্রকে সমগ্ররূপে দেখতে পেলাম, তখন একটা কথা বুঝতে পেরেছি যে, একটি মাত্র পরিচয় আমার কাছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র। আমার চিত্ত নানা কর্মের উপলক্ষে ক্ষণে ক্ষণে নানাজনের গোচর হয়েছে। তাতে আমার পরিচয়ের সমগ্রতা নেই। * * *" ("প্রবাসী," ক্রোড়পত্র, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮; সপ্ততিতম জন্মোৎসবে কবির অভিভাষণ।)

যাহা হউক, এই সমগ্র দৃষ্টিতে দেখিলে কখনও ভুল হইবার কারণ নাই যে, রবীন্দ্রনাথ বর্তমান জগতের চিন্তাবীর ও জ্ঞানীশ্রেষ্ঠদের অন্যতম, বিশ্বমানবের সুদীর্ঘ যাত্রাপথের যাঁহারা অগ্রণী তাঁহাদের তিনি অন্যতম; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটাও আমাদের মনের মধ্যে জুড়িয়া বসিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, সকলের উপরে রবীন্দ্রনাথ কবি, কবিকুলগুরু।

ভালই হইল যে, সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ কবি। আমাদের সর্বপ্রথম কবি হইতেছেন ঋষি বাল্মীকি। আর, আমাদের শাস্ত্রেও কবির যে-সংজ্ঞা বারবার দেওয়া হইয়াছে সে-সংজ্ঞা ত ঋষি সম্বন্ধেই প্রয়োজ্য।

বুঝি-বা তাহার চেয়েও বেশি, বুঝি-বা কবিকে ঋষি অপেক্ষাও বড় আসনই দেওয়া হইয়াছে। কবি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,

ত্রীণি ছন্দাংসি কবয়ো বি যে তিরে
পুরুরূপং দর্শতং বিশ্ব চক্ষণম্
অপো বাতা ওষধয়স
তান্যেকস্মিন্ ভুবন অর্পিতানি।

কবিগণ তিনটি ছন্দের সাধনা করেন ; বিচিত্র রূপ, দর্শনীয় রূপ এবং বিশ্বলোচন সেই ছন্দ ; তাহাই জল, বায়ু ও ওষধি। এক এই ভুবনেই এই তিনটি ছন্দ অর্পিত (প্রতিষ্ঠিত)। আরও বলা হইয়াছে, কবি হইতেছেন, জরা-মৃত্যু রহিত, কবিই আমাদের রক্ষা করেন তাঁহার দিব্য কাব্য দ্বারা।

পশ্চাৎ পুরস্তাদধরাদ্ উতোত্তরাং
কবিঃ কাব্যেন পরিপাহি
সখা সখায়ম্ অজরো জরিম্ণে
মর্ত্ত্যা অমর্ত্ত্যস্ত্বং নঃ।

পশ্চাতে সম্মুখে, নিচে উপরে, হে কবি, তোমার কাব্যের দ্বারা তুমি আমাদের রক্ষা কর। সখা যেমন সখাকে রক্ষা করে, তেমনই হে অজর, হে অমৃত, জরাগ্রস্ত আমাদিগকে, মরণশীল আমাদিগকে তুমি রক্ষা কর। কবি হইতেছেন নিত্য নবীন, তিনি (চির) যুবা, বিশ্বারূপাণি জনয়ন্, বিশ্বরূপ রচনা করিতে করিতে তিনি চলেন। তিনি সকল মর্মের মরমী, সকল রহস্যের সন্ধান একমাত্র তিনিই জানেন।

অমুত্র সন্নিহ বেত্থেতঃ সংস্তানি পশ্যসি

এখানে বাস করিয়া তুমি ওখানকার (মর্ম) জান, ওখানে থাকিয়া এখানকার (লীলারহস্য) তুমি দেখিতে পাও। কবি যিনি, বিশ্বচিত্তের তিনি দূত ; একটি মাত্র লোকে বাস করিয়া সর্বলোকের রহস্য তিনি

জানিতে পান, দেখিতে পান। যে-রস ও রহস্যের প্রেম ও সৌন্দর্যের, শোক ও বেদনার, দুঃখ ও আনন্দের দৃষ্টি দিয়া এই বিশ্বজীবনকে আমরা পাই ও ভোগ করি, সে-দৃষ্টি কবিই আমাদের দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ সেই কবি।

(২)

রবীন্দ্র-কবিমানস অতিশয় আত্মসচেতন। কিশোর বয়স হইতেই রবীন্দ্রনাথ জানিতেন, তিনি কবি, কবি ছাড়া আর কিছুই নহেন ; সেই বয়সের কাব্যেই এই স্বীকারোক্তি আছে যে কাব্যলক্ষ্মীর আরাধনাই তাঁহার জীবনের সর্বোচ্চ বিধিদত্ত অধিকার। উত্তরকালে তাঁহার এই বিশ্বাস দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়াছে, এবং তিনি তাঁহার জীবন ও সাধনাকে অঞ্জলি করিয়া কাব্যলক্ষ্মীর প্রসাদ-দৃষ্টির সম্মুখেই তুলিয়া ধরিয়াছেন ; মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁহার এই একান্ত স্বতন্ত্র আত্মপরায়ণ সাধনা হইতে কখনও বিচ্যুত হন নাই। আজ সুদীর্ঘ সাধনার শেষে এ-কথায় আমরা কিছু বিস্ময়বোধ করি না ; কিন্তু, কবিজীবনের যৌবন-বসন্তোৎসব শেষ হইয়া গিয়া যখন তাঁহার 'দ্রাক্ষা-কুঞ্জবনে গুচ্ছ গুচ্ছ ফল' ধরিয়াছে, যখন তিনি স্থিরনিশ্চয় জানিয়াছেন, শতবর্ষ পরেও সকৌতূহলে তাঁহার কাব্য পঠিত হইবে, মনে রাখা প্রয়োজন, তখনও তাঁহার স্বদেশবাসী সেই দ্রাক্ষাকুঞ্জবনের উন্মাদনরসে আকৃষ্ট হয় নাই, "মানসী-সোনার তরী-চিত্রা"র রসমাধুর্যে উতলা হয় নাই। শুধু সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস, আত্মপরিতৃপ্তি মাত্র সম্বল করিয়া তিনি বহুদিন একান্ত একক ও নিঃসঙ্গ, স্বতন্ত্র ও আত্মপরায়ণ কবিজীবন যাপন করিয়াছেন, এবং পরেও, যাহা কবিধর্মের অন্যতম লক্ষণ, সেই নিঃসঙ্গ স্বাতন্ত্র্য পরিপূর্ণভাবে কোনও দিনই ঘুচে নাই। ঘুচে যে নাই তাহার কারণ রবীন্দ্র-কবিপ্রকৃতির মধ্যেও অনেকাংশে নিহিত ; সে-কথা পরে

বলিতেছি। আপাতত ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এই জাতীয় সহায়হীন, কৃতজ্ঞতাহীন, নিভৃত নিঃসঙ্গ কাব্যসাধনার তুলনা বিরল। উত্তর জীবনে অবশ্য স্বদেশ ও বিদেশবাসীর সকৃতজ্ঞ আনন্দ-প্রসাদ লাভ তাঁহার ঘটিয়াছিল, 'জীবযাত্রা অবসানে দীর্ঘ পথের শেষে শ্রান্তিহরা শান্তির উদ্দেশ্যে দুঃখহীন নিকেতনে' তিনি উত্তরিত হইয়াছিলেন, এবং 'মহিমালক্ষ্মী প্রসন্নবদনে মন্দ হাসিয়া তাঁহার বরমাল্যখানি ভক্তকণ্ঠে পরাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার করপদ্মপরশনে সর্ব দুঃখ-গ্লানি, সর্ব অমঙ্গল শান্ত হইয়াছিল'; কিন্তু অন্তরের নিঃসঙ্গ স্বাতন্ত্র্য কবির কখনও ঘুচে নাই। কাব্যলক্ষ্মীর সাধনায় 'নিজ অন্তরপ্রদীপখানি' জ্বালাইয়া সর্বদাই তিনি একক ও স্বতন্ত্র; এই অন্তরপ্রদীপখানির আলোকই তাঁহার একমাত্র আলোক, আর কোনও নির্দেশের বশ্যতাই তিনি স্বীকার করেন নাই। বিচিত্র প্রত্যয়ের শাসন তাঁহার কাব্যে আছে; বিচিত্র নিয়তি-নিয়ম, বিচিত্র প্রয়োজন-চেতনা, বিচিত্র সংসার-সমাজ-রাষ্ট্র-ভাবনার শাসনও নাই, এমন বলা চলে না; কিন্তু তাহার সমস্তই তাঁহার কবি-প্রাণের স্বধর্মের অনুগত। এই বিচিত্র প্রত্যয় ও ভাবনা-শাসন বারবার নানা বিরোধের সৃষ্টি করিয়াছে, কবিকল্পনাকে নানা স্ববিরোধী প্রেরণায় চঞ্চল ও বিপর্যস্ত করিয়াছে, কিন্তু কোনও বিরোধকেই তিনি স্বীকার করেন নাই, কোনও শাসনকেই একান্ত করিয়া মানিয়া লন নাই। সকল বিরোধ ও বেসুরকে বশ করাই তাঁহার কাব্য ও জীবনসাধনার মূলমন্ত্র; এ-মন্ত্র কখনও তিনি বিস্মৃত হন নাই। কবিকল্পনা বহুক্ষেত্রে স্বভাবতই অন্তর্মুখী, আত্মকেন্দ্রিক ও আত্মভাবপরায়ণ; রবীন্দ্রনাথেও তাহাই, কিন্তু তাঁহার কবিমানসও সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত আত্মসচেতন; তাঁহার বাস্তবানুভূতি যেমন সূক্ষ্ম ও স্পর্শকাতর, তাঁহার বোধ ও বুদ্ধিও তেমনই তীক্ষ্ণ ও প্রখর। অনেকে রবীন্দ্র-কাব্যসাধনাকে মিস্টিক সাধনা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহার

চেয়ে মিথ্যা আর কিছু হইতে পারে না। রবীন্দ্র-কবিকল্পনায় অস্পষ্ট কুহেলিকাচ্ছন্ন কিছু নাই। তাঁহার জ্ঞান ও বুদ্ধি অনাবৃত, তাঁহার কল্প-মানস অতি সচেতন, তাঁহার সাধনা নয়ন ভরিয়া রূপ ও অরূপকে দেখা, সর্বেন্দ্রিয় দিয়া তাহাকে ভোগ করা। তিনি আঁখি মুদিয়া ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া সাধনা করেন নাই—করিলে তিনি ত কবিই হইতে পারিতেন না। রূপাতীত স্পর্শাতীতকে বহিরিন্দ্রিয় দিয়া দেখা, স্পর্শ করাই ত রবীন্দ্র-কবির সাধনা; সেই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার কবিত্বের অনন্যপূর্ব অনন্যসাধারণ গৌরব। মিস্টিকের সাধনা আর রবীন্দ্র-কবির সাধনা এ দু'য়ে কোথাও কোন মিল নাই! সেই জন্যই এই বস্তুজগৎ বা বিশ্বজীবনের ধ্যান যে-সব প্রত্যয় বা ভাবনা তাঁহার চিত্তে জাগাইয়াছে, যে-সব নিয়তি-নিয়মের সংস্কার সৃষ্টি করিয়াছে তাহাদের তিনি জ্ঞানের বা তত্ত্বচিন্তার বিষয় করেন নাই, রসপানের বিষয় করিয়াছেন। রূপধ্যান, রসপানই তাঁহার প্রকৃতি, এবং সেই জন্যই তিনি কবি। রূপ ও রসবৈচিত্র্যের আস্বাদনই সেইজন্য রবীন্দ্র-কাব্য-পাঠকের আকাঙ্ক্ষার বস্তু, বস্তুবিশ্ব বা জীবনদৃশ্যের জ্ঞান গৌণ, পরোক্ষ।

কিন্তু, বস্তুবিশ্ব বা জীবনদৃশ্যের চেতনার স্থান কি রবীন্দ্র-কাব্যসাধনায় একেবারেই নাই? নিশ্চয়ই আছে। যে মুহূর্তে বলিয়াছি, বস্তুবিশ্ব বা জীবনদৃশ্যকে তিনি রসপানের বিষয় করিয়াছেন আত্মসচেতন কবিমানস লইয়া, সেই মুহূর্তেই একথাও স্বীকার করা হইয়াছে। তাঁহার কবিকল্পনা যতই অন্তর্মুখী ও আত্মভাবপরায়ণ হউক না কেন, যতই স্বতন্ত্র হউক না কেন, কবির সচেতন মানস বস্তুবিশ্ব বা জীবনদৃশ্য সম্বন্ধে তাঁহাকে একান্তভাবে উদাসীন থাকিতে দেয় নাই। তিনি ত আজীবন তাহাদের রূপধ্যান রসপানই করিয়াছেন, কিন্তু তাহা কিছু একান্তভাবে নিজের স্বপ্নমায়াসৃষ্ট জীবজগৎ-বিচ্যুত গজদন্তকক্ষের স্বেচ্ছাবন্দীশালায়

বসিয়া নয়। বস্তুত তাহা সম্ভবও নয়; যে-মুহূর্তে কবি বা লেখক বস্তুবিশ্বকে রূপধ্যান রসপানের বিষয় করেন, সেই মুহূর্তেই একধরনের বস্তুচেতনার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হয়। আমাদের দেশের প্রাচীন আলংকারিকেরা বলেন, কাব্যের জগৎ বস্তুর জগৎ নয়, অলৌকিক মায়ার জগৎ; কিন্তু এমন যে মায়া তাহাও ত বস্তুনিরপেক্ষ হইতে পারে না, সে ত অসম্ভব। কাজেই একান্তভাবে বস্তুনিরপেক্ষ কাব্যও হইতে পারে না। একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে লৌকিক মন ও জীবন-রূপ বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সার্থক কাব্যের কল্পনাই করা যায় না। সভ্য সামাজিক মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে লৌকিক মন ও জীবন হইতে বিচ্যুত হইয়া একান্তে বাস করা অসম্ভব, মন ও জীবনের উপর বিশ্বজাগতিক বস্তুপরিবেশের সূক্ষ্ম ও জটিল ক্রিয়ার প্রভাব কেহই একেবারে বিলোপ করিয়া দিতে পারেন না; অন্তত বস্তুর রূপ ও রস লইয়াই যাঁহাদের লীলা সেই কবিরা কিছুতেই পারেন না—অতি সূক্ষ্ম ভাবানুভূতির প্রকাশেও তাহা সম্ভব নয়। তবে, যে-সব কবি বা লেখকের মন ও দৃষ্টি লৌকিক মন ও জীবনবস্তুর বস্তুপরতা বা বস্তুধর্ম সম্বন্ধে সচেতন তাঁহাদের রচিত সাহিত্যের ধারা বেগবান ও স্রোতো-বহুল হইবার সম্ভাবনা বেশি; যাঁহাদের তাহা নাই বা যে-পরিমাণে কম সেই পরিমাণে তাঁহাদের রচিত সাহিত্যের ধারা ক্ষীণ ও শীর্ণ হইতে বাধ্য। তাহার পর কোন্‌টা সার্থক ও মহৎ সাহিত্য আর কোন্‌টা নয়, তাহার বিচার অবশ্যই নির্ভর করিবে কাব্যজিজ্ঞাসাগত মূল নির্দেশকে স্বীকার করিয়া,—তাহা নির্ভর করিবে বহুলাংশে রচয়িতার সৃষ্টি-প্রতিভার উপর।

কিন্তু, যেহেতু রবীন্দ্র-কবিকল্পনা অতিশয় অন্তর্মুখী, স্বতন্ত্র এবং আত্মকেন্দ্রিক সেই হেতু তাঁহার বস্তুচেতনাও অত্যন্ত অন্তর্মুখী, কল্পনা-নির্ভর এবং আত্মভাবনা দ্বারা জারিত; বস্তুর বস্তুধর্ম স্বীয় কবিধর্মের অধীন;

বস্তুর বস্তুপরতা হইতে ভাবানুভূতির প্রকাশ শুধু যে বহুদূরে তাহাই নয়, বস্তুও আপাতদৃষ্টিতে অনুপস্থিত বলিয়াই মনে হয়। বিশেষ 'মূড' বা বিশেষ ভাবানুভূতির 'লিরিক' কবিতায় তাহা হওয়ার সুযোগও বেশি। বস্তুর বস্তুধর্ম গল্প-উপন্যাস-নাটকে যতটা সহজে সংক্রামিত হইবার, সুসংবদ্ধ হইয়া পরিস্ফুট হইবার সুযোগ আছে, লিরিক কবিতায় সে-সুযোগ অপেক্ষাকৃত অনেক কম। বিশেষত যাহাদের কবিকল্পনা অন্তর্মুখী ও আত্মভাবপরায়ণ, তাঁহাদের বস্তুচেতনা, স্বতন্ত্র ও অন্তর্মুখী কবিকল্পনার প্রেরণায়, অত্যন্ত স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিগত রূপ ধারণ করে, বস্তুধর্মের প্রতি সহজ প্রত্যক্ষ অনুরাগ তাঁহাদের চিত্তে ভাবানুভূতির প্রেরণা সঞ্চার করে না। রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ কবিজীবনে ঠিক তাহাই হইয়াছিল। বস্তুচেতনা সর্বত্রই উপস্থিত; স্বীয় অন্তর্মুখী ভাবকল্পনার বহুল ও বিচিত্র ক্রমের ভিতর দিয়া জারিত হওয়া সত্ত্বেও তাহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা কঠিন নয়। কিন্তু বস্তুচেতনামাত্রই ত বস্তুধর্মের সজ্ঞান বোধ নয়; বস্তুবিশ্ব বা জীবনদৃশ্যের পশ্চাতে প্রত্যেক পৃথক বস্তু বা দৃশ্যের গতি পরিণতির অমোঘ নিয়ম, আবর্তন-বিবর্তন-ধারার ঐতিহাসিক পর্যায় সতত ক্রিয়াশীল, তাহাই বস্তুর বস্তুধর্ম। বস্তুর সঙ্গে নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে বস্তুধর্মের সজ্ঞান অনুভূতি জন্মায়, এবং কবিকল্পনার মধ্যে তাহা রূপে ও রসে সঞ্চারিত হয়। এই বস্তুধর্মের সজ্ঞান অনুভূতি রবীন্দ্র-কাব্যে বহুদিন দেখা যায় নাই, যদিও বস্তুচেতনার অনুপস্থিতি তাঁহার কাব্যে কোনও দিনই ছিল না। বস্তুধর্মের স্পর্শ যে তাঁহার কাব্যে ছিল না, তাঁহার একক, নিঃসঙ্গ ও একান্ত স্বতন্ত্র জীবন যে দ্বন্দ্বমুখর সংগ্রামক্ষুব্ধ বস্তুপুঞ্জের সঙ্গে মুখামুখি পরিচয়ের সুযোগ তাঁহাকে দেয় নাই তাহা তিনি জানিতেন; যৌবনেই তাঁহার আত্মসচেতন কবি-চিত্তে তাহা ধরা পড়িয়াছিল। এবং সেজন্য মাঝে মাঝে তাঁহার স্পর্শকাতর সূক্ষ্ম কবিচিত্তে একটা নিদারুণ অস্বস্তিও দেখা দিত। যে-জীবনদৃশ্য

তাঁহার চোখের সম্মুখে বিস্তৃত ছিল সে-দৃশ্য একটি দীপ্তহীন, কর্মহীন, আশাদীন, পরবশ বাঙালী জীবনের ; এ-দৃশ্য তাঁহার একান্ত স্বাতন্ত্র্য-বোধকে আঘাত না করিয়া পারে নাই, ইহার জন্য তাঁহার ক্ষোভ ও লজ্জার সীমা ছিল না। এ-দৃশ্যকে তিনি কখনও ব্যঙ্গ-কষাঘাতে জর্জরিত করিয়াছেন, কখনও আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, "ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন!" কখনও কখনও নিজের অন্তর্মুখী, আত্ম-পরায়ণ ও স্বতন্ত্র ভাবকল্পনার জীবনে নিজেই লজ্জিত হইয়া বলিয়াছেন,

এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে রঙ্গময়ী, দুলায়োনা সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর। ভুলায়োনা মোহিনী মায়ায়
বিজন বিষাদঘন অন্তরের নিকুঞ্জচ্ছায়ায়
রেখোনা বসায়ে আর।

কিন্তু বলিলে কি হইবে! কবির কবিধর্মের প্রেরণা যে বস্তুধর্মবোধের প্রয়োজন-চেতনা হইতে বড়, অধিকতর শক্তিশালী। কাজেই লিরিক আবেশবিহ্বলতার মধ্যেও কবিধর্ম বশে তাঁহাকে বলিতে হইল,

দুর্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি, তারি মাঝে যাব অভিসারে
তাঁর কাছে, জীবন সর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি। কে সে? জানিনা কে। চিনি নাই তারে—
শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী, যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তরপ্রদীপ খানি। * * *
তারপর দীর্ঘপথশেষে
জীবযাত্রা অবসানে ক্লান্তপদে রক্তসিক্ত বেশে
উত্তরিব একদিন শ্রান্তিহরা শান্তির উদ্দেশে
দুঃখহীন নিকেতনে। প্রসন্ন বদনে মন্দ হেসে

পরাবে মহিমালক্ষ্মী ভক্তকণ্ঠে বরমাল্যখানি,
করপদ্মপরশনে শান্ত হবে সর্ব দুঃখগ্লানি
সর্ব অমঙ্গল। লুটাইয়া রক্তিম চরণতলে
ধৌত করি দিব পদ আজন্মের রুদ্ধ অশ্রুজলে।
সুচিরসঞ্চিত আশা সম্মুখে করিয়া উদ্‌ঘাটন
জীবনের অক্ষমতা কাঁদিয়া করিব নিবেদন,
মাগিব অনন্ত ক্ষমা। হয়তো ঘুচিবে দুঃখনিশা,
তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্ব প্রেমতৃষা।

যে-ভাষায়ই ব্যক্ত হউক না কেন, এই দেবী, এই মহিমালক্ষ্মী, এই বিশ্বপ্রিয়া কবিরই কাব্যলক্ষ্মী, এবং আবেশারম্ভের মুহূর্তে যে রঙ্গময়ী কল্পনার হাত হইতে কবি মুক্ত হইতে চাহিয়াছেন, আবেশবিহ্বলতার চরম মুহূর্তে সেই স্বতন্ত্র আত্মকেন্দ্রিক ভাবকল্পনার জগতেই তিনি নিজেকে তুলিয়া ধরিলেন। স্বীয় কবিধর্মের বশ্যতাই তাঁহার একমাত্র প্রেম; সেই প্রেমেই জীবনের সর্বপ্রেমতৃষ্ণার পরিতৃপ্তি তিনি কামনা করিলেন, এবং তাঁহার কামনা পরিপূর্ণ সার্থকতাও লাভ করিল, ইহাও আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম।

কিন্তু, উত্তরকালে বস্তুধর্মের সজ্ঞান অনুভূতিও কবিচিত্তে জাগিয়াছিল। বস্তুর ঐতিহাসিক গতি-পরিণতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি সজাগ হইয়াছিলেন, এবং কাব্যে তাহা রূপাশ্রিত রসাশ্রিত হইয়া দেখাও দিয়াছিল। তবে, তাহার জন্য কবিকে সুদীর্ঘ কাল অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল; সেই নূতন অনুভূতির সঞ্চার তিনি লাভ করিয়াছিলেন জীবনের গোধূলিসন্ধ্যায়। সে-কথা এই গ্রন্থেই অন্যত্র সবিস্তারে বলিয়াছি; এখানে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

একধরনের বস্তুচেতনা বরাবরই কবির ছিল, এ-কথা বলিয়াছি। বস্তুধর্মের অনুভূতি হইতে তাহা যতই পৃথক হউক, কবির এই বস্তুচেতনা অন্তর্মুখী ও আত্মভাবপরায়ণ কবিকল্পনা দ্বারা যতই রঞ্জিত হউক না

কেন, তাহা যে পরোক্ষে বস্তুধর্মের জ্ঞান ও অনুভূতি পাঠকচিত্তের নিকটতর করিয়াছে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। বস্তুবিশ্ব বা জীবনদৃশ্য ত সর্বত্রই কবির ভাবানুভূতি প্রকাশের উৎস ও আশ্রয়, ইহা ত প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। ধরা যাক্, 'সোনার তরী' (গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা) বা 'বলাকা' (সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা) জাতীয় একান্ত স্বতন্ত্র আত্মভাবপরায়ণ অন্তর্মুখী কবিকল্পনাগত কবিতা। দু'টি কবিতাই যে বস্তুবিশ্বের সদা-বহমান ধারার দুই মুহূর্তের দু'টি চলচ্চিত্রচ্ছায়া এ সম্বন্ধে ত সন্দেহ নাই, অবশ্য খুব সূক্ষ্ম ও আকস্মিক, প্রায় অরূপ-অপরূপকে রূপের মধ্যে বাঁধিবার চেষ্টা। তবুও তাহারা যে বস্তুবিশ্বেরই রূপ এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহারা যে কবির একান্ত অন্তর্মুখী ও স্বতন্ত্র কবিকল্পনা দ্বারা রঞ্জিত ও রূপান্তরিত, এ-কথা কি করিয়া অস্বীকার করি? কিন্তু, তাহাতে ক্ষতি কি? বস্তুবিশ্বের যে-দু'টি খণ্ড দুই সুবর্ণ মুহূর্তে এক অপরূপ রূপে রসে রঞ্জিত ও রূপান্তরিত হইয়া আমাদের ভাবদৃষ্টির সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইল তাহাও ত বস্তুর অন্যতম রূপ, এবং এই রূপও ত বস্তুধর্মের চেতনা আমাদের বোধ ও অনুভূতির নিকটতর করে, এই রূপও ত একেবারে অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

(৩)

কাব্যসাধনাই রবীন্দ্রনাথের আজীবন সাধনা, এবং কাব্যসাধনাই তাঁহার জীবনসাধনাও বটে। তাঁহার জীবন ও কাব্য এ-দুইই এক অথচ এ-দু'য়ের একত্ব এত অনন্যসাধারণ যে তাহাতে বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না। অপরূপ অরূপকে রূপের মধ্যে বাঁধিবার, এবং রূপের মধ্য দিয়া অরূপেরই আরাধনা করিবার যে-সাধনা তিনি কাব্যে করিয়াছেন, জীবনেও তাঁহার সেই সাধনারই বিস্তার; তাঁহার ভাব-

জীবন ও ব্যবহারিক জীবন দুইই যেন একসূত্রে গাঁথা। কাব্যই যাঁহার জীবনসাধনার একতম ও প্রধানতম পন্থা, তাঁহার জীবনে ইহার অন্যথা হইবার উপায়ও ছিল না। বিচিত্র বর্ণসম্ভারে রবীন্দ্র-সাহিত্য বর্ণময়, বিচিত্র ভাবপ্রসঙ্গে সমৃদ্ধ, বিচিত্র ও অভিনব রেখায় লীলায়িত। মানব-চৈতন্যের কত জটিল, গভীর ও ব্যাপক স্বপ্ন-কল্পনা, ভয় ভাবনা, জিজ্ঞাসা আকুতি, আনন্দ-বেদনা, কত বিচিত্র ইন্দ্রিয়ানুভূতি রং ও রেখার সীমাহীন অপরূপ কারুকুশলতায় সেই সাহিত্যে স্বপ্রকাশ! এই অপরূপ লীলা-বৈচিত্র্যই এক মুহূর্তে আমাদিগকে অভিভূত করিয়া দেয়; কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্যের গভীরে যে মর্মবাণীটি ধ্বনিত, তাহা একটু স্থিরচিত্তে কান পাতিয়া শুনিতে পারিলে তখন বুঝা যাইবে, যত বিচিত্র বহু রূপময় হউক না কেন সেই সাহিত্য, তাহার সাধনমন্ত্র মূলত ও মুখ্যত একটি। সে-মন্ত্র অপরূপ অরূপকে ভাব, ভাষা ও ছন্দের রূপের মধ্যে বাঁধিবার এবং সেই রূপের মধ্যে অরূপের আরাধনা করিবার মন্ত্র। আমি কোনও গভীর অধ্যাত্মতত্ত্বের কথা বলিতেছি না, একান্তই এই বস্তুবিশ্ব ও জীবনদৃশ্যের রূপ-অরূপের কথাই বলিতেছি। দেশকালধৃত বস্তু ও জীবন-স্রোতের বিচিত্র রূপের মধ্যে তিনি আত্মগত অন্তর্মুখী অসংখ্য ও বিচিত্র ভাবকল্পনার অরূপ অপরূপ অনুভূতিগুলিকে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন ভাষা ও ছন্দের সাহায্যে, সেই অসংখ্য বিচিত্র রূপের চলচ্ছায়া তিনি নয়ন ভরিয়া দেখিয়াছেন, প্রাণ ভরিয়া তাহার রসপান করিয়াছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই রূপের মধ্য দিয়াই তিনি আবার অরূপ অপরূপকেই নয়নপ্রাণের আরও নিকটতর করিয়া লাভ করিয়াছেন। রূপে অরূপে নিত্য এই লীলা প্রাণ ভরিয়া দেখা, দেখার আনন্দে দেহচিত্তমন রাঙাইয়া তোলা এবং ভাষা ও ছন্দে সেই আনন্দ গাঁথিয়া যাওয়া, ইহাই রবীন্দ্র-কবিকীর্তি, ইহাই রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও জীবন-সাধনা। অরূপের জন্য জগৎ ও জীবন নিরপেক্ষ, দেশ ও কাল

নিরপেক্ষ, রুদ্ধেন্দ্রিয়দ্বার, নিমীলিত-নয়ন, সর্বরূপরাগবর্জিত ধ্যানসাধনা কবি রবীন্দ্রনাথের সাধনা নয়; তাঁহার সাধনাও ভাবাত্মক অরূপেরই সাধনা, কিন্তু সে-সাধনপন্থা দেশ ও কালের, জগৎ ও জীবনের বিচিত্র রূপের প্রেক্ষাপটে ইন্দ্রিয়ের যত বাসনা কামনা আনন্দ বেদনা, আত্মার যত আকূতি আকুলতা সব কিছু প্রতিফলিত করিয়া ভাষা ও ছন্দের মধ্যে অরূপের বিচিত্র রূপ প্রত্যক্ষ করা। মানব-চেতনার বিচিত্র বর্ণের, বিচিত্র রেখার, বিচিত্র রসের, বিচিত্র বাসনার যেমন কোনও সীমা নাই, তেমনই বস্তুবিশ্ব ও জীবনদৃশ্যের প্রেক্ষাপটে তাহাদের বিচিত্র রূপেরও কোন সীমা নাই। রবীন্দ্র-সাহিত্য তাই এত বিচিত্র।

বলিলাম, বস্তুবিশ্বের রূপদর্পণে অরূপের লীলা চিত্ত ভরিয়া দেখাই কবির সাধনা। কিন্তু এই দেখা দেশ ও কালের, জগৎ ও জীবনের পরিধির মধ্যেই শুধু আবদ্ধ হইয়া নাই; তাহাকে ক্ষণে ক্ষণে অতিক্রম করিয়াও গিয়াছে। আগেই বলিয়াছি, রবীন্দ্র-কবিকল্পনা একান্ত অন্তর্মুখী ও আত্মভাবপরায়ণ; এই ধরনের একান্ত স্বতন্ত্র, আপন ভাব-বিভোর কবিকল্পনার কাছে সমস্ত রূপই ত বন্ধন,এবং বন্ধন মাত্রই তাঁহার মুক্ত, অবাধ, আত্মপরিতৃপ্ত, আত্মভাববিমুগ্ধ কল্পনার গতিকে ব্যাহত করে। সেই জন্য, প্রতি মুহূর্তেই যে তিনি রূপবন্ধনকে স্বীকার করেন, তাহার কারণ, রূপবন্ধনকে স্বীকার না করিলে যে ভাবকল্পনা রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে না। আবার, প্রতি মুহূর্তেই যে তিনি বন্ধনকে অতিক্রম করিয়া যান, তাহার কারণ, অতিক্রম করিতে না পারিলে যে আত্মতৃপ্ত অন্তর্মুখী ভাবকল্পনার গতি থামিয়া যাইবে। সেইজন্য প্রতি মুহূর্তেই তিনি নিজে বন্ধনমোহ সৃষ্টি করেন রূপতৃষ্ণা মিটাইবার জন্য, 'আমি যে বন্দী হতে সন্ধি করি সবার কাছে', বস্তুবন্ধনের মধ্যে নিজেকে সমর্পণ না করিলে যে রূপকে ধরা ছোঁয়া যায় না। কিন্তু কবি-কল্পনা ত আবার 'নিজের কাছে নিজের গানের সুরে বাঁধা, সে

গানের রক্তে এড়িয়ে চলার ছন্দ'; এমন কবিকল্পনাকে 'বাঁধবি তোরা, সে বাঁধন কি তোদের আছে ?'

কবি নিজে এ-সম্বন্ধে সর্বদাই সচেতন। কতবার কতভাবে যে তিনি বন্ধন-মুক্তির কামনা করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই; কিন্তু গভীর গম্ভীর স্বীকারোক্তি আছে "পূরবীর" 'সাবিত্রী' কবিতায়—

তেজের ভাণ্ডার হতে কী আমাতে দিয়েছ যে ভরে
কে-ই বা সে জানে।
কী জাল হতেছে বোনা স্বপ্নে স্বপ্নে নানা বর্ণডোরে
মোর গুপ্ত প্রাণে।
তোমার দূতীরা আঁকে ভুবন-অঙ্গনে আলিম্পনা,
মুহূর্তে সে ইন্দ্রজাল অপরূপ রূপের কল্পনা
মুছে যায় সরে।
তেমনি সহজ হোক হাসিকান্না ভাবনাবেদনা—
না বাঁধুক মোরে।
তারা সবে মিলে থাক অরণ্যের স্পন্দিত পল্লবে,
শ্রাবণবর্ষণে।
যোগ দিক নির্ঝরের মঞ্জীরগুঞ্জন-কলরবে
উপলঘর্ষণে।
ঝঞ্ঝার মদিরামত্ত বৈশাখের তাণ্ডবলীলায়
বৈরাগী বসন্ত যবে আপনার বৈভব বিলায়,
সঙ্গে যেন থাকে।
তার পরে যেন তারা সব হারা দিগন্তে মিলায়,
চিহ্ন নাহি রাখে।

বস্তুবিশ্ব বা জীবনদৃশ্যের সকল বিচিত্র রূপ তিনি নয়ন ভরিয়া দেখিবেন, আকণ্ঠ পান করিবেন, কিন্তু কোনও রূপই তাঁহাকে বাঁধিবে না, কোনও চিহ্ন কেহ রাখিয়া যাইবে না, সমস্ত অপরূপ রূপের কল্পনা পরমুহূর্তে মুছিয়া সরিয়া যাইবে, ইহাই কবির একান্ত কামনা।

এই ধরনের কবিমানস সত্যই একটু অদ্ভুত, অভূতপূর্ব, এবং তাহা বলিয়াই রবীন্দ্র-কাব্য কিছু বিশেষ নীতি-নিয়মের সংস্কার বা কোনও বিশেষ প্রত্যক্ষ, দেশকালবদ্ধ প্রয়োজন-চেতনা বা জীবন-ভাবনা দ্বারা, কোনও জীবনাদর্শ দ্বারা বুঝিতে পারা বা পরীক্ষা করিতে পারা যায় না; করিতে গেলেই তাহার কাব্যরস কোথায় যে উড়িয়া যায়, কি করিয়া যেন হারাইয়া যায়। রবীন্দ্র-কাব্য বন্ধনমুক্তির কাব্য, বন্ধনকে অস্বীকার করিয়া নয়, তাহারই হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া, অথচ তাহাকে এড়াইয়া। কোনও বিশেষ ভাব-বন্ধন, কোনও বিশেষ ভাবনা-বন্ধনই রবীন্দ্র-কাব্যকে পূর্বাপর বাঁধিতে পারে নাই, এবং রবীন্দ্রকাব্যের সাহায্যে দেশকাল-ধৃত, বস্তুগত, প্রয়োজনগত, পূর্বাপরযুক্তি-সামঞ্জস্যগত কোনও জীবন-ভাবনা বা জীবনাদর্শ গড়িয়া তোলা সম্ভব নয়, বোধ হয় উচিতও নয়।

ইহাই যাহার কবিকল্পনার ধর্ম, তাঁহার অন্তরতম কবিপ্রাণ যে বিবাগী প্রাণ হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? রবীন্দ্র-কাব্যের মূল রাগিণীও তাই বিবাগিনী রাগিণী। একটি পরম ঔদাসীন্য তাঁহার সমস্ত কবিকীর্তি জুড়িয়া ব্যাপ্ত। কতবার কতভাবে কত অসংখ্য ক্ষণিক মোহের মধ্যে তিনি নিজেকে জড়াইয়াছেন, কিন্তু পরমুহূর্তেই সেই মোহ মুক্তি রূপে জ্বলিয়া উঠিয়াছে, সেই মোহাসক্তি হইতে নিজেকে তিনি দূরে সরাইয়া লইয়া গিয়াছেন। কোনও বিশেষ কেন্দ্রে তাঁহার কোনও আসক্তি নাই, আকর্ষণ নাই, সকলই ক্ষণিক মোহের ক্রীড়নক, ক্ষণিক রূপধ্যানের রসপানের বস্তু,—যতক্ষণ যাহাকে প্রয়োজন ততক্ষণ তাহাকে সঙ্গে রাখিয়াছেন, পরক্ষণেই তাহাকে আলিঙ্গনমুক্ত করিয়া দিয়া পরম ঔদাসীন্যে দূরে সরিয়া গিয়াছেন। কোনও বস্তু বা ভাবকেন্দ্রের প্রতিই যাঁহার পূর্বাপর কোনও বিশেষ আসক্তি বা আকর্ষণ

নাই, শুধু তাঁহার ভাবজীবন নয়, ব্যক্তিগত অন্তরজীবনও যে একক ও নিঃসঙ্গ হইবে, স্বতন্ত্র ও আত্মকেন্দ্রিক হইবে তাহাতে তৃ আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। ব্যক্তিগত জীবনে যাঁহারা কবিকে জানিয়াছেন, তাঁহারা এ-কথাও জানেন, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন ভক্তশিষ্য পরিবৃত থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ বরাবরই ছিলেন একক ও নিঃসঙ্গ, সর্বদাই স্বতন্ত্র ও আত্মকেন্দ্রিক; যে-কোনও মুহূর্তে নিজকে তিনি নিজের মধ্যে গুটাইয়া লইতে পারিতেন; বিচিত্র জনকোলাহলের মধ্যেও হঠাৎ নিজের অন্তরের আড়ালের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িবার আশ্চর্য ক্ষমতা তাঁহার ছিল। তিনি যেমন ভালবাসিয়াছেন, তেমনই ভালবাসা পাইয়াছেন, কিন্তু কোনও বিশেষ স্নেহ-ভালবাসার পাত্রপাত্রীদের উপর তাঁহার কোনও আসক্তি ছিল না, একটি পরম ঔদাসীন্য যেন তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকিত। ব্যক্তিগত জীবনে মর্মান্তিক শোকতাপ তিনি অনেক পাইয়াছেন, কিন্তু তাহার মর্মান্তিক প্রকাশ কেহ কখনও দেখিয়াছে কিনা সন্দেহ। সুদুঃসহ শোকেও তিনি এত স্বতন্ত্র ও আত্মভাবপরায়ণ যে দ্বিতীয় কোনও মনের বা চিত্তের সঙ্গে যোগ সেই মুহূর্তেও তিনি কামনা করেন নাই। বাহিরে তিনি দশজনের একজন, আন্তরজীবনে তিনি একক, একান্ত নিঃসঙ্গ; নিজের ভাবকল্পনা, প্রত্যয়ভাবনা লইয়া তিনি একান্তই স্বতন্ত্র ও অন্তর্মুখী—সেখানে তাঁহাকে সঙ্গ দান করিবার জন্য কাহাকেও তিনি আহ্বান করেন নাই। বস্তুবিশ্ব বা জীবন-দুঃখের সকল কিছুর উপর একটি পরমপ্রীতিময় ঔদাসীন্য না থাকিলে ইহা কিছুতেই সম্ভব হইত না। কবির কাব্যে ও জীবনে উভয় ক্ষেত্রেই এই প্রীতিময় পরম ঔদাসীন্য, এই বিবাগী প্রাণের ধর্ম একান্তই স্বপ্রকাশ।

রবীন্দ্র-কাব্য বস্তুকেন্দ্রিক বস্তুধর্মবশ রচনা নয়; কবির নিজস্ব ভাবকল্পনা ও রসানুভূতি হইতে কিছুতেই সে-কাব্যকে বিচ্যুত করা

চলে না, উচিতও নয়। এই কল্পনা ও অনুভূতি অন্তর্মুখী ও আত্মকেন্দ্রিক, এ-কথা বারবার আগেই বলিয়াছি; তাহার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কবিকল্পনা বস্তুর বাস্তবরূপ বা বস্তুধর্ম অতিক্রম করিয়া যায়, তাহাও বলিয়াছি। কিন্তু শুধু তাহাই নয়; কবিকল্পনা যে বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া মুক্তি পায়, স্বতন্ত্র ও অন্তর্মুখী প্রেরণার ফলে তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুর স্বরূপকেও অতিক্রম করে এবং চক্ষের পলকে তাহা অবিশেষ নৈর্ব্যক্তিক বস্তু-উত্তর রসপরিবেশের মধ্যে রূপান্তরিত হইয়া যায়। যে সুনিবিড় ব্যক্তিগত আত্মগত ভাবকল্পনা লিরিক কবিতার প্রাণধর্ম, সেই একান্ত আন্তরিক প্রাণধর্মের বেগ ও আবেগ নৈর্ব্যক্তিক পরিবেশের মধ্যে যথেষ্ট আনুকূল্য লাভ করিতে পারে না। এই কারণে রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা কিংবা শোকের কবিতা সর্বত্র যথেষ্ট ব্যক্তিচেতনাঘন ও স্পর্শসুনিবিড় নয়। আসল কথা, রবীন্দ্রনাথ মূলত ব্যক্তি ও বস্তু অতিক্রান্ত লোকোত্তর জীবনরসের কবি; তাই বস্তু ও ব্যক্তির যাহা প্রতিদিনের বাস্তব রূপ তাহাকে তিনি আত্মপ্রেমে শোধিত, ভাবকল্পনায় রঞ্জিত এবং প্রত্যয়-ভাবনায় জারিত করিয়া, বহু ক্রমের ভিতর দিয়া তাহাকে রূপান্তরিত করিয়া আমাদের কাছে উপস্থাপিত করিয়াছেন। রবীন্দ্র-কবিকল্পনার ইহাই বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বজীবন

"চিত্রা"য় দুইটি কবিতা আছে, একটি 'অন্তর্যামী', আর একটি "জীবনদেবতা'। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের সুগভীর একটি রহস্য এই কবিতা দুইটিতে প্রকাশ পাইয়াছে—

এ কি কৌতুক নিত্য নূতন
ওগো কৌতুকময়ী,
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই।
অন্তরমাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।
কী বলিতে চাই সব ভুলে যাই,
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,
সংগীতস্রোতে কূল নাহি পাই
কোথা ভেসে যাই দূরে।

এই কৌতুকময়ীটি কে? কে এই রহস্যময়ী কবির মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া গানে কবিতায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন; কবির নিজের কোনও কথা নাই, কোনও ভাষা নাই, যাহা কিছু সব এই কৌতুকময়ীর রহস্যলীলা! অথবা—

ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম।
দুঃখসুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়

নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ
দলিত দ্রাক্ষাসম।

এই অন্তরতমই বা কে? কাহাকে তিনি দলিত দ্রাক্ষার মতই সমস্ত বুক নিংড়াইয়া দুঃখ-সুখের লক্ষ ধারা পাত্র ভরিয়া পান করাইয়াছেন? কবি বলিতেছেন, এই অন্তরতম, এই কৌতুকময়ীই তাঁহার অন্তর্যামী, তাঁহার জীবনদেবতা! কবির ধ্যান সত্যই একটু অদ্ভুত। এই কৌতুকময়ী অন্তর্যামীকে তিনি নিজে খুঁজিয়া বাহির করেন নাই, অন্তরতম জীবন-দেবতা নিজে তাঁহাকে বরণ করিয়াছেন। অথচ কবির যাহা কিছু নর্ম কর্ম সকল কিছুর দেবতা এই অন্তরতম; কবির গানে কবিতায় যাহা ফুল হইয়া ফুটিয়াছে তাহা এই অন্তরতমেরই পূজার জন্য। কবির জীবনটি যেন একটি বীণা; সে-বীণার সুর বাঁধিয়া দিয়াছেন জীবন-দেবতা, রাগিণী রচনা করিয়া দিয়াছেন তিনি, কিন্তু গান ফুটাইয়া তুলিতে দিয়াছেন কবিকে। তবে কি এই জীবনদেবতার, অন্তরতমের অধিষ্ঠান কবির মনের মধ্যে—তিনিই কি কবির সমস্ত অন্তর বিদীর্ণ করিয়া ভাষায় কবিতায় ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছেন? তাঁহার ক্ষণিক খেলার লাগিয়াই কি কবি প্রতিদিন বাসনার সোনা গলাইয়া গলাইয়া নিত্য নূতন মূর্তি রচনা করিতেছেন? বুঝি বা অন্তরের মধ্যে সুতীব্র একটা অনুভূতি দেবতার রূপে তাঁহার সমগ্র জীবনের অধীশ্বর হইয়া বসিয়া আছে! বুঝি তিনিই আবার কখনও দেবীর রূপ ধরিয়া কবির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, এবং কবি তাঁহারই চরণে দীন ভক্তের অর্ঘ্য লইয়া আসিয়াছেন—

তবু ওগো দেবী, নিশিদিন করি পরানপণ
চরণে দিতেছি আনি
মোর জীবনের সকল শ্রেষ্ঠ সাধের ধন—
ব্যর্থ সাধনখানি।

* * * *

তুমি যদি দেবী, পলকে কেবল
কর কটাক্ষ স্নেহসুকোমল,
একটি বিন্দু ফেল আঁখিজল
করুণা মানি,
সব হতে তবে সার্থক হবে
ব্যর্থ সাধনখানি।

জীবনদেবতার আর এক রূপ সন্দেহ নাই, তবু জীবনদেবতাই বলিতে হইবে এই দেবীকেও। কবিজীবনের যত অকৃত কার্য, অকথিত বাণী, অগীত গান, বিফল যত বাসনা সমস্তই তাঁহার চরণে উৎসর্গ করা হইয়াছে, তাঁহারই কৃপায় সমস্ত সার্থক হইয়া উঠিবে। কিন্তু এই জীবনদেবতা কে?

কবি মনে করেন মানুষের চিত্তে একটা সৃষ্টির প্রেরণা আছে। মানুষ গানে-কবিতায়-চিত্রে-ভাস্কর্যে-শিল্পে-সাহিত্যে-চিন্তায়-কর্মে যাহা কিছু প্রকাশ করে তাহার মূলে রহিয়াছে এই সৃষ্টির প্রেরণা। এই প্রেরণাই তাঁহাকে সমস্ত কর্মে সমস্ত সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত করে; জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখকে সমস্ত ঘটনাকে ঐক্যদান করে, তাৎপর্য দান করে; ইহাই সৃজনীশক্তি। জীবনের মূলে সৃষ্টির এই প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ এক এক সময় অত্যন্ত গভীর ভাবে অনুভব করিয়াছেন। পূর্বে যে-তিনটি কবিতার উল্লেখ করিয়াছি, তাহার মধ্যে এই অনুভূতিটিই রসে ও সৌন্দর্যে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সৃষ্টির এই প্রেরণাই তাঁহাকে সমস্ত কর্মে প্রবৃত্ত করে, সমস্ত কর্মে নিয়ন্ত্রিত করে; এই প্রেরণাই নিরন্তর তাঁহার অন্তরের মধ্যে বসিয়া মুখ হইতে ভাষা কাড়িয়া লইয়া আপনাকে ব্যক্ত করে।

কিন্তু প্রশ্নটি হইতেছে, সৃষ্টির এই যে প্রেরণা, এই যে সৃজনীশক্তি, ইহা কি একেবারেই স্বয়ংসিদ্ধ? এই প্রেরণা কি আপনিই মনের মধ্যে

জাগে? বাহির হইতে কিছুই কি এ-প্রেরণাকে উদ্বুদ্ধ করে না? রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সৃষ্টির যে এই প্রেরণা, যে-প্রেরণাকে তিনি বলিয়াছেন কৌতুকময়ী অন্তর্যামী, সে-প্রেরণা কি আপনা হইতে তাঁহার মনে জাগিয়াছিল, বাহিরের কিছু কি তাহাকে উদ্বুদ্ধ করে নাই? মনে হয় তাহা নহে। তত্ত্বের দিক হইতে কোন্‌টা সত্য, এই বিচার অবান্তর; কিন্তু কবির ধ্যান, সৃষ্টির এই প্রেরণা আপনা হইতে মনের মধ্যে জাগে না; চিত্ত যে শুধু আপনাআপনি বাহিরের এই বিশ্বজীবনের মধ্যে একটা সৌন্দর্যকে দেখিয়া ও ভোগ করিয়া তৃপ্ত হয় তাহা নয়; বাহিরের এই বিশ্বজীবনের মধ্যেও এমন কিছু আছে, যাহা চিত্তের মধ্যে এই সৌন্দর্যানুভূতিকে উদ্রিক্ত করে। মানুষের চিত্ত এবং বাহিরের এই বিশ্বজীবন এই দু'য়ের মিলনালিঙ্গনেই মানুষের মনে সৃষ্টিপ্রেরণা উদ্বুদ্ধ হয়। বাহিরের বিশ্বজীবনের যে সৃষ্টিবৈচিত্র্যকে মনের মধ্যে আমরা একটি অখণ্ড সমগ্রতায় ভোগ করি, সেই ভোগানুভূতিটিই যেন আমরা ভাবে ও কথায় ফুটাইয়া তুলিতে চাই।

কবি মনে করেন, সৃষ্টিপ্রেরণার মূলে একটা উৎস আছে; এই সৃষ্টিপ্রেরণাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে একটা ভাবসত্তা। এই ভাবসত্তাকেই কবি যেন তাঁহার কবিমানসের নিয়ন্তা বলিয়া মনে করিতেছেন। তিনি মনে করেন, যে-গান তিনি রচনা করেন, যে-কথা তিনি বলেন, যাহা কিছু তিনি সৃষ্টি করেন, তাহা এই ভাবসত্তার প্রেরণায়। এই ভাবসত্তাকেই তিনি সুখ-দুঃখের লক্ষ ধারা পাত্র ভরিয়া পান করাইয়াছেন; তাহারই চরণে তিনি জীবনের যত শ্রেষ্ঠ সাধের ধন উৎসর্গ করিয়াছেন, এবং সর্বশেষে তাহাকেই প্রশ্ন করিয়াছেন, এত যে তোমায় দিলাম, এত যে তোমার পূজা করিলাম, হে আমার অন্তরতম, তুমি তৃপ্ত হইয়াছ কি? এই ভাবসত্তা আবার তাঁহাকে নিত্য নূতন লীলায় প্রবৃত্ত করিয়াছে, নিত্য নূতন কৌতুকে মাতাইয়াছে;

ইহাকেই তিনি কৌতুকময়ী অন্তর্যামী বলিয়া মনে করিয়াছেন। এই অনুভূতি যখন প্রবল হইয়াছে, যে-মুহূর্তে মনে হইয়াছে তাঁহার সমস্ত অন্তর জুড়িয়া একজন অন্তরতম বসিয়া আছেন, তিনি অন্তরের ভিতর হইতে ঠেলিয়া বাহির হইতেছেন সকল কথায় ও কর্মে, সেই মুহূর্তে কবি তাহার খেলার পুতুল হইয়া গিয়াছেন, একান্ত দীন ভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। জীবনের তেমন বহু মুহূর্তের কয়েকটি সুদীর্ঘ মুহূর্ত "চিত্রা"র কয়েকটি কবিতায় ধরা পড়িয়াছে।

এ-কথা আমি বলিতেছি না যে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিশ্বজীবনের অনুভূতি ও সৃষ্টিপ্রেরণা একই বস্তু। আমার কথা হইতেছে এই যে, বিশ্বজীবনের অনুভূতিই তাঁহাকে সৃষ্টির মূলে প্রেরণা দান করিয়াছিল, এবং সৃষ্টির এই প্রেরণা তিনি যৌবনের প্রথম উন্মেষ হইতেই অনুভব করিয়াছিলেন। এই অনুভূতি জীবনের এক এক স্তরে এক এক বিভিন্ন ভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে; একটি প্রবাহ এক স্থানে আসিয়া বাধা পাইয়া আর এক দিকে স্রোতের গতি ফিরাইয়াছে, আর এক মুখে বাধা পাইয়া ভিন্ন মুখে গিয়াছে—কখনও শীতের শুষ্ক রেখায়, কখনও বর্ষার মত্ত ধারায়। আমার মনে হয়, বিশ্বজীবনের এই অনুভূতি প্রথম হইতেই বিচিত্র গানে ও সুরে, গল্পে ও কবিতায়, ভাবে ও কর্মে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে। অবান্তর হইলেও এখানেই এ-কথা বলিতে চাই যে, এই ধ্যানানুভূত প্রত্যয়কেই কবি উত্তরকালে 'জীবনদেবতা' বলিয়াছেন। কবির নিজের বিশ্লেষণেই তাহার স্বীকারোক্তি আছে। "বঙ্গভাষার লেখক" (১৩১১) গ্রন্থে সংকলিত আত্মপরিচয়ে তিনি বলিতেছেন,

"আমার সুদীর্ঘকালের কবিতা লেখার ধারাটাকে ফিরিয়া যখন দেখি, তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই—এ একটা ব্যাপার, যাহার উপর আমার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। যখন লিখিতেছিলাম, তখন মনে করিয়াছি আমি লিখিতেছি বটে, কিন্তু আজ জানি

কথাটা সত্য নহে। কারণ, সেই খণ্ড কবিতাগুলিতে আমার সমগ্র কাব্য গ্রন্থের তাৎপর্য সম্পূর্ণ হয় নাই—সেই তাৎপর্য কী, তাহাও আমি পূর্বে জানিতাম না। এইরূপে পরিণাম না জানিয়া আমি একটির সহিত একটি কবিতা যোজনা করিয়া আসিয়াছি, —তাহাদের প্রত্যেকের যে-ক্ষুদ্র অর্থ কল্পনা করিয়াছিলাম, আজ সমগ্রের সাহায্যে নিশ্চয় বুঝিয়াছি সে অর্থ অতিক্রম করিয়া একটি অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য তাহাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছিল। তাই দীর্ঘকাল পরে একদিন লিখিয়াছিলাম— "এ কী কৌতুক নিত্য নূতন' ইত্যাদি।

"যখন যেটা লিখিতেছিলাম তখন সেইটেকেই পরিণাম বলিয়া মনে করিয়াছিলাম * * * * আমিই যে তাহা লিখিতেছি, এ সম্বন্ধেও সন্দেহ ঘটে নাই। কিন্তু আজ জানিয়াছি সে-সকল লেখা উপলক্ষ মাত্র। * * * তাহাদের রচয়িতার মধ্যে আর একজন কে রচনাকারী আছেন, যাঁহার সম্মুখে সেই ভাবী তাৎপর্য প্রত্যক্ষ বর্তমান।

"শুধু কি কবিতা লেখার একজন কর্তা কবিকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার লেখনী চালনা করিয়াছেন তাহা নহে। সেই সঙ্গে ইহাও দেখিয়াছি যে, জীবনটা যে গঠিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার সমস্ত সুখ-দুঃখ, তাহার সমস্ত যোগ-বিয়োগের বিচ্ছিন্নতাকে কে একজন একটি অখণ্ড তাৎপর্যের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিতেছেন।

"এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি 'জীবনদেবতা' নাম দিয়াছি।

"আমার অন্তর্নিহিত যে সৃজনীশক্তি আমার জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখকে সমস্ত ঘটনাকে ঐক্যদান তাৎপর্যদান করিতেছে, আমার রূপরূপান্তর জন্মজন্মান্তরকে ঐক্যসূত্রে গাঁথিতেছে, যাহার মধ্য দিয়া বিশ্ব-চরাচরের মধ্যে ঐক্য অনুভব করিতেছে, তাহাকেই 'জীবনদেবতা' নাম দিয়া লিখিয়াছিলাম, "ওহে অন্তরতম' ইত্যাদি।"

কিন্তু এই যে কবি, এই যে সৃজনীশক্তি ইহা ভগবানেরই অন্য অভিধা, এ-কথা মনে করিবার কিছুমাত্র কারণ নাই; ইহা কবিচিত্তেরই দ্বৈতানুভূতি, ব্যক্তিগত ব্যবহারিক সত্তার 'আমি' এবং সৃজনী প্রেরণার মূলগত 'আমি'র প্রত্যয়গত যুগ্মসত্তা। কিন্তু সে কথা পরে বলিতেছি।

কবিগুরুর অনেক পত্রাংশে ও "জীবনস্মৃতি"তে বাল্যজীবনের এই অনুভূতির প্রথম অস্পষ্ট আভাস আমরা জানিতে পারি। একদিন সকালবেলা বারান্দায় দাঁড়াইয়া সদর স্ট্রীটের রাস্তার পূর্ব প্রান্তে ফ্রী স্কুলের বাগানের দিকে চাহিয়া যে অপূর্ব অনুভূতির স্পর্শ তিনি পাইয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস সকলেরই জানা আছে; সে কথা এখানে আর না-ই উদ্ধৃত করিলাম। কিন্তু আর দু'টি অংশ উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন আছে—

"আমার নিজের খুব ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়ে, কিন্তু সে এতো অপরিস্ফুট যে ভাল ক'রে ধরতে পারিনে। কিন্তু বেশ মনে আছে এক একদিন সকালবেলা অকারণে অকস্মাৎ খুব একটা জীবনানন্দ মনে জেগে উঠতো! তখন পৃথিবীর চারিদিক রহস্যে আচ্ছন্ন ছিল। গোলাবাড়িতে একটা বাখারি দিয়ে রোজ রোজ মাটি খুঁড়তাম, মনে করতাম কি একটা রহস্য আবিষ্কৃত হবে। পৃথিবীর সমস্ত রূপরসগন্ধ, সমস্ত নড়া-চড়া আন্দোলন, বাড়ির ভেতরের নারিকেল গাছ, পুকুরের ধারের বট, জলের উপকার ছায়ালোক, রাস্তার শব্দ, চিলের ডাক, ভোরের বেলাকার বাগানের গন্ধ—সমস্ত জড়িয়ে একটা বৃহৎ অর্ধপরিচিত প্রাণী নানান মূর্তিতে আমায় সঙ্গ দান করত।

আর একটি পত্রাংশ এইরূপ—

"প্রকৃতির মধ্যে যে এমন একটা গভীর আনন্দ পাওয়া যায়, সে কেবল তার সঙ্গে আমাদের একটি নিগূঢ় আত্মীয়তা অনুভব ক'রে। এই তৃণ-গুল্ম লতা, জলধারা, বায়ু-প্রবাহ, এই ছায়ালোকের আবর্তন, জ্যোতিষ্কদলের প্রবাহ, পৃথিবীর অনন্ত প্রাণী পর্যায় এই সমস্তের সঙ্গেই আমাদের নাড়ি চলাচলের যোগ রয়েছে। বিশ্বের সঙ্গে আমরা একই ছন্দে বসানো, তাই এই ছন্দের যেখানেই যতি পড়েছে, যেখানে ঝংকার উঠছে, সেইখানেই আমাদের মনের ভেতর থেকে সায় পাওয়া যাচ্ছে। জগতের সমস্ত অণু-পরমাণু যদি আমাদের সগোত্র হতো, যদি প্রাণে ও আনন্দে অনন্ত দেশকাল স্পন্দমান হয়ে না থাকতো, তা হলে কখনই এই বাহ্য জগতের সংস্পর্শে আমাদের অন্তরের মধ্যে আন্দোলন সঞ্চার হতোনা। আমরা যাকে জড় বলি তার সঙ্গে আমাদের যথার্থ জাতি-ভেদ নেই বলেই আমরা উভয়ে এক জগতে স্থান পেয়েছি, নইলে আপনই দুই স্বতন্ত্র জগৎ তৈরি হয়ে উঠতো।"

প্রকৃতির মধ্যে একটা গভীর আনন্দ বহু কবিই অনুভব করিয়াছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই আনন্দ একটা বিশেষ ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি প্রকৃতির সব কিছু রূপের সঙ্গে একটা নিগূঢ় আত্মীয়তা অনুভব করিয়াছেন। এই বিশ্বপ্রকৃতির যত কিছু রূপ, যত কিছু বিচিত্র প্রকাশ, সব-কিছু যেন এক অখণ্ড রূপে তাঁহার অন্তরের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে; এবং সেই অখণ্ড রূপের সঙ্গে বাহিরের যত খণ্ড বিচিত্র রূপ সব কিছুর একটা নিবিড় 'নাড়ি চলাচলের যোগ' আছে। এই যে একটা অপূর্ব রহস্যের অনুভূতি, বলা নাই কহা নাই এক একদিন হঠাৎ অকারণে মনের মধ্যে এই অনুভূতির স্পর্শ পাইয়া সমস্ত অন্তরাত্মা যেন একটা চঞ্চল পুলকে নাচিয়া উঠিত। অন্তরের সীমার মধ্যে বাহিরের বিশ্বপ্রকৃতি যে অনুভব জাগাইয়াছে সেই অনুভূতিটাই বাহিরের বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত বিচিত্র রূপের মধ্যে নিজেকে খুঁজিয়া পাইতে চায়। সেই অনুভূতি যে কি বস্তু, কি যে তাহার স্বরূপ, কিছুই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে না, অথচ ভিতর হইতে কি যেন একটা 'অর্ধপরিচিত প্রাণী' ঠেলিয়া বাহির হইতে চায়। এই যে অপূর্ব রহস্য, মনে হয় প্রকৃতির প্রত্যেক প্রকাশের মধ্যে বুঝি এই রহস্য আত্মগোপন করিয়া আছে; কিন্তু সত্য কথাটা এই যে, সে অপূর্ব রহস্য তাঁহার চিত্তের মধ্যেই, অন্য কোথাও নয়; সেইখানেই এই রহস্যানুভূতি 'একটা বৃহৎ অর্ধপরিচিত প্রাণীর মূর্তি ধরিয়া' নিরন্তর তাঁহাকে সঙ্গদান করিতেছে। এই অর্ধপরিচিত প্রাণীটির অনুভূতিই বিশ্বজীবনের অখণ্ড অনুভূতির প্রথম অস্পষ্ট ইঙ্গিত।

"প্রভাত সংগীতে"র অনেক কবিতায় বিশেষ করিয়া নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটিতে এই ইঙ্গিত সর্বপ্রথম একটা সৌন্দর্যময় প্রকাশ লাভ করিল। যে-অনুভূতির স্পর্শে সমস্ত দেহ মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, যে-অনুভূতি অন্তরের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আকুলি ব্যাকুলি করিয়া মরিতেছে,

সেই অনুভূতি একদিন সমস্ত অন্তর ভেদ করিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া বিশ্বপ্রকৃতির অসীম অফুরন্ত প্রকাশের মধ্যে নিজেকে বিসর্জন করিয়া দিয়া সার্থক হইতে চাহিল। যে বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত বিচিত্র খণ্ড খণ্ড প্রকাশকে কবি নিগূঢ় আত্মবোধের বলে এক অখণ্ড রূপে নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিয়াছিলেন, সেই অনুভূতিটিই আবার 'একটা বৃহৎ অর্ধপরিচিত প্রাণীর মূর্তি ধরিয়া' তাঁহার ভিতর হইতে ঠেলিয়া বাহির হইয়া বিশ্বপ্রকৃতির খণ্ড খণ্ড সমস্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রকাশের মধ্যে নিজেকে পুনরায় ফিরিয়া পাইল—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি,
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
ধরায় আছে যত মানুষ শত শত
আসিছে প্রাণে মোর হাসিছে গলাগলি
* * * *
পরান পুরে গেল হরষে হোল ভোর
জগতে কেহ নাই, সবাই প্রাণে মোর।

অথবা—

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত পাখির গান।
না জানি কেন রে এতদিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ।

সর্বত্রই এই অনুভূতির ইঙ্গিত পাইতেছি। এই যে অনুভূতি, ইহাকেই কবি উত্তরকালে 'জীবনদেবতা' বলিয়াছেন, এবং এই অনুভূতিই চিরকাল 'নানান্ মূর্তি ধরিয়া' তাঁহাকে সঙ্গদান করিয়াছে। "প্রভাত সংগীতে" দেখিতেছি এই অনুভূতি অস্পষ্ট, তখনও তাহার একটা সুনির্দিষ্ট রূপ বা মূর্তি কবির মনের মধ্যে গড়িয়া উঠে নাই।

এই অনুভূতির মধ্যে একটা প্রত্যয়ের সন্ধান পাওয়া খুব কঠিন নয়; সে-প্রত্যয় রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় ও পরিচিত; এবং বহু কথায় ও কবিতায় কবি তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের দেশের ও বিদেশের কোনও কোনও চিন্তাধারার মধ্যেও সে-প্রত্যয়টি প্রকাশ পাইয়াছে। বাহিরের এই যে বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির সীমাহীন অগণন প্রকাশ আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রসারিত হইয়া আছে; এই বিশ্বপ্রকৃতি যখন আমাদের অন্তরের মধ্যে ধরা দেয়, তখন তাহা একটা সীমার মধ্যে অখণ্ড অনুভূতির রূপ গ্রহণ করে। কিন্তু এই অখণ্ড অনুভূতি কিছুতেই অন্তরের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চায় না, আপন সীমার মধ্যে আপনই চঞ্চল হইয়া উঠে, এবং আকুল আবেগে সীমা লঙ্ঘন করিয়া বিশ্বপ্রকৃতির অসীমতার মধ্যে বিচিত্র রূপে নিজেকে উপলব্ধি করিতে চায়। আসল কথা হইতেছে, যাহা অসীম তাহা কিছুতেই সত্য অথবা সার্থক নহে, তাহার কোন রূপ নাই, সীমার মধ্যে ধরা দিয়া তবে তাহার রূপ, তবে তাহার সার্থকতা; এই সীমার মধ্যে ধরা না দিলে অসীমকে কিছুতেই উপলব্ধি করা যায় না। আবার যাহা কিছু সীমার মধ্যে আবদ্ধ, যাহা কিছু সীমার মধ্যে একটা রূপ গ্রহণ করিয়াছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহা সেই সীমার বন্ধনকে অতিক্রম করিয়া অসীম অরূপের মধ্যে নিজেকে বিসর্জন না দিল এবং উপলব্ধি করিতে না পারিল ততক্ষণ পর্যন্ত তাহা সার্থক হইল না। সীমা ও অসীম, রূপ ও অরূপ, অংশ ও সম্পূর্ণ এমনই করিয়া পাশাপাশি বাস করে; আমাদের মরণশীল ব্যক্তিগত জীবন ও বাহিরের বিশ্বপ্রকৃতির শাশ্বত জীবন—এই দু'য়ের মধ্যেও এমনই একটা 'নাড়ি চলাচলের যোগ' আছে। এই ব্যক্তিগত জীবনের সীমাবদ্ধ অনুভূতির মধ্যেই আমরা বিশ্বপ্রকৃতির সীমাহীন শাশ্বত জীবন প্রত্যক্ষ করি। সৃষ্টির মধ্যে এমন কিছু নাই যাহা আমাদের অন্তরের অনুভূতির মধ্যে ধরা দেয় না, তাহা না হইলে কি

ব্যক্তিগত জীবন, কি বিশ্বজীবন কিছুরই কোনও সার্থকতা থাকিত না। পরিণত বয়সের একটি কবিতায় কবির এই প্রত্যয়-ভাবনাটি অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে—

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয় সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা,—
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।

প্রথম যখন একটা অনুভূতির স্পর্শ লাভ করা যায়, তখন অন্তরের মধ্যে হঠাৎ একটা খুব আকুল চঞ্চলতা জাগিয়া উঠে ; স্পষ্ট একটা কিছু ধারণা হয় না, অথচ অনুভূতির তীব্রতা এত বেশি যে নিজেকে কিছুতেই ধরিয়া রাখাও যায় না। "প্রভাত সংগীতে" অন্তরের এই আকুল চঞ্চলতা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। এবং ক্রমে দেখিব, বিশ্বজীবনের সঙ্গে কবিচিত্তের নিগূঢ় আত্মীয়তা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যতই বাড়িতে লাগিল, ততই এই অনুভূতি আরও তীব্র আরও স্পষ্ট হইয়া সমস্ত কবিজীবনকে অধিকার করিয়া বসিল। "প্রভাত সংগীতে" এই অনুভূতির যে অস্পষ্ট ইঙ্গিত, "ছবি ও গানের" দু'একটি কবিতায়ও তাহার আভাস আছে। 'রাহুর প্রেম' কবিতাটিতে এই অনুভূতি যেন একটা মূর্তি গ্রহণ করিতে

চাহিতেছে, যেন একটা রূপের মধ্যে ধরা দিতে চাহিতেছে এবং তাহার সঙ্গে কবি একটা প্রেমবন্ধনে বাঁধা পড়িতেছেন—

শুনেছি আমারে ভালোই লাগেনা
নাই বা লাগিল তোর।
কঠিন বাঁধনে চরণ বেড়িয়া
চিরকাল তোরে রব আঁকড়িয়া
লোহার শিকলডোর।
তুই তো আমার বন্দী অভাগী,
বাঁধিয়াছি কারাগারে,
প্রাণের বাঁধন দিয়েছি প্রাণেতে
দেখি কে খুলিতে পারে।
জগৎ-মাঝারে যেথায় বেড়াবি,
যেথায় বসিবি, যেথায় দাঁড়াবি,
বসন্তে শীতে দিবসে নিশীথে
সাথে সাথে তোর থাকিবে বাজিতে
এ পাষাণপ্রাণ চিরশৃঙ্খল
চরণ জড়ায়ে ধ'রে,—
একবার তোরে দেখেছি যখন
কেমনে এড়াবি মোরে।

স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি, "প্রভাত সংগীতে"র কুয়াশাচ্ছন্ন অনুভূতি যেন ক্রমে স্পষ্ট হইয়া আসিতেছে, চিত্তের মধ্যে বেশ একটি রূপ লইতেছে এবং সেই রূপের সঙ্গে যোগ একটু একটু করিয়া নিবিড় হইতেছে। এ যেন একটা প্রাণের মধ্যে একটা জীবনের মধ্যে আর একটা প্রাণ আর একটা জীবন নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হইতে চাহিতেছে, একটা চিরন্তন জীবন যেন একটা ক্ষণিক জীবনের মধ্যে বিকশিত হইয়া উঠিবার প্রয়াস করিতেছে। এই ক্ষণিক জীবন যে-দিকেই আঁখি মেলিয়া তাকায়, দেখিতে পায়, শীতে কি বসন্তে, দিবসে কি নিশীথে, রোদনে

কি হাসিতে, সম্মুখে কি পশ্চাতে, সর্বত্র যেন এই চিরন্তন জীবনের মূর্তি আঁকা রহিয়াছে, তাহারই আড়ালে সমস্ত ঢাকা পড়িয়াছে, সমস্ত জগৎ বিশ্বপ্রকৃতির যেন এই 'অনন্তকালের সঙ্গী'র মধ্যে রূপ গ্রহণ করিয়াছে—

নিত্য কালের সঙ্গী আমি যে,
আমি যে রে তোর ছায়া ;
কি বা সে রোদনে, কি বা সে হাসিতে,
দেখিতে পাইবি কখনো পাশেতে
কভু সম্মুখে কভু পশ্চাতে
আমার আঁধার কায়া।

* * *

যে দিকে চাহিবি আকাশে আমার
আঁধার মূরতি আঁকা
সকলি পড়িবে আমার আড়ালে,
জগৎ পড়িবে ঢাকা।

"ছবি ও গানে"র আর একটি কবিতা উল্লেখযোগ্য,—শুধু এই অনুভূতির বিকাশ হিসাবে নয়, রসাভিব্যক্তির দিক হইতেও কবিতাটি মধুর এবং সুন্দর। 'নিশীথ জগৎ' কবিতাটির মধ্যে যেন একটা তীব্র-আবেগকম্পিত বেদনাক্ষুব্ধ ছবি প্রাণবান হইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিম আকাশে মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে, নিবিড় মেঘের প্রান্ত-সীমায় বিদ্যুৎ থাকিয়া থাকিয়া চমকিয়া উঠিতেছে, মাথার উপর দিয়া 'উড়িছে বাদুড়, কাঁদিছে পেচক'—এই ভীষণ দুর্যোগে শিশু মা'র হাত ধরিয়া গহন বনের পথে যাত্রা করিয়াছে। হঠাৎ 'খেলিবার তরে' মা'র হাত যেমনি ছাড়িয়া দিল অমনি পিছনে পড়িয়া গেল—'বাছা বাছা' বলিয়া ডাকিয়া মা আর বাছার সন্ধান কোথাও পাইলেন না। মাতৃহারা শিশু এদিকে গহন বনের মধ্যে বসিয়া আছে—

সহসা সমুখ দিয়ে কে গেল ছায়ার মত
লাগিল তরাস।

কে জানে সহসা যেন কোথা কোন্ দিক হতে
শুনি দীর্ঘশ্বাস।
কে বসে রয়েছে পাশে? কে ছুঁইল দেহ মোর
হিম হস্তে তার?

এই অদৃশ্য পুরুষটি কে? অন্ধকারে যত অদৃশ্য প্রাণী এই বিরাট বিশ্বপ্রকৃতি সকলের মধ্যে যে সে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, শিশু নিজেও যে সেই অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়া গিয়া এই বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছে, অন্ধকারে নিজকেও ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছে না; কি করিয়াই বা পাইবে, তাহার আপন যে তাহার নিজের মধ্যেই ডুবিয়া আছে। এই গুপ্ত-আপনাকে কিছুতেই যে দেখিতে পাওয়া যায় না—

অন্ধকারে আপনারে দেখিতে না পাই যত,
তত ভালবাসি,
তত তারে বুকে করে বাহুতে বাঁধিয়া লয়ে
হয়েযেতে ভাসি।
তত যেন মনে হয় পাছে রে চলিতে পথে
তৃণ ফুটে পায়,
যতনের ধন পাছে চমকি কাঁদিয়া ওঠে
কুসুমের বায়।

আমি যে বলিয়াছি জীবনদেবতার অনুভূতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজীবনের অনুভূতির একটা নিবিড় যোগ আছে, "মানসী"র প্রথম কবিতাটিতে তাহার প্রমাণ আছে। এই যে অসংখ্য গানে ও কবিতায় মনের ভাবনা কামনাগুলি ফুলের মত বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, ইহারা কি? কবির কথায়, ইহারা প্রত্যেকটি এক একটি 'আনন্দক্ষণের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণের প্রকাশ'। এই আনন্দক্ষণটির, প্রাণের সর্বোত্তম মুহূর্তটির স্পর্শ মনের মধ্যে কখন আমরা লাভ করি, 'উপহার'

কবিতাটিতে কবি তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার এই চিত্তের প্রান্তদেশে প্রতি মুহূর্তে জীবনের তরঙ্গ আসিয়া আঘাত করিতেছে, মুহূর্ত তাহার বিরাম নাই; দুঃখসুখের বিচিত্র সুর প্রতি মুহূর্তে অন্তরের মধ্যে ধ্বনিত হয়। সকলে মিলিয়া অন্তরকে ব্যাকুল করিয়া তোলে, 'বিচিত্র দুরাশা জাগাইয়া' চঞ্চল করিয়া দেয়। তখন কবি বাহিরের এই তরঙ্গাঘাতক্ষুব্ধ বিচিত্র সুর-ধ্বনিত অসীম বিশ্বপ্রকৃতিকে নিজের অন্তরের অনুভূতির সীমার মধ্যে একান্ত আপনার করিয়া গ্রহণ করেন এবং তাহাকে আশা দিয়া, ভাষা দিয়া, ভালবাসা দিয়া, অর্থাৎ নিজের সমস্ত হৃদয়-বৃত্তি দিয়া অভিষিক্ত করিয়া, নিজের 'মানসী-প্রতিমা' রূপে গড়িয়া তোলেন। এই মানসী-প্রতিমাই কখনও সখা রূপে, কখনও প্রিয়তমা নারী রূপে, কখনও অন্তরের দেবতা রূপে, কখনও জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে তাঁহাকে নিরন্তর সঙ্গ দান করে। বাহিরে এই বিশ্ব বিচিত্র গান, বিচিত্র দৃশ্য, বিচিত্র সৌন্দর্য লইয়া আমাদের সম্মুখে প্রসারিত হইয়া আছে; কিন্তু সে সঙ্গীহারা বিরহী; একান্ত ব্যথায় সে কবির হৃদয়ের দ্বারে আসিয়া তাঁহার সঙ্গলাভের জন্য কাঁদিয়া মরিতেছে। কবির মনেও তখন বিরহ জাগিয়া উঠে; তখন তাঁহার মর্মের মূর্তিমতী কামনা অন্তঃপুরবাস ছাড়িয়া সলজ্জচরণে আসিয়া বাহিরের বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হইয়া তাঁহাকে সঙ্গ দান করে। অন্তরের সঙ্গে বাহিরের এই ব্যাকুলিত মিলনের যে মুহূর্ত এই মুহূর্তটিই একটি আনন্দক্ষণের, 'সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণের প্রকাশে'র মুহূর্ত। এমনই মুহূর্তে যত গান যত কবিতা মনের কুঁড়ির ভিতর হইতে ফুটিয়া বাহির হয়।

"মানসী"র শেষের কবিতাটিও খুব লক্ষ্য করিবার। কবি মনে করিতেছেন, তাঁহার অন্তরের মধ্যে নিত্য যে তাঁহাকে সঙ্গদান করিতেছে, তাহার উপর তিনি জয়ী হইয়াছেন; তিনি যে-মাধুরী এ জীবনে পাইয়াছেন সে তাহা পায় নাই। এই অলস সকাল বেলায়,

অলস মেঘের মেলায় সারাদিনের জলের আলোর খেলার মধ্যে সর্বত্র যেন সেই অন্তরসঙ্গীর 'ওই মুখ ওই হাসি ওই দু'নয়ন' ভাসিয়া উঠিতেছে, কাছে দূরে সর্বত্র মধুর কোমল সুরে তাহার ডাক শুনা যাইতেছে। কবি তো তাই ভাবেন, এ-জীবনে তিনি যাহা পাইলেন তাঁহার অন্তর-সঙ্গী তাহা পাইল না। কবি মনে করেন, তাঁহার নিজের কোন সীমা নাই, আদি নাই, অন্ত নাই, সমস্ত সীমাকে অতিক্রম করিয়া বিশ্বের মধ্যে তিনি পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন—কিন্তু যাহার প্রসাদে তাঁহার এই অপূর্ব অনুভূতি তাহাকেই তিনি শুধাইয়াছেন,

তুমি কি করেছ মনে দেখেছ—পেয়েছ তুমি
সীমারেখা মম ?
ফেলিয়া দিয়াছ মোরে আদি অন্ত শেষ ক'রে
পড়া পুঁথি সম ?
নাই সীমা আগে পাছে, যত চাও তত আছে,
যতই আসিবে কাছে তত পাবে মোরে।
আমারেও দিয়ে তুমি এ বিপুল বিশ্বভূমি
এ আকাশ এ বাতাস দিতে পার ভ'রে।
আমাতেও স্থান পেত অবাধে, সমস্ত তব
জীবনের আশা
একবার ভেবে দেখো এ পরান ধরিয়াছে
কত ভালোবাসা।

কিন্তু "সোনার তরী"তেই সর্বপ্রথম এই অনুভূতির সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখা গেল। "মানসী"তে কবি যে 'মানসী প্রতিমা' গড়িয়া তুলিয়াছেন, 'সোনার তরী"তে তাহাই 'মানসসুন্দরী' হইয়া দেখা দিল। এই কবিতাটি আমি সর্বপ্রথম উল্লেখ করিতেছি এই জন্য যে ইহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি-প্রেরণার রহস্যময়ীকে যেন আমরা দেখিতে পাই। ইতিপূর্বে দেখিয়াছি, পৃথিবীর সমস্ত রূপরসগন্ধ, নড়াচড়া আন্দোলন

বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত বিচিত্র প্রকাশ, সব জড়াইয়া একটি 'অর্ধপরিচিত প্রাণী' তাঁহাকে নিরন্তর সঙ্গ দান করিত ; এই প্রাণীটির সঙ্গে তখন ভাল করিয়া পরিচয় ছিল না, তবু কি সন্ধ্যায়, কি প্রভাতে, কি গৃহকোণে, কি জনশূন্য গৃহছাদে, আকাশের তলে এই আধচেনাশোনা সঙ্গীটির সঙ্গে তাঁহার দেখা হইত, নানান বিচিত্র কথা বলিয়া সে তাঁহাকে ভুলাইত। বাল্যকালে এই সঙ্গীটি তাঁহার কাছে আসিয়াছিল 'নবীন বালিকা মূর্তি' ধরিয়া—কবি জীবনের এই প্রথম প্রেয়সীকে, তাঁহার ভাগ্যগগনের সৌন্দর্যশশীকে, তাঁহার যৌবনের মানসসুন্দরীকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন,

মনে আছে কবে কোন্ ফুল্ল যূথীবনে,
বহু বাল্যকালে, দেখা হত দুইজনে
আধো চেনাশোনা? তুমি এই পৃথিবীর
প্রতিবেশিনীর মেয়ে, ধরার অস্থির
এক বালকের সাথে কী খেলা খেলাতে
সখী, আসিতে হাসিয়া, তরুণ প্রভাতে
নবীন-বালিকামূর্তি, শুভ্রবস্ত্র পরি
উষার কিরণধারে সদ্যস্নান করি
বিকচ কুসুমসম ফুল্লমুখখানি
নিদ্রাভঙ্গে দেখা দিতে,—নিয়ে যেতে টানি
উপবনে কুড়াতে শেফালি। বারে বারে
শৈশবকর্তব্য হতে ভুলায়ে আমারে
ফেলে দিয়ে পুঁথিপত্র, কেড়ে নিয়ে খড়ি,
দেখায়ে গোপন পথ দিতে মুক্ত করি
পাঠশালাকারা হতে; কোথা গৃহকোণে
নিয়ে যেতে নির্জনেতে রহস্য ভবনে
জনশূন্য গৃহছাদে আকাশের তলে।
কী করিতে খেলা; কী বিচিত্র কথা বলে

ভুলাতে আমারে—স্বপ্নসম চমৎকার,
অর্থহীন সত্য মিথ্যা তুমি জান তার।

কিন্তু সে বাল্যজীবন কবির এখন আর নাই—তাঁহার বালিকা সঙ্গিনীও শৈশবের খেলাক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। কবির জীবনের বনে যৌবন-বসন্তের প্রথম মলয় বায়ু আজ নিশ্বাস ফেলিয়াছে, মনের মধ্যে নূতন আশা মুকুলিত হইয়া উঠিয়াছে, বিশ্বজীবনের অনুভূতি আজ নূতন রূপে তাঁহার অন্তরকে স্পর্শ করিয়াছে। এমন দিনে হঠাৎ কবি দেখিলেন, তাঁহার শৈশবের সঙ্গিনী—

খেলাক্ষেত্র হতে
কখন্ অন্তরলক্ষ্মী এসেছ অন্তরে,
আপনার অন্তঃপুরে গৌরবের ভরে
বসি আছ মহিষীর মতো।

*　　*　　*

ছিলে খেলার সঙ্গিনী,
এখন হয়েছ মোর মর্মের গেহিনী,
জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

বাল্যের সঙ্গিনী আজ অন্তরের প্রিয়া রূপে দেখা দিয়াছে। বাল্য যাহার মধ্যে বিধৃত হইয়াছিল, আজিকার যৌবনও তাহারই মধ্যে বিধৃত হইয়া আছে—অনুভূতি একই রহিয়া গিয়াছে, শুধু তাহার রূপ বদলাইয়া গিয়াছে। কিন্তু অন্তরের এই প্রিয়া সে ত অন্তরের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া নাই, সে যে আপনাকে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে অনন্ত বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে। হয়ত কবিজীবনের এই প্রিয়া পূর্বজন্মেও কবির অন্তরের মধ্যে সৌন্দর্যে বিকশিত হইয়াছিল—মৃত্যু-বিরহে সে মিলন-বন্ধন টুটিয়া গিয়া প্রিয়া তাঁহার সমস্ত বিশ্বের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। সেই জন্যই

কবি এই বিশ্বপ্রকৃতির যে দিকেই তাকাইতেছেন, প্রিয়ারই অনিন্দ্য-সুন্দর রূপ তিনি দেখিতে পাইতেছেন—

এখন ভাসিছ তুমি
অনন্তের মাঝে ; স্বর্গ হতে মর্ত্যভূমি
করিছ বিহার ; সন্ধ্যার কনকবর্ণে
রাঙিছ অঞ্চল ; উষার গলিতস্বর্ণে
গড়িছ মেখলা ; পূর্ণ তটিনীর জলে
করিছ বিস্তার তলতল-ছলছলে
ললিত যৌবনখানি ; বসন্তবাতাসে
চঞ্চল বাসনাব্যথা সুগন্ধ নিশ্বাসে
করিছ প্রকাশ ; নিষুপ্ত পূর্ণিমারাতে
নির্জন গগনে একাকিনী ক্লান্ত হাতে
বিছাইছ দুগ্ধশুভ্র বিরহশয়ন।

কিন্তু অন্তরের মধ্যে প্রিয়ার এই অনুভূতির শুধু স্পর্শ লাভ করিয়া কবি যেন তৃপ্ত হইতে পারিতেছেন না, বাস্তব মূর্তিতে এই মানসী প্রিয়াকে তিনি দেখিতে চাহিতেছেন—তাহাকে তিনি তাই শুধাইতেছেন

সেই তুমি
মূর্তিতে দিবে কি ধরা। এই মর্ত্যভূমি
পরশ করিবে রাঙা চরণের তলে ?
অন্তরে বাহিরে বিশ্বে শূন্যে জলে স্থলে
সর্ব ঠাঁই হতে সর্বময়ী আপনারে
করিয়া হরণ, ধরণীর একধারে
ধরিবে কি একখানি মধুর মুরতি।

এই সর্বময়ী বিশ্বপ্রকৃতির অনুভূতি কোনো বাস্তব মূর্তি ধরিয়া কোনদিনই দেখা দেয় নাই, কিন্তু কতরূপে যে অনুভূতির স্পর্শ কবি লাভ করিয়াছেন, কত ভাবে যে তাঁহার মানসসুন্দরী তাঁহাকে দেখা দিয়াছে,

তাহার ইয়ত্তা নাই। একদিন এই অন্তরপ্রিয়ার সঙ্গে তাঁহার ঝুলন-মেলা, সে-দিন হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া তিনি দেখিলেন, তাঁহার 'পরান' তাঁহার বুকের কাছে বসিয়া আছে, থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিয়া সে কবির বক্ষ চাপিয়া ধরিতেছে, এই নিষ্ঠুর নিবিড় বন্ধনসুখে কবির হৃদয় নাচিতেছে, তাঁহার বুকের কাছে তাঁহার 'পরান' 'আকুলি ব্যাকুলি' করিতেছে। এতকাল তিনি ভয়ে ভয়ে এই পরানসম মানসসুন্দরীকে যতনে পালন করিয়াছেন, পাছে তার ব্যথা লাগে, পাছে দুঃখ জাগে; সোহাগে চুম্বনে তাহাকে ভরিয়া দিয়াছেন, যাহা কিছু মধুর সুন্দর তাহাই দু'হাত পূর্ণ করিয়া ঢালিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এত সুখ আজ তাঁহার প্রিয়াকে আলস্যের আবেশে মোহগ্রস্ত করিয়া ফেলিয়াছে; স্পর্শ করিলে আজ আর সে সাড়া দেয় না, কুসুমের হার তাহার গুরুভার বলিয়া মনে হয়। 'কিন্তু এমন করিলে আমার মধুর বধূরে যে হারাইব, অতল স্বপ্নসাগরে ডুবিয়া যে মরিব! তাহাকে যে আজ আবার নূতন করিয়া পাইতে হইবে'—

ভেবেছি আজিকে খেলিতে হইবে
নূতন খেলা
রাত্রিবেলা।
মরণদোলায় ধরি রশিগাছি
বসিব দুজনে বড়ো কাছাকাছি,
ঝঞ্ঝা আসিয়া অট্ট হাসিয়া
মারিবে ঠেলা,
আমাতে প্রাণেতে খেলিব দুজনে
ঝুলন খেলা
নিশীথবেলা।
দে দোল্ দোল্।
দে দোল্ দোল্।

এ মহাসাগরে তুফান তোল্।
বধূরে আমার পেয়েছি আবার
ভরেছে কোল।
*   *   *
প্রাণেতে আমাতে মুখোমুখি আজ
চিনি লব দোঁহে ছাড়ি ভয় লাজ,
বক্ষে বক্ষে পরশিব দোঁহে
ভাবে বিভোল।
দে দোল্ দোল্।

আজ দেখিলাম অন্তরে এ কি কল্লোল, আকাশে বাতাসে কি হট্ট-রোল—মানসসুন্দরীর সঙ্গে কি অপূর্ব ঝুলনমেলা। কিন্তু আর একদিন দেখিতেছি এই মানসসুন্দরীই তাঁহাকে কোন্ নিরুদ্দেশ যাত্রায় টানিয়া লইয়া যাইতেছে, তার কোন ঠিকানাই নাই—কিসের অন্বেষণে যে এই যাত্রা কবি নিজেই তাহা জানেন না; অথচ তাঁহার অন্তরের মধ্যে যে অন্তরলক্ষ্মী, সে-ই আজ তাঁহাকে নিরুদ্দেশ পথে ছুটাইয়া লইয়া যাইতেছে। পথের মধ্যে অন্তরের সুন্দরীকে তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন,

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরী
বল কোন্ পার ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী।
যখনি শুধাই ওগো বিদেশিনী,
তুমি হাস শুধু মধুরহাসিনী,
বুঝিতে না পারি কী জানি কী আছে
তোমার মনে।
নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি
অকূল সিন্ধু উঠিছে আকুলি
দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন
গগনকোণে।
কী আছে হেথায় চলেছি কিসের
অন্বেষণে।

আবার এ-কথাও কবি জানেন, যত বিচিত্র হোক অন্তরের মধ্যে অনুভূতির এই প্রকাশ, বিশ্বপ্রকৃতির যত বিচিত্রতার মধ্যেই সে আপনাকে বিকশিত করিয়া সার্থক করিয়া তুলুক, অন্তরের মধ্যে সকল বৈচিত্র্য এক হইয়া গিয়া একটি মাত্র অখণ্ড রূপ গ্রহণ করিয়াছে, সেখানে তাহার বিচ্ছিন্ন পৃথক অস্তিত্ব আর কিছুই নাই। এই একটিমাত্র অখণ্ড রূপ তাঁহার মানসসুন্দরীর রূপ, অন্তরতমের রূপ, জীবনদেবতার রূপ। জগতের মধ্যে এ রূপের প্রকাশ বিচিত্র—সুদূর নীলগগনে নীহারিকা-পুঞ্জের অদ্ভুত আলোকে তাহার রূপ ঝলসিয়া উঠিতেছে, ফুলকাননে সে আকুল পুলকে উল্লাসে মাতিয়া উঠিতেছে, দ্যুলোকে ভূলোকে সর্বত্র সেই চঞ্চলগামিনী চিত্রা চলচঞ্চল চরণে হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে। তাহার মুখর নূপুর সুদূর আকাশে থাকিয়া থাকিয়া বাজিয়া উঠে; মধুর গন্ধবাতাসে অলকগন্ধ উড়িয়া যায়, নৃত্যের তালে তালে মঙ্গলরাগিণী ঝংকারিয়া উঠে। বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে এত বিচিত্র যাহার লীলা, "চিত্রা"য় সে কিনা কবির অন্তরের মধ্যে দেখা দিল তাহার সমস্ত বিচিত্র প্রকাশকে এক অখণ্ডরূপে রূপায়িত করিয়া—

> জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
> তুমি বিচিত্ররূপিণী।

* * *

কিন্তু—

> অন্তর-মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
> তুমি অন্তরবাসিনী।

দেখিলাম, বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশের এক অখণ্ড অনুভূতি মানসসুন্দরীর রূপ ধরিয়া কবির অন্তরকে পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে, সেই সুন্দরীকেই বাহিরে তিনি বিশ্বজীবনের সমস্ত অভিব্যক্তির মধ্যে

দেখিয়াছেন, এই সুন্দরীই তাঁহার জীবনকে বিকশিত করিতেছে, নিয়ন্ত্রিত করিতেছে—পদে পদে তাঁহাকে দিক ভুলাইতেছে, অজানা পথে নিরুদ্দেশ যাত্রায় ছুটাইয়া লইয়া চলিয়াছে,—কবির নিজের কোন কথা নাই, ভাষা নাই, তাহারই কথা লইয়া ভাষা লইয়া, তাঁহারই মানসসুন্দরী জীবনদেবতা তাঁহার অন্তরের সকল কথা সকল ভাষা ফুটাইয়া তুলিতেছে ! এ কি অপূর্ব রহস্য, এ কি অদ্ভুত কৌতুক—এর কি কোন অর্থ আছে, কোন শেষ আছে ?

> এ কী কৌতুক নিত্য-নূতন
> ওগো কৌতুকময়ী,
> আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
> বলিতে দিতেছ কই ।
>
> * * *
>
> একথা প্রথম প্রভাতবেলায়
> সে-পথে বাহির হইনু হেলায়
> মনে ছিল, দিন কাজে ও খেলায়
> কাটায়ে ফিরিব রাতে ।
>
> পদে পদে তুমি ভুলাইলে দিক,
> কোথা যাব আজি নাহি পাই ঠিক,
> ক্লান্ত হৃদয় ভ্রান্ত পথিক
> এসেছি নূতন দেশে ।

কিন্তু এত করিয়া যে তুমি আমাকে নিজেই বরণ করিলে, আমার অন্তরের মধ্যে বাস করিয়া আমাকে লইয়াই এত কৌতুক করিলে, তোমার হাতের পুতুল করিয়া এত খেলা যে খেলাইলে, আমার সমস্ত জীবনকে যে তুমি তোমার পূজার ফুল বলিয়া গ্রহণ করিলে—এত কিছু করিয়া আমাকে লইয়া তুমি তৃপ্তি পাইয়াছ কি ? এ প্রশ্ন ত না করিয়া উপায় নাই—

ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম।

আমাকে নিঃশেষে যদি তুমি লইয়া থাক, আমার যত শোভা যত গান যত প্রাণ সব যদি আজ শেষ হইয়া থাকে, আমার জীবনকুঞ্জে তোমার অভিসার নিশা যদি ভোর হইয়া থাকে—তবে আমাকে আবার তুমি নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়া লও, আমার মধ্যে আবার নূতন করিয়া তোমার অভিসার আরম্ভ হউক—তুমি তো নিজেই নিত্য নূতন, আমার অনিত্যের মধ্যে তোমার নিত্য লীলা নিত্য বিকশিত হউক—

ভেঙ্গে দাও তবে আজিকার সভা,
আনো নব রূপ, আনো নব শোভা,
নূতন করিয়া লহো আরবার
চির পুরাতন মোরে।—

কিন্তু এ নব নব রূপের যে আর শেষ নাই, সীমা নাই—আর এই নব নব রূপ নব নব শোভার আবাহনেরও শেষ নাই। অন্তরের মধ্যে অন্তরতমের স্পর্শ নূতন নূতন ভাবে এক একবার অনুভব করিয়াছেন বলিয়াই না কবি-জীবনের দ্রাক্ষাকুঞ্জবন আজ গুচ্ছ গুচ্ছ ফলে ভরিয়া উঠিয়াছে—"চৈতালী"তে কবি তাই তাঁহার 'নিকুঞ্জ নিবাসে' আবার অন্তরতমকে আবাহন করিয়াছেন।

"প্রভাত সংগীত" হইতে আরম্ভ করিয়া "চৈতালী" পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের মধ্যে বিশ্বজীবনের যে-অনুভূতি তাহার প্রকাশ ও পরিচয়টুকু আমরা লইতে চেষ্টা করিলাম। বহু কবিতার মধ্যে এই অনুভূতির আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু যে কবিতাগুলিতে সেই আভাস স্পষ্ট, সেই কবিতাগুলি হইতেই কবিজীবনের এই অপূর্ব রহস্যটিকে

বুঝিতে চেষ্টা করা সহজ। দেখিলাম, কবিজীবনের প্রথম হইতেই বাহিরের বিশ্বজীবনের বিচিত্র প্রকাশের সঙ্গে কবিহৃদয়ের একটা 'নিবিড় নাড়ি চলাচলের যোগ'—তাহার সঙ্গে কবির কি যেন একটা আত্মীয়তা আছে। শুধু তাই নয়, যাহা কিছু তিনি চোখের ও মনের দৃষ্টিতে দেখিতেছেন, কানে শুনিতেছেন, স্পর্শে অনুভব করিতেছেন, এই পাখির গান, বাতাসের শব্দ, আকাশের সূর্যচন্দ্রতারা, মানুষের চলা বলা, গাছ পালা, নদ নদী, যত কিছু সব মিলিয়া যেন একটা অখণ্ড রূপ লইয়া তাঁহার অন্তরের মধ্যে ধরা দিয়াছে—এই রূপ তাঁহার অর্ধপরিচিত এবং এই অর্ধপরিচিত প্রাণীটি' যেন নিরন্তর তাঁহাকে সঙ্গ দান করিতেছে। কিন্তু অন্তরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া সে নিজে সার্থকতা খুঁজিয়া পায় না, ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িতে চায় এবং বিশ্বপ্রকৃতির অফুরন্ত প্রকাশের মধ্যে নিজেকে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিতে চায়। "প্রভাত সংগীতে" এই কামনাটা প্রকাশ পাইয়াছে। বলিয়াছি, অন্তরের মধ্যে এই প্রাণীটির, পরিচয় প্রথম স্পষ্ট ছিল না, কিন্তু ক্রমে যেন তাহার অস্তিত্ব স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রথমে দেখা গেল, বাহিরের বিশ্বজীবনের বিচ্ছিন্ন বিচিত্র খণ্ড খণ্ড প্রকাশ অখণ্ড অনুভূতির রূপ লইয়া কবির অন্তরের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহার সঙ্গে কবি নিবিড় বন্ধুত্বের বাঁধনে বাঁধা পড়িয়াছেন—সে তাঁহার খেলার সাথী। কিন্তু এই বন্ধন নিবিড় হইতে যতই নিবিড়তর হইতে লাগিল এবং কবির বয়স যতই বাড়িতে লাগিল,ততই যেন তাঁহার সখী কবি-প্রাণের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়া কবির প্রেমের কারাগারে বন্দী হইতে লাগিল এবং ক্রমে বাল্যের সখী কৈশোরের সঙ্গিনী যৌবনে অন্তরলক্ষ্মী মর্মের গেহিনী হইয়া অন্তরমন্দিরে প্রবেশ করিল। তখন তাহার সঙ্গে কবির কত মিলন-বিরহের লীলা, কত সোহাগ-চুম্বন, এ যেন প্রায় প্রতিদিনের সাংসারিক জীবনের দাম্পত্য-প্রেমের লীলা! এ-লীলার মধ্যেও আবার মাঝে মাঝে

অবসাদ দেখা দেয়, প্রতিদিনের স্পর্শে মাধুর্য তাহার নূতনত্ব হারায়। তখন আবার নূতন করিয়া পাইবার ইচ্ছা জাগে। মাঝে মাঝে আবার তাহাকে একটি গভীরতম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, তুমি কি আমাকে লইয়া তৃপ্ত হইয়াছ, আমার কথিত ও অকথিত যত বাসনা, কৃত ও অকৃত যত কর্ম সব কিছু তুমি গ্রহণ করিয়াছ কি? কিন্তু এই প্রিয়তমার রূপ ছাড়া এই মানসসুন্দরীর আর একটা রহস্যরূপ দেখিতে পাই। সেরূপ শুধু প্রিয়তমারই রূপ নয়, সেখানে যেন এই প্রিয়তমাই আবার জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে দেখা দিয়াছে। আগে যাহা বলিয়াছি, এ যেন ব্যক্তিজীবনের মধ্যেই আর একটা জীবন, এবং সেই আর একটা জীবনই যেন ব্যক্তিজীবনের অধীশ্বর। মানস-সুন্দরীর, অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সে এক কৌতুকময়ীর রূপ, রহস্যময়ীর রূপ—কবি নিজে যাহা বলেন তাহা এই রহস্যময়ীর কথা, যে পথে চলেন সে পথের নির্দেশও করে এই কৌতুকময়ী, সে-ই তাঁহাকে অজানা নিরুদ্দেশ পথে ছুটাইয়া লইয়া চলিয়াছে। এই রহস্যময়ী কৌতুকময়ী মানসসুন্দরীই জীবনদেবতা—বাল্যে যে সাথী, যৌবনে সে প্রিয়তমা। সকলেই এই বিশ্বজীবনের বিচিত্র প্রকাশের এক অখণ্ড রূপ। ইহার অনুভূতিই অন্তরপুরুষের অনুভূতি, জীবনদেবতার অনুভূতি! ইহাই কবিজীবনের অধীশ্বর, ইহাই কবির অসংখ্য কথায় ও কবিতায়, গানে ও সুরে নিজেকে সার্থক অভিব্যক্তি দান করিয়াছেন। ব্যক্তির জীবনসত্তার বাহিরে তাহার কোনও অস্তিত্বই নাই, কাজেই এই অনুভূতি ভগবৎ-অনুভূতি বলিয়া ভুল করিবারও কোনও কারণ নাই।

বস্তুত কবিজীবনের অধীশ্বরের, জীবনদেবতার অনুভূতি অত্যন্ত রস ও রহস্যময়, অপূর্ব সৌন্দর্যময় অনুভূতি না হইয়াই পারে না। কারণ যাহাকে জীবনদেবতার অনুভূতি বলিতেছি তাহার মধ্যে বিশ্বজীবনের যত রূপ, যত রস, যত বর্ণ, যত গন্ধ, যত বিচিত্র প্রকাশ, যত রহস্য, যত

সৌন্দর্য, সব কিছুর অনুভূতি এক হইয়া অন্তর ব্যাপিয়া একটি মাত্র অনুভূতির রূপ ধারণ করিয়াছে, এবং সে প্রতি মুহূর্তে বাহিরের বিচিত্র বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে নিজের সার্থকতা খুঁজিয়া মরিতেছে। আর যে-কবির মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে 'নাড়ি চলাচলের যোগ' এত সত্য, যিনি তুচ্ছতম পদার্থের মধ্যেও অপূর্ব রস ও সৌন্দর্যের আস্বাদন লাভ করেন, আকাশের নীহারিকাপুঞ্জ, উপরকার ছায়ালোক, বাড়ির বাগানের নারিকেল গাছ সব কিছুর মধ্যে যিনি অনির্বচনীয় রস ও রহস্যের আভাস পাইতেন, তাঁহার কাছে এই জীবনদেবতার অনুভূতি অপূর্ব অনির্বচনীয় রস, রহস্য ও সৌন্দর্যের উৎস হইয়া সমস্ত জীবনকে কবিতার কুসুমে ফুটাইয়া তুলিবে, ইহা কিছুই বিচিত্র নয়। হইয়াছেও তাহাই। "প্রভাত সংগীত" হইতে আরম্ভ করিয়া "কথা ও কাহিনী," 'কল্পনা," "ক্ষণিকা" পর্যন্ত সমস্ত জীবন গানে গানে কবিতায় কবিতায় একেবারে ছাইয়া গিয়াছে—কোথাও এতটুকু ফাঁক নাই। আর সে-গান ও কবিতা উভয়ই অপূর্ব, কোনও তত্ত্ব নাই, কোনও তথ্য নাই, যেন একটি অফুরন্ত রস ও সৌন্দর্যের প্রবাহ; বাহিরের সঙ্গে অন্তরের, মানুষের সঙ্গে বিশ্বজীবনের সম্পূর্ণ মিলনের যে-আনন্দ, সে-আনন্দ যেন এই সময়কার কবিতাগুলির ভিতর হইতে আপনি বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে। সমস্ত জীবন যেন বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে রসে ও সৌন্দর্যে, ভোগে ও প্রেমে একবারে ডুবিয়া আছে, বিশ্বজীবনের অফুরন্ত রস-উৎসের মধ্যে নিজকে ভাল করিয়া ভোগ করিবার, সার্থক করিবার একটা চঞ্চল আকুলতা মনের মধ্যে আবেগে কম্পিত হইতেছে। 'বসুন্ধরা,' 'যেতে নাহি দিব,' 'সমুদ্রের প্রতি,' 'স্বর্গ হইতে বিদায়,' 'প্রবাসী' ইত্যাদি অনেক কবিতায় সেই আকুলতার আবেগকম্পন প্রকাশ পাইয়াছে। এ-সম্বন্ধে তাঁহার অনুভূতি সত্যই অপূর্ব রহস্যময়—

তৃণে পুলকিত যে মাটির ধরা
　　লুটায় আমার সামনে
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া
　　কেন যে কব তা কেমনে ?
মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণ জলে
সে দুয়ার খুলি কবে কোন্ ছলে
　　বাহির হয়েছি ভ্রমণে।

* * * * *

এ-সাতমহলা ভবনে আমার
　　চির জনমের ভিটাতে
স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে
　　বাঁধা যে গিঠাতে গিঠাতে।

এ-কথা সকলেই জানেন যে বিভিন্ন ভাববিকাশ সত্ত্বেও "প্রভাত সংগীত" হইতে আরম্ভ করিয়া "কল্পনা" "ক্ষণিকা" পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কবিজীবন একান্তই রূপ-মাধুর্য-রস-সৌন্দর্যানুভূতির জীবন। ইহার পর "নৈবেদ্য-খেয়া" হইতে কবি-জীবনের যে নূতন অধ্যায় শুরু হইল তাহার মুখে এই মাধুর্য-রসপূর্ণ জীবনের কাছে কবিকে কতকটা বিদায় লইতে হইল। এই বিদায়ের একটা বেদনা আছে, সে-বেদনার ক্রন্দন "কল্পনা" ও "ক্ষণিকা"র অনেক কবিতাতেই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু জীবন-দেবতার অনুভূতি এখনও যেন অন্তরের মধ্যে তার স্পর্শ বুলাইয়া রাখিয়াছে। তবু উপায় নাই, মানসসুন্দরী এই প্রিয়তমার কাছ হইতে বিদায় লইতেই হইবে—যত নিষ্ঠুর যত কঠোর হউক তাহা—

আমি নিষ্ঠুর কঠিন কঠোর
　　নির্মম আমি আজি
আর নাই দেরি ভৈরব-ভেরী
　　বাহিরে উঠিছে বাজি।

তুমি ঘুমাইছ নিমীল-নয়নে,
কাঁপিয়া উঠিছ বিরহ-স্বপনে
প্রভাতে জাগিয়া শূন্য শয়নে
কাঁদিয়া চাহিয়া রবে।

কবি তাহা জানেন, তবু—

সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়তে হবে।

কবি ত বাঁধন ছিঁড়িতে চান; কিন্তু পিছন হইতে কে তাঁহাকে ডাকে—তিনি ত মনে করিতেছেন, কাজ তাঁহার শেষ হইয়াছে, দীর্ঘ দিনমান কাটিয়া সন্ধ্যা নামিয়া আসিয়াছে, এখন তাঁহার বিদায়ের সময়—কিন্তু এমন সময় অন্তরের মধ্যে কার আহ্বান শুনা যায়—এ কি জীবনদেবতার?

রে মোহিনী, রে নিষ্ঠুরা ওরে রক্তলোভাতুরা
কঠোরা স্বামিনী,
দিন মোর দিনু তোরে শেষে নিতে চাস হ'রে
আমার যামিনী?
জগতে সবারি আছে সংসার সীমার কাছে
কোনোখানে শেষ,
কেন আসে মর্মচ্ছেদি সকল সমাপ্তি ভেদি
তোমার আদেশ?
বিশ্বজোড়া অন্ধকার সকলেরি আপনার
একেলার স্থান,
কোথা হতে তারো মাঝে বিদ্যুতের মতো বাজে
তোমার আহ্বান?

যাহা হউক, "নৈবেদ্য" হইতে শুরু করিয়াই এই রস-মাধুর্যপূর্ণ জীবনের সঙ্গে বিচ্ছেদ পূর্ণ হইল। বিশ্বজীবনের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে কবির সেই 'নাড়ি চলাচলের যোগ' আর অনুভব করা যাইবে না,

ক্ষুদ্রতম ক্ষুদ্র বস্তুটিতেও সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করিবার, ভূমাকে প্রত্যক্ষ করিবার সহজ আনন্দ, 'to see a world in a grain of sand' আর দেখা যাইবে না, সুখে-দুঃখে হাসি-কান্নায় ভরা এই পৃথিবী তাহার নানা রূপে কবির প্রাণে আর দোলা দিবে না—বহুদিনের জন্য এই অনুভূতি স্তব্ধ হইয়া গেল। "নৈবেদ্যে" যে-জীবনের আরম্ভ, গীতিমাল্য-গীতালিতে" সেই জীবনের পূর্ণতা। এই জীবনের মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির পর, বিশ্বপ্রকৃতির যিনি অধীশ্বর তাঁহার অনুভূতিই ক্রমশ সমস্ত অন্তরের মধ্যে মায়াস্পর্শ বুলাইয়া দিল। বিশ্বজীবনের সমস্ত বিকাশের মূলে যিনি তিনিই এই সময়ের কবিজীবনকে আর এক সার্থকতায় ভরিয়া দিলেন। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের ভাবধারার সঙ্গে যাহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা সকলেই এ-কথা জানেন; কাজেই সবিস্তারে তাহা এখানে বলিবার কোনও প্রয়োজন নাই। তবে এ-কথা বলা প্রয়োজন যে, ভাবধারার এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনদেবতার যে অপূর্ব রহস্যময় অনুভূতি তাহারও অনেকখানি পরিবর্তন হইল। আর, না হইয়া উপায়ই বা কি? বিশ্বজীবনের সঙ্গে গভীর নিগূঢ় আত্মীয়তা বোধ অপেক্ষাও গভীরতর রহস্যের মধ্যে মন যেখানে মগ্ন হইয়া গিয়াছে, সেখানে জীবনদেবতার অনুভূতি ত কতকটা বিদায় লইতে বাধ্য; কারণ, জীবনদেবতা-রহস্যের সমস্ত অনুভূতিটুকু ত প্রতিষ্ঠিতই ছিল বিশ্বজীবনের সঙ্গে মানবাত্মার নিগূঢ় যৌগিক মিলন ও নিবিড় আত্মীয়তা-বোধের উপর, তাহার বিচিত্র প্রকাশকে এক অখণ্ড রূপে অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করিবার উপর।

এইখানে এই কথাটা বুঝা সহজ হইবে যে, বিশ্বজীবনের অনুভূতিই ক্রমে বিশ্বদেবতার অনুভূতির মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছিল, হয়ত বা দু'য়ের মধ্যে একটু সত্য সম্বন্ধও রহিয়াছে। সে যাহাই হউক, এ কথা ঠিক যে, এই দুই অনুভূতিকে আমরা এক বলিয়া কিছুতেই ভুল করিতে

পারি না। জীবনদেবতার প্রকাশ বিশ্বজীবনের মধ্যে নয়, আমাদের মধ্যে—অর্থাৎ 'আমি এই বিশেষ ব্যক্তির অন্তরের মধ্যে—এইখানে তাহার লীলা এবং সেই লীলাকে আমি' উপলব্ধি করি আমার অন্তরের বাহিরে বিশ্বজীবনের মধ্যে। 'আমি' এই ব্যক্তির ক্ষণিক জীবনকে জীবনদেবতার প্রসাদে উপলব্ধি করি বিশ্বপ্রকৃতির চিরন্তন জীবনের মধ্যে। এই হিসাবে জীবনদেবতা কবিজীবনেরই একটা বৃহত্তর গভীরতর জীবন। ভগবান বা বিশ্বদেবতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি আর যাহাই হউক ঠিক ইহা নহে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিতেছেন,

"চিত্রা কাব্যে আমি একদিন বলেছিলুম আমার অন্তর্যামী আমাকে দিয়ে যা বলাচ্ছে চান আমি তাই বলি, কথাটা এই রকম শুনতে হয়। কিন্তু চিত্রায় আমার যে উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে সেটি অন্য শ্রেণীর। আমার একটি যুগ্ম সত্তা আমি অনুভব করেছিলুম যেন যুগ্ম-নক্ষত্রের মতো, সে আমারই ব্যক্তিত্বের অন্তর্গত, তারই আকর্ষণ প্রবল। তারই সংকল্প পূর্ণ হচ্ছে আমার মধ্য দিয়ে, আমার সুখ দুঃখ আমার ভালোয় মন্দয়। * * * * বস্তুত চিত্রায় জীবন-রঙ্গভূমিতে যে মিলন নাট্যের উল্লেখ হয়েছে তার কোনো নায়িক-নায়িকা জীব-সত্তার বাহিরে নেই এবং তার মধ্যে কেউ ভগবানের স্থানাভিষিক্ত নয়।"

("রবীন্দ্ররচনাবলী," ৪র্থ খণ্ড, "চিত্রা"র 'সূচনা')

তবে এ-কথা হয়ত খানিকটা সত্য যে, জীবনদেবতার অনুভূতি ক্রমে একসময়ে বিশ্বদেবতার গভীরতর অনুভূতির সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছিল, ব্যক্তিজীবনের মধ্যে বিশ্বজীবনের যে উপলব্ধি তাহা বিশ্বদেবতার উপলব্ধির মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। কারণ, "খেয়া," "গীতাঞ্জলি," "গীতিমাল্য" প্রভৃতির কোনও কোনও কবিতায় দেখা যায়, কবিজীবনের মধ্যে যে বৃহত্তর গভীরতর জীবনের অনুভূতি সেই অনুভূতিই যেন কোথাও কোথাও বিশ্বদেবতার, ভগবানের অনুভূতি বলিয়া মনে হইয়াছে, অবশ্য ক্ষণিক একটা মুহূর্তে।

রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের রহস্যকে যে-ভাবে আমি এখানে উপস্থিত করিয়াছি, তাহার মধ্যে একটা প্রত্যয়-ভাবনা আপনি প্রকাশ পাইয়াছে, একটা অনুভূত সত্য আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছে; এই সত্যের একটু আভাস আমি দিতে চেষ্টাও করিয়াছি। হয়ত রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতার যে অপূর্ব রহস্য তাহা এই সত্যকে কতকটা আশ্রয়ও করিয়াছে। কিন্তু এ-কথাটাকে কিছুতেই একান্ত করিয়া দেখিতে চাই না; ইহার মধ্যে বৈষ্ণব ভেদাভেদ দর্শন, অথবা উপনিষদের বিশুদ্ধ অদ্বৈততত্ত্ব কিংবা হেগেলীয় দর্শন কতখানি স্থান পাইয়াছে, কতখানি পায় নাই, সে-বিচারের মধ্যেও ঢুকিবার কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া আমি মনে করি না। এ-রহস্য একান্তই অনুভূতির কথা—অনুভব দ্বারাই এ-রহস্যকে তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন: এ-রহস্যের সঙ্গে যে অনুভূতি, যে-কল্পনা জড়াইয়া আছে, তাহা একান্তই কবিচিত্তের একটা সহজ প্রত্যয়-ভাবনা। আমি আগেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ কবি, তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত নহেন; তাঁহার কবিজীবনের উৎস কোনও নির্দিষ্ট তত্ত্ব অথবা সত্য সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান নহে, সে-উৎস তাঁহার কবিচিত্তের অতি সহজ এবং অতি আশ্চর্য অনুভূতির ক্ষমতা। এই অদ্ভুত ক্ষমতার বলেই তিনি জগৎ ও জীবনের যত দুর্গম ও দুর্জ্ঞেয় রহস্যের সন্ধান পাইয়াছেন—ন মেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন। সেই জন্যই এই জীবনদেবতার রহস্যের মধ্যে কোনও তত্ত্বের সন্ধান লইবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করিতে পারিলাম না—কবিকে কিংবা কবির কাব্যকে বুঝিবার পক্ষে সে-তত্ত্বজ্ঞান আমাদের কিছু সাহায্য করিবে বলিয়া মনে হয় না।

কিন্তু প্রসঙ্গের সূত্রটিকে আবার ধরিতে চাই। "কল্পনা-ক্ষণিকা"র সঙ্গে সঙ্গেই কি কবির অন্তরের মধ্যে তাঁহার জীবনদেবতার, মানস-সুন্দরীর এই রহস্যময় অনুভূতিটি স্তব্ধ হইয়া গেল—আর কি এই

অনুভূতি তাঁহার কবিচিত্তকে রস ও সৌন্দর্যের বর্ণে গন্ধে পত্রে পুষ্পে ভরিয়া দিবে না? আপাতদৃষ্টিতে কিন্তু তাহাই মনে হয়—মনে হয় সত্য সত্যই বুঝি কবি এই অনুভূতিটিকে হারাইলেন। যে মানস-প্রিয়া একবার অন্তরতম হইয়া অন্তরবেদীটি অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন, তিনি কি সত্যই চিরকালের জন্য হারাইয়া যাইবেন, আর কি কোনও দিনই তাঁহার দেখা মিলিবে না? বিশ্বদেবতাই কি জীবনদেবতার আসন জুড়িয়া থাকিবেন?

এ কথা সকলেই জানেন যে, "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"র কবি রবীন্দ্রনাথ "বলাকা"য় এক নূতন জীবনে জন্মলাভ করিয়াছেন; এই নব-জন্মলাভ বাস্তবিকই একটি অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার। আমরা এক সময় ভাবিয়াছিলাম, "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্যে"র রসবোধে সকল বিচিত্র রসবোধ বিলীন করিয়া দিয়া অনন্যশরণ বিশ্বদেবতার চরণে আত্মসমর্পণই বুঝি রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তের শেষ আশ্রয় হইল। তাহা হইলে মানব-চিত্তের যাহা স্বাভাবিক পরিণতি তাহাই হইত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথে তাহা হইল না। কেন হইল না, কি করিয়া "বলাকা"য় এই নব-জন্মলাভ সম্ভব হইল, তাহা আমি অন্যত্র বলিয়াছি, এখানে আর তাহার পুনরুক্তি করিতে চাহি না। "বলাকা" চঞ্চল গতিরাগের কাব্য—প্রেম, যৌবন ও সৌন্দর্যের জয়গান খুব উঁচুদরের একটা বুদ্ধির আবেদন লইয়া সেই কাব্যের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। যৌবনের এই গতিবেগ, প্রেমাবেগ, সৌন্দর্যাবেগ ফিরিয়া পাইবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আবার সেই জীবনদেবতার রহস্যের অস্পষ্ট আভাস একটু ফিরিয়া পাইতেছি। 'মত্ত সাগর দিল পাড়ি গহন রাত্রিকালে, ঐ যে আমার নেয়ে,' এই কবিতাটির মধ্যে বোধ হয় এই অপরিচিত অন্তর-পুরুষটির অতি অস্পষ্ট পদধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, "বলাকা"র পরেই

আসিয়াছে "পলাতকা"। "পলাতকা"য় দেখিতেছি বিশ্বজীবনের একটি অংশ, মানবজীবনের তুচ্ছ সুখদুঃখ, তুচ্ছ ঘরকন্নার ইতিহাস আবার তাঁহাকে নূতন করিয়া দোলা দিতে শুরু করিয়াছে। মনে হয় "পলাতকা"র কবিতাগুলিতে শুধু নানা ভাবে নানা ছন্দে গল্পকথায় মানবচিত্তের নানা অনুভূতির ভিতর দিয়া সংসারের বিচিত্র মাধুর্য-রসপূর্ণ জীবনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ার চেষ্টাই প্রকাশ পাইয়াছে। বুঝিতে পারিতেছি বাল্যের সখী, কৈশোরের সঙ্গিনী, যৌবনের মানসসুন্দরী যে-অনুভূতির রূপে রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছিল সে-রহস্য সে-অনুভূতি বুঝি ধীরপদসঞ্চারে অন্তর-মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতেছে। সে বুঝি আসে, আসে, আসে!

"পূরবী"তে সে সত্যই আসিয়া পড়িল—বিশ্বদেবতার গভীরতর অনুভূতি তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না। কি করিয়াই বা পারিবে—বিশ্বজীবন যে বিশ্বদেবতা অপেক্ষা প্রিয়তর, রবীন্দ্রনাথ যে মানব-জীবনের কবি, নিসর্গজীবনের কবি! "পূরবী"র ভাবপ্রসঙ্গ আমি অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু এখানে তাহার একটু পুনরুল্লেখ করিবার প্রয়োজন আছে; যে-কারণেই হোক যে গভীর অধ্যাত্মানুভূতির ভিতর রবীন্দ্রনাথের কবিজীবন ডুব দিয়াছিল সে-জীবন তাঁহার ভাল লাগিল না; 'কান্না হাসির গঙ্গা যমুনায়' তিনি ফিরিয়া আসিলেন, 'পুণ্য ধরার ধুলো মাটি ফল হাওয়া জল তৃণ তরুর সনে' আবার নিবিড় 'নাড়ি চলাচলের যোগ' প্রতিষ্ঠিত হইল—

> —এই যা দেখা এই যা ছোঁওয়া, এই ভালো এই ভালো।
> এই ভালো আজ এ সংগমে কান্নাহাসির গঙ্গা-যমুনায়
> ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।
> এই ভালো রে প্রাণের রঙ্গে এই আসঙ্গ সকল অঙ্গে মনে
> পুণ্য ধরার ধুলো মাটি ফল হাওয়া জল তৃণ তরুর সনে।

এই ইচ্ছা যখনই জাগিল তখন কবি সহজেই অনুভব করিলেন—

আজ ধরণী আপন হাতে
অন্ন দিলেন আমার পাতে
ফল দিয়েছেন সাজিয়ে পত্রপুটে।
আজকে মাঠের ঘাসে ঘাসে
নিঃশ্বাসে মোর খবর আসে
কোথায় আছে বিশ্বজনের প্রাণ।

এ যেন আবার সেই প্রথম যৌবনের অনুভূতি, বিশ্বজনের প্রাণকে নিজের প্রাণের মধ্যে অনুভব করিবার আকৃতি। আর এ-আকৃতি, এ-অনুভূতিই যদি ফিরিয়া আসিল, তবে সেই লীলাসঙ্গিনী মানসসুন্দরীর স্পর্শ লাভের আর দেরি কত? সত্যই ত সে-ও ফিরিয়া আসিল—

দুয়ার-বাহিরে যেমনি চাহিরে
মনে হলো যেন চিনি,—
কবে, নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা,
ছিলে লীলাসঙ্গিনী?

এই লীলাসঙ্গিনী অতীতের সেই মধুর দিনগুলিতে কতদিন কত লীলার ছলে আসিয়া কবিকে বারবার দেখা দিয়া গিয়াছে, তাহার কঙ্কণ-ঝংকারে কবির বন্ধ দুয়ার কতদিন খুলিয়া গিয়াছে, বাতাসে বাতাসে তাহার ইশারা ভাসিয়া আসিয়াছে। কখনও আমের নবমুকুলের বেশে, কখনও নব মেঘভারে, কত বিচিত্ররূপে চঞ্চল চাহনিতে কবিকে বারে-বারে সে ভুলাইয়াছে। কিন্তু এতদিন পরে জীবন-সন্ধ্যায় সে যে আসিল তাহাকে আমি বরণ করিয়া ঘরে লইতে পারিব কি, পারিলেই বা আর কতদিন!

দেখো না কি হায়, বেলা চলে যায়,—
সারা হয়ে এল দিন।

বাজে পূরবীর ছন্দে রবির
শেষ রাগিণীর বীন।
এতদিন হেথা ছিনু আমি পরবাসী,
হারিয়ে ফেলেছি সেদিনের সেই বাঁশি,
আজ সন্ধ্যায় প্রাণ উঠে নিশ্বাসি
গানহারা উদাসীন।
কেন অবেলায় ডেকেছ খেলায়
সারা হয়ে এল দিন।

এই যে মানসী প্রিয়ার অনুভূতিকে ফিরিয়া পাওয়া, এই কথাটি "পূরবী"র অনেক কবিতাতেই খুব স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। আনন্দে সৌন্দর্যে মাধুর্যে এক সময় যে-জীবন পরিপ্লুত হইয়াছিল জীবনের সেই আনন্দ সৌন্দর্য কোথায় হারাইয়া গিয়াছিল; আজ তাহা জীবনসন্ধ্যায় অতি ধীরে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আবার আসিয়া গোপনে কবির ভাবের ও অনুভূতির রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। বড় দ্রুত ক্ষণিকার মত সেদিনের প্রিয়তমার ত্রস্ত আঁখিযুগল সুনিবিড় তিমিরের তলে ডুবিয়া গিয়াছিল, দুজনের জীবনের চরম অভিপ্রায় সেদিন পূর্ণ হয় নাই। হে আকাশ, আজ তোমার স্তব্ধ নীল যবনিকা তুমি তুলিয়া দাও, আমার মানসী প্রিয়াকে খুঁজিয়া লইতে দাও। একদিন আমার অন্তর ব্যাপিয়া তাহার রাজ্যপাট বিস্তৃত ছিল; আর একদিন এক গোধূলিবেলায় তাহার ভীরু দীপশিখাটি লইয়া কোন্ দিগন্তে যে সে মিলাইয়া গেল, কিছুই জানি না। আজ আবার সে ফিরিয়া আসিয়াছে—

আজ দেখি সেদিনের সেই ক্ষীণ পদধ্বনি তার
আমার গানের ছন্দ গোপনে করিছে অধিকার,
দেখি তার অদৃশ্য অঙ্গুলি
স্বপ্ন অশ্রু সরোবরে ক্ষণে ক্ষণে দেয় ঢেউ তুলি।

কোন্ অতীত দিনে কবেকার সেই প্রিয়া কবিকে তার শেষ চুম্বন

দিয়া গিয়াছে—কবি সুদীর্ঘ বিচ্ছেদে তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। আজ যখন আবার তাহাকে মনে পড়িয়াছে তখন তিনি বড় আকুল হৃদয়ে এই বিস্মৃতির জন্য ক্ষমা চাহিতেছেন। সেই শেষ চুম্বনের পরে কত মাধবী-মঞ্জরী থরে থরে শুকাইয়া পড়িয়া গিয়াছে, কত কপোত-কূজন-মুখর মধ্যাহ্ন, কত সন্ধ্যা সোনার বিস্মৃতি আঁকিয়া দিয়া প্রতি মুহূর্ত জাল বুনিয়া দিয়া কাটিয়া গিয়াছে। দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে কবি যদি তাঁহার প্রিয়াকে ভুলিয়াই থাকেন, আজ তাহার জন্য তিনি ক্ষমা চাহিতেছেন। কিন্তু এ-কথা তিনি জানেন, সেই প্রিয়ার স্পর্শ তিনি পাইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার জীবন সোনা হইয়া গিয়াছে—

> তবু জানি, একদিন তুমি দেখা দিয়েছিলে ব'লে
> গানের ফসলে মোর এ জীবন উঠেছিল ফলে,
> আজো নাই শেষ; * * *
> * * * তোমার পরশ নাহি আর
> কিন্তু কী পরশমণি রেখে গেছ অন্তরে আমার,—
> বিশ্বের অমৃতছবি আজিও তো দেখা দেয় মোরে
> ক্ষণে ক্ষণে,—অকারণ আনন্দের সুধাপাত্র ভ'রে
> আমারে করায় পান।

কিন্তু আরও উল্লেখের প্রয়োজন আছে কি? কবি নিজেই স্বীকার করিলেন, এই মানসসুন্দরীর অন্তরপ্রিয়ার স্পর্শলাভ ঘটিয়াছিল বলিয়াই গানের ফসলে এ-জীবন ভরিয়া উঠিয়াছিল, আজও তাহার শেষ নাই; সত্যই 'আজো নাই শেষ'। দিনশেষের সায়াহ্নের গোধূলি আলোকে সেই অন্তরতম আবার অন্তরকে স্পর্শ করিয়াছেন, আবার অন্তরের মধ্যে জীবনদেবতার পাট বিস্তৃত হইয়াছে, সেইজন্যই ত পরিণত বার্ধক্যেও গানের ফসলের আর শেষ নাই; অফুরন্ত গান, অফুরন্ত কবিতা, অফুরন্ত রস, অফুরন্ত সৌন্দর্য ধারাস্রোতের মতন নিরন্তর আমাদের সম্মুখ দিয়া বহিয়া যাইতেছে—সেই ধারাস্রোত হইতে ঘট ভরিয়া সৌন্দর্যসুধা আমরা ঘরে লইয়া যাইতেছি! বিশ্বজীবনের বিচিত্র প্রকাশের

মধ্যে কবির ব্যক্তিজীবন যে নূতন করিয়া জীবনদেবতার অনুভূতি লাভ করিল ইহার জন্য কি কোনও প্রমাণের আবশ্যক আছে? দিনের পর দিন মাসের পর মাস ঋতুর পর ঋতুতে আমরা কি দেখিতেছি না অফুরন্ত গানের অফুরন্ত কবিতার ফেয়ারা; আর সে-গান সে-কবিতাই বা কি—সে-ফুলে সে-ফসলে বিশ্বদেবতার অভিনন্দন নয়, বিশ্বজীবনের অভিনন্দন।

ইতিপূর্বে আমি দুই 'আমি'র কথা বলিয়াছি, এক জীবনের মধ্যে আর এক জীবনের কথা বলিয়াছি, দ্বৈতানুভূতির কথা ইঙ্গিত করিয়াছি; কবি নিজে যে এই বস্তুকেই যুগ্ম-সত্তা বলিয়াছেন, তাহারও উল্লেখ করিয়াছি। ইহার মধ্যে জটিল তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা কিছু নাই; এই দ্বৈতানুভূতি, এই যুগ্ম-সত্তার অনুভূতি অনেক বড় সার্থক কবির মধ্যে দেখা যায়। দুই 'আমি' যখন বলি তখন এক ব্যক্তির ব্যবহারিক সত্তারূপ আমি এবং আর এক কবির কবিপুরুষ বা কবিসত্তারূপ আমির কথা বলি; এক জীবনের মধ্যে আর এক জীবন বলিতেও তাহাই বুঝি। দ্বৈতানুভূতি বা যুগ্ম-সত্তার কথা যখন বলা হয় তখনও এই রহস্যের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়, এবং এই রহস্য বিভিন্নরূপে বহু সার্থক কবির মধ্যেই স্বপ্রকাশ। এই দুই আমি—ব্যক্তিপুরুষ ও কবিপুরুষ—এই যুগ্ম-সত্তার মধ্যে পরস্পর বিরোধিতাও অনেক কবির কাব্যে ও জীবনে দেখা যায়। এই বিরোধ-চেতনার প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ সকল কবির মধ্যে একই ভাবে হয় না। কাহারও কাহারও মধ্যে ব্যক্তিপুরুষ কবিপুরুষের অধীন; তাঁহারা একান্তভাবে কবিসত্তার কোলেই আত্মসমর্পণ করেন এবং কবিপুরুষেরই কোন্ প্রতীককে একতম সত্তা বলিয়া অনুভব করেন। কেহ কেহ আবার সেই কবিপুরুষের বা কবিসত্তার এক বা বহু কাল্পনিক মূর্তি গড়েন এবং সেই মূর্তিরই পূজা করেন; তাঁহাদের এই মূর্তিপূজাই তাঁহাদের কাব্যসাধনা। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনা একটু ভিন্নধর্মী। ব্যক্তিপুরুষ

ও কবিপুরুষের বিরোধ-চেতনা রবীন্দ্রনাথেরও ছিল, কিন্তু আমি অন্যত্র বলিয়াছি, বিরোধ ও বেসুরকে বশ করা, তাহাকে না মানাই রবীন্দ্র-কবিমানসের প্রতিজ্ঞা। কাজেই বিরোধ-চেতনার প্রতিক্রিয়া রবীন্দ্রনাথের ভিতর প্রকাশ পাইয়াছে এই দুই আমি বা দুইপুরুষের সামঞ্জস্য ঘটাইবার সাধনায়—দুইপুরুষের মিলনালিঙ্গনে। দুই আমি দুই পাখি; এক আমি আর এক আমির দিকে অনিমেষ নয়নে তাকাইয়া থাকে, দুজনের মধ্যে নিবিড় নিগূঢ় যোগ। দুইজনে মিলিয়া এক অখণ্ড অবিচ্ছিন্ন যুগ্ম-সত্তা। বস্তুবিশ্ব ও জীবনদৃশ্য লইয়া ব্যক্তির যে ব্যবহারিক সত্তা তাহা আপনাকে কবিসত্তার হাতে তুলিয়া মিলাইয়া বিলাইয়া দেয়, তাহারই নির্দেশ মানিয়া চলে, কিন্তু তাই বলিয়া নিজকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দেয় না—দুইয়ে মিলিয়া শুধু এক হইয়া যায়। বিশ্বজীবনধৃত ব্যক্তিসত্তাকে না পাইলে কবিসত্তা বাঁচে না, কবিসত্তার ইঙ্গিত ও নির্দেশ না পাইলে ব্যক্তিসত্তা অর্থহীন জড়বস্তুতে পরিণত হইয়া যায়। ইহাই রবীন্দ্রপ্রত্যয় ; এ-প্রত্যয় যুক্তিসহ কিনা সে-প্রশ্ন অবান্তর।

আমি যে-ভাবে বুঝিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজীবনানুভূতির রহস্যের পরিচয় সেই ভাবে উপস্থিত করিলাম। আমার এ-পরিচয় সত্য না-ও হইতে পারে। কিন্তু যে-কথাটি অস্বীকার করিবার উপায় নাই সেই কথাটি বলিয়াই এই নিবন্ধ শেষ করিব। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবন যে-ভাবকল্পার মধ্যে নানা বর্ণে নানা গন্ধে বিচিত্র রূপে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, সে-ভাবকল্পনার উৎস বিশ্বজীবনের অপূর্ব রূপরসগন্ধময় অনুভূতি ; এই অনুভূতিই রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের বাল্য, কৈশোর ও যৌবনকে নানান রঙে রাঙাইয়াছে, জীবনের সায়াহ্ন-বেলাকেও এই অনুভূতিই বিচিত্র গোধূলি রঙে রঞ্জিত করিয়াছে।

কাব্য-প্রবাহ

(১)

রবীন্দ্রনাথের কবিমানস অপূর্ব রস ও রহস্য-ঘন। তাঁহার কাব্য-লোকের মধ্যে যাঁহাদের গতিবিধি আছে তাঁহারাই এ-কথা জানেন, কবি তাঁহার চারিদিকে ভাব-কল্পনার একটি বিশিষ্ট জগতের মধ্যে চিরকাল বিহার করিয়া, কোনও নির্দিষ্ট ভাব-উৎস হইতে রস আহরণ করিয়া অধিককাল তৃপ্ত থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার সুদীর্ঘ কবিজীবন এক ভাবপর্যায় হইতে অন্য পর্যায়ে, এক অনুভূতি-রাজ্য হইতে অন্য রাজ্যে মুক্ত বিহঙ্গের মত উড়িয়া বেড়াইয়াছে। সকল সীমা লঙ্ঘন করিয়া, সকল গণ্ডি অতিক্রম করিয়া বিশ্বের সকল ভাববস্তুর স্পর্শ এবং অনুভূতি লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা সর্বদাই কবিকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। কি প্রেম, কি সৌন্দর্য, কি প্রকৃতি কি অধ্যাত্মবোধ, সব কিছুর সঙ্গে একটা নিবিড় বন্ধন তাঁহার কাব্যের মধ্যে সর্বত্র স্বপ্রকাশ; যখন যে-অনুভূতি, জীবনের যে-পর্যায়ে যে-ভাবৈশ্বর্য চিত্তকে অধিকার করিয়াছে, তখন তাঁহার কবিমানস তাহারই মধ্যে আপনাকে একান্তভাবে লীন করিয়া দিয়া তাহারই পরিপূর্ণ আবেগে চিত্তের সব তন্তুকে একেবারে ভরপুর করিয়া লইয়াছে, এবং তাহারই ফলে কবি ও কাব্য একে অন্যকে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া চিরন্তন রসমূর্তিতে অনাগত কালের পানে তাকাইয়া আছে। রবীন্দ্র-নাথের কবিমানস কখনও ভোগবাসনার মধ্য দিয়া, কখনও পরিপূর্ণ সৌন্দর্যানুভূতির মধ্য দিয়া, কখনও বা স্বদেশ-সাধনার যজ্ঞবেদীর পৌরোহিত্য করিয়া, কখনও বা গাঢ় অধ্যাত্মবোধের অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া ভাব হইতে ভাবান্তরে, অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে স্থির পদক্ষেপে

পথ চলিয়াছে; ইহার কোনও একটিকেই কবি কখনও পরম ও চরম অনুভূতি বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকেন নাই। ইহার প্রত্যেকটিই তাঁহার কবিজীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের এক একটি স্তর। প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত কত বিচিত্র ভাবরাজ্যের ভিতর দিয়া যে কবিচিত্তের যাত্রা, সে-যাত্রা কোনও কালে কোনও নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া সমাপ্তি লাভ করে নাই। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথা হইতেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। কবির চঞ্চল চলিষ্ণু চিত্ত কোথাও এক নির্দিষ্ট স্থানে অধিক দিন বাস করিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারে নাই; ইহা তাঁহার জীবনে যেমন সত্য, কাব্যেও তেমনই সত্য। সত্য বলিতে কি, তাঁহার কাব্যকে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, অথবা জীবনকে কাব্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার কোনও উপায় নাই। অন্যান্য কবিদের পক্ষে যাহাই হউক, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাঁহার জীবনের বাহিরে তাঁহার কাব্যের কোনও অস্তিত্বই নাই; কাব্যই তাঁহার জীবনের গভীরতম সত্তা, তাঁহার অন্তর্নিহিত চৈতন্য,* এবং যেহেতু তাঁহার জীবন গতিবেগে চঞ্চল, তাঁহার কবি-মানসও সেই হেতু চলার আবেগে স্পন্দিত—

---

* "রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রত্যেক অবস্থার সঙ্গে সেই সেই অবস্থার রচিত তাঁহার কাব্যের এমন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ যে তাঁহার কাব্যকে সম্পূর্ণভাবে বুঝিবার জন্য তাঁহার জীবনের কথা কিছু কিছু জানা দরকার হয়; আর কোনো কবির জীবন নিজ কাব্যের ধারাকে একান্তভাবে অনুসরণ করিয়া চলে নাই। কবির জীবনের বড় বড় পরিবর্তনগুলি প্রথম কাব্যের মধ্য দিয়া নিগূঢ় ইঙ্গিত মাত্রে প্রতিফলিত হইয়া শেষে জীবনের ঘটনারূপে প্রকাশ পাইয়াছে। * * কোনো কবির কাব্য যে তাঁহার জীবনকে ক্রমে ক্রমে রচনা করিয়া তুলিয়াছে, এবং সেই কাব্য যে জীবনের সচেতন কর্তৃত্বের কোনো অপেক্ষা রাখে নাই, এমন আশ্চর্য ব্যাপার আর কোনো কবির জীবনে ঘটিয়াছে কিনা জানি না। সেইজন্যই অন্য সকল কবির চেয়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সমালোচনার সময়ে তাঁহার জীবনের কথা বেশি করিয়া পাড়তে হয়।" (অজিতকুমার চক্রবর্তী, "কাব্যপরিক্রমা," ২য় সং ১৫৭-৫৮ পৃঃ)

চিরকাল ধ'রে দিবস চলিছে
দিবসের অনুগামী
শুধু আমি নিজ বেগ সামালিতে নারি
ছুটেছি দিবস যামী।

কবি নিজের বেগ নিজেই সামলাইতে না পারিয়া যেমন এক স্থান হইতে স্থানান্তরে ছুটিয়া চলিয়াছেন, তাঁহার কাব্যেও তিনি তেমনই ভাব ও কল্পনার আবেগে বারংবার ভাব হইতে ভাবান্তরে পাড়ি জমাইয়াছেন। কবি যখন "মানসী"র কবিতা রচনায় ব্যাপৃত তখন তিনি শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে একটি পত্রে (১১ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৭; ২৪ মে, ১৮৯৯) লিখিতেছেন,

"আজকাল যে-সকল কবিতা লিখচি, তা ছবি ও গান থেকে এত তফাত যে, আমি ভাবি আমার লেখার আর কোনও পরিণতি হচ্চে না, ক্রমাগতই পরিবর্তন চলেচে। আমি বেশ অনুভব করতে পারচি, আমি যেন আর একটা পরিবর্তনের সন্ধিস্থলে আসন্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি। এ-রকম আর কতকাল চলবে, তাই ভাবি। অবশেষে একটা জায়গা তো পাব, যেটা বিশেষরূপে আমারই জায়গা। অবিশ্রাম পরিবর্তন দেখলে ভয় হয় যে, এতকাল ধরে এতগুলো যে লিখলুম, সেগুলো কিছুই হয়ত টিকবেনা—আমার নিজের যেটা যথার্থ চরম অভিব্যক্তি, সেটা যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ এগুলো কেবল tentative ভাবে আছে।" ("রবীন্দ্র-জীবনী," ১ম খণ্ড, বিশ্বভারতী সং, ২১৫-১৬ পৃঃ)

এই যে পরিণতি হইতেছে না বলিয়া কবির আক্ষেপ, এ আক্ষেপ অর্থহীন। "মানসী"তে তিনি যে পরিবর্তনের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই পরিবর্তনের সন্ধিস্থল কবির জীবনে বার বার আসিয়াছে; এবং এই ক্রমাগত পরিবর্তনই তাঁহার কবিজীবনকে পরম পরিণতির দিকে ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছে; অথবা একটু অন্যভাবে বলিতে পারা যায়, এই ক্রমাগত পরিবর্তনই পরম পরিণতি। যে অবিরাম পরিবর্তন

দেখিয়া কবি ভীত হইয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার কাব্যকে অপূর্ব জীবনৈশ্বর্য দান করিয়াছে, এবং এই অবিরাম পরিবর্তনের ভিতরই কবিজীবনের চরম অভিব্যক্তি লাভও ঘটিয়াছে।

রবীন্দ্র-কাব্যপাঠ এক দুরূহ ব্যাপার। সাধারণ কবিমানস ও কবিকীর্তির মানদণ্ডে রবীন্দ্র-কাব্য তৌল করা প্রায় একরূপ অসম্ভব বলিলেই চলে; তাহার সমগ্রতা পরিমাপ করা আরও অসম্ভব। এই বিরাট কবিকীর্তির মূলে যে জাগ্রত চৈতন্যের লীলা আছে, প্রতিভার যে দিব্য ক্রীড়া আছে, তাহাকে বিশ্লেষণ করা হয়ত কঠিন না-ও হইতে পারে, কিন্তু কাব্যরসিক পাঠকের কাছে এই বিশ্লেষণের মূল্য খুব বেশি নয়; কারণ বিশ্লেষণ যত সূক্ষ্মতর হইবে, কবি ততই দূর হইতে আরও দূরে সরিয়া যাইবেন। রবীন্দ্রনাথের কবিকীর্তির সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে এক মহারণ্যের, যে-অরণ্য লতাগুল্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মহামহীরুহের ঐশ্বর্যে শুধু বৈচিত্র্যময়ই নয়, শুধু বিচিত্র রঙে ও রসে প্রাণবন্তই নয়, ভাব-গাম্ভীর্যে এবং আয়তন-বিরাটতায় মহীয়ানও বটে। কিন্তু সেই বিরাট অরণ্যের মধ্যে একবার ঢুকিয়া পড়িলে তখন বিচ্ছিন্ন লতা-পাদপগুলিই মাত্র দৃষ্টিগোচর হয়, প্রত্যেক পৃথক তরুলতা পৃথক পৃথক ভাবেই চিত্ত চক্ষুকে আকর্ষণ করে, মহারণ্য তখন তাহার সমগ্রতা হারায়, তাহার ভাব-গাম্ভীর্য তখন চিত্তগোচর হয় না। আবার বাহির হইতে সমগ্রভাবে যখন সেই মহাটবী চিত্ত ও চক্ষুর গোচর হয়, তখন প্রত্যেক পৃথক পৃথক লতাগুল্ম ও মহীরুহ তাহার রঙের বৈচিত্র্য রসের বৈশিষ্ট্য হারায়। রবীন্দ্র-কাব্য সম্বন্ধে ঠিক এই কথাই বলা যাইতে পারে।

রবীন্দ্র-কাব্য পাঠক মাত্রেই এই বিরাট কবিকীর্তির মূলে একটি নিগূঢ় নিয়ম বা মূল সুর আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা

কিছু অস্বাভাবিকও নয়, অসম্ভব ত নয়ই। কিন্তু বিপদ এই, সেই মূল সুরটির অথবা নিগূঢ় নিয়মটির স্থূল সুনির্দিষ্ট পথরেখা ধরিয়া যদি আমরা রবীন্দ্র-কাব্য-মহাটবীর ভিতর সঞ্চরণে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমরা কবির সৃষ্টি-প্রাচুর্যের মধ্যে যে অগণিত রং ও বিচিত্র রসের লীলা দক্ষিণে বামে ছন্দিত ও নন্দিত তাহা হইতে আমরা বঞ্চিত হইব; এমন কি যে-সব অস্পষ্ট ও সুকুমার পদরেখা স্থূল রেখাটির সমান্তরালে চলিয়াছে কিংবা তাহাকে নানা দিকে নানা ভাবে স্পর্শ করিয়া অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে তাহাদের আভাস না পাইতে পারি। প্রত্যেক বৃহৎ প্রতিভা, বৃহৎ জীবনের মধ্যেই একটা কালক্রমিক বিকাশ, বিবর্তনের একটা ধারা লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্র-কবিকীর্তির মধ্যে এই বিকাশ, এই বিবর্তন-ধারা অত্যন্ত স্পষ্ট। যাঁহারা কালক্রমানুযায়ী রবীন্দ্র-কাব্য মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই এ-কথা জানেন; এমন কি এই বিবর্তন-ধারাটি না জানিলে না বুঝিলে রবীন্দ্র-কাব্যের সম্যক উপলব্ধিও হয় না। এই কালক্রমিক বিকাশ, এই বিবর্তন-ধারার সঙ্গে পরিচয় সাধনের উদ্দেশ্যেই এই নিবন্ধের অবতারণা; কিন্তু পূর্বাহ্নেই এ-কথা জানিয়া রাখা ভাল যে, এই পরিচয়ই রবীন্দ্র-কাব্যের সম্পূর্ণ পরিচয় নয়, ইহা স্থূল পথরেখার নির্দেশ মাত্র। ইহাও জানিয়া রাখা ভাল যে, এই বিবর্তন-ধারা সর্বত্র এক নহে, রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ কবিজীবন সর্বত্র একই ধারা অনুসরণ করিয়া চলে নাই; জীবনের এক এক পর্যায়ে তাঁহার কবিমানস এক একটি ভাববন্ধন স্বীকার করিয়াছে, আবার কিছুদিন পর সেই বন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনাকে সবলে মুক্ত করিয়াছে—মুক্ত করিয়াছে আবার নূতন করিয়া নূতন ভাববন্ধনে বাঁধা পড়িবার জন্য। এই বন্ধন-মুক্তি এবং মুক্তি-বন্ধনের প্রেরণাই, অন্য দিক হইতে বলিতে গেলে, রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতি, তাঁহার কবিধর্ম, তাঁহার কবিজীবনের অপূর্ব বৈশিষ্ট্য। এই যে বন্ধন ও মুক্তি, মুক্তি ও বন্ধন,

আমি আগেই বলিয়াছি, ইহার কোনও পরিণতি নাই, ক্রমাগত পরি-বর্তনই ইহার পরিণতি। কবি নিজেও তাহা জানেন,—তিনি জানেন তাঁহার এই 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কোথাও শেষ হইবার নয়, শুধু 'পথ চলাতেই তাঁহার আনন্দ'। নানা ভাবে নানা ভঙ্গিতে নানা ছলে এ-কথা বার বার তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন। তবু, তবু আবার বার-বার নানা ভাবে নানা ভঙ্গিতে নানা ছলে তাঁহার কাব্যলক্ষ্মীকে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,

> আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী ?
> বলো কোন্ পার ভিড়িবে তোমার সোনার তরী।
> যখনি শুধাই, ওগো বিদেশিনী,
> তুমি হাস শুধু মধুরহাসিনী,
> বুঝিতে না পারি, কী জানি কী আছে তোমার মনে।
> নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি
> অকূল সিন্ধু উঠিছে আকুলি,
> দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন গগন কোণে।
> কী আছে হোথায়—চলেছি কিসের অন্বেষণে।

রবীন্দ্র-কাব্যে এই প্রশ্নও অশেষ, ইহার উত্তরও অশেষ। বস্তুত রবীন্দ্র কবিজীবনের যাহা ধর্ম, তাহাতে এ-প্রশ্নের শেষ কখনও হইতে পারে না, ইহার উত্তরেরও কোনও শেষ হইতে পারে না।

রবীন্দ্র-কাব্যপাঠের আর একটি প্রধান অন্তরায়, আমাদের মনে কাব্যের মধ্যে তত্ত্বান্বেষণের সহজাত সংস্কার, বিশেষ ভাবে রবীন্দ্র-কাব্যের মধ্যে। কাব্য তত্ত্ববিরহিত হইতে পারে কি পারে না, এ-প্রশ্ন এখানে উত্থাপন করা অবান্তর; রবীন্দ্র-কাব্যের মধ্যে তত্ত্বের শাসন আছে কি নাই সে-জিজ্ঞাসার আলোচনারও প্রয়োজন নাই। রবীন্দ্র-কাব্য-

পাঠে তত্ত্বান্বেষণ-প্রচেষ্টা প্রবল হইয়া উঠিলে তাহাতে যে পথভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে, আমি শুধু তাহারই ইঙ্গিত করিতে চাই। কবির কাব্যে তত্ত্ব নাই, তত্ত্বজিজ্ঞাসা নাই, এ-কথা আমি বলি না, কেহই বলিবেন না, —কিন্তু সে-তত্ত্ব অনুভূত প্রত্যয় মাত্র এবং কবির কবিমানসকে অতিক্রম করিয়া সে-তত্ত্বের, সে-জিজ্ঞাসার কোনও মূল্য নাই; সে-তত্ত্ব কবির কাব্য-নিরপেক্ষ নয়, কাব্যের বাহিরে তাহার কোনও সত্তা নাই। এ-কথা বলিতেছি এই জন্য যে, রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে স্পষ্ট দেখা যাইবে, কোনও নির্দিষ্ট সুস্পষ্ট প্রত্যয়-শাসন তাহার মধ্যে খুব বেশি নাই, বরং মনে হইবে যে, তত্ত্বকে তাঁহার কাব্য যতটুকু আশ্রয় করিয়াছে তাহা অত্যন্ত গৌণ, তাহা শুধু তাঁহার কবি-মানসের মুক্ত স্বাধীন বিহারের জন্যই, তাহার রস ও রহস্য কবিমানসের বিচিত্র লীলা প্রকাশ করিতে সহায়তা করিয়াছে মাত্র। তাঁহার কাব্যের উপজীব্য তত্ত্ব নয়, এই মুক্ত স্বাধীন স্বচ্ছন্দ লীলাই প্রধান উপজীব্য। তাঁহার জীবন ও কাব্য সম্বন্ধে এই কথাই সত্য। মৃত্যু সম্বন্ধে, জীবন সম্বন্ধে, দুঃখ সম্বন্ধে, এবং অন্যান্য আরও অনেক কিছু সম্বন্ধে রবীন্দ্র-কাব্যে অনেক তত্ত্বের ইঙ্গিত ও নির্দেশ পাওয়া যায়, এবং একাধিক রবীন্দ্র-কাব্য-পাঠক এক একটি তত্ত্বের সূত্র ধরিয়া কবির কবিতা কালানুক্রমিক সাজাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং তাহার ফলে কেহ কেহ কোনও কোনও তত্ত্বের একটা ক্রমবিকাশের ধারা আবিষ্কার করিতেও সমর্থ হইয়াছেন। আমি নিজেও একাধিকবার সে-প্রয়াস করিয়াছি। এ-জাতীয় প্রয়াসকে আমি মিথ্যা বা নিরর্থক বলি না; তবে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের সত্য পরিচয় এ-ভাবে পাওয়া যায় না, যাইতে পারে না। রবীন্দ্র-কাব্য সহস্রদ্যুতি; কোনও একটি নির্দিষ্ট আলোকরেখার দিক হইতে দেখিলে হীরকখণ্ডের অসংখ্য বিচিত্র দ্যুতি যেমন নয়নগোচর হয় না, তেমনি বিশেষ কোনও একটি তত্ত্বের দিক

হইতে রবীন্দ্র-কাব্য পাঠ করিলে তাহার অসংখ্য রং ও রেখার বৈচিত্র্য, প্রাণরসের প্রাচুর্য, কবিমানসের স্বচ্ছন্দ লীলা, কিছুই আমাদের চিত্ত-গোচর হয় না। পাঠকের সমগ্র দৃষ্টি তাহাতে ব্যাহত হয়, রসোপলব্ধির ব্যাঘাত হয়, এবং তাহার ফলে কবি ও কাব্য দুইটি আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে পড়িয়া যায়। রবীন্দ্র-কাব্যপাঠে এই বিশ্বাসই আমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছে।

রবীন্দ্র-প্রতিভার বিকাশ, গতি ও পরিণতি মন্থর। তাহার ইতিহাস জৈব। গাছ যেমন ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়, ধীরে ধীরে বাড়ে, ফলে ফুলে পল্লবে নিজেকে সমৃদ্ধ করে, ধীরে ধীরে বৃহৎ বনস্পতির আকার ধারণ করে এবং নিজের শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে বিরাট মহীরুহের রূপ লইয়া বনভূমির বিরাট সম্রাট হইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিণতিও তেমনই ধীর ও মন্থর এবং একান্তই জৈব। একদিন হঠাৎ আবির্ভূত হইয়া তিনি সকলকে চমকাইয়া দেন নাই; প্রাকৃতিক নিয়মে ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া সে-প্রতিভার বিকাশ, বিস্তার ও পরিণতি; শেষ পর্যন্ত তিনি নব নব ফল-ফুলপল্লবে নিজেকে বিকশিত করিয়া গিয়াছেন। আর, বিকাশ, গতি ও পরিণতি যেমন, সে প্রতিভার বিলয়ও তেমনই; তাহাও যেন প্রাকৃতিক নিয়মের মতই। একদিনেই হঠাৎ তাহার বিলয় ঘটে নাই; সে-বিলয়ও ঘটিয়াছে ধীরে ধীরে সকলের অনুস্রীয়মান দৃষ্টির সম্মুখে। প্রতিভার এইরূপ জৈব, নিশ্চিত ও মন্থর বিবর্তন সাহিত্যের ইতিহাসে বড় বিরল। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে রবীন্দ্র-প্রতিভার এই বিবর্তন-ইতিহাস তাই আনন্দিত বিস্ময় উৎপাদন না করিয়া পারে না; সমগ্র ভাবে দেখিলে সে-ইতিহাসে আকস্মিকতার স্থান বড় একটা কোথাও নাই। বিবর্তনের প্রত্যেকটি স্তর, প্রত্যেকটি পর্যায়, প্রত্যেকটি পথ-রেখার

গতি সুস্পষ্ট, প্রত্যেকটি ইঙ্গিতের সূচনা, গতি ও পরিণতি যেন প্রাকৃতিক নিয়মাধীন। তাঁহার প্রতিভার যাত্রা পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করিয়াই সূত্রপাত; কাব্যে কালিদাস ও বৈষ্ণব কবিদের বাণী, ভঙ্গি ও ঐতিহ্য এবং বিহারীলাল; গদ্যে বঙ্কিমচন্দ্র; কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি তাঁহাদের অতিক্রম করিলেন; এই অতিক্রমণের ইতিহাসের প্রত্যেকটি রেখা স্পষ্ট। তারপর নিজেকে যখন নিজে আবিষ্কার করিলেন তখনও হঠাৎ তাঁহার সমস্ত সম্ভাবনা একদিনে দেখা দিল না; ধীরে ধীরে যেমন ভাবকল্পনার বিরাট বৈচিত্র্য বিকশিত হইতে লাগিল, অনুভূতি যেমন ধীরে ধীরে সূক্ষ্ম, গভীর ও ব্যাপক হইতে লাগিল, কাব্যের আঙ্গিক ও গদ্যের বিবর্তনও তেমনি ধীরে ধীরে দেখা দিতে লাগিল; প্রত্যেকটির সূচনা ও সর্বশেষ পরিণতির মধ্যে বিবর্তনের সুদীর্ঘ ইতিহাস। এই ইতিহাসটি রসিক-চিত্তে নিকটতর করা রবীন্দ্র-সাহিত্য-পাঠের অন্যতম উদ্দেশ্য। বস্তুত, কালানুক্রমিক রবীন্দ্র-রচনাবলী ধারাবাহিক ভাবে পাঠ করিলে ভাবপ্রসঙ্গ ও আঙ্গিকের, ভাবকল্পনা ও অনুভূতির ঐতিহাসিক পারম্পর্য এবং পারস্পরিক সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এই কারণেই বিরাট রবীন্দ্র-সাহিত্যে কোথাও পুনরাবৃত্তি নাই; তাঁহার প্রত্যেকটি কাব্য ও গদ্যগ্রন্থ রীতি ও বিষয়বস্তুতে স্বতন্ত্র। কোনও বিশেষ রীতি সার্থক বা সুন্দর হইয়াছে বলিয়াই তিনি তাহার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকেন নাই বা তাহার পুনরাবৃত্তি করেন নাই। জীবদেহ ত কখনও পুনরাবৃত্তি করে না, রবীন্দ্রনাথও কখনও আত্মানুকরণ করেন নাই। নিত্য নূতন রীতি যেমন তিনি আহরণ করিয়াছেন, বিষয়বস্তু এবং ভাবপ্রসঙ্গও তাঁহার তেমনই নূতন। এই জৈব চিরনূতনত্বই তাঁহার রচিত সাহিত্যের বিষয়। কাব্য প্রবাহের আলোচনায় আমি যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছি তাহা বিশেষভাবে কবির ভাবপ্রসঙ্গ ও বিষয়বস্তুর জৈবরীতির বিবর্তন-ধারাগত। ইহা ছাড়া অন্য রীতি নাই, এ-কথা

বলি না ; কিন্তু কোনও কবির রচনা ঐতিহাসিক সমগ্রতায় দেখিবার ও দেখাইবার ইহাই প্রকৃষ্ট পথ বলিয়া আমি মনে করি।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই ঐতিহাসিক সমগ্ররূপের কথা আমরা অনেক সময়ই ভুলিয়া যাই। খণ্ড খণ্ড কবিতা, খণ্ড খণ্ড রচনার বিশেষ সৌন্দর্য ও রসমাধুর্য ত আছেই, সে রসোপভোগের উপায় ও পথও আছে, তাহার প্রয়োজনও আছে। কিন্তু তাহাতে কোনও কবির, বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের মতন বিচিত্র কবিপ্রতিভার, বিরাট কবিমানসের ঐতিহাসিক সমগ্রতার পরিচয় পাওয়া যায় না, এবং তাহা পাওয়া না গেলে খণ্ড খণ্ড কবিতার পরিপূর্ণ রসোপলব্ধিও সহজ ও সুগম হয় না। প্রত্যেক খণ্ড বস্তুই একটি অখণ্ড সমগ্রতার মধ্যে বিধৃত ; প্রত্যেক খণ্ড কবিতা বা খণ্ড কাব্যগ্রন্থও তেমনই কবির সমগ্র কবিমানসের, কবিকল্পনার বিরাট প্রেক্ষাপটের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত ; তাহা হইতে বিচ্যুত করিয়া রসোপভোগ সম্ভব নয়, এ-কথা বলিনা ; কিন্তু তাহাতে সমস্ত রসতাৎপর্যটুকু ধরা পড়ে না, রসচেতনা তাহার সমগ্রতা হারায়। এই সমগ্রতাটুকু পাঠকচিত্তের নিকটতর করা সাহিত্য সমালোচকের একটি প্রধান দায় ও কর্তব্য।

রবীন্দ্র-কাব্যের বিস্তৃতি, বৈচিত্র্য ও বহুমুখীনতা ত সর্বজনবিদিত ; তাহা কোনও যুক্তিপ্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, এবং তাঁহার প্রতিভার এই বৈশিষ্ট্য যে তাঁহার মহৎ ও বিরাট কবিযশের অন্যতম হেতু তাহারও পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। এই বহুমুখী অভিব্যক্তির মধ্যে যে-ভাবসত্তা প্রতিমুহূর্তে দীপ্যমান তাহাতে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধিতাও আছে পদে পদে প্রতি মুহূর্তে ; কবিকল্পনায় তাহা থাকিতে বাধ্য, কিন্তু ঐতিহাসিক সমগ্রতায় রবীন্দ্র-কাব্য পাঠ করিলে সমস্ত বিরোধের একটা সুসমঞ্জস ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়, বিরোধের স্বরূপ চিত্তের নিকটতর হয়,

খণ্ড খণ্ড মিলন, বিরোধ ও বিকার একটি অখণ্ড সমগ্র রসচেতনার অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন বুঝা যায়, ইহার কোনটিই আকস্মিক নয়, ভাবকল্পনার বা মানসচেতনার যুক্তির বহির্ভূত নয়। রসোপলব্ধির, রসোপভোগের জন্যও পাঠকচিত্তে এই বোধের প্রয়োজন আছে। মানবচেতনার অসংখ্য স্তর, অপরিমিত সীমা রবীন্দ্রনাথ স্পর্শ করিয়াছেন, উদ্ভাসিত ও প্রস্ফুটিত করিয়াছেন; বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন সীমায় তাঁহার ভাবকল্পনা ও কবিমানস বিভিন্ন রূপে ও রসে প্রকাশমান। একই বস্তু সম্বন্ধে এক মুহূর্তে তাঁহার যে-দৃষ্টি ও মন ক্রিয়াশীল, অন্য মুহূর্তে হয়ত তাহার বিপরীত, এক সময়ে আদর্শবাদী, একান্ত অন্তর্মুখী কল্পনানির্ভর, অন্য সময়ে প্রত্যক্ষানুগামী। যেখানে একই বস্তু সম্বন্ধে এই দৃষ্টি সেখানে বিভিন্ন বস্তু সম্বন্ধে ভাবকল্পনার ও কবিমানসের বিভিন্ন দৃষ্টি ত থাকিবেই; তাহা কিছু দৃষ্টান্তের অপেক্ষা রাখে না, এবং তাহা হইতেও বাধ্য; রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনার ধর্মই ত এইরূপ। কিন্তু, তৎসত্ত্বেও ঐতিহাসিক সমগ্রতার প্রেক্ষাপটে প্রত্যেক পৃথক ভাবকল্পনার ও মানস-চেতনার একটা প্রাকৃতিক ধারাবাহিকতার যুক্তি আছে; সমগ্রতা হইতে তাহাদের বিচ্ছিন্ন করিয়া একান্ত করিয়া দেখিলে তাহার রসতাৎপর্য ক্ষুণ্ণ হয়, কবিমানসের স্বরূপোপলব্ধিও দূরে সরিয়া যায়। জৈব প্রকৃতির জীবন-বিকাশের মধ্যে যেমন বিরোধ ও বিভিন্নতা প্রাকৃতিক নিয়মের বশেই হইয়া থাকে রবীন্দ্র-ভাবসত্তার বিকাশের মধ্যেও তেমনই বিরোধ ও বিভিন্নতা ঐতিহাসিক যুক্তি-নিয়মাধীন; বিবর্তনের অন্তর্নিহিত নিয়তি-নিয়মের বশ।

এখানে আমার এই 'কাব্য-প্রবাহ' নিবন্ধের আলোচনা-রীতি সম্বন্ধে কিছু বলা প্রাসঙ্গিক। কাব্যালোচনার বিভিন্ন রীতির সঙ্গে আমরা বহুকাল পরিচিত। তাহাদের যৌক্তিকতা বা অযৌক্তিকতার আলোচনা

না করিয়াও ভারতীয় কাব্যজিজ্ঞাসার ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া বলা যায়, কাব্য রসোপভোগের, রসোপলব্ধির বস্তু। এই রসোপভোগের ও উপলব্ধির জন্যই লোকে কাব্য পাঠ করিয়া থাকে। রস কি বস্তু, তাহা লইয়া বিস্তৃত আলোচনা ভারতীয় কাব্যজিজ্ঞাসুরা করিয়াছেন, কিন্তু তাহার ইতিমূলক কোনও সংজ্ঞা কেহ দিতে পারেন নাই, যদিও নেতিমূলক সংজ্ঞার অভাব ঘটে নাই। ধ্বনি ও ব্যঞ্জনা, রূপ ও রীতি, কথা ও ছন্দ, নানা মানসিক ও বাহ্যিক উপাদান, ঐতিহ্য ও সংস্কার, বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তি, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ-চেতনা, নানা প্রয়োজন-চেতনা, নানা নিয়তি-নিয়ম-চেতনা প্রভৃতি অনেক কিছু জড়াজড়ি করিয়া কাব্যদেহে বাস করে। এই সব-কিছুকে আশ্রয় করিয়া, সব কিছুর মর্মভেদ করিয়া, সব-কিছু জড়াইয়া থাকে কবির ব্যক্তিগত ভাবকল্পনা ও মানসচেতনা; এই দু'য়ের রসায়নে কাব্যরসের উদ্ভব। অথচ সেই রস উল্লিখিত বস্তু-উপাদানগুলির কোনও একটির মধ্যে বা তাহাদের কোনও যৌগিক সংমিশ্রণের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, যদিও তাহাদের প্রত্যেকটিই আবার রসোদ্বোধনের সহায়ক। তাহাদের অবলম্বন না করিলে আবার কবির ভাবকল্পনা বা মানস-চেতনার কোনও ক্রিয়াই কল্পনা করা যায় না! ফলে এই দাঁড়ায় যে কোনও সার্থক কাব্যের বা কবিতার উদ্বোধিত রস যে কি বস্তু তাহা কেহই অঙ্গুলি-নির্দেশে দেখাইয়া দিতে পারেন না। তবে, কি কি বস্তু-উপাদানে, কবির ভাবকল্পনার ও মানসচেতনার কি ধর্মে ও প্রকৃতিতে রস উদ্বোধিত হইয়াছে, মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে রসিক সমালোচক তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে পারেন; দেখাইবার সার্থকতা এই যে তাহাতে বিশেষ কাব্য বা কবিতার রসোপলব্ধি পাঠকচিত্তের নিকটতর হয়, এবং রসোপভোগ সহজতর হয়। সমালোচনার এই রীতি বহুল-প্রচলিত।

আর একটি রীতিও একেবারে অপ্রচলিত নয়। প্রত্যেক সার্থক কাব্যপাঠেই পাঠকের চিত্তে কতকগুলি তাৎক্ষণিক একান্ত ব্যক্তিগত মানস-প্রতিক্রিয়াগত ভাবানুভূতি সঞ্চারিত হয়; তাহা একান্ত অনুরাগেরও হইতে পারে, বিরাগেরও হইতে পারে। এই প্রতি-ক্রিয়াগত ভাবানুভূতির সূক্ষ্মতা বা তীব্রতা নির্ভর করে পাঠকের ব্যক্তিগত চিত্ত-সমৃদ্ধির উপর। সে যাহাই হউক, সেই পাঠকের যদি ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা থাকে, অর্থাৎ তিনি যদি নিজে সাহিত্য-রচয়িতা হন তাহা হইলে তিনি ব্যক্তিগত মানস-প্রতিক্রিয়াগত ভাবানুভূতিকে অন্য পাঠকের চিত্তে সংক্রামিত করিয়া দিতে পারেন আবার নূতন করিয়া রসোদ্বোধনের সাহায্যে; তাহার সঙ্গে সমালোচ্য কাব্যের বা কবিতার উদ্বোধিত রসের এক বস্তুগত সম্বন্ধ ছাড়া অন্য সম্বন্ধ না-ও থাকিতে পারে। আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ নিজে, এলিয়ট প্রভৃতি অনেক বিদেশী লেখক ও কবি এই রীতি অবলম্বন করিয়া সাহিত্যালোচনা করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ নিজে শকুন্তলা নাটকের যে-আলোচনা করিয়াছেন তাহা কতকটা এই জাতীয়। কিন্তু নাটকটির কথা ছাড়িয়া দিয়াও বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা'-আলোচনা আর এক নূতন সৃষ্টি। তাঁহার 'মেঘদূত'-কবিতাও ত এক নূতন মেঘদূত সৃষ্টি। এই ধরনের আলোচনার সার্থকতা কিছুতেই অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু যেহেতু আমি সাহিত্য-স্রষ্টা নই, আমি এই রীতিতে আলোচনাও করি নাই।

আমার উদ্দেশ্য বিরাট রবীন্দ্র-সাহিত্য হইতে রবীন্দ্রনাথের ভাব-কল্পনা ও কবিমানসের ধর্ম, প্রকৃতি ও স্বরূপটিকে জানা, এবং আমার জ্ঞানবুদ্ধিমত তাহা পাঠককে জানান। বস্তুত, শুধু 'কাব্য-প্রবাহ' নিবন্ধ নয়, এই গ্রন্থের সব নিবন্ধগুলির উদ্দেশ্য তাহাই, এবং তাহা জানাই রবীন্দ্রসাহিত্য-পাঠের ভূমিকা। ভাবকল্পনা ও মানসচেতনার ধর্ম,

প্রকৃতি ও স্বরূপ জানিবার অন্যতর উপায়ের অস্তিত্ব হয় ত আছে, আমি তাহা না জানিয়া স্বীকার বা অস্বীকার কিছুই করিতেছি না; তবে রসোপভোগ ও রসোপলব্ধি সহজ ও সুগম করিবার জন্য আমি যে-উপায় সার্থক ও ফলপ্রসূ মনে করিয়াছি, সেই উপায়ই অবলম্বন করিয়াছি। এই উপায় সব নিবন্ধগুলিতেই সমভাবে অনুসৃত।

প্রথমত, সর্বত্রই আমার আলোচনা কালানুক্রমিক, ইতিপরম্পরা-গত ঐতিহাসিক ধারাবাহিক সমগ্রতার অনুধ্যানই আমার লক্ষ্য, কারণ তাহাতে ভাবকল্পনা ও মানসচেতনার সমগ্র রূপটি সহজে ধরা পড়ে। দ্বিতীয়ত, আমার আলোচনা প্রসঙ্গগত, ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে হইলে বলা উচিত, বাহ্যিক ও মানসিক বস্তুপ্রসঙ্গগত। এই বাহ্যিক ও মানসিক বস্তুপ্রসঙ্গের পারম্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে ভাবকল্পনা ও মানস-চেতনার যে নিরন্তর রূপান্তর তাহাই সার্থকতর শব্দের অভাবে বলিতে পারি, ভাবপ্রসঙ্গ। কাজেই এই ভাবপ্রসঙ্গের পরিচয়ের মধ্যেই ভাবকল্পনা ও মানসচেতনার স্বরূপের পরিচয়ও নিহিত; আর কোনও কিছুর মধ্যেই সে-পরিচয় পাওয়া যাইবে না। এবং যেহেতু আমার আলোচনা ইতিপরম্পরাগত, সেইহেতু আমার ভাবপ্রসঙ্গ-পরিচয়ও ধারাবাহিক। এ-উপায় ছাড়া আর কি উপায়েই বা ভাবকল্পনা বা মানসচেতনার গতি ধরা পড়িবে?

এই রীতি ও কাঠামো স্মরণে রাখিয়া আমি রবীন্দ্র-কাব্য পরিক্রমা করিয়াছি। এবং তাহা করিতে গিয়া বাহ্যিক ও মানসিক বস্তুপ্রসঙ্গত অনেক তথ্যের আলোচনাই আমাকে করিতে হইয়াছে। কবির ব্যক্তিগত ব্যবহারিক জীবন, তাঁহার জীবনাদর্শ ও তৎসংপৃক্ত বিচিত্র প্রত্যয়ভাবনা সমসাময়িক ব্যক্তি ও সমাজচেতনা এবং কবিকল্পনায় তাহার রূপান্তর, ঐতিহ্য ও সংস্কারবোধ, নানা নিয়তি-নিয়মের শাসন, নানা ধ্যান-ধারণা

এবং মানসচেতনায় তাহার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, ইত্যাদি অনেক কিছুই আসিয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছে ; কারণ, এ সমস্তই কবিকল্পনা ও মানসচেতনার অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের সব-কিছু মিলিয়া তাঁহার সমগ্র কবিদৃষ্টির রূপ। সেই দৃষ্টির পরিচয় না জানিলে কাব্যরসোপভোগ ও উপলব্ধি দূরে থাকিতে বাধ্য। এই বিশিষ্ট স্বতন্ত্র কবিদৃষ্টিই বিশেষ ছন্দের, বিশেষ আঙ্গিকের, বিশেষ ধ্বনি ও ব্যঞ্জনার, বিশেষ কথাবস্তুর ও বিশেষ রীতির, এক কথায়, বিশেষ কাব্যরূপ আশ্রয়ের মূলে। ইহারা একান্তই ভাবকল্পনা ও মানসচেতনার, এক কথায়, কবির বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে, সুতরাং ইহাদের আলোচনা গৌণ। বস্তুত ভাবানুভূতি ও মননপ্রকৃতির বাহিরে কাব্যরূপের সার্থক অস্তিত্ব কিছু নাই। তবু ইহাদের আলোচনার সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে, কারণ সেই আলোচনার ভিতর দিয়া ভাবকল্পনা, মননপ্রকৃতি ও মানসচেতনার স্বরূপ কিছুটা ধরিতে পারা কঠিন নয়। আমার বর্তমান আলোচনায় তাহার স্থান যে প্রায় নাই তাহার একমাত্র কারণ, একসঙ্গে সব কথা কেহ বলিতে পারে না, বলিবার যোগ্যতাও হয়ত রাখে না ; তাহা ছাড়া লেখককেও পুঁথির ও পত্রপৃষ্ঠার সীমা মানিয়া চলিতেই হয়। কাজেই এই দিককার আলোচনা বাধ্য হইয়াই ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিতে হইল।*

*এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের সমালোচনায় অন্তত একজন সমালোচক 'কাব্য-প্রবাহ' নিবন্ধে আমার প্রসঙ্গগত আলোচনা রীতি সম্বন্ধে আপত্তি জানাইয়াছিলেন। আমার আলোচনা ধারাবাহিক ভাবপ্রসঙ্গগত তাহা ত অত্যন্ত পরিষ্কার। কেন এই রীতি আমি অবলম্বন করিয়াছি তাহার কারণ উপরে বিবৃত করিলাম। সুখের বিষয়, উত্তর-জীবনে রবীন্দ্রনাথ নিজে এই রীতির যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। 'গীত-বিতানের ২য় সংস্করণের (১৩৪৮) বিজ্ঞাপনে তিনি লিখিয়াছেন,

"গীত-বিতান যখন প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তখন সংকলনকর্তারা সত্বরতার তাড়নায় গানগুলির মধ্যে বিষয়ানুক্রমিক শৃঙ্খলা বিধান করতে

(২)

পৃথ্বীরাজ-পরাজয় (১২৭৯)

বনফুল (১২৮২-৮৩র, ১২৮৬প্র)

কবি-কাহিনী (১২৮৪র, ১২৮৫প্র)

শৈশব সংগীত (১২৮৪-৮৭র, ১২৯১প্র।

বাল্মীকি-প্রতিভা (১২৮৭প্র)

ভগ্নহৃদয় (১২৮৭র, ১২৮৮প্র)

কালমৃগয়া (১২৮৯প্র)

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (১২৯১প্র)

সন্ধ্যা-সংগীত (১২৮৮প্র)

প্রভাত সংগীত (১২৯০প্র)

যে পরিবার-পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জন্ম সে পরিবার-পরিবেশ উনবিংশ শতকের মধ্যপাদের বাংলাদেশের মধ্যে বিধৃত। তাহার রাজধানী কলিকাতা, যে-কলিকাতা ইংরেজ বণিক-রাজের সৃষ্টি। সেই কলিকাতার প্রধানতম বাণিজ্য-রাজপথ চিৎপুর রোডের

পারেন নি। তাতে কেবল যে ব্যবহারের পক্ষে বিঘ্ন হয়েছিল তা নয়, সাহিত্যের দিক থেকে রসবোধেরও ক্ষতি করেছিল। সেইজন্যে এই সংস্করণে ভাবের অনুষঙ্গ রক্ষা করে গানগুলো সাজানো হয়েছে। এই উপায়ে সুরের সহযোগিতা না পেলেও, পাঠকেরা গীতিকাব্যরূপে এই গানগুলির অনুসরণ করতে পারবেন।"

গানের ক্ষেত্রেই এই ভাবের অনুষঙ্গ রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা যদি স্বীকৃত হয় তাহা হইলে কাব্য ও কবিতার ক্ষেত্রেও হইবে তাহা আর আশ্চর্য কি? এবং এই ভাবের অনুষঙ্গ রক্ষা করিয়া রবীন্দ্র কাব্য অনুসরণ করিলে সাহিত্যের দিক হইতে রসবোধের সাহায্য হইবে, এ-আশা করা অন্যায় কি?

এপাশে ওপাশে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির বিভিন্ন পারিবারিক বাসগৃহ। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবার শিক্ষায় দীক্ষায় শীলে শালীনতায় ধ্যানে ধারণায় বেশে ভূষায় আচারে ব্যবহারে তখন বাংলাদেশের চলমান সামাজিক জীবনস্রোতের বাহিরে। ক্ষীয়মান ভারতীয় মুসলমানী সংস্কৃতির বাহ্যিক সৌষ্ঠব-শালীনতার সঙ্গে শান্ত সমাহিত আবেগবিরল ঔপনিষদিক, প্রাক্‌পৌরাণিক যুগের ভারতবর্ষের ধ্যান ও চিন্তার একটি অপূর্ব মিলন ঘটিয়াছিল এই পরিবারে। শুধু তাহাই নয়; এই মানসিক আবহাওয়ার মধ্যে ছিল ইংরেজি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি ও লেখকদের নিভৃত অথচ অবাধ সঞ্চরণ, এবং সমস্ত কিছু জড়াইয়া গভীর স্বদেশপ্রীতির একটি মৃদুমন্দ সৌরভ। অথচ এই অপূর্ব পরিবেশ তদানীন্তন বাংলাদেশের সাধারণ সামাজিক জীবনের পরিবেশ নয়। তাহার উপর, ঠাকুর-পরিবার পিরালী ব্রাহ্মণ-পরিবার; তাঁহাদের বৈবাহিক ও সামাজিক আদান-প্রদান-সম্বন্ধ ছিল সীমাবদ্ধ, এবং এই কারণে ঠাকুর-পরিবারের স্থান ছিল বাংলার বৃহত্তর সামাজিক জীবনের এক পাশে। তাহারও উপর আবার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রামমোহন-প্রবর্তিত ধর্মসাধনার অনুগামী। এই সমস্ত কারণের সম্মিলিত ক্রিয়ার ফলে ঠাকুর-পরিবারে একটা স্বাতন্ত্র্য গড়িয়া উঠিয়াছিল; বাংলাদেশের সাধারণ সামাজিক জীবনস্রোতের সঙ্গে এই পরিবারের বিশেষ কোনও গভীর যোগ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁহাদের পরিবারের এই স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সজ্ঞান ছিলেন। যৌবন-মধ্যাহ্নে, ১৯০১ সালের জুলাই মাসে, স্ত্রীর নিকট এক পত্রে তিনি লিখিতেছেন, "আমাদের পরিবারের শিক্ষা রুচি অভ্যাস ভাষা ও ভাব অন্য সমস্ত বাঙালী পরিবার থেকে স্বতন্ত্র", সেই পরিবারে রবীন্দ্রনাথ যখন জন্ম লইলেন তখন যাহা কিছু পুরাতন কালের চালচলন পালপার্বণ ইত্যাদি এতকাল ছিল তাহাও বিদায় হইয়া গিয়াছে; বস্তুত তখন পুরাতন

কালই প্রায় বিদায় লইয়াছে, নূতন একটি কাল জন্মগ্রহণ করিতেছে, এবং সেই কালের বাতাস এই পরিবারেই প্রথম আসিয়া লাগিতেছে। রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় ভাবে ও ভাষায়ই এই অপূর্ব স্বাতন্ত্র্য-পরিবেশের কথা শোনা যাইতে পারে।—

"যে সংসারে প্রথম চোখ মেলেছিলুম সে ছিল অতি নিভৃত। শহরের বাইরে শহরতলীর মতো চারিদিকে প্রতিবেশীর ঘরগাড়িতে কলরবে আকাশটাকে আঁট করে বাঁধেনি।

আমাদের পরিবার আমার জন্মের পূর্বেই সমাজের নোঙর তুলে দূরে বাঁধা ঘাটের বাইরে এসে ভিড়েছিল। আচার অনুশাসন ক্রিয়াকর্ম সেখানে সমস্তই বিরল।

আমাদের ছিল মস্ত একটা সাবেক কালের বাড়ি, তার ছিল গোটাকতক ভাঙ্গা ঢাল, বর্শা ও মরচে পড়া তলোয়ার খাটানো দেউড়ি, ঠাকুর দালান, তিন চারটে উঠোন, সদর অন্দরের বাগান, সংবৎসরের গঙ্গাজল ধরে রাখবার মোটা মোটা জালা-সাজানো অন্ধকার ঘর। পূর্ব যুগের নানা পালপার্বণের পর্যায় নানা কলরবে সাজে-সজ্জায় তার মধ্য দিয়ে একদিন চলাচল করেছিল আমি তার স্মৃতিরও বাইরে পড়ে গেছি। আমি এসেছি যখন, এ বাসায় তখন পুরাতন কাল সদ্য বিদায় নিয়েছে, নতুন কাল সবে এসে নামল, তার আসবাবপত্র এখনো এসে পৌঁছনি।

এ-বাড়ি থেকে এ-দেশীয় সামাজিক জীবনের স্রোত যেমন সরে গেছে তেমনই পূর্বতন মনের স্রোতও পড়েছে ভাঁটা। পিতামহের ঐশ্বর্য-দীপাবলী নানা শিখায় একদা এখানে দীপ্যমান ছিল, সেদিন বাকি ছিল দহন শেষের কালো দাগগুলো, আর ছাই, আর একটিমাত্র কম্পমান ক্ষীণ শিখা। * * *

নিরালায় এই পরিবারে যে স্বাতন্ত্র্য জেগে উঠেছিল সে স্বাভাবিক মহাদেশ থেকে দূরবচ্ছিন্ন দ্বীপের গাছপালা জীবজন্তুরই স্বাতন্ত্র্যের মতো। * * *

(সপ্ততিতম জয়ন্তী-উৎসবে ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনার উত্তরে কবির প্রতিভাষণ)

এই দূরবিচ্ছিন্ন দ্বীপের স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জন্ম এবং বাল্য- ও কৈশোর পরিবেশ। এই পরিবেশেও তদানীন্তন অভিজাত পরিবারের স্বাতন্ত্র্য। বাড়িতে লোকজন প্রচুর, বৃহৎ পরিবার, কিন্তু সে-পরিবারের কর্তা দেবেন্দ্রনাথ। তাঁহার আদেশ ও নির্দেশ কিছু নাই,

কিন্তু আদর্শ অমোঘ, সেই আদর্শ সকলের মনে। অসংখ্য পরিজন, কিন্তু প্রত্যেকের সুনির্দিষ্ট স্থান, কেহ কাহারও সীমা লঙ্ঘন করে না। রবীন্দ্রনাথ সর্বকনিষ্ঠ পুত্র, ভৃত্যরাজতন্ত্রের মধ্যে তাঁহার অশনবসন, চলনবলন; পড়াশুনা গৃহশিক্ষকের হাতে, গানবাজনা, শরীরচর্চা তাহারও আবশ্যিক ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সমস্তই সুনিয়ন্ত্রিত, শাসনে নয় কিন্তু নিয়ম-সংযমে আঁটসাঁট করিয়া বাঁধা। বাড়িতে মজলিসেরও অভাব নাই, সেখানে গানবাজনা, নাট্যাভিনয়, কাব্যচর্চা, স্বদেশচর্চা, দেশোদ্ধারের পরিকল্পনা, এমন কি গুপ্তসভারও স্থান আছে, এবং রবীন্দ্রনাথ বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও সেখানে তিনি আদৃত। অবাধ আনন্দের অবকাশ আছে কিন্তু তাহা হইলেও সমস্তই নিয়মে সংযমে নিয়ন্ত্রিত "ঠেলাঠেলি ভিড়ের মধ্যে নয়। শান্ত অবকাশের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে এর প্রভাব আমাদের অন্তরে প্রবেশ করেছিল।" বৃহৎ পরিবারের সর্বত্রই এই শান্তি, সর্বত্রই একটা সুবিস্তৃত অবকাশ। কলিকাতা শহরের অভিজাত ও মধ্যবিত্ত জীবনেও তখন আজিকার দিনের ব্যস্ততা ঢুকিয়া পড়ে নাই, সে-জীবন তখনও অপেক্ষাকৃত শান্ত ও নিশ্চঞ্চল। দেবেন্দ্র-নাথের পরিবার তাহার মধ্যে আরও শান্ত, আরও নিশ্চঞ্চল।—

"কলকাতা শহরের বক্ষ তখন পাথরে বাঁধা হয়নি, অনেকখানি কাঁচা ছিল। তেলকলের ধোঁয়ায় আকাশের মুখে তখনো কালি পড়েনি। ইমারত অরণ্যের ফাঁকায় ফাঁকায় পুকুরের জলের উপর সূর্যের আলো ঝিকিয়ে যেত, বিকেল বেলায় অশথের ছায়া দীর্ঘতর হয়ে পড়ত, হাওয়ায় দুলত নারকেল গাছের পত্র ঝালর, বাঁধা নালা বেয়ে গঙ্গার জল ঝরনার মতো ঝরে পড়ত আমাদের দক্ষিণ বাগানের পুকুরে, মাঝে মাঝে গলি থেকে পালকি বেহারার হাঁই-হুঁই শব্দ আসত কানে, আর বড়ো রাস্তা থেকে সহিসের হেইও হাঁক। সন্ধ্যেবেলায় জ্বলতো তেলের প্রদীপ, তারই ক্ষীণ আলোয় মাদুর পেতে বুড়ী দাসীর কাছে শুনতুম রূপকথা। এই নিস্তব্ধপ্রায় জগতের মধ্যে আমি ছিলুম এক কোণের মানুষ, লাজুক, নীরব, নিশ্চঞ্চল।"

(সপ্ততিতম জয়ন্তী-উৎসবে ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনার উত্তরে কবির প্রতিভাষণ)

সত্যই, বালক রবীন্দ্রনাথ ছিলেন দেবেন্দ্রনাথের শান্ত, অবকাশবহুল, স্বতন্ত্র পরিবারের এক কোণের মানুষ, একলা, একঘরে; কবির নিজের কথায়, "* * * * সে হচ্ছে একটি বালক, সে কুনো, সে একলা, সে একঘরে তার খেলা নিজের মনে। সে ছিল সমাজের শাসনের অতীত, ইস্কুলের শাসনের বাইরে। বাড়ির শাসনও তার হালকা * * *!"

আমি যে ইতিপূর্বেই বার বার কবির একান্ত স্বতন্ত্র, অন্তর্মুখী, আত্মভাবপরায়ণ কবি-কল্পনার কথা বলিয়াছি তাহার মূল এই বাল্য, কৈশোরের জীবনভূমিকার মধ্যে নিহিত, এ-কথা কি বলা চলে না?

যাহাই হউক, যে-পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের শৈশব ও কৈশোর কাটিয়াছে তাহা কিন্তু কাব্যাভ্যাসের পক্ষে খুব অনুকূল ছিল। ঠাকুর-বাড়ি তখন গান, কাব্য ও সাহিত্য চর্চার প্রধানতম কেন্দ্রস্থল, এবং বিদ্যালয়ের প্রতি বীতরাগ রবীন্দ্রনাথ, পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রবীন্দ্রনাথকে দেখিতে পাই,—এই গান, কাব্য ও সাহিত্য চর্চার মধ্যে তিনি আপনার তৃপ্তি অন্বেষণে ব্যাপৃত। তের বৎসর বয়সেই গৃহ-শিক্ষকের সাহায্যে "কুমার-সম্ভব," "শকুন্তলা," "ম্যাকবেথ," বিদ্যাপতির পদাবলী ইত্যাদি পড়া হইয়া গিয়াছে। শুধু পড়া নয়, অধীত বিষয় কাব্যে তর্জমার চেষ্টাও চলিতেছে, কিছু কিছু কাব্য-রচনাও আরম্ভ হইয়াছে। নিজের বাড়িতে স্বর্ণকুমারী, দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের কাব্য পাঠ ও আলোচনা এক দিকে, অন্য দিকে বিহারীলালের গীতি-কাব্য ক্রমশ বালকচিত্তে প্রভাব বিস্তার করিতেছে। তাহা ছাড়া, যে-সময়টা একা একা আছেন তখন বসিয়া বসিয়া কল্পলোকের স্বপ্নজাল বুনিতেছেন বালসুলভ বিলাস-মোহে; এই স্বপ্নজাল অধিকাংশই প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া, কিশোর বয়সের কুয়াশাচ্ছন্ন হৃদয়বৃত্তিগুলিকে

লইয়া। কতকটা এই রকম পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-চর্চার সূত্রপাত হইল।

"এই লেখাগুলো যেমনই হোক, এর পেছনে একটা ভূমিকা আছে—সে হচ্ছে একটি বালক, সে কুনো, * * * বাড়ির শাসনও তার হালকা। পিতৃদেব ছিলেন হিমালয়ে, বাড়িতে দাদারা ছিলেন কর্তৃপক্ষ। জ্যোতিদাদা, যাঁকে আমি সকলের চেয়ে মানতুম, বাইরে থেকে তিনি আমায় কোনো বাঁধন পরাননি। তাঁর সঙ্গে তর্ক করেছি, নানা বিষয়ে আলোচনা করেছি বয়স্যের মতো। তিনি বালককেও শ্রদ্ধা করতে জানতেন। আমার আপন মনের স্বাধীনতার দ্বারাই তিনি আমার চিত্তবিকাশের সহায়তা করেছেন। * * * শুরু হলো আমার ভাঙা ছন্দে টুকরো কাব্যের পালা, উল্কাবৃষ্টির মতো; বালকের যা তা এলোমেলো কাঁচা গাঁথুনি। এই রীতিভঙ্গের ঝোঁকটা ছিল সেই একঘরে ছেলের মজ্জাগত।"

এগারো কি বার হইতে আঠার উনিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত যত কাব্য অথবা কাব্যনাট্য তিনি রচনা করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা কম নয়।* কাব্য, গীতিকাব্য, কাব্যোপন্যাস, কাব্যনাট্য, গীতিনাট্য, গাথা ইত্যাদি সাহিত্য-রচনার সকল দিকেই কিশোর কবিচিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু ইহাদের মধ্যে "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী" এবং "বাল্মীকি প্রতিভা"ই কালের কষ্টিপাথরে যাচাই হইয়া টিকিয়া আছে; আর বাকি

"সমস্তই লোকচক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে

---

* কালক্রম ও বিস্তৃত বিবরণের জন্য প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, "রবীন্দ্র-জীবনী," ১ম খণ্ড; উক্ত গ্রন্থকারের "রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী" (১৩৩৮), এবং চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "রবিরশ্মি" পূর্বখণ্ড (১৩৪৪); Calcutta Municipal Gazette, Tagore Memorial Special Supp, Sept. 13, 1941; Viswa-Bharati Quarterly, Tagore-Birthday Number, May-Oct., 1941: 'শনিবারের চিঠি' রবীন্দ্র-সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৪৮; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র-গ্রন্থ পরিচয় (১৩৪৯); রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, এবং রবীন্দ্র-রচনাবলীর ১ম খণ্ডের গ্রন্থ-পরিচয় দ্রষ্টব্য।

গেলেও ঐতিহাসিকের নাগালের বাহিরে যায় নাই। অনুসন্ধান করিলে সেগুলি এখনো পাওয়া যায়। কিন্তু সত্যই মহাকাল সেগুলি বিনাশ করিয়াছে—কারণ সাহিত্য-হিসাবে সেগুলি নগণ্য।" (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্র-জীবনী", ১ম খণ্ড, ৫১ পৃঃ, বিশ্বভারতী সং, ১৩৪০)

প্রভাতবাবুর এই উক্তি যথার্থ! এগুলি যে কখনও মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় বাঙালী পাঠকের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, এবং এখনও যে মাঝে মাঝে এখানে ওখানে কোনও কোনও রচনার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, এজন্য কবি নিজে অত্যন্ত লজ্জিত! "জীবন-স্মৃতি"তে, "সঞ্চয়িতা"র ভূমিকায়, নানা পত্রালাপে এবং অধুনা "অচলিত সংগ্রহ রচনাবলী"র ভূমিকায় তিনি বারংবার এই লজ্জা ও সংকোচ স্বীকার করিয়াছেন, এবং অপরিণত বয়সের এই রচনাগুলিকে অত্যন্ত নির্মম-ভাবে কশাঘাত করিয়াছেন। কবি নিজের প্রতি এতটা কঠোর না হইলেও পারিতেন! "পৃথ্বীরাজ-পরাজয়" বাদ দিলে বাকি কয়েকটি রচনা তদানীন্তন বাংলা-কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে একেবারে নগণ্য নয়। মধুসূদন 'পয়ারের পায়ের বেড়ি' ভাঙিয়াছেন বটে, কিন্তু তখনও পর্যন্ত এক বিহারীলাল ছাড়া আর কেহ বাংলা কাব্যলক্ষ্মীর ছন্দজড়িমা ঘুচাইতে পারেন নাই, কিংবা গীতিকবিতার অপূর্ব সম্ভাবনার স্বপ্ন কোনও কবিকে চঞ্চল করে নাই। বিহারীলালই বোধ হয় সর্বপ্রথম বাংলা কাব্যে একটি নূতন ধারা প্রবর্তন করিলেন, এবং বিহারীলালের প্রেরণা পাইয়া সেই ধারায় রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের উন্মেষ হইল। এই কথার প্রমাণ কবির এই কৈশোর কাব্যাভ্যাসের মধ্যে পাওয়া যাইবে। তাহা ছাড়া পরবর্তী জীবনে যে সব ভাব ও কল্পনা কবিকে আবেগ-চঞ্চল করিয়াছে, তাঁহার জীবন ও কাব্যকে নানা ভাবে নানা রূপে স্পর্শ করিয়াছে, তাহাদের দুই-একটির আভাসও এই রচনাগুলির ভতর লক্ষ্য করা যায়। তবে তাহা আভাস মাত্রই, শ্রুত অথবা অধীত

বাক্যমাত্রই, তখনও তাহারা অনুভব-ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে নাই, কিংবা সার্থক কাব্যরূপও লাভ করে নাই।

"বনফুল" কাব্যে একটি গল্প। বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে মানব-প্রকৃতির যে সুগভীর সম্বন্ধ পরবর্তী জীবনে ও কাব্যে রবীন্দ্র-কাব্য-জিজ্ঞাসার একটা বৃহৎ স্থান অধিকার করিয়া আছে, এই কাব্যোপন্যাসে তাহার আভাস আছে। লিরিক প্রতিভার উন্মেষও ইহার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

"কবি-কাহিনী" ও "বনফুলে"র মত ট্র্যাজিক্ রোম্যান্স। যে-ঐশ্বর্য, যে-মাধুর্য মানুষের করায়ত্ত, সেই নিকটের ঐশ্বর্য অথবা মাধুর্যের মূল্য না বুঝিয়া অথবা অবহেলায় নিকটে ছাড়িয়া মানুষ দূরে যায়, ঐশ্বর্য ধূলিমুষ্টি জ্ঞান করিয়া দূরে নিক্ষেপ করে, মাধুর্যকে তুচ্ছ করে, অথচ দূরে গিয়া পশ্চাতের জন্য মন কাঁদিয়া উঠে, তখন নিকটের নাগাল আর পাওয়া যায় না, দূরও মনকে শান্তি দিতে পারে না—এই ভাবটি রবীন্দ্র-কাব্যে বহু-স্থানে বহু ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। কিশোর বয়সের "কবি-কাহিনী"তে তাহার অস্পষ্ট আভাস আছে। তাহা ছাড়া যে-বিশ্বজীবন, বিশ্বপ্রেম তাঁহার পরবর্তী জীবন ও কাব্যকে একটি নূতন রূপ দান করিয়াছে তাহারও খুব বিস্তৃত আভাস এই রচনাটিতে ধরিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা শুধু, আমি আগেই বলিয়াছি, শ্রুত বা অধীত বাক্য মাত্র, অনুভূত প্রত্যয় নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলিতেছেন,

"ইহার মধ্যে বিশ্বপ্রেমের ঘটা খুব আছে—তরুণ কবির পক্ষে এইটি বড় উপাদেয়, কারণ ইহা শুনিতে খুব বড়, এবং বলিতে খুব সহজ। নিজের মধ্যে সত্য যখন জাগ্রত হয় নাই, পরের মুখের কথাই যখন প্রধান সম্বল, তখন রচনার মধ্যে সরলতা ও সংযম রক্ষা করা সম্ভব নহে। তখন, যাহা স্বতই বৃহৎ, তাহা বাহিরের

দিক হইতে বৃহৎ করিয়া তুলিবার দুশ্চেষ্টায় তাহাকে বিকৃত ও হাস্যকর করিয়া তোলা অনিবার্য।" ("জীবনস্মৃতি," বিশ্বভারতী সং, ১৫৭ পৃঃ)

কিন্তু এই যে 'বিশ্বপ্রেমের ঘটা' এই কাব্যটিতে দেখা যায় তাহার কারণটুকু জানা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবন কাটিয়াছিল 'ভৃত্যরাজতন্ত্রের' শাসনের মধ্যে, তাহার মধ্যে স্নেহ-মায়া-ভালবাসা কিছুই ছিল না। কিশোর-চিত্তের বিচিত্র বর্ণের হৃদয়লীলার খবর সেখানে কেহ লইত না, স্নেহে প্রীতিতে সহানুভূতিতে অথবা সহজ-বোধের সাহায্যে সেই লীলাকে স্পর্শ করিবার কেহ ছিল না। কিশোর-চিত্তকে বাধ্য হইয়াই তখন আপনার মধ্যেই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, একটা 'বস্তুহীন ভিত্তিহীন কল্পনালোকে' বাস করা ছাড়া তাহার আর কিছু উপায় ছিল না। মনের এই অবস্থায় 'তিল তাল হয়ে' উঠে, সুখ-দুঃখের অনুভূতি স্বপ্ন অথবা কল্পনামাত্র হইলেও অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া দেখা দেয়, এবং 'যাহা স্বতই বৃহৎ তাহা বাহিরের দিক হইতে বৃহৎ করিয়া তুলিবার দুশ্চেষ্টায় তাহাকে বিকৃত ও হাস্যকর করিয়া তোলা অনিবার্য'। রবীন্দ্রনাথ কদাচিৎ বাড়ির বাহিরে যাইতে পারিতেন, সময় সময় যখন সুযোগ ঘটিত তখন কোনও ভৃত্য অথবা কর্মচারী সঙ্গে যাইত। বাহিরের এই জগৎ তাঁহার কাছে অজ্ঞাত ছিল বলিলেই চলে। বিশ্বজগতের সঙ্গে তাঁহার শৈশব ও কৈশোরের যে সম্বন্ধ তাহা শুধু দরজা-জানলার ফাঁকে ফাঁকে; সেই ফাঁক দিয়াই এই আলো-বাতাস, রৌদ্র-বৃষ্টি, আকাশ ও মাটি, লতা, গাছ, পশু, পক্ষী, মানুষ, রূপ-রস-গন্ধ তাঁহাকে স্পর্শমাত্র করিয়া যাইত, কিন্তু ইহাদের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের সুযোগ তাঁহার ছিল না। বিশ্বপ্রকৃতি

"যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা ক'রবার চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ—মিলনের উপায় ছিল না,—সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল। আজ সেই খড়ির গণ্ডি মুছিয়া গেছে, কিন্তু গণ্ডি তবু ঘোচে নাই।" ("জীবনস্মৃতি," বিশ্বভারতী সং, ১৪ পৃঃ)

প্রভাতবাবু যথার্থই বলিয়াছেন,

"রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনের কথা স্মরণ করিলে মনে হয় যে বালক রবীন্দ্রনাথ 'কবি-কাহিনী'র মধ্যে কল্পনার সাহায্যে নিজের অনেক অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিয়া লইয়াছেন।" ("রবীন্দ্র-জীবনী," বিশ্বভারতী. সং ১ম খণ্ড, ৬৬ পৃঃ)

ঠিক এই কারণেই, কবির কৈশোরের সব কয়টি রচনাই 'বস্তুহীন ভিত্তিহীন,' উচ্ছ্বাসের বাষ্পে ভরা, এবং সবগুলিই ট্র্যাজেডি। এই বয়সটাই তো স্পর্শচঞ্চল চিত্তের পক্ষে দুঃখ-বিলাসের বয়স, এবং রবীন্দ্রনাথের বাল্য ও কৈশোর যে-ভাবে কাটিয়াছে, তাহাতে এই দুঃখ-বিলাসের আকর্ষণ আরও প্রবল হইবারই কথা।

কিন্তু "কবি-কাহিনী" অথবা এই বয়সের অন্যান্য রচনার ভাব যাহাই হউক ইহাদের মধ্যে দুইটি জিনিস সহজেই লক্ষ্য করা যায়, একটি কবির হৃদয়বৃত্তির সৌকুমার্য ও কল্পনার অবাধ স্বচ্ছন্দ গতি, আর একটি তাঁহার লিরিক প্রতিভা। যে লিরিক প্রতিভা উত্তর-জীবনে রবীন্দ্রনাথকে অপূর্ব বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে তাহার পরিচয় এই রচনাগুলি হইতে আরম্ভ হইয়াছে. এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

"রুদ্রচণ্ড" একটি ক্ষুদ্র নাটিকা, একটু মেলোড্রামাটিক, এবং ইহার কাব্যমূল্যও খুব বেশি নয়। কিন্তু ইহার কিছুদিন পরেই রবীন্দ্রনাথ "ভগ্নহৃদয়" নামে একটি গীতিকাব্য রচনা করেন; ইহার কাব্যমূল্য উপেক্ষা করা যায় না। "ভগ্নহৃদয়" নাটকাকারে লিখিত, কিন্তু কেহ পাছে ইহাকে নাটক বলিয়া ভুল করেন সেইজন্য কবি ভূমিকাতেই লিখিয়াছেন,

"নিম্নলিখিত কাব্যটিকে কাহারও যেন নাটক বলিয়া ভ্রম না হয়। দৃশ্যকাব্য ফুলের গাছের মত; তাহাতে ফুল ফুটে, কিন্তু সে-ফুলের সঙ্গে শিকড়, কাণ্ড, শাখা,

পত্র, কাঁটাটি পর্যন্ত থাকা আবশ্যক। নিম্নলিখিত কাব্যটি ফুলের তোড়া। গাছের আর সমস্ত বাদ দিয়া কেবলমাত্র ফুলগুলি সংগ্রহ করা হইয়াছে। নাটকাকারে কাব্য লিখিত হইয়াছে।" ("ভারতী", ১২৮৭, কার্ত্তিক, ৩৩৬ পৃঃ)

"ভগ্নহৃদয়" লেখা আরম্ভ হইয়াছিল প্রথম বিলাত-প্রবাস কালে, দেশে ফিরিয়া আসার পর শেষ করা হয়। যে কৈশোর কবিধর্মের প্রকাশ "কবিকাহিনী"তে আমরা দেখিতে পাই, তাহা "ভগ্নহৃদয়"-কাব্যেও সুস্পষ্ট। এই বয়সের সব ক'টি রচনাই হৃদয়োচ্ছ্বাসের বাষ্পে আচ্ছন্ন, সে-কথা ত আগেই বলিয়াছি; "ভগ্নহৃদয়ে" এই উচ্ছ্বাস যেন আরও ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছে, কিন্তু এখনও হৃদয়াবেগ অত্যন্ত অস্পষ্ট ও অপরিস্ফুট, এখনও তাহা মূর্তি-গ্রহণ করে নাই। কবি নিজেই বলিতেছেন,

"ভগ্নহৃদয় যখন লিখতে আরম্ভ করেছিলেম তখন আমার বয়স আঠারো। বাল্যও নয়, যৌবনও নয়। বয়সটা এমন একটা সন্ধিস্থলে যেখান থেকে সত্যের আলোক স্পষ্ট পাবার সুবিধা নেই। একটু একটু আভাস পাওয়া যায় এবং খানিকটা খানিকটা ছায়া। এই সময়ে সন্ধ্যাবেলাকার ছায়ার মত কল্পনটা অত্যন্ত দীর্ঘ এবং অপরিস্ফুট হয়ে থাকে। সত্যকার পৃথিবী একটা আজগুবি হয়ে উঠে। মজা এই, তখন আমারই বয়স আঠারো ছিল তা নয়—আমার আশে পাশে সকলের বয়স যেন আঠারো ছিল। আমরা সকলে মিলে একটা বস্তুহীন ভিত্তিহীন কল্পনালোকে বাস করতেম। সেই কল্পলোকের খুব তীব্র সুখ-দুঃখও স্বপ্নের সুখ-দুঃখের মত। অর্থাৎ তার পরিমাণ ওজন করবার কোনো সত্য পদার্থ ছিল না, কেবল -নিজের মনটাই ছিল—তাই আপন মনে তিল তাল হয়ে উঠতো।" (জনৈক বন্ধুর নিকট পত্র, "জীবনস্মৃতি", বিশ্বভারতী সং, ১৮৭ পৃঃ)

মনের এই অবস্থার পরিচয় অন্যত্র কবি নিজেই দিতেছেন,

"বাড়ির লোকেরা আমার হাল ছাড়িয়া দিলেন। কোনদিন আমার কিছু হইবে এমন আশা না আমার, না আর কাহারও মনে রহিল। কাজেই কোনো কিছুর ভরসা না রাখিয়া আপন মনে কেবল কবিতার খাতা ভরাইতে লাগিলাম। সে লিখাও তেমনি। মনের মধ্যে আর কিছুই নাই, কেবল বাষ্প আছে—বাষ্পভরা

বুদ্‌বুদরাশি, সেই আবেগের কোমলতা অলস কল্পনার আবর্তের টানে পাক খাইয়া নিরর্থক ভাবে ঘুরিতে লাগিল। তাহার মধ্যে কোনো রূপের সৃষ্টি নাই, কেবল গতির চাঞ্চল্য আছে। কেবল টগবগ করিয়া ফুটিয়া ফুটিয়া ওঠা, ফাটিয়া ফাটিয়া পড়া। তাহার মধ্যে বস্তু যাহা কিছু ছিল তাহা আমার নহে, সে অন্য কবিদের অনুকরণ; উহার মধ্যে আমার যেটুকু, সে কেবল একটা অশান্তি, ভিতরকার একটা দুরন্ত আক্ষেপ। যখন শক্তির পরিণতি হয় নাই অথচ বেগ জন্মিয়াছে তখন সে একটা ভারি অন্ধ আন্দোলনের অবস্থা।" ("জীবনস্মৃতি," বিশ্বভারতী সং, ১৩৬ পৃ:)

এমন সত্য ও সুন্দর আত্মবিশ্লেষণ কোনও কবি নিজের কাব্য-সম্বন্ধে করিয়াছেন বলিয়া জানি না।

চিত্তের যে অস্পষ্ট অপরিস্ফুট হৃদয়াবেগ হইতে "কবিকাহিনী," "রুদ্রচণ্ড" অথবা "ভগ্নহৃদয়ে"র সৃষ্টি ঠিক অনুরূপ অবস্থার মধ্যেই "শৈশব সংগীতে"রও সৃষ্টি। "শৈশব সংগীতে"র কবিতাগুলি অনেকগুলিই গাথা-জাতীয়, এবং এই গাথাগুলি এবং অন্যান্য কবিতাগুলি কবির আঠারো হইতে কুড়ি বৎসরের মধ্যে লেখা। এগুলিও উচ্ছ্বাসের বাষ্পে ভরা, এবং গাথাগুলি প্রায় সবই ট্র্যাজেডি। বোঝা যাইতেছে "বনফুল," "কবিকাহিনী", "রুদ্রচণ্ড", "ভগ্নহৃদয়ে"র সঙ্গে "শৈশব সংগীত"ও একই পর্যায়ের রচনা, একই চিত্তধারার সৃষ্টি। এই ধারা চলিয়াছে "সন্ধ্যা সংগীত" পর্যন্ত, এবং "শৈশব সংগীত" ও "সন্ধ্যা সংগীত যাঁহারা একটু অভিনিবেশে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন এই দুই রচনার মধ্যে একটা খুব নিবিড় ভাব-ঐক্য আছে। কাব্যসৃষ্টির দিক হইতে "সন্ধ্যা সংগীত" সার্থকতর, এ-কথা সত্য, কিন্তু তাহা কিছু ভাবৈশ্বর্যের জন্য নয়, চিত্তসমৃদ্ধির জন্য নয়; বরং যে অস্পষ্ট অপরিস্ফুট হৃদয়াবেগ পূর্ববর্তী রচনাগুলিতে লক্ষ্য করা যায়, "সন্ধ্যা সংগীতে" তাহা সমভাবেই বিদ্যমান, যে হৃদয়-অরণ্যের মধ্যে কবি ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিতেছেন সে-অরণ্য

এখনও তেমনই গহন, তেমনই গভীর। তবু "শৈশব সংগীতে"র সঙ্গে "সন্ধ্যা সংগীতে"র পার্থক্য একটা আছে, কিন্তু সে-পার্থক্য শুধু প্রকাশ-ভঙ্গির, কাব্যরূপের। প্রভাতবাবুও বলিতেছেন, "শৈশব সংগীত"

'সন্ধ্যা সংগীত'এর অব্যবহিত পূর্বের রচনা। 'সন্ধ্যা সংগীত' এর সঙ্গে তফাত শুধু বলিবার ভঙ্গিতেই প্রধান। * * * 'বনফুল' হইতে 'ভগ্নহৃদয় পর্যন্ত কাব্যোপন্যাস গুলি, শৈশব সংগীতএর কবিতাগুলি 'সন্ধ্যাসংগীতএর সোপান বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ইহাদের মধ্যে ভাবের বিচ্ছেদ টানা কঠিন, যথার্থ পার্থক্য দাঁড়াইয়াছে 'সন্ধ্যা সংগীত'এর বলিবার ভঙ্গিতে, সে ভঙ্গি তাঁহার নিজস্ব।" (রবীন্দ্র-জীবনী, ১ম খণ্ড, বিশ্বভারতী সং, ১০০-১০১পৃঃ)

যত উচ্ছ্বাসের বাষ্পে ভরা, যত শিথিল, যত বাক্‌বহুল বর্ণনার আতিশয্য, যত কাহিনীগত অসংগতি, যত দীর্ঘ অতিশয়োক্তি, যত বয়স্কের অভিমান, যত অন্ধ অনুকরণ, এই কৈশোর কাব্য-প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে থাকুক না কেন—এবং তাহা যে আছে অস্বীকার করিবার উপায় নাই—তৎসত্ত্বেও এই অপরিণত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রাথমিক দীপ্তি ও মাধুর্য ধরা পড়ে অতি সহজেই; এবং শুধু তাহাই নয়, উত্তর-জীবনে কবির প্রাণধর্মের যে-প্রকৃতি তাহারও প্রথম সূচনা এই কৈশোরকাব্যসাধনার মধ্যে নিহিত। আমাদের এই বস্তুসংসার, বিশ্বপ্রকৃতি, মানবজীবন প্রভৃতি সম্বন্ধে কতকগুলি প্রত্যয় উত্তর-জীবনে আমরা সুস্পষ্ট ধরিতে পারি; আশ্চর্যের বিষয়, সেই সুপরিচিত প্রত্যয়-ভাবনাগুলির প্রাথমিক উন্মেষ এই কাব্যগ্রন্থগুলির ভিতরই প্রথম ধরা পড়ে। নিসর্গ-প্রকৃতিকে কবি কোনদিনই কতকগুলি উপকরণের আধার-রূপে কল্পনা করেন নাই; তাহার ভিতর মানবিক সত্তার উপলব্ধি তাঁহার কবিপ্রাণের ধর্ম। বস্তুসংসারের বিচিত্র রূপকেও তিনি কখনও তাহাদের নিছক বস্তুধর্মে বুদ্ধিগম্য করেন নাই; তাহাদের পশ্চাতে কোনও অদৃশ্য অনির্বচনীয়

শক্তি সর্বদা ক্রিয়াশীল, সেই শক্তির লীলা তিনি কবিকল্পনায় অনুভব করিয়াছেন। আপাতদৃষ্টিতে, বস্তুদৃষ্টিতে মানুষে মানুষে যে দ্বন্দ্ব বিরোধ, মানব-সম্বন্ধের যে-বৈপরীত্য তাহাকেও তিনি বরাবরই অবিশ্বাসের, অসংগতির দৃষ্টিতেই দেখিয়াছেন; মৈত্রীবোধই মানবসম্বন্ধের নিগূঢ় প্রেরণা, এই বিশ্বাসই তাঁহার জীবন-দর্শনের অন্তর্গত। ইহাদের প্রত্যেকটির প্রাথমিক কবিকল্পনার রূপ এই কৈশোর-কাব্য-প্রচেষ্টার মধ্যে মিলিবে। উত্তর-জীবনেও ইহাদের মৌলিক প্রকৃতি একই। এই প্রাথমিক রূপের দৃষ্টান্ত "কবিকাহিনী" হইতে আরম্ভ করিয়া "সন্ধ্যা সংগীত" পর্যন্ত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত।

কিন্তু এই ঐতিহাসিক মূল্য ছাড়া এই কৈশোর রচনাগুলির সাহিত্যিক মূল্যও একেবারে নগণ্য নয়। যে আবেগময় সুর, যে গীতধ্বনি, যে অব্যাহত গতিচ্ছন্দ রবীন্দ্রকাব্যের বৈশিষ্ট্য, যে অবারিত মুক্তপক্ষ কল্পনা ও তাহার একান্ত স্বতন্ত্র অন্তর্মুখী প্রকৃতি রবীন্দ্র-গীতি-কবিতার ধর্ম তাহারও প্রথম উন্মেষ ইহাদের মধ্যে পরিস্ফুট। অনেক কবিতাখণ্ডের বাক্‌ ও বর্ণ-বহুল প্রকৃতি-বর্ণনা, তাহাদের সুর ও ধ্বনি, ছন্দ ও বাক্‌ভঙ্গি অনেক সময়ই যৌবনোন্মেষ ও পরিণত-যৌবনের রবীন্দ্র-কাব্যের অনেক ছবি, অনেক খণ্ড, অনেক সৌরভ স্মরণে জাগাইয়া তোলে; এই সব কৈশোর প্রচেষ্টার মধ্যে যৌবনের পূর্বধ্বনি শোনা যায় বিশেষ ভাবে, সুরে ও ধ্বনিতে এবং অবারিত গতিচ্ছন্দে।

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই, নিজস্ব রসানুভূতি দ্বারা আপ্লুত ও আচ্ছন্ন, ব্যক্তিগত, আত্মগত মনের সুরধ্বনিময় যে-প্রকাশকে আমরা 'লিরিক্‌' বা গীতি-কবিতা বলি, রবীন্দ্রনাথের মন ও কল্পনা তাহার দিকে আকৃষ্ট হইল কি করিয়া? বাংলা কাব্য-সাহিত্য তখন মাইকেল হেম-নবীনের প্রতাপদীপ্ত রাজত্ব; তাহার অব্যবহিত আগেকার কাব্যিক

আবহাওয়ার এক দিকে ভারতচন্দ্র, অন্য দিকে ঈশ্বর গুপ্ত, আর লোক-স্তরে নিধুবাবু, দাশরথি রায় ইত্যাদি। হেম-নবীনের কথা ছাড়িয়াই না হয় দিলাম, কিন্তু মধুসূদনের প্রদীপ্ত কাব্য-প্রতিভা তাঁহাকে আকৃষ্ট করিল না, অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী ভারতচন্দ্র-ঈশ্বর গুপ্তের আবেশে তিনি মুগ্ধ হইলেন না, এ-তথ্য অন্যতম সাহিত্যিক বিস্ময়। ঠাকুরবাড়িতে গান, কাব্য ও সাহিত্যালোচনার যে-মজলিস বসিত সেখানে ইঁহাদের চর্চা ছিল না এমন নয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চর্চা চলিত বৈষ্ণব কবিতার, সমসাময়িক ইংরেজি রোম্যান্টিক গীতিকাব্যের এবং পরিবারের প্রিয়কবি বিহারীলালের। আদর্শ ও উদ্দেশ্য মূলক, উপাখ্যানগত, সমষ্টি মনের কল্পনাগত যে-কাব্য মাইকেল-হেম-নবীনের দান, বা লোকপুরাণগত, বাকচাতুর্যময় যে-কাব্য ভারতচন্দ্র-ঈশ্বর গুপ্তের দান, তাহার সঙ্গে বৈষ্ণব কবিতা, সমসাময়িক ইংরেজি গীতি-কবিতা বা বিহারীলালের গীতিকাব্যের একটি জাতিগত, প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। কি বৈষ্ণব পদকর্তাদের রচনায়, কি সমসাময়িক ইংরেজি কাব্যে কি বিহারীলালের কাব্যে একক মনের যে-অনুভূতি, ব্যক্তিগত প্রাণের যে-স্পন্দন সংগীতের সুরে ছন্দে ধ্বনিতে ধরা যায়, বাংলা সাহিত্যের কাব্য-ঐতিহ্যের অন্যত্র কোথাও তাহা ছিল না। কিশোর-রবীন্দ্রনাথের একক স্বতন্ত্র ব্যক্তিচিত্তে যে কাব্য-ঐতিহ্য, যে কাব্য-প্রকৃতি নূতন এক উন্মাদনার সঞ্চার করিয়াছিল তাহা গীতিকাব্যের এই একক মনের অনুভূতি, ব্যক্তিগত প্রাণের স্পন্দন। এই গীতিকাব্যিক উন্মাদনা লালিত ও বর্ধিত হইবার সুযোগ পাইল বিহারীলালের নৈকট্যে, "বঙ্গসুন্দরী" ও "সারদামঙ্গলে"র কাব্যছায়ায়। বিহারীলালকে যে রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাহা অনেকটা বিনয়নম্র স্বীকৃতি হইলেও একেবারে অসার্থক নয়: কবির কৈশোর কাব্যপ্রচেষ্টাগুলির ভিতর বিহারীলালের

নিজস্ব দৃষ্টি ও প্রকাশভঙ্গি, আত্মকেন্দ্রিক স্বাতন্ত্র্যের প্রভাব সুস্পষ্ট, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও অবশ্য স্বীকার্য যে রবীন্দ্রনাথের প্রকাশ প্রাথমিক উন্মেষেই অধিকতর গীতময়, ধ্বনিবহুল এবং গতিচ্ছন্দময়। "বনফুল" বা "শৈশব সংগীতে"র যে কোনও গাথা "সারদামঙ্গলে"র পাশাপাশি রাখিয়া পড়িলেই তাহা স্বীকার করিতে আপত্তি হইবে না।

"ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী" কবির ষোল বছর বয়সের লেখা, "কবিকাহিনী" রচনারও আগে। এই রচনাটি কবির কিশোর বয়সের অন্যান্য কাব্য-রচনা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, এবং সেই হেতু পৃথকভাবে আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত।

এই কিশোর বয়সে বিহারীলাল একদিকে তাঁহার আদর্শ ছিলেন, আমরা দেখিয়াছি; কবির মনে মনে আকাঙ্ক্ষা ছিল বিহারীলালের মত কবি হইবার, এবং কতকটা বিহারীলালের অনুকরণই দেখা যায় তাঁহার "কবিকাহিনী", "রুদ্রচণ্ড", "শৈশব সংগীত", "ভগ্নহৃদয়" প্রভৃতি রচনাগুলিতে, বিশেষভাবে ছন্দ ও প্রকাশভঙ্গিতে। কিন্তু আর একদিকে প্রাচীন বৈষ্ণব পদকর্তাদের পদাবলীও তরুণ কবির চিত্তকে স্পর্শ করিয়াছিল; তাঁহাদের ভাষা ও ছন্দ কিশোর কবির স্পর্শকাতর সুকুমার মনকে অভিভূত করিয়াছিল, এবং বৈষ্ণব কবিদের অনুকরণে কবিতা রচনা করিবার একটা প্রবল ইচ্ছার সঞ্চার করিয়াছিল। এই ইচ্ছার মধ্যেই "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী"র সৃষ্টি। কিন্তু ইহার জন্য তাঁহাকে কম কষ্ট স্বীকার করিতে হয় নাই। বৈষ্ণব-সাহিত্য পাঠ ও আলোচনা শৈশবেই শুরু হইয়াছিল।—

"শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয় সরকার মহাশয়ের প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ সে সময়ে আমার কাছে একটি লোভের সামগ্রী হইয়াছিল। গুরুজনেরা ইহার গ্রাহক ছিলেন কিন্তু নিয়মিত পাঠক ছিলেন না। সুতরাং এগুলি জড় করিয়া আনিতে আমাকে বেশি

কষ্ট পাইতে হইত না। বিদ্যাপতির দুর্বোধ্য বিকৃত মৈথিলী পদগুলি অস্পষ্ট বলিয়াই বেশি করিয়া আমার মনোযোগ টানিত। আমি টীকার উপর নির্ভর না করিয়া নিজে বুঝিবার চেষ্টা করিতাম। বিশেষ কোনো দুরূহ শব্দ যেখানে যতবার ব্যবহৃত হইয়াছে সমস্ত আমি একটি ছোট বাঁধানো খাতায় নোট করিয়া রাখিতাম। ব্যাকরণের বিশেষত্ব-গুলিও আমার বুদ্ধি-অনুসারে যথাসাধ্য টুকিয়া রাখিয়াছিলাম।" ("জীবনস্মৃতি," বিশ্বভারতী সং, ১২১ পৃঃ)

শৈশবেই এমন করিয়া বৈষ্ণব পদাবলী যিনি পড়িয়াছিলেন, উত্তর-জীবনের কাব্যে ভাবে ও ভাষায়, ছন্দে ও কল্পনায় বৈষ্ণব পদকর্তাদের স্পর্শ লাগিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? এ-পদগুলির মধ্যে কবি যে ছন্দ-স্বাচ্ছন্দ্য, কল্পনার যে মুক্তি, যে বিচিত্র চিত্রসৃষ্টি, যে নিবিড় ভাবোপলব্ধি লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার কিশোর কবিচিত্তকে মুগ্ধ করিয়াছিল; বৈষ্ণব-কবিতার ভাষার সহজ ললিতগতি এবং গীতি-মাধুর্যও তাঁহার কবিপ্রাণে নূতন প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল—উত্তর-জীবনে কখনও তিনি তাহা বিস্মৃত হন নাই, এবং লক্ষ্যে ও অলক্ষ্যে কবির সমগ্র কবিজীবনে এই বৈষ্ণব পদকর্তাদেব প্রভাব তাহার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। বস্তুত, একমাত্র কালিদাস ছাড়া ভারতবর্ষের প্রাচীন কবিদের মধ্যে এই বৈষ্ণব পদকর্তাদের মত আর কেহই রবীন্দ্রনাথের উপর এতটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্র-কাব্য যে একান্তই গীতধর্মী, একান্ত স্বতন্ত্র ও আত্মগত, তাহার মূলে এই বৈষ্ণব পদকর্তারা নাই, এ-কথা বলা অত্যন্ত কঠিন। যাহা হউক, উত্তর-কালে রবীন্দ্রনাথ "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী" সম্বন্ধে যে-মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত কঠোর, এবং বোধ হয়, অন্যায়ও বটে। ভানুসিংহ ছদ্মনাম, এবং এই ছদ্মনামে অনেকেই প্রতারিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কবি বলিতেছেন,

"ভানুসিংহ যিনিই হৌন্ তাঁহার লেখা যদি বর্তমানে আমার হাতে পড়িত আমি নিশ্চয়ই ঠকিতাম না এ কথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। উহার ভাষা প্রাচীন

পদকর্তার বলিয়া চালাইয়া দেওয়া অসম্ভব ছিল না। কারণ এ ভাষা তাঁহাদের মাতৃভাষা নহে, ইহা একটি কৃত্রিম ভাষা; ভিন্ন ভিন্ন কবির হাতে উহার কিছু না কিছু ভিন্নতা ঘটিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের ভাবের মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল না। ভানুসিংহের কবিতা একটু বাজাইয়া বা কষিয়া দেখিলেই তাহার মেকি বাহির হইয়া পড়ে। তাহাতে আমাদের দিশি নহবতের প্রাণ গলানো ঢালা সুর নাই, তাহা আজ কালকার সস্তা অর্গানের বিলাতি টুংটাং মাত্র।" ("জীবনস্মৃতি", বিশ্বভারতী সং, ১৪৫-৪৬ পৃঃ)

রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিদের ছন্দ, ভঙ্গি, কলাকৌশল ঠিকই আয়ত্ত করিয়াছিলেন; সেই দিক দিয়া ভানুসিংহের দ্বারা যাঁহারা প্রতারিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের খুব অপরাধী করা যায় না; বিষয়-নির্বাচনেও তিনি পদকর্তাদের সার্থক অনুকরণ করিয়াছিলেন; কৃষ্ণের আপাতনিষ্ঠুর লীলা, রাধার বিরহ-দুঃখ, অন্ধকার বৃষ্টিমুখরিত শ্রাবণ রজনী, তরঙ্গিত যমুনা, বাঁশির সুর, অভিসার, মিলন, কুঞ্জবন কিছুই বাদ পড়ে নাই; পরিবেশ-সৃষ্টির দিক হইতে কোনই ত্রুটি নাই। 'নিদ-মেঘপর স্বপন-বিজলি সম রাধা বিলসিত হাসি'—ষোল বৎসর বয়সের কবির হাতে এই ছবি ও উপমা সুন্দর, সন্দেহ কি? তাছাড়া, দু'চারটি পদ আছে যাহা যে-কোনও বয়সের কবির পক্ষে গৌরব করিবার মতন; 'শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা, নিশীথ যামিনীরে', 'মরণ রে, তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান' ইত্যাদি পদ ত 'বাজাইয়া কষিয়া' দেখিলেও মেকি বলিয়া ধরা পড়িবার সম্ভাবনা কম। তবে, বৈষ্ণব পদকর্তাদের একটা জিনিস রবীন্দ্রনাথ সে-বয়সে ধরিতে পারেন নাই, কারণ তাহা অনুকরণ করা যায় না। তাহা তাঁহাদের অনুভবঘন প্রত্যয়, তাঁহাদের ভাবের অকৃত্রিমতা। আমি বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন, তাঁহার এই বয়সের সমস্ত রচনাই ভাবহীন, বস্তুহীন, কল্পলোকের সৃষ্টি। "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী"ও তাহা হইতে বাদ পড়ে নাই। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ পদকর্তাদের

বহির্দিকটাই দেখিয়াছিলেন এবং সেই বহির্দিক তাঁহার মত প্রতিভার পক্ষে অনুকরণ করা কঠিন ছিল না ; কিন্তু তাঁহাদের অন্তর্লোকের মধ্যে তিনি তখনও প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারেন নাই। সেই জন্যই "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী" অন্য সকল দিক দিয়া সার্থক হইলেও কবিমনের সত্য পরিচয় ইহাতে নাই ; নিজের কবিমানস এখনও অনাবিষ্কৃত। ইহার অন্যথা কি করিয়া হইবে ? কবির কাব্য-রচনা এই বয়সে এখনও অনুকরণের পর্যায় অতিক্রম করিতে পারে নাই। কবি এখনও নিজের মধ্যে নিজ অবরুদ্ধ, বাহিরের স্পর্শ যতটুকু আসিয়া লাগিতেছে তাহাতে বাহিরকে জানিবার ও বুঝিবার, তাহার রহস্যের অন্তরে প্রবেশ করিবার আকাঙ্ক্ষা উদ্বুদ্ধ হইতেছে না, বরং নিজের মধ্যেই অবরুদ্ধ হইয়া আবর্তের সৃষ্টি করিতেছে ; এখনও হৃদয়-অরণ্যের মধ্যেই কবি ঘুরপাক খাইয়া ফিরিতেছেন।

এই অনুকরণের পর্যায় তিনি অতিক্রম করিলেন "সন্ধ্যা সংগীতে", যদিও অবরুদ্ধ অবস্থাটা সেখানে একেবারে কাটিয়া যায় নাই। "সন্ধ্যা সংগীতে"ই সর্বপ্রথম কবি অন্য কবিদের রচিত 'কবিতার শাসন হইতে চিরমুক্তি লাভ করিলেন,' তাঁহার 'মনের মধ্যে ফাঁকা একটা আনন্দের আবেগ আসিল'। এই যে অন্য কবিতার শাসন হইতে মুক্তি, এই মুক্তিই ক্রমশ তাঁহাকে মনের অবরুদ্ধ অবস্থা হইতে মুক্তির দিকে, হৃদয়-অরণ্য হইতে মুক্তির দিকে ঠেলিয়া লইয়া গেল। খানিকটা মুক্তিলাভ "সন্ধ্যা সংগীতে" ঘটিল বটে, কিন্তু যথার্থ মুক্তিলাভ ঘটিল "সন্ধ্যা সংগীত" অতিক্রম করিয়া "প্রভাত সংগীতে"। সেই জন্য মোহিতবাবু-সম্পাদিত রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীতে "সন্ধ্যা সংগীতে"র কবিতাগুলিতে যে 'হৃদয়-অরণ্য' পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল, তাহার যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না।

কারণ, "সন্ধ্যা সংগীতে"ও কবির ভাব ও কল্পনা অস্পষ্ট ও অপরিস্ফুট,

এখনও 'ভাবহীন বস্তুহীন' কল্পলোকের রাজত্বই চলিতেছে। দুঃখ-বিলাস এখনও কবিকে পরিত্যাগ করে নাই।

কিন্তু "সন্ধ্যা-সংগীতে"র ছন্দ ও প্রকাশভঙ্গি নূতন ; কবির পূর্ববর্তী কবিতাগুলি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। কাব্য-রচনার যে-রীতি ও সংস্কারের মধ্যে কবি এতকাল আবদ্ধ ছিলেন তাহা খসিয়া পড়িয়া গেল, এবং তিনি নিজস্ব রীতি ও কলা-কৌশলের সন্ধান পাইলেন। একটা স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতার মধ্যে তাঁহার কাব্য মুক্তি পাইল। রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষাতেই এই মুক্তির আবেগানন্দ সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে।

"* * * বাহিরের সঙ্গে যখন জীবনটার যোগ ছিল না, যখন নিজের হৃদয়েরই মধ্যে আবিষ্ট অবস্থায় ছিলাম, যখন কারণহীন আবেগ ও লক্ষ্যহীন আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আমার কল্পনা ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতেছিল তখনকার অনেক কবিতা নূতন গ্রন্থাবলীতে বর্জন করা হইয়াছে—কেবল সন্ধ্যা-সংগীতে প্রকাশিত কয়েকটি কবিতা [মোহিতবাবু-সম্পাদিত কাব্য-গ্রন্থাবলীর] হৃদয়-অরণ্য বিভাগে স্থান পাইয়াছে।

" * * * যখন আপন মনে একা ছিলাম তখন, জানি না কেমন করিয়া, কাব্য রচনার যে-সংস্কারের মধ্যে বেষ্টিত ছিলাম সেটা খসিয়া গেল। আমার সঙ্গীরা যে সব কবিতা ভালাবাসিতেন ও তাঁহাদের নিকট খ্যাতি পাইবার ইচ্ছায় মন স্বভাবতই যে সব কবিতার ছাঁচে লিখিবার চেষ্টা করিত, বোধ করি, তাঁহারা দূরে যাইতেই আপনা আপনি সেই সকল কবিতার শাসন হইতে আমার চিত্ত মুক্তি লাভ করিল।

" * * * দুটো একটা কবিতা লিখিতেই মনের মধ্যে ভারি একটা আনন্দের আবেগ আসিল। আমার সমস্ত অন্তঃকরণ বলিয়া উঠিল—বাঁচিয়া গেলাম। যাহা লিখিতেছি এ দেখিতেছি সম্পূর্ণ আমারই।

" * * * এই সংকীর্ণতার প্রথম আনন্দের বেগে ছন্দোবন্ধকে আমি একেবারেই খাতির করা ছাড়িয়া দিলাম। নদী যেমন একটা খালের মতো সিধা চলে না—আমার ছন্দ তেমনি আঁকিয়া বাঁকিয়া নানামূর্তি ধারণ করিয়া চলিতে লাগিল। আগে হইলে এটাকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করিতাম কিন্তু এখন লেশমাত্র সংকোচ বোধ হইল না।

"বিহারী চক্রবর্তী মহাশয় তাঁহার বঙ্গসুন্দরী কাব্যে যে-ছন্দ প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা তিনমাত্রা মূলক * * *। তিনমাত্রা জিনিসটা দুইমাত্রার মতো চৌকা নহে,

তাহা গোলার মতো গোল, এইজন্য তাহা দ্রুতবেগে গড়াইয়া চলিয়া যায়, তাহার এই বেগবান গতির নৃত্য যেন ঘন ঘন ঝংকারে নূপুর বাজাইতে থাকে। একদা এই ছন্দটাই আমি বেশি করিয়া ব্যবহার করিতাম। * * * সন্ধ্যা-সংগীতে আমি ইচ্ছা করিয়া নহে কিন্তু স্বভাবতই এই বন্ধন ছেদন করিলাম।

"* * * কোনো প্রকার পূর্ব সংস্কারকে খাতির না করিয়া এমনি করিয়া লিখিয়া যাওয়াতে যে-জোর পাইলাম তাহাতেই প্রথম এই আবিষ্কার করিলাম যে যাহা আমার সকলের চেয়ে কাছে পড়িয়াছিল তাহাকেই আমি দূরে সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছি। * * * হঠাৎ স্বপ্ন হইতে জাগিয়াই যেন দেখিলাম আমার হাতে শৃঙ্খল পরান নাই।

"* * * কাব্য-হিসাবে সন্ধ্যা-সংগীতের মূল্য বেশি না হইতে পারে। উহার কবিতাগুলি যথেষ্ট কাঁচা। উহার ছন্দ, ভাষা, ভাব, মূর্তি ধরিয়া, পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারে নাই। উহার গুণের মধ্যে এই যে, আমি হঠাৎ একদিন আপনার ভরসায় যা খুশি তাই লিখিয়া গিয়াছি। সুতরাং সে-লেখাটার মূল্য না থাকিতে পারে, কিন্তু খুশিটার মূল্য আছে।" ("জীবনস্মৃতি" বিশ্বভারতী সং, ২০৮-১২ পৃঃ)

যাহা হউক, এইটুকু বোঝা গেল, ছন্দের দিক হইতে, বহিরঙ্গের দিক হইতে "সন্ধ্যা-সংগীতে"ই কবির চিত্ত পূর্বসংস্কার হইতে মুক্তি পাইল, কবি নিজেকে নিজে আবিষ্কার করিলেন, কিন্তু হৃদয়-অরণ্য হইতে মুক্তিলাভ এখনও ঘটিল না। "সন্ধ্যা-সংগীতে"র কবিতাগুলি পাঠ করিলেই দেখা যাইবে, কবির সমস্ত চিত্ত ব্যথাভারাক্রান্ত, অজানা দুঃখভারে পীড়িত। কবিতাগুলির নামই তাহার প্রমাণ—'তারকার আত্মহত্যা,' 'আশার নৈরাশ্য', 'পরিত্যক্ত,' 'সুখের বিলাপ', 'দুঃখ আবাহন,' 'অসহ্য ভালোবাসা', 'হলাহল', 'পরাজয় সংগীত' ইত্যাদি। 'সন্ধ্যা' কবিতায়—

> ব্যথা বড়ো বাজিয়াছে প্রাণে
> সন্ধ্যা তুই ধীরে ধীরে আয়।
> কাছে আয়—আরো কাছে আয়—
> সঙ্গীহারা হৃদয় আমার
> তোর বুকে লুকাইতে চায়।

অথবা 'আশার নৈরাশ্য' কবিতায়—

বলো, আশা, বসি মোর চিতে,
'আরো দুঃখ হইবে বহিতে,
হৃদয়ের যে-প্রদেশ হয়েছিল ভগ্নশেষ
আর যারে হত না সহিতে
আবার নূতন প্রাণ পেয়ে
সেও পুন থাকিবে দহিতে।'

অথবা 'পরিত্যক্ত' কবিতায়—

চলে গেল সকলেই চলে গেল গো
বুক শুধু ভেঙে গেল দলে গেল গো।

অথবা 'দুঃখ আবাহন' কবিতায়—

আয়, দুঃখ, আয় তুই
তোর তরে পেতেছি আসন,
হৃদয়ের প্রতি শিরা টানি টানি উপাড়িয়া
বিচ্ছিন্ন শিরার মুখে তৃষিত অধর দিয়া
বিন্দু বিন্দু রক্ত তুই করিস শোষণ;
জননীর স্নেহে তোরে করিব পোষণ
হৃদয়ে আয়রে তুই হৃদয়ের ধন।

যে দুঃখ-বিলাসের সুর ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাই "সন্ধ্যা-সংগীতে"র সমস্ত কবিতার সুর; কিন্তু ইহাকে শুধু দুঃখ-বিলাসই বা কি করিয়া বলি? অস্পষ্টতার একটা বেদনা আছে; অপরিস্ফুট আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতি মনের মধ্যে ব্যাথার আবর্ত ঘোলাইয়া তোলে। ইহা শুধু বিলাস মাত্র নয়; ইহা মনের একটা বিশেষ অবস্থায় সত্য, এবং সেই হেতু ইহার মূল্যও আছে। "সন্ধ্যা-সংগীতে"র

"* * * মূল নাই বলিলে ঠিক বলা হয় না, তবে কিনা মূল্য নাই বলিয়া তর্ক করা চলিতে পারে। কিন্তু একেবারে নাই বলিলে কি অত্যুক্তি হইবে না? কেন না কাব্যের ভিতর দিয়া মানুষ আপনার হৃদয়কে ভাষায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে; সেই হৃদয়ের কোনো অবস্থার পরিচয় যদি কোনো লেখায় ব্যক্ত হয় তবে মানুষ তাহাকে কুড়াইয়া রাখিয়া দেয়—ব্যক্ত যদি না হয় তবেই তাহাকে ফেলিয়া দিয়া থাকে। অতএব হৃদয়ের অব্যক্ত আকূতিকে ব্যক্ত করায় পাপ নাই—যত অপরাধ ব্যক্ত করিতে না পারার দিকে। মানুষের মধ্যে একটি দ্বৈত আছে। বাহিরের ঘটনা, বাহিরের জীবনের সমস্ত চিন্তা ও আবেগের গভীর অন্তরালে যে-মানুষটা বসিয়া আছে, তাহাকে ভালো ক'রয়া চিনি না ও ভুলিয়া থাকি, কিন্তু জীবনের মধ্যে তাহার সত্তাকে তো লোপ করিতে পারি না। বাহিরের সঙ্গে তাহার অন্তরের সুর যখন মেলে না—সামঞ্জস্য যখন সুন্দর ও সম্পূর্ণ হইয়া উঠে না তখন সেই অন্তরনিবাসীর পীড়ায় বেদনায় মানস প্রকৃতি ব্যথিত হইতে থাকে। এই বেদনাকে কোনো বিশেষ নাম দিতে পারি না—ইহার বর্ণনা নাই—এই জন্য ইহার যে রোদনের ভাষা তাহা স্পষ্ট ভাষা নহে—তাহার মধ্যে অর্থবদ্ধ কথার চেয়ে অর্থহীন সুরের অংশই বেশি। সন্ধ্যা-সংগীতে যে-বিষাদ ও বেদনা ব্যক্ত হইতে চাহিয়াছে তাহার মূল সত্যটি সেই অন্তরের রহস্যের মধ্যে। * * *"

যাহাই হউক, "সন্ধ্যা-সংগীতে"র শেষের কয়েকটি কবিতায় দেখা যাইতেছে, মনের এই অবস্থার সঙ্গে কবিচিত্তের একটা সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। কবি এই ব্যথা-ভারাক্রান্ত জীবন হইতে মুক্ত হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। 'দুঃখের কঠোরতা' মাঝে মাঝে ঘুচিতেছে, মাঝে মাঝে মন শান্ত হইতেছে; বিহঙ্গের গান, তটিনীর কথা, 'বসন্তের কুসুমের মেলা' মাঝে মাঝে ভাল লাগিতেছে, অবরুদ্ধ অবস্থা হইতে মন মাঝে মাঝে মুক্ত হইয়া বাহিরের জগতের স্পর্শ লাভ করিতেছে, কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে সব ঢাকিয়া যাইতেছে। এই দুঃখময়ীকে আর তিনি চাহেন না,

এই অস্পষ্টতা অপরিস্ফুটতার বেদনায় ভারাক্রান্ত দিনগুলি আর তাঁহার ভাল লাগে না; তিনি এইবার বহির্জগতের স্পর্শলাভের জন্য ব্যগ্র। দুঃখময়ীকে তিনি বিদায় দিতে চাহিতেছেন,—

যাও মোরে যাও ছেড়ে, নিও না—নিও না কেড়ে
নিও না নিও না মন মোর;
সখাদের কাছ হতে ছিনিয়া নিও না মোরে,
ছিঁড়ো না এ প্রাণের ডোর।
আবার হারাই যদি এই গিরি, এই নদী,
মেঘ বায়ু কানন নির্ঝর,
আবার স্বপন ছুটে একেবারে যায় টুটে,
এ আমার গোধূলির ঘর,
আবার আশ্রয় হারা ঘুরে ঘুরে হই সারা
ঝটিকার মেঘ খণ্ড সম,
দুঃখের বিদ্যুৎফণা ভীষণ ভুজঙ্গ এক
পোষণ করিয়া বক্ষে মম—
তা হলে এ জনমে নিরাশ্রয় এ জীবনে
ভাঙা ঘর আর গড়িবে না
ভাঙা হৃদি আর জুড়িবে না।

বারবার কবি প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, আর এই দুঃখময়ীর কাছে পরাজয় তিনি স্বীকার করিবেন না, বারবার তাঁহার প্রতিজ্ঞা টুটিতেছে। তবু প্রাণপণ প্রয়াস করিয়া বাঁচিতেই হইবে, এইবার ফিরিয়া জগতের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইতেই হইবে। কবি নিজেকেই নিজে বলিতেছেন,—

জাগ্, জাগ্, জাগ্, ওরে গ্রাসিতে এসেছে তোরে
নিদারুণ শূন্যতার ছায়া
আকাশ-গরাসী তার কায়া।
গেল তোর চন্দ্র সূর্য, গেল তোর গ্রহ তারা,
গেল তোর আত্ম আর পর,
এই বেলা প্রাণপণ কর!
এই বেলা ফিরে দাঁড়া তুই,
স্রোতোমুখে ভাসিসনে আর
যাহা পাস আঁকড়িয়া ধর
সম্মুখে অসীম পারাবার। ("সন্ধ্যা-সংগীত")

'সংগ্রাম সংগীত' কবিতায় এই ভাব আরও প্রবল হইয়াছে, সংগ্রামের সংকল্প জাগিয়াছে মনে।*

হৃদয়ের সাথে আজি
করিব রে করিব সংগ্রাম।
এতদিন কিছু না করিনু
এত দিন বসে রহিলাম
আজি এই হৃদয়ের সাথে
একবার করিব সংগ্রাম। ("সন্ধ্যা-সংগীত")

এই সংগ্রামে কবির চিত্ত মথিত হইল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কবি জয়ী হইলেন। তাহার সংবাদ পাওয়া গেল "প্রভাত-সংগীতে"।

* "সেই সময়কার একটি গদ্যেও এই ভাবের আভাস পাই। প্রবন্ধটির না[ম] আত্মসংসর্গ।" (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, "রবীন্দ্র-জীবনী" বিশ্বভারতী, ১ম খণ্ড, ১২৪ পৃঃ)

সূচনাটা আরম্ভ হইল "সন্ধ্যা-সংগীতে"র শেষের দিক হইতেই—হৃদয়ের সঙ্গে সংগ্রাম যখন আরম্ভ হইল, তখনই সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়িয়া গেল, একটা নূতন চিত্তজগতের প্রথম অরুণোদয় দেখা দিতেছে। "প্রভাত-সংগীতে"র প্রথম কবিতা 'আবাহন সংগীত'; এই কবিতাটির প্রথম দিকে "সন্ধ্যা-সংগীতে"র সুর ধ্বনিত হইতেছে,—

নিজের নিশ্বাসে কুয়াশা ঘনায়ে
ঢেকেছে নিজের কায়া,
পথ আঁধারিয়া পড়েছে সম্মুখে
নিজের দেহের ছায়া

* * *

মুখেতে রয়েছে আঁধার পুঁজিয়া
নয়নে জ্বলিছে বিষ
সাপের মতন কুটিল হাসিটি
লুকানো তাহার বিষ। ("প্রভাত-সংগীত")

কিন্তু শেষের দিকে কবি এক নূতন জগতের আহ্বান শুনিতে পাইতেছেন, বিশ্বজীবন তাঁহাকে ডাক দিতেছে,—

ওরে শোন ওই ডাকিছে সবাই
বাহির হইয়া আয়। ("প্রভাত-সংগীত")

প্রথমবার বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া "একটি একটি করিয়া সন্ধ্যা-সংগীত লিখিতেছি, এমন সময় আমার মনের মধ্যে হঠাৎ একটা কী উলট-পালট হইয়া গেল।" এই উলট-পালটটাই "সন্ধ্যা-সংগীত" ও তাহার পূর্ববর্তী কবিজীবন হইতে "প্রভাত-সংগীত" ও তাহার

পরবর্তী কবিজীবনের যে সুগভীর পার্থক্য তাহার কারণ; তবে এই উলট-পালট 'হঠাৎ' হয় নাই, একদিনে হয় নাই। আমি এই একটু আগেই বলিতে চেষ্টা করিয়াছি, মনের অবরুদ্ধ অবস্থা হইতে মুক্ত হইবার একটা প্রবল প্রয়াস "সন্ধ্যা-সংগীতে"র শেষের দিকেই আরম্ভ হইয়াছে, এবং একটির পর একটি কবিতায় চিত্তের এই সংগ্রাম অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। 'কোথা গো প্রভাত রবি-কর' বলিয়া "সন্ধ্যা-সংগীতে"র শেষের দিকে একটা ক্রন্দন 'আমি-হারা' কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে, অন্যান্য কবিতায়ও আছে; ইহার অর্থ এই যে, প্রভাতের রবির কর একদিন প্রাণে আসিয়া প্রবেশ করিবে, কবি তাহার জন্য ব্যাকুল হইতেছেন—তারপর সেই দিনটি সত্যই আসিল, সে আনন্দের আবেগ কবি কিছুতেই আর নিজের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না, চমকিত হইয়া গাহিয়া উঠিলেন

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর। ("প্রভাত-সংগীত")

"প্রভাত-সংগীতে"র (১২৮৯—৯০) দ্বিতীয় কবিতা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'; এই কবিতাটিতেই "প্রভাত-সংগীতে"র কবিজীবনের মূল সুরটি ধ্বনিত হইয়াছে। মোহিতবাবু-সম্পাদিত কাব্য-গ্রন্থাবলীতে এই কবিতাটিকে যে 'নিষ্ক্রমণ' বিভাগে স্থান দেওয়া হইয়াছে, তাহার ইঙ্গিত সার্থক। "সন্ধ্যা-সংগীতে"র হৃদয়-অরণ্য হইতে কবির নিষ্ক্রমণ লাভ যে ঘটিল তাহার পরিচয় আমরা পাইলাম 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায়। রবীন্দ্র-কাব্যে এমন কতকগুলি বিশেষ কবিতা আছে যাহা বিশেষভাবে কবিজীবনের এক একটি নূতন অধ্যায়ের সূচক; 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' তেমন একটি কবিতা। মনের কোন্ অবস্থা হইতে এই কবিতাটির এবং "প্রভাত-সংগীতে"র অন্যান্য কবিতার সৃষ্টি হইল তাহা কবি নিজেই অতি সুন্দর করিয়া বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

"একদিন জোড়াসাঁকোর বাড়ির ছাদের উপর অপরাহ্ণের শেষে বেড়াইতেছিলাম। দিবাবসানের ম্লানিমার উপরে সূর্যাস্তের আভাটি জড়িত হইয়া সেদিনকার আসন্ন সন্ধ্যা আমার কাছে বিশেষভাবে মনোহর হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। পাশের বাড়ির দেওয়ালগুলি পর্যন্ত আমার কাছে সুন্দর হইয়া উঠিল। আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, পরিচিত জগতের উপর হইতে এই যে তুচ্ছতার আবরণ একেবারে উঠিয়া গেল একি কেবল সায়াহ্নের আলোক-সম্পাতের একটি যাদুমাত্র? কখনই তাহা নয়। আমি বেশ দেখিতে পাইলাম ইহার আসল কারণটি এই যে, সন্ধ্যা আমারই মধ্যে আসিয়াছে—আমিই ঢাকা পড়িয়াছি। দিনের আলোতে আমিই যখন অত্যন্ত উগ্র হইয়া ছিলাম তখন যাহা কিছুতে দেখিতে, শুনিতেছিলাম সমস্তকে আমিই জড়িত করিয়া আবৃত করিয়াছি। এখন সেই আমিই সরিয়া আসিয়াছি বলিয়াই জগৎকে তাহার নিজের স্বরূপে দেখিতেছি। * * * এমন সময় আমার জীবনের একটা অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম তাহা আজ পর্যান্ত ভুলিতে পারি নাই। সদর ষ্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধ করি ফ্রী স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেই দিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ একমুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দ এবং সৌন্দর্য সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেইদিন 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া চলিল। লেখা শেষ হইয়া গেল কিন্তু জগতের সেই আনন্দরূপের উপর তখনো যবনিকা পড়িয়া গেল না। এমনি হইল আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না। * * * আমি বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিতাম, রাস্তা দিয়া মুটে মজুর যে কেহ চলিত তাহাদের গতিভঙ্গি, শরীরের গঠন, তাহাদের মুখশ্রী আমার কাছে ভারি আশ্চর্য বলিয়া বোধ হইত; সকলেই যেন নিখিল-সমুদ্রের উপর দিয়া তরঙ্গলীলার মতো বহিয়া চলিয়াছে। শিশুকাল হইতে কেবল চোখ দিয়া দেখাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ যেন একেবারে সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম। * * *

"সামান্য কিছু কাজ করিবার সময়ে মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যে গতিবৈচিত্র্য প্রকাশিত হয় তাহা আগে কখনো লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই—এমন মুহূর্তে সমস্ত মানবদেহের চলনের সংগীত আমাকে মুগ্ধ করিল। এ সমস্তকে আমি স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতাম না, একটি সমষ্টিকে দেখিতাম। * * * এই সময়ে যে লিখিয়াছিলাম—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি,
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি,—

ইহা কবিকল্পনার অত্যুক্তি নহে। বস্তুত যাহা অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি আমার ছিল না।

"আরো কিছু অধিক বয়সে, প্রভাত-সংগীত সম্বন্ধে একটা পত্র লিখিয়াছিলাম, সেটার এক অংশ এখানে উদ্ধৃত করি।—

" 'জগতে কেহ নাই সবাই প্রাণে মোর'—ও একটা বয়সের বিশেষ অবস্থা। যখন হৃদয়টা সর্বপ্রথম জাগ্রত হয়ে দুই বাহু বাড়িয়ে দেয় তখন মনে করে সে যেন সমস্ত জগৎটাকে চায়। * * * ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারা যায় মনটা যথার্থ কি চায় এবং কি চায় না। তখন সেই পরিব্যাপ্ত হৃদয়-বাষ্প সংকীর্ণ সীমা অবলম্বন করে জ্বলতে এবং জ্বালাতে আরম্ভ করে। একেবারে সমস্ত জগৎটা দাবি করে বসলে কিছুই পাওয়া যায় না, অবশেষে একটা কোন কিছুর মধ্যে সমস্ত প্রাণমন দিয়ে নিবিষ্ট হতে পারলে তবেই অসীমের মধ্যে প্রবেশের সিংহদ্বারটি পাওয়া যায়। প্রভাত-সংগীতে আমার অন্তর প্রকৃতির প্রথম বহির্মুখ উচ্ছ্বাস, সেইজন্যে ওটাতে আর কোন কিছুর বাছবিচার নেই।" ("জীবনস্মৃতি", বিশ্বভারতী সং, ২২৬-৩৬ পৃঃ)

এই নূতন অভিজ্ঞতা হইতে "প্রভাত-সংগীতের" সৃষ্টি। স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে, হৃদয়-অরণ্যের অন্ধকার হইতে, কৈশোরের একান্ত আত্মকেন্দ্রিক ভাববিলাস হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কবি বস্তুময় ভাবময় সত্য ও সার্থক বিশ্বজীবনের আনন্দানুভূতির জগতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। উত্তর-কালে তাহার কবিমানস যে বিপুল জগতের রস ও রহস্যের মধ্যে স্বেচ্ছাবিহার করিবে সে-জগতের সিংহদ্বার তিনি অতিক্রম করিলেন। "প্রভাত-সংগীতে"র কবিতাগুলি বিচিত্র বিপুল সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ

ভবিষ্যৎ তাঁহার সম্মুখে প্রসারিত করিল, সবেগে সবলে অতীত জীবনের সমস্ত কুজ্‌ঝটিকা ছিন্ন-ভিন্ন দীর্ণ কীর্ণ করিয়া। প্রথম যৌবনের মুক্তির আবেগ হইতে উত্থিত এই কবিতাগুলিতে অত্যুক্তি যথেষ্ট, মানসিক স্বাস্থ্যের উদ্দামতা সুস্পষ্ট, নবদীক্ষার উচ্ছ্বাস প্রত্যক্ষ; সেই হিসাবে কবিতাগুলি কাব্য-হিসাবে কতকটা দুর্বল। কবি এখনও প্রকৃত স্রষ্টা হইয়া উঠেন নাই; সৃষ্টির আবেগ শুধু তাহার মনে জাগিয়াছে বিপুল একটি কবিপ্রাণ প্রথম আলোর স্পর্শে শুধু উদ্বেলিত হইয়াছে মাত্র, সত্য স্থির গাম্ভীর্য লাভ করিতে পারে নাই।

'আহ্বান সংগীত' কবিতাটিতে এই নূতন অভিজ্ঞতার প্রথম সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়। অতীতের দুঃখভারাক্রান্ত কুয়াশাচ্ছন্ন জীবন একান্ত মিথ্যা, এই বোধ তাহার মনে জাগিয়াছে; কবিকে কে যেন বলিতেছে,

> আর কতদিন কাটিবে এমন
> সময় যে চলে যায়!
> ওই শোন্ ওই ডাকিছে সবাই
> বাহির হইয়া আয়!

তারপর একদিন নির্ঝরের 'স্বপ্নভঙ্গ' হইয়া গেল। সেদিন কবি নিজেকে আর সংবরণ করিতে পারিলেন না, কোনই 'বাছবিচার' আর রহিল না। শুধু কথায়ই যে তাহা প্রকাশ পাইল, তাহা নয়, কবিতার ছন্দেও তাহা ফুটিয়া উঠিল, যেমন উদ্দাম উচ্ছ্বসিত বল্‌গাবিহীন আবেগ, যেমন বর্ণ ও বর্ণনার আতিশয্য, তেমনই উদ্দাম উচ্ছ্বসিত ছন্দ।

> আজি এ প্রভাতে রবির কর
> কেমনে পশিল প্রাণের পর,
> কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
> প্রভাত-পাখির গান

না জানি কেন রে এত দিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ।
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বেদনা প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি।

সহসা আজি এ জগতের মুখ
নূতন করিয়া দেখিনু কেন?
একটি পাখির আধখানি তান
জগতের গান গাহিল যেন।

* * *

আমি ঢালিব করুণাধারা,
আমি ভাঙিব পাষাণকারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগলপারা।

('নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', "প্রভাত সংগীত")

তারপর 'প্রভাত-উৎসব', 'অনন্ত জীবন,' 'অনন্ত মরণ,' 'পুনর্মিলন,' 'প্রতিধ্বনি,' মহাস্বপ্ন', 'সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়' প্রভৃতি কবিতায় এই কথাটাই বিচিত্র ভঙ্গিতে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি কবিতায় (যেমন 'অনন্ত জীবন', 'অনন্ত মরণ,' 'প্রতিধ্বনি', 'সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়') কবির একটি নূতন দিক আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—তাহা তাঁহার সুগভীর বিজ্ঞান-বোধ। বর্তমান জড়বিজ্ঞানের সঙ্গে পুরাণ গল্পের একটা অপূর্ব সামঞ্জস্যের মধ্যে কবির প্রাণ একটা আশ্রয় সৃষ্টি করিয়াছে; সৃষ্টি ও জীবন-রহস্য সম্বন্ধেও একটা সুগভীর দৃষ্টি এই কবিতা কয়টির ভিতর সুস্পষ্ট। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে, কবি যে নিজেকে নিজে

খুঁজিয়া পাইয়াছেন, নিজের বোধ যে জাগিয়াছে, একটা নূতন জগতে যে তিনি জাগিয়াছেন সেই কথাটাই এই কবিতাগুলির মধ্যে বিশেষ-ভাবে ধরা পড়ে। কবি যে বলিতেছেন, বিশ্বজগতের খণ্ড খণ্ড দৃশ্যকে, বস্তুকে 'আমি স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতাম না, একটা সমষ্টিকে দেখিতাম', সেই কথাটাই এই কবিতাগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট। 'পুনর্মিলন' কবিতাটি অতীতের স্মৃতি বিজড়িত, সেই স্মৃতির সঙ্গে বর্তমান জীবনের যোগ তিনি সন্ধান করিতেছেন। একদিন প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার বিচ্ছেদ হইয়াছিল, তাঁহার হৃদয় নামক এক বিশাল অরণ্যে তিনি নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন; "প্রভাত-সংগীতে" আসিয়া আবার প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার পুনর্মিলন হইয়াছে—এই কথাটিই তিনি বলিতে চাহিয়াছেন। ত্রিশ বৎসর পর "জীবন-স্মৃতি"তেও তাহার পুনরুক্তি করিয়াছেন।

"আমার শিশুকালেই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমার খুব একটি সহজ ও নিবিড় যোগ ছিল। বাড়ির ভিতরে নারিকেল গাছগুলি প্রত্যেকে আমার কাছে অত্যন্ত সত্য হইয়া দেখা দিত। * * * তাহার পর একদিন যখন যৌবনের প্রথম উন্মেষে হৃদয় আপনার খোরাকের দাবি করিতে লাগিল, তখন বাহিরের জীবনের সহজ যোগটি বাধাগ্রস্ত হইয়া গেল। তখন ব্যথিত হৃদয়টাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নিজের মধ্যেই নিজের আবর্তন শুরু হইল—চেতনা তখন আমাদের ভিতরের দিকেই আবদ্ধ হইয়া রহিল। * * অবশেষে একদিন সেই রুদ্ধদ্বার জানিনা কোন্ ধাকায় হঠাৎ ভাঙিয়া গেল, তখন যাহাকে হারাইয়াছিলাম, তাহাকে পাইলাম। শুধু পাইলাম তাহা নহে, বিচ্ছেদের ব্যবধানের ভিতর দিয়া তাহার পূর্ণতার পরিচয় পাইলাম। * * এইজন্য আমার শিশুকালের বিশ্বকে প্রভাত-সংগীতে যখন আবার পাইলাম, তখন তাহাকে অনেক বেশি পাওয়া গেল।......" ("জীবন-স্মৃতি," বিশ্বভারতী. ২৩৬-৩৮ পৃঃ)

'প্রতিধ্বনি' কবিতাটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই "জীবনস্মৃতিতে সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন ("জীবনস্মৃতি," বিশ্বভারতী, ২৩১—৩৫ পৃঃ)। অতিরিক্ত বলিবার কিছুই নাই।

আসল কথা এই যে চিত্তের ভিতর কতকগুলি নূতন ভাব তাহাদের সমস্ত নূতন আবেগ লইয়া উপস্থিত, কিন্তু যে ভাষা ও ছন্দের সাহায্যে নিয়ম সংযমের ভিতর তাহাদের বাঁধিয়া একটা সার্থক রূপ দিতে পারা যায় তাঁহা এখনও কবির আয়ত্ত হয় নাই। এক কথায় ভাব রসমূর্তি পরিগ্রহ করে নাই; কাজেই "প্রভাত-সংগীতে"র রচনা অপরিস্ফুট; মনন-ক্রিয়ার কিছু কিছু পরিচয় কোনও কোনও কবিতায় আছে, কিন্তু তাহা অপরিণত; সুতরাং ভাব যাহাই হউক কাব্য হিসাবে তাহাদের মূল্য খুব বেশি নয়। বস্তুত, কবি নিজেই বলিয়াছেন, "কড়ি ও কোমলে"র পূর্বে কাব্যের ভাষা তাঁহার কাছে ধরা দেয় নাই।

যাহাই হউক, "প্রভাত-সংগীতে" একটা পর্ব শেষ হইয়া গেল। শৈশব হইতে যে হৃদয়ারণ্যের মধ্যে কবি নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহা হইতে তাঁহার নিষ্ক্রমণ লাভ ঘটিল; বাহিরের বিচিত্র এই বিশ্বজগতের অর্গল তাঁহার নিকট মুক্ত হইল, এবং প্রথমটায় সদ্য মুক্তির আনন্দ উচ্ছ্বাসাতিশয্যের ভিতর দিয়া নিজেকে যেন কতকটা অতিমাত্রায় ব্যক্ত করিয়া ফেলিল। এখন হইতে কবিজীবনের নূতন পালা, নূতন পর্যায় আরম্ভ হইবে; একটির পর একটি করিয়া কবি নিজের সৃষ্টিকে নিজেই বারংবার অতিক্রম করিয়া যাইবেন। সত্য ও সার্থক কবিজীবন এখন হইতেই আরম্ভ হইবে, এবং এক এক নূতন ভাবপর্যায়ের ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবি-মানসকে স্ফুট হইতে স্ফুটতর করিবেন।

(৩)

ছবি ও গান (১২৯০)
কড়ি ও কোমল (১২৯৩)
মানসী (১২৯৭)
চিত্রাঙ্গদা (১২৯৯)

যে বৃহত্তর বিশ্বজীবনের সিংহদ্বারের প্রবেশমুখে "প্রভাত-সংগীত" রচিত হইয়াছিল, সেই বিশ্বজীবনের সঙ্গে কবিমানসের নিবিড়তর পরিচয় ধীরে ধীরে শুরু হইল "ছবি ও গান" হইতে। ইহার কিছু দিন আগে কারোয়ারের সমুদ্রতীরে আসিয়া কবি "প্রকৃতির প্রতিশোধ" নামে একটি কাব্য-নাটিকা রচনা করিয়াছেন। এই নাটিকাটি কথার তুলিতে আঁকা ছবি ছাড়া আর কিছুই নয়; টুকরা টুকরা ছবি যেন একটি মালায় গাঁথিয়া তোলা হইয়াছে। "ছবি ও গান"ও ঠিক এই কথার রেখায় টানা ছবি। এই রচনাগুলিও আরম্ভ হইয়াছিল কারোয়ারের সমুদ্রতীরেই; সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া

"চৌরংগীর নিকটবর্তী সারকুলার রোডের একটি বাগান বাড়িতে আমরা তখন বাস করিতাম। তাহার দক্ষিণের দিকে মস্ত একটা বসতি ছিল। আমি অনেক সময়েই দোতালার জানালার কাছে বসিয়া সেই লোকালয়ের দৃশ্য দেখিতাম। তাহাদের সমস্ত দিনের নানাপ্রকার কাজ, বিশ্রাম, খেলা ও আনাগোনা দেখিতে আমার বড় ভালো লাগিত, সে যেন আমার কাছে বিচিত্র গল্পের মতো মনে হইত।

"নানা জিনিসকে দেখিবার যে দৃষ্টি সেই দৃষ্টি যেন আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তখন একটি একটি যেন স্বতন্ত্র ছবিকে কল্পনার আলোকে ও মনের আনন্দ দিয়া ঘিরিয়া লইয়া দেখিতাম। এক-একটি বিশেষ দৃশ্য এক-একটি বিশেষ রসে রঙে নির্দিষ্ট হইয়া আমার চোখে পড়িত। এমনি করিয়া নিজের মনের কল্পনা পরিবেষ্টিত ছবিগুলি গড়িয়া তুলিতে ভারি ভালো লাগিত। সে আর কিছু না, এক একটি পরিস্ফুট চিত্র আঁকিয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা।

"* * * নিতান্ত সামান্য জিনিসকেও বিশেষ করিয়া দেখিবার একটা পালা এই "ছবি ও গান":এ আরম্ভ হইয়াছে। গানের সুর যেমন সাদা কথাকেও গভীর করিয়া তোলে, তেমনি কোন একটা সামান্য উপলক্ষ লইয়া সেইটিকে হৃদয়ের মধ্যে বসাইয়া তাহার তুচ্ছতা মোচন করিবার ইচ্ছা "ছবি ও গান"এ ফুটিয়াছে। না, ঠিক তাহা নহে। নিজের মনের তারটা যখন সুরে বাঁধা থাকে তখনই বিশ্ব-সংগীতের ঝংকার সকল জায়গা হইতে উঠিয়াই তাহাতে অনুরণন তোলে। সেইদিন লেখকের চিত্তযন্ত্রে একটা

সুর জাগিতেছিল বলিয়াই বাহিরের কিছু তুচ্ছ ছিল না। * * *" ("জীবনস্মৃতি", বিশ্বভারতী সং, ২৫১—২৫৩ পৃঃ)

"ছবি ও গানে"র অধিকাংশ কবিতা বাহিরে যাহা কিছু কবি দেখিতেছেন তাহাকে কথার রেখায় ধরিয়া এক একটি চিত্র রচনার চেষ্টা, কবির নবজাগ্রত চৈতন্যের প্রথম চিত্রলিপি। শুধু দৃষ্টিভঙ্গিমার নূতনত্বে নয়, ছন্দকৌশলের দিক হইতেও কবি নূতন ক্ষমতা অর্জন করিয়াছেন; একটা স্বতঃউচ্ছ্বসিত আনন্দও কবিতাগুলির মধ্যে সুপরিস্ফুট। উনত্রিশ বৎসর বয়সে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট একটি পত্রে কবি "ছবি ও গান" সম্বন্ধে লিখিতেছেন,—

"* * * আমার "ছবি ও গান" আমি যে কি মাতাল হয়ে লিখেছিলুম, তোমার চিঠি পড়ে বোঝা গেল তুমি সেটি সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছ, এবং মনের মধ্যে হয়ত অনুভব করেছ। আমি তখন দিনরাত পাগল হয়ে ছিলুম। * * * আমার সমস্ত শরীরে মনে নব যৌবন যেন একেবারে হঠাৎ বন্যার মত এসে পড়েছিল। * * * কেবলি একটা সৌন্দর্যের পুলক, তার মধ্যে পরিমাণ কিছু ছিল না। * * * সত্যি কথা বলতে কি, সেই নবযৌবনের নেশা এখনও আমার হৃদয়ের মধ্যে লেগে রয়েছে। "ছবি ও গান" পড়তে পড়তে আমার মন যেন চঞ্চল হয়ে উঠে, এমন আমার কোনো পুরানো লেখায় হয় না। * * *" (৮ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৭। ২১ মে ১৮৯০; সবুজপত্র, ১৩২৪, শ্রাবণ, ২৩৬—৩৯ পৃঃ)

জীবন-সায়াহ্নে কবি "ছবি ও গান" সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য জ্ঞাপন করিয়া গিয়াছেন; এ-মন্তব্যের সঙ্গে পাঠকের দ্বিমতের কোন কারণ নাই।

"এটা বয়ঃসন্ধিকালের লেখা, শৈশব যৌবন যখন সবে মিলেছে। ভাষায় আছে ছেলেমানুষি, ভাবে এসেছে কৈশোর। তার পূর্বেকার অবস্থায় একটা বেদনা ছিল অনির্দিষ্ট, সে যেন প্রলাপ বকে আপনাকে শান্ত করতে চেয়েছে। এখন সেই বয়স যখন কামনা কেবল সুর খুঁজছে না, রূপ খুঁজতে বেরিয়েছে। কিন্তু আলো-আঁধারে

রূপের আভাস পায়, স্পষ্ট করে কিছু পায় না। ছবি এঁকে তখন প্রত্যক্ষতার স্বাদ পাবার ইচ্ছা জেগেছে মনে, কিন্তু ছবি আঁকবার হাত তৈরি হয়নি তো।

"কবি সংসারের ভিতরে তখনো প্রবেশ করেনি, তখনো সে বাতায়ন-বাসী। দূর থেকে যার আভাস দেখে তার সঙ্গে নিজের মনের রেশ মিলিয়ে দেয়। এর কোনো-কোনোটা চোখে দেখা এক টুকরো ছবি পেনসিলে আঁকা, রবারে ঘষে দেওয়া, আর কোনো কোনোটা সম্পূর্ণ বানানো। মোটের উপরে অক্ষম ভাষার ব্যাকুলতায় সবগুলিতেই বানানো ভাব প্রকাশ পেয়েছে, সহজ হয়নি। কিন্তু সহজ হবার একটা চেষ্টা দেখা যায়। সেইজন্যে চলতিভাষা আপন এলোমেলো পদক্ষেপে এর যেখানে সেখানে প্রবেশ করেছে। আমার ভাষা ও ছন্দে এই একটা মেলামেশা আরম্ভ হলো। ছবি ও গান, কড়ি ও কোমলের ভূমিকা করে দিলে।" (রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১ম খণ্ড, "ছবি ও গান" উপলক্ষে কবির মন্তব্য, ১০৪ পৃঃ)

কিন্তু বসিয়া বসিয়া ছবি দেখা, টুকরা টুকরা করিয়া কথায় ছবি ও গানের মালা গাঁথিয়া তোলা বোধ হয় মনকে তৃপ্তি দিতে পারিতেছিল না। বৃহত্তর সৃষ্টির মধ্যে আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা মনের মধ্যে আবেগের সৃষ্টি করিতেছিল। এই চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিল গল্পে প্রবন্ধে মসীযুদ্ধে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ রচনায়। মানব-জীবনের সকল দিক দিয়া নিজেকে ব্যক্ত করিবার একটি আকুলতা মনকে একান্ত করিয়া টানিতেছে; এখন আর মন শুধু জানালার ধারে বসিয়া আপন মনে বিচিত্রদৃশ্যের ছবি আঁকিয়াই তৃপ্ত থাকিতে চাহিতেছে না। ইতিমধ্যে দুই-দুইটা মৃত্যু আসিয়া কবির জীবনে একটা নূতন অভিজ্ঞতা, নূতন অনুভূতি দান করিয়া গেল; জীবনের সঙ্গে কবির একটা গভীর পরিচয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দিয়া গেল। কিছুদিনের জন্য একটা বৈরাগ্য কবিচিত্তকে অধিকার করিয়াছিল।

"সেই বৈরাগ্যের ভিতর দিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য আরও গভীর রূপে রমণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কিছুদিনের জন্য জীবনের প্রতি আমার অন্ধ আসক্তি একেবারে চলিয়া গিয়াছিল বলিয়াই চারিদিকে আলোকিত নীল আকাশের মধ্যে গাছপালার আন্দোলন

আমার অশ্রুধৌত চক্ষে তারি একটা মাধুরী বর্ষণ করিত। জগৎকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্ত যে দূরত্বের প্রয়োজন মৃত্যু সেই দূরত্ব ঘুচাইয়া দিয়াছিল। আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম তাহা বড়ো মনোহর।" ("জীবন-স্মৃতি", বিশ্বভারতী সং, ২৭৩ পৃঃ)

যেমন করিয়াই হউক, এই মৃত্যুর ভিতর দিয়া কবি বৃহত্তর জীবন-লোকে উত্তীর্ণ হইলেন; 'উদার পৃথিবীর উন্মুক্ত খেলাঘর' তাঁহাকে 'ভৃত্যের আঁকা খড়ির গণ্ডি'র ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিল। এখন হইতে মানবজীবনের বিচিত্র রঙ্গলীলা কবির মনকে একান্ত করিয়া টানিতে আরম্ভ করিল; "কড়ি ও কোমলে"র নানান কবিতার ভিতর দিয়া এই কথাটাই নানা প্রকারে প্রকাশ পাইয়াছে। মানব-জীবনের বিচিত্র লীলা রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার এবং তাহাকে সকল দিক দিয়া গ্রহণ করিবার জন্য একটা অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা "কড়ি ও কোমলে"র কবিতাগুলির মর্মকথা, এবং এই মর্মকথাটি ব্যক্ত হইয়াছে গ্রন্থের প্রথম কবিতাগুলিতেই—

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই। ('প্রাণ')

সত্যই, কবির কবিতা এখন বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং বস্তুবিশ্বের প্রতি উন্মীলিত নয়ন লইয়া মানুষের দ্বারা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে,—

"এখানে তো একেবারে অবারিত প্রবেশের ব্যবস্থা নাই; মহলের পর মহল, দ্বারের পরে দ্বার। পথে দাঁড়াইয়া কেবল বাতায়নের ভিতরকার দীপালোকটুকু মাত্র দেখিয়া কতবার ফিরিতে হয়, শানাইয়ের বাঁশিতে ভৈরবীর তান দূর প্রাসাদের সিংহদ্বার হইতে কানে আসিয়া পৌঁছে। মনের সঙ্গে মনের আপস, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার বোঝাপড়া, কত বাঁকাচোরা বাধার ভিতর দিয়া দেওয়া এবং নেওয়া। সেই সব বাধায় ঠেকিতে ঠেকিতে জীবনের নির্ঝরধারা মুখরিত উচ্ছ্বাসে হাসিকান্নায় ফেনাইয়া উঠিয়া নৃত্য করিতে থাকে, পদে পদে আবর্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠে এবং তাহার গতিবিধির কোনো নিশ্চিত হিসাব পাওয়া যায় না।

"কড়ি ও কোমল' মানুষের জীবন-নিকেতনের সেই সম্মুখের রাস্তাটায় দাঁড়াইয়া গান। সেই রহস্ত সভার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আসন পাইবার জন্ত দরবার। ("জীবনস্মৃতি", বিশ্বভারতী সং, ২৭৮—৭৯ পৃঃ)

কিন্তু মানুষের জীবন-নিকেতনের রহস্যসভার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আসন পাইবার জন্য কবিচিত্তে এমন আকুলতা জাগিল কেন? কবি নিজেই বলিতেছেন,—

"* * * যেখানে জীবনের উৎসব হইতেছে সেইখানকার প্রবল সুখদুঃখের নিমন্ত্রণ পাইবার জন্ত একলা ঘরের প্রাণটা কাঁদে।

"যে মৃদু নিশ্চেষ্টতার মধ্যে মানুষ কেবলই মধ্যাহ্নতন্দ্রায় ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে সেখানে মানুষের জীবন আপনার পূর্ণ পরিচয় হইতে আপনি বঞ্চিত থাকে বলিয়াই তাহাকে এমন একটা অবসাদে ঘিরিয়া ফেলে। সেই অবসাদের জড়িমা হইতে বাহির হইবার জন্ত আমি চিরদিন বেদনা বোধ করিয়াছি। * * *

"মানুষের বৃহৎ জীবনকে বিচিত্রভাবে নিজের জীবনে উপলব্ধি করিবার ব্যথিত আকাঙ্ক্ষা, এ যে সেই দেশেই সম্ভব যেখানে সমস্তই বিচ্ছিন্ন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃত্রিম সীমায় আবদ্ধ। আমি আমার সেই ভৃত্যের আঁকা খড়ির গণ্ডির মধ্যে মনে মনে উদার পৃথিবীর উন্মুক্ত খেলাঘরটিকে যেমন করিয়া কামনা করিয়াছি যৌবনের দিনেও আমার নিভৃত হৃদয় তেমনি বেদনার সঙ্গেই মানুষের বিরাট হৃদয়লোকের দিকে হাত বাড়াইয়াছে। সে যে দুর্লভ, সে যে দুর্গম দূরবর্তী। কিন্তু তাহার সঙ্গে প্রাণের যোগ না যদি বাঁধিতে পারি, * * তবে যাহা জীর্ণ পুরাতন তাহাই নূতনের পথ জুড়িয়া পড়িয়া থাকে, * * তাহা কেবলি জীবনের উপর চাপিয়া চাপিয়া পড়িয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

"* * * আমার কাব্যলোকে যখন বর্ষার দিন ছিল তখন কেবল ভাবাবেগের বাষ্প এবং বায়ু এবং বর্ষণ। তখন এলোমেলো ছন্দ এবং অস্পষ্ট বাণী। কিন্তু শরৎকালের কড়ি ও কোমলে কেবলমাত্র আকাশে মেঘের রঙ্গ নহে, সেখানে মাটিতে ফসল দেখা দিতেছে। এবার বাস্তব সংসারের সঙ্গে কারবারে ছন্দ ও ভাষা নানাপ্রকার রূপ ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে।

"এবারে একটা পালা সাঙ্গ হইয়া গেল। জীবনে এখন ঘরের ও পরের, অন্তরের ও বাহিরের মেলামেশির দিন ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে। এখন হইতে জীবনের যাত্রা ক্রমশই ডাঙার পথ বাহিয়া লোকালয়ের ভিতর দিয়া যে সমস্ত ভালোমন্দ সুখ-দুঃখের বন্ধুরতার মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইবে তাহাকে কেবলমাত্র ছবির মত হালকা করিয়া দেখা আর চলে না। এখানে কত ভাঙা গড়া, কত জয় পরাজয়, কত সংঘাত ও সম্মিলন।" ("জীবনস্মৃতি," বিশ্বভারতী সং, ২৮২—৮৫ পৃঃ)

"কড়ি ও কোমলে"র প্রথম কবিতা তারিখ হিসাবে প্রথম রচনা নয়; কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, এই কবিতাটির মধ্যে "কড়ি ও কোমলে"র মর্মবাণীটি ব্যক্ত হইয়াছে, এবং এই কারণেই সম্পাদন-কর্তা আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় ইহাকেই পুরোভাগে স্থান দিয়াছিলেন। পরিবারের মধ্যে উপরি উপরি দুইটি মৃত্যু কবিকে গভীরভাবে অভিভূত করিয়াছিল, একথা আগেই বলিয়াছি; কিছুদিনের জন্য জীবনের প্রতি তাঁহার অন্ধ আসক্তি একেবারেই চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে শুধু কিছু দিনের জন্যই। সুখ হউক, দুঃখ হউক যে কোন ভাব অথবা অনুভূতি হউক কোনও কিছুই কবিকে দীর্ঘকাল ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারে না; তিনি যে তাহা ভুলিয়া যান, তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার কবিচিত্ত তাহাকে অতিক্রম করিয়া যায়। কবি জীবনের কোনও অবস্থাকেই চরম ও পরম বলিয়া স্বীকার করেন না। উত্তর-জীবনেও মৃত্যুশোক বার বার তাঁহার জীবনকে আঘাত করিয়াছে, কিন্তু নিদারুণ দুঃখও তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে নাই, একটা অপার অগাধ নির্লিপ্ততার মধ্যে তাঁহার চিত্ত সহজেই যেন-আশ্রয় খুঁজিয়া পায়; মৃত্যুকে বার বার তিনি অস্বীকার করেন, বার বার শুধু জীবনকেই ফিরিয়া পাইবার জন্য। সেই জন্যই "কড়ি ও কোমলে"র কবিতাগুলিতে বার বার জীবনের আহ্বানই শুনিতে পাওয়া যায়; মৃত্যুকে, পুরাতনকে বার বার তিনি পিছনে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে চাহিতেছেন,—

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্য করে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই। ('প্রাণ')

অথবা,

হেথা হতে যাও, পুরাতন,
হেথা হতে যাও, পুরাতন,
হেথায় নূতন খেলা আরম্ভ হয়েছে।
আবার বাজিছে বাঁশি, আবার উঠিছে হাসি,
বসন্তের বাতাস বয়েছে। ('পুরাতন')

অথবা,

বহুদিন পরে আজি মেঘ গেছে চলে
রবির কিরণ সুধা আকাশে উথলে।
স্নিগ্ধ শ্যাম পত্রপুটে আলোক ঝলকি উঠে
পুলক নাচিছে গাছে গাছে।
নবীন যৌবন যেন প্রেমের মিলনে কাঁপে
আনন্দ বিদ্যুৎ-আলো নাচে। ('যোগিয়া')

কিন্তু এই জীবনের পথ মৃত্যুকে এড়াইয়া নয়; মৃত্যুর নিবিড় ভাব-কল্পনা লইয়া। বস্তুত, নিবিড় মৃত্যুভাবনার প্রথম সূচনা এই "কড়ি ও কোমল" গ্রন্থেই, এবং উত্তর-জীবনে নানা ভাবে নানা রূপে সেই ভাবনার প্রকাশ।

যাহাই হউক, মানবের মাঝে, 'জীবন্ত হৃদয়ের মাঝে' কবি যেদিন স্থান পাইতে চাহিলেন, তখনই খণ্ড খণ্ড জীবনের মূল্য তাঁহার কাছে কিছু রহিল না; জীবনের সমগ্রতার মধ্যে যে বিচিত্র-রসলীলা দিকে দিকে উৎসারিত হইতেছে, তাহাই তাঁহার কবিচিত্তকে একান্ত করিয়া টানিতে লাগিল। "কড়ি ও কোমলে" সেইজন্য জীবনের এই বিচিত্রতার সন্ধান পাওয়া যায়; যৌবনের বিচিত্র স্বপ্ন, প্রেম, প্রকৃতি, নারী, সৌন্দর্য-রহস্য, শিশুজীবন, স্বদেশ, জীবনের গভীর তাৎপর্য কিছুই

কবিচিত্তের স্পর্শ হইতে বাদ পড়ে নাই। 'বঙ্গবাসীর প্রতি', 'আহ্বান-গীত' প্রভৃতি কবিতায় স্বদেশ সম্বন্ধে যে গভীর বেদনা ও অনুরাগ এবং যে অনন্যসাধারণ ভাবের ইঙ্গিত প্রকাশ পাইয়াছে তাহা বাংলা এই জাতীয় কবিতায় বিরল। বান্দোরা হইতে (ইন্দিরা দেবীর নিকট) লিখিত কয়েকটি পত্র-কবিতায় জীবনের গভীর তাৎপর্য সম্বন্ধে কবির ভাব ও ভাবনা ব্যক্তিগত আন্তরিকতার স্পর্শে অপূর্ব কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে। কিন্তু কি এই জাতীয় কবিতা, কি শিশু-জীবন সম্বন্ধীয় কবিতা, কি প্রেম ও প্রকৃতি সম্বন্ধে গান ও কবিতা, সর্বত্রই লাগিয়াছে কবির যৌবনস্বপ্নের স্পর্শ।

> আমার যৌবন-স্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ।
> ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে রূপসীর পরশের মতো।
> পরাণে পুলক বিকশিয়া বহে কেন দক্ষিণা বাতাস।
> যেথা ছিল যত বিরহিণী সকলের কুড়ায়ে নিশ্বাস।
> শত নূপুরের রুনুঝুনু বনে যেন গুঞ্জরিয়া বাজে।
> মদির প্রাণের ব্যাকুলতা ফুটে ফুটে বকুল মুকুলে;
> কে আমারে করেছে পাগল—শূন্যে কেন চাই আঁখি তুলে,
> যেন কোন উর্বশীর আঁখি চেয়ে আছে আকাশের মাঝে।
>
> ('যৌবন-স্বপ্ন')

এই যৌবন-স্বপ্নই কবিমানসকে এমন একটা স্তরে উন্নীত করিয়াছে যাহার ফলে "কড়ি ও কোমলে"র কবিতাগুলিতে কবির সৃষ্টি-ক্ষমতার প্রথম আভাস লক্ষ্য করা যায়; এজন্যই সকল ভাব, সকল রূপ, সকল রস দেখিতেছি, কবিচিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে। এই যৌবন-স্বপ্নই কবিকে সৌন্দর্য-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিতেছে—সে-সৌন্দর্য নারীদেহে, সে-সৌন্দর্য প্রকৃতিতে, সে-সৌন্দর্য ভোগে ও মিলনে, প্রেমে ও মিলনাতীত বিরহে। ভুবনের প্রতি রন্ধ্রে, প্রতি উন্মুক্ত প্রসারে এই সৌন্দর্য বিচ্ছুরিত হইতেছে বলিয়াই কবি মরিতে চাহেন না, মানুষের

মাঝে তিনি বাঁচিয়া থাকিতে চান। এইজন্যই নারীদেহের সৌন্দর্য কবির কাছে তুচ্ছ ত নয়ই, বরং পরম রমণীয়, পরম উপভোগ্য, দেহের মিলনও পরম কাম্য। কারণ দেহের মিলন না হইলে ত দেহের আকর্ষণ হইতে মুক্তি নাই। কিছুদিন পরে লেখা একটি পত্রে কবি নিজেও বলিতেছেন,

"* * * যারা সৌন্দর্যের মধ্যে সত্যি সত্যি নিমগ্ন হতে অক্ষম তারাই সৌন্দর্যকে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের ধন বলে অবজ্ঞা করে—কিন্তু এর মধ্যে যে অনির্বচনীয় গভীরতা আছে, তার আস্বাদ যারা পেয়েছে তারা জানে সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়ের চূড়ান্ত শক্তিরও অতীত—কেবল চক্ষু কর্ণ দূরে থাক সমস্ত হৃদয় নিয়ে প্রবেশ করলেও ব্যাকুলতার শেষ পাওয়া যায় না। * * *" ("ছিন্ন পত্র," বিশ্বভারতী)

তা ছাড়া যৌবনের প্রথম স্বপ্ন প্রথম আকাঙ্ক্ষাই ত ভোগের স্বপ্ন, ভোগের আকাঙ্ক্ষা; জীবন যদি সত্য হয়, যৌবন যদি সত্য হয়, তাহার ভোগাকাঙ্ক্ষাও সত্য, কামনা-বাসনাও সত্য। 'স্তন', 'চুম্বন', 'বিবসনা,' 'বাহু', 'দেহের মিলন', 'তনু', 'পূর্ণ মিলন', 'বন্দী' প্রভৃতি কবিতায় এই ভোগবাসনা সৌন্দর্যধারায় সিক্ত হইয়া অপূর্ব কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে।

ফেল গো বসন ফেল—ঘুচাও অঞ্চল।
পর শুধু সৌন্দর্যের নগ্ন আবরণ
সুর বালিকার বেশ কিরণ বসন।
পরিপূর্ণ তনুখানি বিকচ কোমল,
জীবনের যৌবনের লাবণ্যের মেলা।

অথবা,

('বিবসনা')

নারীর প্রাণের প্রেম মধুর কোমল,
বিকশিত যৌবনের বসন্ত সমীরে
কুসুমিত হয়ে ওই ফুটেছে বাহিরে,
সৌরভ সুধায় করে পরান পাগল।

* * * * *

হের গো কমলাসন জননী লক্ষ্মীর—
হের নারী-হৃদয়ের পবিত্র মন্দির।

('স্তন')

পবিত্র সুমেরু বটে এই সে হেথায়,
দেবতা বিহার-ভূমি কনক-অচল।
উন্নত সতীর স্তন স্বরগ-প্রভায়
মানবের মর্ত্যভূমি করেছে উজ্জ্বল।
ধরণীর মাঝে থাকি স্বর্গ আছে চুমি
দেব-শিশু মানবের ঐ মাতৃভূমি।

('স্তন' ২)

প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে।
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন।
হৃদয়ে আচ্ছন্ন দেহ হৃদয়ের ভরে
মুরছি পড়িতে চায় তব দেহ পরে।
সর্বাঙ্গ ঢালিয়া আজি আকুল অন্তরে।
দেহের রহস্য মাঝে হইব মগন।
আমার এ দেহ মন চির রাত্রি-দিন
তোমার সর্বাঙ্গে যাবে হইয়া বিলীন।

('দেহের মিলন')

প্রভৃতি কবিতায় সর্বত্রই একটা ভোগাকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু এটিও লক্ষ্য করিবার যে এই ভোগাকাঙ্ক্ষাও কতকটা রোম্যান্টিক, যৌনাকর্ষণ হইতে ভাবগত আকর্ষণই প্রবল। বিবসনা নারীর দেহে তিনি 'লাজহীন পবিত্রতার' সন্ধান করিতেছেন, নারীর স্তন-সুমেরুকে কবি 'দেবশিশু মানবের মাতৃভূমি' বলিয়া কল্পনা করিতেছেন, দেহের সায়রের মধ্যে তিনি ডুব দিতে চাহেন হৃদয়কে স্পর্শ করিবার জন্য, তনুদেহের দিকে চাহিয়া কবির দৃষ্টি দূরে অতীত

জীবনের স্মৃতির মধ্যে বিলীন হইয়া যায়—দেহের জন্যই দেহের আকর্ষণ কোথাও উদগ্র হইয়া দেখা দেয় না; ভোগ-বাসনাও যেন সৌন্দর্য-সৌরভের সঙ্গে মিশিয়া বাতাসে সঞ্চারিত হইয়া যায়, বস্তুর মধ্যে আবদ্ধ হইতে চায় না। এই একান্ত রোম্যান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উত্তর-কবিজীবনে "সোনার তরী", "চিত্রা", "চৈতালী"তে আমরা দেখিব, এই একান্ত ভাবধর্মী রোম্যান্টিক দৃষ্টি রবীন্দ্র-কাব্যকে একটি শুচিশুভ্র সংযম দান করিয়াছে; দীর্ঘ অভিসারের পর বার বার তিনি দেহসায়রের তীরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন; কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই দেহভোগাকাঙ্ক্ষাকে বৃহত্তর সৌন্দর্য-ভোগাকাঙ্ক্ষার মধ্যে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছেন, বস্তুদেহ ভাবদেহের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

এই রোম্যান্টিক দৃষ্টিভঙ্গিরই আর একটা দিক "কড়ি ও কোমলে"র অন্য কয়েকটি কবিতাতে দেখা যায়। কবির চিরবিরহী চিত্ত বাহু-লতার বন্ধনে পূর্ণ মিলনের মধ্যেও যেন অতৃপ্ত থাকিয়া যায়, একটা ঔদাস্য যেন কবিচিত্তকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখে, দেহসম্ভোগের মধ্যে যেন তৃপ্তি নাই, বাসনার ফাঁদ হইতে কবিচিত্ত মুক্তি পাইতে চায়। দেহের পরিপূর্ণ মিলন ত দুরাশার স্বপ্ন মাত্র ('পূর্ণ মিলন,'), বাহুপাশ-বন্ধন ত চিত্তের বন্দীদশা ('বন্দী'), দেহের মোহ, ভোগবাসনার মোহ কয়দিন থাকে, 'এ মায়া মিলায়' ('মোহ'), প্রেম যে ভোগবাসনার বিষনিশ্বাসে তিলে তিলে মরিয়া যায় ('পবিত্র প্রেম'), দেহসম্ভোগের কুসুমশয়ন ত স্বপ্নরাজ্যের মরিচীকা, সে ত যে কোনও মুহূর্তে মিলাইয়া যায় ('মরীচিকা')—এ ভোগবাসনার জীবন হইতে কবিচিত্ত মুক্তি চাহে; জাগ্রত হৃদয়, বৃহত্তর জীবনের জন্য কবিচিত্তে আকাঙ্ক্ষা জাগে ('স্বপ্নরুদ্ধ,' 'অক্ষমতা,' 'জাগিবার চেষ্টা' প্রভৃতি কবিতা), স্বদেশের 'আহ্বান গীত,' জীবনের গভীর সার্থকতার ইঙ্গিত তাহাকে আকর্ষণ

করে, 'শেষ কথা'টি বলিবার জন্য মন তখন আকুল হইয়া উঠে। কত কথা ত বলা হইল, চিত্তের অসংখ্য আবেগ ও আকূতি অসংখ্য ভাবে প্রকাশ করা হইল, তবু শেষ কথাটি যেন বলা হইল না।

মনে হয় কি একটি শেষ কথা আছে,
সে কথা হইলে বলা সব বলা হয়।
* * * *
সে কথা হইলে বলা নীরব বাঁশরি
আর বাজাব না বীণা চিরদিন তরে,
* * * *
সে কথায় আপনারে পাইব জানিতে,
আপনি কৃতার্থ হব আপন বাণীতে।

('শেষ কথা')

কিন্তু শেষ কথা কি কিছু আছে; শেষ কথা যদি বলা হইয়া যাইত তাহা হইলে ত কবি কবেই নীরব হইয়া যাইতেন। "শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে ?"—পরবর্তী জীবনে কবি এই কথাই বার বার নানা ভাষায় বলিয়াছেন। এক ভাবপর্যায়ের সীমা শেষ হইয়া যায়, এই শেষের মধ্যে যে অশেষ আছে তাহা কবিকে নূতন পর্যায়ের সীমায় টানিতে থাকে; রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের সুদীর্ঘ ইতিহাস এই অশেষকে শেষ করিয়া প্রকাশ করিবার প্রচেষ্টার ইতিহাস। নানা ভাবে, নানা ভঙ্গিতে, নানা বিচিত্র অনুভবের ভিতর দিয়া তিনি অসীমের, অরূপের, অশেষের বিচিত্র রহস্য প্রকাশ করিয়াছেন, করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু যতই তিনি বলিয়াছেন, যত চেষ্টাই তিনি করিয়াছেন, শেষ কিছুতেই আর হয় নাই, হইবার নয়।

কিন্তু "কড়ি ও কোমলে"ও কবি স্ব-প্রতিষ্ঠ হইতে পারেন নাই; তাঁহার কাব্য এখনও সত্য ও সার্থক সৃষ্টি হইতে পারে নাই। ছন্দের

উপর যথেচ্ছ অধিকার এখনও জন্মায় নাই। এই আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মপ্রত্যয় লাভ ঘটিল —"মানসী"তে। "মানসী"তেই তিনি সর্বপ্রথম নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হইলেন, এবং তাঁহার প্রদীপ্ত কবি-প্রতিভার প্রথম উন্মেষ লক্ষ্য করা গেল। কি প্রেম, কি নিসর্গ, সব কিছু সম্বন্ধেই রবীন্দ্রনাথের যে বিশেষ দৃষ্টি-ভঙ্গি তাহা এই সময় হইতেই একটা সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করিল, তিনি মানস-সুন্দরীর সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। "মানসী"র নিসর্গ সম্বন্ধীয় কবিতাগুলি তাঁহার তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ, সুতীব্র অনুভূতি, সুগভীর ভাবগাম্ভীর্য এবং অপূর্ব ছন্দসম্পদে সমৃদ্ধ। 'সিন্ধুতরঙ্গ,' 'মেঘদূত,' 'অহল্যার প্রতি' প্রভৃতি কবিতায় যে ভাব ও ধ্বনি গাম্ভীর্য, চিন্তার যে গভীরতা, মনের যে উন্মুক্ত প্রসার এবং যে সবল কল্পনার ঐশ্বর্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহা পূর্ববর্তী কোনও কবিতাতেই দেখা যায় না, এবং পরবর্তী কালে "সোনার তরী," "চিত্রা," "চৈতালী," "কল্পনা" "বলাকা" ও "পূরবী"তে এই গুণগুলিই বিচিত্র ও ক্রমবর্ধমান অভিজ্ঞতা দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া বিচিত্ররূপে প্রকাশ পাইয়াছে। শব্দ নির্বাচনের ক্ষমতা, ধ্বনি ও ছন্দকে হাতের ক্রীড়নক করিয়া নিজের ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা, কথার তুলিতে ছবি আঁকিবার ক্ষমতা সমস্তই "মানসী"র অধিকাংশ কবিতায় অপূর্ব নৈপুণ্যে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। 'কুহুধ্বনি,' 'বধূ' 'অপেক্ষা,' 'একাল ও সেকাল,' প্রভৃতি কবিতা তাহার প্রমাণ; তাহা ছাড়া এই জাতীয় কবিতায় কবিহৃদয়ের যে সুগভীর সহানুভূতি, প্রকৃতির সঙ্গে যে নিবিড় আত্মীয়তাবোধ প্রথম লক্ষ্য করা যায় তাহাই পরবর্তী জীবনে আরও ব্যাপক, আরও সমৃদ্ধ হইয়া রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসকে অপরূপ সম্পদ দান করিয়াছে। বস্তুত, "মানসী"ই রবীন্দ্রনাথের প্রথম সার্থক কাব্যসৃষ্টি; এবং এই কাব্যেই উত্তর-জীবনের রবীন্দ্রনাথের মূল ভাবপ্রসঙ্গ ও বিষয়-বস্তুগুলি ধরা পড়িয়াছে।

"মানসী"র কবিতাগুলি ১২৯৪ বৈশাখ হইতে ১২৯৭ কার্তিকের মধ্যে লেখা এবং অধিকাংশ কবিতাই গাজিপুরের নির্জনবাসে রচিত। প্রথম কবিতা 'উপহার' ১২৯৭ বৈশাখের রচনা, কিন্তু এই কবিতাটিতেই "মানসী"র এবং পরবর্তী কবি-জীবনের মর্মবাণীটি ব্যক্ত হইয়াছে,—

নিভৃত এ চিত্ত মাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে
জগতের তরঙ্গ আঘাত
ধ্বনিত হৃদয়ে তাই মুহূর্ত বিরাম নাই
নিদ্রাহীন সারা দিন রাত।

* * * *

এ চির জীবন তাই আর কিছু কাজ নাই
রচি শুধু অসীমের সীমা
আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালবাসা দিয়ে
গড়ে তুলি মানসী প্রতিমা।

('উপহার')

বিশ্ব-জীবনের তরঙ্গাঘাত প্রতিমুহূর্তে কবিচিত্তকে স্পর্শ করিতেছে, এবং তাহার ফলে যে বিচিত্র অনুভূতি জন্মলাভ করিতেছে, কবি তাহাকেই বাণীরূপ দান করিতেছেন—ইহাই রবীন্দ্র-কবিজীবনের ইতিহাস। এই বাণীরূপই তাঁহার মানসী-প্রতিমা। অনন্ত কাল ও অনন্ত বিশ্ব-জীবন রবীন্দ্র-কবিচিত্তের পটভূমি; তাঁহার কবিমানস খণ্ড বস্তুকে খণ্ড জীবনকে লইয়া সৃষ্টি সূচনা করে, কিন্তু মুহূর্তেই তাহা ব্যাপ্ত হইয়া যায় অনন্ত কালের মধ্যে, বিশ্বজীবনের অসীমতার মধ্যে,—

জগতের মর্ম হতে মোর মর্মস্থলে
আনিতেছে জীবন-লহরী।

('জীবন মধ্যাহ্ন')

অথবা;—

বিশ্বের নিশ্বাস লাগি জীবন-কুহরে
মঙ্গল আনন্দ ধ্বনি বাজে।
('জীবন-মধ্যাহ্ন')

ঠিক এই জন্যই রবীন্দ্রনাথের নিসর্গ কবিতায় যে উদার নিখিল ব্যাপ্তি, যে সুগভীর গাম্ভীর্য, যে সর্বানুভূতি ও বিশ্ববোধ লক্ষ্য করা যায়, এবং তাহার ফলে এই জাতীয় কবিতাগুলি যে রূপ ও রস-সমৃদ্ধি লাভ করে তাহা কবির প্রেমের কবিতায় অথবা দেশ সম্বন্ধীয় কবিতাগুলিতে পাওয়া যায় না। "মানসী"তে এই তিন জাতীয় কবিতাই আছে, কিন্তু রসিক পাঠক তুলনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন, নিসর্গ কবিতাগুলির সঙ্গে অন্য জাতীয় কবিতাগুলির রসসমৃদ্ধির তুলনাই হইতে পারে না। পরবর্তী কবিজীবনে এই কথার আরও সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। "মানসী"র প্রেমের কবিতাগুলিতে এবং পরবর্তী জীবনের প্রেমের কবিতায়ও প্রেমের বিচিত্র লীলারহস্যের পরিচয় যে নাই, তাহা নহে, কিন্তু যেহেতু সেই প্রেম কায়া-নৈকট্য হারাইয়া, বস্তুনিরপেক্ষ হইয়া ভাবলোকে উত্তীর্ণ হইয়া যায়, সেই হেতুই এই প্রেমের রসনিবিড়তা ক্ষুণ্ণ হয়, তাহার ঘন মাধুর্য নিসর্গ সৌরভের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে, মানবচিত্ত তাহাতে রসাবেশে মুগ্ধ হয় বটে, কিন্তু প্রেমাস্পদকে পাইবার অথবা ভোগ করিবার আগ্রহে উদ্বেল হইয়া উঠে না, ভাবলোকের আসঙ্গ লিপ্সায়ই প্রেম চরিতার্থতা লাভ করে। ঠিক এই কারণেই, কীট্‌স অথবা চণ্ডীদাসকে আমরা যে হিসাবে প্রেমের কবি বলি, রবীন্দ্রনাথকে সেই হিসাবে প্রেমের কবি বলিতে পারি না। অথচ যে দৃষ্টিভঙ্গির জন্য রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা রসনিবিড় হইয়া উঠিতে পারে না, সেই দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই তাঁহার নিসর্গ সম্বন্ধীয় কবিতাগুলি অপরূপ রসঘন রূপ লাভ করে।

এই জাতীয় কবিতাগুলিতে যে মুহূর্তে বিশ্বের নিশ্বাস আসিয়া লাগে সেই মুহূর্তেই কবিতাগুলি অপূর্ব অনির্বচনীয় রূপলোকে রসলোকে উত্তীর্ণ হইয়া যায়।

এই নিসর্গ কোনও সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করিতেছি না, শুধু প্রকৃতি বুঝিতেছি না ; মানুষ, পৃথিবী. মানবজীবন, বিশ্বজীবন, সৌন্দর্য সমস্তই এই নিসর্গের অন্তর্গত, এবং ব্যাপক অর্থে প্রেমও। কিন্তু প্রেমের কবিতা বলিতে এখানে যাহা বুঝিতেছি তাহা শুধু আমাদের জড়-জগতের নরনারীর দেহ-আত্মাকে লইয়া যে লীলা তাহাই বুঝিতেছি, এবং সেই অর্থেই শুধু রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা সম্বন্ধে উপরের কথাগুলি প্রয়োজ্য।

এই দেহ-আত্মাকে লইয়া প্রেমলীলার খুব গভীর পরিচয় যে "মানসী"র কবিতাগুলিতে আছে, এমন কথা বলা যায় না। 'ভুলভাঙা,' 'বিরহানল,' 'বিচ্ছেদের শান্তি," ক্ষণিক মিলন,' 'সংশয়ের আবেগ,' 'নারীর উক্তি,' 'পুরুষের উক্তি,' 'গুপ্তপ্রেম,' 'ব্যক্তপ্রেম,' নিষ্ফল প্রয়াস,' 'সুরদাসের প্রার্থনা বা আঁখির অপরাধ,' 'হৃদয়ের ধন,' 'পূর্বকালে,' 'অনন্ত প্রেম' প্রভৃতি কবিতায় এই প্রেমলীলার সহজ অথচ বিচিত্র অনুভূতির পরিচয় কবিচিত্তের তরঙ্গিত ভাবধারায় রূপান্তরিত হইয়া অপূর্ব গীতমাধুর্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই জাতীয় কবিতাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'নিষ্ফল কামনা,' এবং এই কবিতাটির মধ্যেই কবিচিত্তের রোম্যান্টিক ভাবকল্পনা যেন দানা বাঁধিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"বৃথা এ ক্রন্দন।
বৃথা এ অনল-ভরা দুরন্ত বাসনা।
* * * *
বৃথা এ ক্রন্দন।
হায় রে দুরাশা,
এ রহস্য, এ আনন্দ তোর তরে নয়।

যাহা পাস তাই ভালো—
হাসিটুকু কথাটুকু,
নয়নের দৃষ্টিটুকু, প্রেমের আভাস।
সমগ্র মানব তুই পেতে চাস,
এ কি দুঃসাহস।
কী আছে বা তোর,
কী পারিবি দিতে।
আছে কি অনন্ত প্রেম,
পারিবি মিটাতে জীবনের অনন্ত অভাব?

*   *   *

ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানব,
কেহ নহে তোমার আমার।
অতি সযতনে, অতি সঙ্গোপনে
সুখে দুঃখে, নিশীথে দিবসে,
বিপদে সম্পদে, জীবনে মরণে,
শত ঋতু-আবর্তনে
বিশ্বজগতের তরে ঈশ্বরের তরে
শতদল উঠিতেছে ফুটি—
সুতীক্ষ্ণ বাসনা ছুরি দিয়ে
তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে?
লও তার মধুর সৌরভ,
দেখো তার সৌন্দর্যবিকাশ,
মধু তার করো তুমি পান
ভালবাসো প্রেমে হও বলী—
চেয়ো না তাহারে।
আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।
শান্ত সন্ধ্যা স্তব্ধ কোলাহল।
নিবাও বাসনাবহ্নি নয়নের নীরে
চলো ধীরে ঘরে ফিরে যাই।   ('নিষ্ফল কামনা')

সত্য হউক, মিথ্যা হউক, নরনারীর দেহ-আত্মার লীলা সম্বন্ধে ইহাই রবীন্দ্রনাথের ভাব-কল্পনা, ইহাই তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি। ভোগবাসনা মানুষের মনে মোহ উৎপন্ন করে, মোহ হইতে জাগে বিভ্রম, এই বিভ্রম মানবের স্বচ্ছ দৃষ্টিকে ম্লান করিয়া দেয়, বৃহতের সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন করে। কাজেই 'নিবাও বাসনা-বহ্নি'। প্রেম অনন্ত, নরনারীর দেহ-আত্মার লীলার মধ্যে তাহার খণ্ড অংশ মাত্র প্রকাশ পায়, তাহারই মধ্যে একান্ত ভাবে ডুবিয়া গেলে প্রেমের সমগ্রতা উপলব্ধি করা যায় না। এই খণ্ড প্রেম হইতে মুক্তি চাই; বাসনার আবেগ এবং মুক্তির কামনা এই দুইয়ের হর্ষে ও ব্যথায় কবিচিত্ত আন্দোলিত। অনন্ত প্রেম চাই, সে প্রেমকে পাইতে হইলে নরনারীর দেহ-আত্মার লীলার শুধু সৌরভ-টুকু আহরণ কর, সৌন্দর্য-বিকাশটুকু দেখ, মধুটুকু পান কর, কিন্তু প্রেমাস্পদকে একান্ত করিয়া চাহিও না। খণ্ড প্রেমে তৃপ্তি পাইবে না, পাওয়ার জন্য ক্রন্দন বৃথা, 'বৃথা এ অনলভরা দুরন্ত বাসনা' 'জীবনের অনন্ত অভাব' আমাদের এই খণ্ড প্রেম দ্বারা মিটান যায় না। এই কথাই, এই দৃষ্টিভঙ্গিই "মানসী"র কবিতাগুলিতে নানা ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। "কড়ি ও কোমলে" এই দৃষ্টিভঙ্গির আভাস আমরা পাইয়াছি; "মানসী"তে তাহা আরও স্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইল। অজিতবাবু সত্যই বলিয়াছেন,

"* * মানসীর প্রেমের কবিতাগুলিতে যদিও জীবনের খুব গভীরতার পরিচয় আছে * * তথাপি সে প্রেম যে জীবনের সব নয়, তাহাকে যে চরম করিয়া তোলা চলে না, এমন একটি ভাব মানসীর অধিকাংশ কবিতার মধ্যে বারংবার প্রকাশ পাইয়াছে।" (অজিতকুমার চক্রবর্তী, "রবীন্দ্রনাথ")

যে-দুইটি নরনারীর প্রেম চিরদিবসের অনন্ত প্রেমের মধ্যে অবসান লাভ করে, যে প্রেমের মধ্যে 'সকল প্রেমের স্মৃতি, সকল কালের সকল কবির গীতি' আসিয়া আশ্রয় লয়, যে প্রেমের মধ্যে আসিয়া মেশে

'নিখিলের সুখ, নিখিলের দুঃখ, নিখিলের প্রাণের প্রীতি' সেই দেহ-আত্মার প্রেম কতকটা নিবিড়তা হারাইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি ?

স্বদেশ এবং আমাদের সমাজ ও জাতীয় জীবনের অনুভূতি হইতেও "মানসী"র কয়েকটি কবিতা জন্মলাভ করিয়াছে। 'দুরন্ত আশা,' 'দেশের উন্নতি,' 'বঙ্গবীর,' 'গুরু গোবিন্দ,' 'নব বঙ্গ-দম্পতির প্রেমালাপ,' 'ধর্ম-প্রচার' প্রভৃতি কবিতাগুলিকে এ পর্যায়ে ফেলা যাইতে পারে। এই ধরনের কবিতা "কড়ি ও কোমলে"ও কিছু কিছু আছে। আমাদের খণ্ড খণ্ড করা ধীর মন্থর গতানুগতিক জীবনযাত্রার ছন্দ কবি-চিত্তকে কখনও আকর্ষণ করিতে পারে নাই; আমাদের সমাজ ও জাতীয় জীবনের মিথ্যা আড়ম্বর, কাপুরুষতা, চিত্তের দৈন্য, ভিক্ষার প্রবৃত্তি, মূঢ় নিশ্চেষ্টতা প্রভৃতিও তিনি কখনও সহ্য করিতে পারেন নাই—নানা প্রবন্ধে, চিঠিপত্রে, বক্তৃতায় তিনি সর্বদা তাহা অকুণ্ঠচিত্তে ব্যক্ত করিয়াছেন। অনেক সময় দেশবাসী তাহা শুনিয়া দুঃখিত হইয়াছেন, কিন্তু কবি তাহা অনুভব করিয়াছেন, নির্ভয়ে তাহা ব্যক্ত করিতে কখনও কুণ্ঠিত হন নাই। সমসাময়িক কাব্য-রচনায়ও তাহার ছাপ পড়িয়াছে। কিন্তু "মানসী"তে এখনও দেশ, সমাজ ও জাতীয় জীবন কবির গভীর দরদ ও সহানুভূতি সার্থক কল্পনা ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টির মধ্যে আসন লাভ করিতে পারে নাই; এখনও শুধু তিনি লঘু বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গের ভিতর দিয়াই আমাদের স্বদেশবাসীর ক্ষুদ্রতা নীচতা ত্রুটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। তবু 'দুরন্ত আশা'র মধ্যে একটা সত্য ও গভীর অনুভূতির সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই কবিতা-টির মধ্যে একটা দুঃখ-বরণের আকাঙ্ক্ষা, দুঃসাধ্য ব্রত-উদ্‌যাপনের আনন্দ বৃহত্তর জীবনের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িবার একটা দুর্দম বাসনা, একটা সুস্থ সবল উন্মুক্ত অসভ্য জীবন-যাপন করিবার ইচ্ছা কাব্যরসে

অভিষিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ১২৯২, ৩১এ জ্যৈষ্ঠের লেখা একটা পত্রেও এই ভাবটি ব্যক্ত হইয়াছে ("ছিন্নপত্র," বিশ্বভারতী, ১৩৭ পৃঃ)।

"মানসী"র নিসর্গ কবিতাগুলির মধ্যে আবার ফিরিয়া আসিতে হইল, কারণ, এই কবিতাগুলির ভিতরই রবীন্দ্রনাথের কবিমানস সত্য ও সার্থকরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। এই কবিতাগুলিতে ছন্দ ও ধ্বনি-সম্পদ, শব্দচয়ন নৈপুণ্য, এবং কথার তুলিতে ছবি আঁকার ক্ষমতার কথা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। রসিক পাঠক যাঁহারা 'একাল ও সেকাল' 'মেঘদূত,' 'অহল্যার প্রতি' প্রভৃতি কবিতা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, কবি যেন এই কবিতাগুলির মধ্যে প্রাচীন যুগের নিসর্গ মণিকোঠার রহস্য-কুঞ্চিকাটির সন্ধান আমাদের দিয়াছেন; কালিদাস, জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, রামায়ণ-মহাভারতের জগৎ যেন মন্ত্রবলে আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়াছে নূতন রসে ও ভাবে অভিষিক্ত হইয়া।

বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী ('একাল ও সেকাল')

অথবা,

এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘন ঘোর বরিষায়। ('বর্ষার দিনে')

অথবা,

"বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল্"— ('বধূ')

অথবা,

প্রখর মধ্যাহ্ন-তাপে প্রান্তর ব্যাপিয়া কাঁপে
বাষ্পশিখা অনল-শ্বসনা। ('কুহুধ্বনি')

অথবা,

সকাল বেলা কাটিয়া গেল
বিকাল নাহি যায়। ('অপেক্ষা')

অথবা,

আঁখি কুন্তল দিব খুলে।
অঞ্চল মাঝে ঢাকিব তোমায়
নিশীথ-নিবিড় চুলে। ('ভালো করে বলে যাও')

অথবা,

অকূল সাগর মাঝে চলেছে ভাসিয়া
জীবন তরণী। ('বিদায়')

প্রভৃতি কবিতার যে শান্ত সৌন্দর্য ও মাধুর্য, যে করুণ কোমল সুকুমার শ্রী, নিসর্গের যে অনির্বচনীয় রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাই রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের অতুলনীয় সম্পদ, ইহাই রবীন্দ্র-কবিতার মূল ঐশ্বর্য।

কিন্তু নিসর্গের শান্ত মধুর কান্ত রূপ রচনাতেই রবীন্দ্র-প্রতিভা নিঃশেষিত হয় নাই; তাহার রুদ্র রূপ, মমতাহীন, নিষ্ঠুর রূপও কবি-চিত্তকে আন্দোলিত করিয়াছে, এবং পরবর্তী জীবনে নিসর্গের এই দিকটার যে পরিচয় "বলাকা" অথবা "পূরবী"তে দেখা যায়, তাহার প্রথম আভাস মানসীর 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি', প্রকৃতির প্রতি', 'সিন্ধুতরঙ্গ' প্রভৃতি কবিতায় পাওয়া যাইতেছে। "মানসী"র এই জাতীয় কবিতাগুলিতেও কবির অদ্ভুত শব্দচিত্র রচনার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়; 'সিন্ধুতরঙ্গ' কবিতাটি তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

"মানসী"তে দেখিতেছি, নরনারীর দেহ আত্মার লীলা, নিসর্গের বিচিত্র সৌন্দর্যমাধুর্য, স্বদেশ, সমাজ ও জাতীয় জীবন সব কিছুই কবি-চিত্তকে স্পর্শ করিতেছে, কিন্তু সব কিছুর ভিতরেই যেন কবিচিত্ত একটু ব্যথায় বেদনায় ভারাক্রান্ত। প্রেমাস্পদের হৃদয় যে শুধু দেহের মধ্যে ধরা যায় না, এই ভাবানুভূতি যে-সব কবিতায় প্রকাশ পাইতেছে, তাহার মধ্যে কোথায় যেন একটু বেদনাবোধ আছে; স্বদেশ, সমাজ ও জাতীয় জীবনের যে সমস্ত ত্রুটি ও দৈন্যকে তিনি বিদ্রূপ করিয়াছেন,

তাহার মধ্যেও একটু বেদনাবোধ প্রচ্ছন্ন আছে বই কি। নিসর্গ কবিতাগুলির মধ্যেও তাহা বাদ পড়ে নাই।

শুধু এই বেদনাবোধ নয়, যাহা কিছু তাঁহার চিত্তকে স্পর্শ করিতেছে, নরনারীর দেহ-আত্মার লীলা, নিসর্গের কান্ত মধুর প্রেম, সব কিছু হইতে মুক্তি পাইবার একটা আকুলতা "মানসী"র কয়েকটি কবিতায় দেখা যায়। একটা বৃহত্তর জীবনের মধ্যে দুঃখবরণের জন্য, একটা দুর্দম উন্মুক্ত জীবনের জন্য ব্যাকুলতা 'দুরন্ত আশা' কবিতাটিতে সুস্পষ্ট, ইহা আগেই বলিয়াছি। যে প্রেম 'জীবনমরণময় সুগম্ভীর কথা' বলিবার জন্য ব্যাকুল, সেই প্রেমও যেন কবিকে তৃপ্তি দিতে পারিতেছে না; নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দর্যময় কাব্যময় জীবনের মধ্যে কবি আর আনন্দ পাইতেছেন না, এই সংকীর্ণ রুদ্ধ জীবন যেন তাঁহাকে পীড়িত করিতেছে। এই ধরনের বস্তুহীন ভাব-কল্পনার জীবনে কবি অতৃপ্ত, এবং এই অতৃপ্তি অনেক কবিতাতেই লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু সবচেয়ে সুস্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে 'ভৈরবী গান' কবিতাটিতে। বৃহত্তর জীবনের প্রখর দহন, নিষ্ঠুর আঘাত, পাষাণ কঠিন পথ তিনি কামনা করিতেছেন—অশ্রুসজল ভৈরবী গান আর তাঁহার ভাল লাগিতেছে না।

> **ওগো এর চেয়ে ভালো প্রখর দহন,**
> **নিঠুর আঘাত চরণে।**
> **যাব আজীবন কাল পাষাণকঠিন সরণে।**
> **যদি মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় পথ,**
> **সুখ আছে সেই মরণে। ('ভৈরবী গান')**

কিন্তু "মানসী"তে যে দেহ-আত্মার প্রেমলীলায় কবি অতৃপ্তি জ্ঞাপন করিয়াছেন, সেই প্রেমলীলাই "চিত্রাঙ্গদা"র উপজীব্য। "চিত্রাঙ্গদা"র দেহসম্পর্কঘটিত নীতি-দুর্নীতি লইয়া নানা আলোচনা একসময় হইয়াছিল, কিন্তু সে-আলোচনা সাহিত্য-রসালোচনার বিষয়ীভূত নহে।

সাহিত্য-রসাভিব্যক্তির দিক হইতে দেখিতে গেলে "চিত্রাঙ্গদা" যৌবন ও প্রেমলীলার অপূর্ব গীতিকাব্য, এবং এই গীতিকাব্যে দেহ-আত্মার প্রেমলীলা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি আমরা ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি, তাহাই অপূর্ব রূপ ও রসমাধুর্যে অভিষিক্ত হইয়া পরিস্ফুট হইয়াছে। গীতিকাব্য বলিলাম এই জন্য যে, "চিত্রাঙ্গদা"র বহিরঙ্গ অর্থাৎ সাহিত্যাকৃতিই শুধু কাব্য-নাটিকার, উহার সাহিত্য-লক্ষণ গীতি-কাব্যের। উত্তরকালে লিখিত 'কচ ও দেবযানী' যেমন বিশুদ্ধ গীতিকাব্য-লক্ষণাক্রান্ত, "চিত্রাঙ্গদা"ও তেমনই গীতিকাব্যধর্মী; নাটকীয় চরিত্র-রীতি অবলম্বন করা সত্ত্বেও উহা নাট্যলক্ষণাশ্রয়ী নহে।

নরনারীর প্রেমলীলা দেহকেই প্রথম কামনা করে, আকর্ষণ করে, মোহাক্রান্ত হইয়া দেহকেই একান্ত করিয়া পাইতে চায়, ইহা একান্ত সত্য; দেহধর্মের মূল্য নাই, একথা বলা চলে না! কিন্তু যে প্রেম দেহসর্বস্ব হইয়া উঠে, তাহাতে তৃপ্তি নাই, শান্তি নাই, সে প্রেম মিথ্যা। দেহ যেমন সত্য, মনও তেমনই সত্য, আত্মাও সত্য তেমনই, দেহগত প্রেম যেমন সত্য, দেহোত্তীর্ণ দেহাতিরিক্ত প্রেমও তেমনই সত্য। এক মন, আত্মা, হৃদয়, দেহকে অতিক্রম করিয়া আর এক মন, আত্মা, হৃদয়কে পাইতে চায়, স্পর্শ করিতে চায়, এবং তাহা যখন পারে তখনই প্রেমাস্পদকে পূর্ণভাবে জানা যায়, পাওয়া যায়, ভোগ করা যায়। দেহগত প্রেম খণ্ডপ্রেম, তাহা ক্ষণিক, দেহ-আত্মার প্রেম পূর্ণ প্রেম, তাহা নিত্য। অর্জুন যখন এই নিত্য পূর্ণ প্রেমের পরিচয় পাইলেন তখন তিনি ধন্য হইলেন, চিত্রাঙ্গদার নারীজন্মও সার্থক হইল; শাশ্বত নরের সঙ্গে শাশ্বত নারীর মিলন হইল। ইহাই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি, দেহ-আত্মার এই প্রেম-ভাবনাই রবীন্দ্র-চিত্তকে অধিকার করিয়াছে, এবং বার বার নানাস্থানে নানাভাবে এই ভাবনাই বিচিত্র-রূপে ও রসে তিনি উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন।

কিন্তু "চিত্রাঙ্গদা" তত্ত্বসর্বস্ব তো নয়ই, বরং ইহার সৌন্দর্য ও রসমাধুর্য সমস্ত তত্ত্বকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে, সমস্ত তত্ত্ব ইহার রসের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছে। হৃদয়-রহস্যের যে বিচিত্র ও গভীর পরিচয়, সৌন্দর্যপ্রকাশের যে রসঘন রূপ "চিত্রাঙ্গদা"য় অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক উপায়ে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার কাছে যৌন-ভাবনাগত, সমাজ-ভাবনাগত নীতি-দুর্নীতির প্রশ্ন অবান্তর। অতি সুন্দর, অতি মধুর, অতি গভীর ভাবদ্যোতক খণ্ড খণ্ড অংশ উদ্ধৃত করিয়াও "চিত্রাঙ্গদা"র কাব্যমাধুর্যের পরিচয় দেওয়া যায় না ; অর্জুন, চিত্রাঙ্গদা, মদন ও বসন্তের কথোপকথনের ভিতর দিয়া দুইটি হৃদয়ের যে-রহস্য স্তরে স্তরে প্রকাশ পাইয়াছে, যে-ব্যঞ্জনা ও অর্থ-গরিমা তাহাদের বাক্যকে আশ্রয় করিয়াছে, শব্দচয়নে, ধ্বনি-মাধুর্যে এবং ভাব-সংযমে যে নৈপুণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, ইহারা সকলে মিলিয়া "চিত্রাঙ্গদা"কে যে পূর্ণ অখণ্ড রসরূপ দান করিয়াছে তাহার পরিচয় কোনও খণ্ড-অংশে পাওয়া কঠিন। এমন কি

> হায়, আমারে করিল
> অতিক্রম আমার এ তুচ্ছ দেহখানা
> মৃত্যুহীন অন্তরের এই ছদ্মবেশ
> ক্ষণস্থায়ী।

অথবা,

> এই যে সংগীত
> শোনা যায় মাঝে মাঝে বসন্ত সমীরে
> এই মোর বহুভাগ্য।

অথবা,

> গৃহে নিয়ে যাবে ? বলো না গৃহের কথা
> গৃহ চির বরষের ; নিত্য যাহা থাকে তাই
> গৃহে নিয়ে যেয়ো।

অথবা,

বাহুবন্ধে
এসো বন্দী করি দোঁহে দোঁহা প্রণয়ের
সুধাময় চিরপরাজয়।

অথবা,

যখন প্রথম
তারে দেখিলাম, যেন মুহূর্তের মাঝে
অনন্ত বসন্ত পশিল হৃদয়ে। বড়
ইচ্ছা হয়েছিল, সে যৌবন-সমীরণে
সমস্ত শরীর যদি দেখিতে দেখিতে
অপূর্ব পুলকভরে উঠে প্রস্ফুটিয়া
লক্ষ্মীর চরণশায়ী পদ্মের মতন।

ইত্যাদি অংশেও নয়।

নরনারীর যে প্রেমলীলা "চিত্রাঙ্গদা"র উপজীব্য, সেই প্রেমলীলা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের রসচেতনা একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে এ বিষয়ে কবির ব্যক্তিগত কল্পমানসের ইঙ্গিত স্পষ্টতর হইতে পারে।

এই খণ্ড কাব্যটির নায়ক অর্জুন বা নায়িকা চিত্রাঙ্গদা কোনও বিশেষ ব্যক্তি নয়, দুইজনই প্রতীকরূপে কল্পিত। চিত্রাঙ্গদা সমগ্র নারীজাতির কথাই বলিতেছে, এবং ক্ষণকালের জন্য হইলেও অর্জুন ভাবপ্রবণ সৌন্দর্যলালসাহত পুরুষের প্রতীক। কাজেই নায়ক বা নায়িকা কেহই সামাজিক নীতি-নিয়মের অন্তর্ভুক্ত নয়; সেইজন্যই যৌন-সমস্যার সমাধান বা কোনও সামজিক আদর্শও "চিত্রাঙ্গদা" কাব্যের বিষয়ীভূত হইতে পারে না, অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন-চেতনার প্রকাশ এই কাব্যে খুঁজিলে ভুল করা হইবে। তাহা ছাড়া এই ধরনেব প্রয়োজন চেতনা রবীন্দ্রনাথের অন্তর্মুখী আত্মকেন্দ্রিক বাস্তববিমুখ কবিকল্পনার বিরোধী। কিন্তু প্রেম ত ব্যক্তিকে আশ্রয় না করিয়া, ব্যক্তির দেহ-

আত্মাকে আশ্রয় না করিয়া উদ্দীপিত হইতে পারে না; কাজেই ব্যক্তিরূপেই অর্জুন চিত্রাঙ্গদা কল্পনার সৃষ্টি। চিত্রাঙ্গদার ব্যক্তিদেহেই অর্জুনের সম্ভোগতৃপ্তি এবং ব্যক্তি-চিত্রাঙ্গদার অন্তরঙ্গ-উপলব্ধিতেই তাহার পরিণতি।

নরনারীর প্রেমলীলার বিকাশ ও পরিণতির একটা যুক্তি রবীন্দ্র-কবিকল্পনায় কি রূপ লইয়াছে তাহার কিছু পরিচয় আমরা ইতিপূর্বেই "কড়ি ও কোমল" ও "মানসী"তে দেখিয়াছি। পুনরুক্তি না করিয়া "চিত্রাঙ্গদা"য় এ বিষয়ে যে-যুক্তি স্বপ্রকাশ তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। কবির বক্তব্য, চিত্রাঙ্গদা নিজে কুরূপা, কঠোরা, পুরুষধর্মিণী নারী, কিন্তু প্রথম পার্থ-দর্শনেই তাহার সুপ্ত নারীত্ব জাগিয়াছে। অর্জুন কিন্তু চিত্রাঙ্গদার বাহিরের রূপটাই দেখিল এবং দেখিয়া আকৃষ্ট বোধ করিল না। আহত চিত্রাঙ্গদা মদন ও বসন্তের নিকট হইতে রূপ ও যৌবন ধার করিল—ধার করিল অর্জুনকে আকৃষ্ট করিবার জন্যই। তাহার কামনা সার্থকও হইল। অর্জুন সেই ধার করা বাহিরের রূপে প্রলুব্ধ হইয়া চিত্রাঙ্গদার দেহসম্ভোগ করিল; চিত্রাঙ্গদাও সেই দেহ-সম্ভোগের অসহ্য পুলকে আনন্দে বিবশ হইল। কিন্তু পরমুহূর্তেই চিত্রাঙ্গদার মনে হইল অর্জুন তাহার অন্তরঙ্গকে চাহে নাই, পায়ও নাই, এবং সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের রূপ ও যৌবনসৌন্দর্যের প্রতি তাহার ধিক্‌কার আসিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও অর্জুনের বাহুবন্ধনের দেহবন্ধনের মধ্যে বার বার ধরা দিতে সে সংকুচিত হইল না। এদিকে, একান্ত লালসনির্ভর একান্ত দেহনির্ভর জীবনে একদিন অর্জুনের তৃষ্ণা মিটিয়া গেল, সত্যকার চিত্রাঙ্গদাকে জানিবার সে জন্য উন্মুখ হইল। চিত্রাঙ্গদাও তখন ধার-করা বাহিরের রূপ ও যৌবন দূরে ফেলিয়া দিয়া অন্তরের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া অর্জুনের সম্মুখীন হইল, এবং তখনই সম্ভব হইল দুই জনের পূর্ণতর সার্থকতর মিলন। ইহার রবীন্দ্র-কল্পনার যুক্তি।

"চিত্রাঙ্গদায়" কবিকল্পনার এই যুক্তি-প্রকৃতি সম্বন্ধে কবি নিজেই জীবন-সায়াহ্নে একটি মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; তাহার উদ্ধৃতি অবান্তর নয়।

"অনেক বছর আগে রেলগাড়িতে যাচ্ছিলুম শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতার দিকে। তখন বোধ করি চৈত্র মাস হবে। রেল লাইনের ধারে ধারে আগাছার জঙ্গল। হলদে বেগনি সাদা রঙের ফুল ফুটেছে অজস্র। দেখতে দেখতে এই ভাবনা এল মনে যে আর কিছু কাল পরেই রৌদ্র হবে প্রখর, ফুলগুলি তাদের রঙের মরীচিকা নিয়ে যাবে মিলিয়ে—তখন পল্লীপ্রাঙ্গণে আম ধরবে গাছের ডালে ডালে, তরুপ্রকৃতি তার অন্তরের নিগূঢ় রসসঞ্চয়ের স্থায়ী পরিচয় দেবে আপন অপ্রগল্‌ভ ফল সম্ভারে। সেই সঙ্গে কেন জানি হঠাৎ আমার মনে হলো সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছে তাহলে সে তার সুরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতিন বলে ধিক্‌কার দিতে পারে। এ যে তার বাইরের জিনিস, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহ বিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে। যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চরিত্রশক্তি থাকে তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমের পক্ষে মহৎলাভ, যুগল জীবনের জয়যাত্রার সহায়। সেই দানে আত্মার স্থায়ী পরিচয়, এর পরিণামে ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই, অভ্যাসের ধূলিপ্রলেপে উজ্জ্বলতার মালিন্য নেই। এই চারিত্রশক্তি জীবনের ধ্রুব সম্বল, নির্মম প্রকৃতির আশু প্রয়োজনের প্রতি তার নির্ভর নয়। অর্থাৎ এর মূল্য মানবিক, এ নয় প্রাকৃতিক।

"এ ভাবটাকে নাট্য আকারে প্রকাশ-ইচ্ছা তখনি মনে এল, সেই সঙ্গে মনে পড়ল মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার কাহিনী। এই কাহিনীটি কিছু রূপান্তর নিয়ে অনেকদিন আমার মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। অবশেষে লেখবার আনন্দিত অবকাশ পাওয়া গেল উড়িষ্যার পাণ্ডুয়া বলে এক নিভৃত পল্লীতে গিয়ে।" (রবীন্দ্র-রচনাবলী", ৩য় খণ্ড, "চিত্রাঙ্গদার সূচনা, ১৬০ পৃঃ)

যাহা হউক, কবি কল্পনার এই যুক্তির মধ্যে জীবনদর্শনের একটি প্রশ্ন নিহিত। ইতি পূর্বে "কড়ি ও কোমল" এবং "মানসী"-আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের প্রেম-কল্পনা ব্যক্তির কায়া-নিরক্ষেপ, দেহভাবনা-

বিচ্যুত কামনা-বাসনার উর্ধ্বে! দেহকে একেবারে অস্বীকার করা হয় না সত্য, কিন্তু দেহভাবনা, রূপবাসনা এক মুহূর্তে ভাবলোকে রূপান্তরিত হইয়া যায়; স্বতন্ত্র আত্মকেন্দ্রিক রসপ্রেরণার বশে প্রেম ও ভালবাসা ব্যক্তির একটি ভাবমূর্তিকে আশ্রয় করে এবং তাহাকেই সার্থক জীবনাদর্শ ও পূর্ণতর জীবনদর্শন বলিয়া ঘোষণা করে। এই জীবনাদর্শে ও জীবনদর্শনে দেহ ও আত্মার অর্থাৎ জীবনসত্তার ভিতর ও বাহির এই দুইয়ের পৃথক অস্তিত্বের কল্পনা অনিবার্য, দুইয়ের মধ্যে একটা বিরোধ-কল্পনাও সমান অনিবার্য। সেই পৃথক অস্তিত্ব ও বিরোধ রবীন্দ্রনাথের উত্তর জীবনের অনেক রচনাতেই সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। এ কথা সত্য যে নানা আধারে, নানা বিষয়বস্তুর অবলম্বনে এই কল্পনার বিভিন্নরূপ ও বিভিন্ন ভঙ্গি, কিন্তু মূলত ইহার প্রকৃতি একই; দেহ ও আত্মার ধর্মের বিরোধ-বৈপরীত্যের কল্পনা, পৃথক অস্তিত্বের কল্পনা সর্বদাই উপস্থিত এবং দেহধর্মের উপরে, তাহাকে অতিক্রম করিয়া আত্মার প্রেমের অস্তিত্ব এমন কি তাহার জয়-ঘোষণাও কবিকল্পনার অন্তর্গত। স্বল্পায়তন, ব্যক্তিসম্পর্কহীন, একান্ত ভাবাশ্রয়ী গীতিকবিতায় নরনারীর প্রেমলীলার এই আদর্শ ও দর্শন সহজেই একটি অখণ্ড রসমূর্তি ধারণ করে; যে বিরোধ-বৈপরীত্যের কথা বলিয়াছি তাহা সেক্ষেত্রে কিছু বাধা বা অসংগতির সৃষ্টি করে না, অন্তত পাঠকের তাহা চিত্তগোচর হয় না। কিন্তু এই প্রেমলীলাই যেখানে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে আশ্রয় করে, যেখানে বিশেষ ঘটনা-সংস্থানের ভিতর দিয়া সেই লীলা বিকশিত হয়, বিশেষ বিশেষ চরিত্র ঘটনাগুলিকে আশ্রয় করিয়া নিজেদের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করে, যেমন "চিত্রাঙ্গদা"য় করিয়াছে, সেখানে প্রেমলীলা সম্বন্ধে কবির স্বতন্ত্র আত্মকেন্দ্রিক কল্পনা ও ভাবাদর্শ জীবন-ধর্মের সঙ্গে যে বিরোধ সৃষ্টি করে, তাহাতে প্রেমলীলায় দেহ ও আত্মার পৃথক অস্তিত্বের কল্পনাগত উপরোক্ত জীবনাদর্শ ও জীবনদর্শনের খণ্ডতা

ও অপূর্ণতা ধরা পড়িয়া যায়। "চিত্রাঙ্গদা" কাব্যে তাহার পরিচয় উপস্থিত। কথাটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

চিত্রাঙ্গদা অর্জুনের প্রতি আকৃষ্ট; কুরূপা কঠোরা বলিয়া অর্জুন বিরূপ। চিত্রাঙ্গদা রূপ ও যৌবন ধার করিয়া নিজের দেহকে সমৃদ্ধ করিল অর্জুনকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য। অর্জুন প্রলুব্ধ হইল এবং চিত্রাঙ্গদার দেহে তাহার সম্ভোগ তৃপ্ত হইল। চিত্রাঙ্গদা কিন্তু প্রথম হইতেই জানে অর্জুন মিথ্যার উপাসনাই করিতেছে, যথার্থ চিত্রাঙ্গদার স্বরূপ সে কামনা করিতেছে না, তাহার অস্তিত্বের খবরও হয়ত সে জানে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও চিত্রাঙ্গদা অর্জুনের 'তৃষার্ত কম্পিত' কামনার আলিঙ্গনে নিজেকে স্বেচ্ছায় ধরা দিল, ফিরাইতে চেষ্টা করিয়াও পারিল না পারা সম্ভবও নয়—

> হায়, হায়, সে কি ফিরাইতে পারি। সেই
> থরথর ব্যাকুলতা বীর-হৃদয়ের,
> তৃষার্ত কম্পিত এক স্ফুলিঙ্গ নিশ্বাসী
> হোমাগ্নি শিখার মতো; সেই নয়নের
> দৃষ্টি যেন অন্তরের বাহু হয়ে কেড়ে
> নিতে আসিছে আমায়, উত্তপ্ত হৃদয়
> ছুটিয়া আসিতে চাহে সর্বাঙ্গ টুটিয়া,
> তাহার ক্রন্দন ধ্বনি প্রতি অঙ্গে যেন
> যায় শুনা। এ তৃষ্ণা কি ফিরাইতে পারি?

যাহাই হউক, তাহার ফলে

> শুনিলাম, "প্রিয়ে প্রিয়তমে!"
> গম্ভীর আহ্বানে, মোর এক দেহমাঝে
> জন্ম জন্ম শত জন্ম উঠিল জাগিয়া।
> কহিলাম "লহ লহ যাহা কিছু আছে
> সব লহ জীবন-বল্লভ।" দুই বাহু

দিলাম বাড়ায়ে।—চন্দ্র অস্ত গেল বনে,
অন্ধকারে ঝাঁপিল মেদিনী। স্বর্গ মর্ত্য
দেশকাল দুঃখ সুখ জীবন মরণ
অচেতন হয়ে গেল অসহ্য পুলকে।

কিন্তু প্রায় পরমুহূর্তেই চিত্রাঙ্গদা মদনকে বলিল,

কারে, দেব, করাইলে পান! কার তৃষা
মিটাইলে। সে চুম্বন, সে প্রেমসংগম
এখনো উঠিছে কাঁপি যে-অঙ্গ ব্যাপিয়া
বীণার ঝংকার সম, সে তো মোর নহে।
বহুকাল সাধনার এক দণ্ড শুধু
পাওয়া যায় প্রথম মিলন, সে মিলন
কে লইল লুটি, আমারে বঞ্চিত করি।

স্পষ্টতই দেখা যায়, চিত্রাঙ্গদা সমস্ত দেহচিত্তমন দিয়া অর্জুনসঙ্গসুখ উপভোগ করিতেছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে ইহাও বুঝিতেছে যে, যে-দেহ এই সুখ উপভোগ করিতেছে সে-দেহ তাহার দেহ নহে, যে নিবিড় মিলনে তাহার দেহ কাঁপিয়া উঠিতেছে সেই পরম দুর্লভ মিলন তাহার 'আমি'কে বঞ্চিত করিতেছে। এ কথা দুর্বোধ্য নয় যে, যে রূপ-যৌবন তাহার দেহকে আশ্রয় করিয়াছে সে-রূপযৌবন ধার করা, তাহা বাহিরের বস্তু; সেই হেতু তাহার প্রতি চিত্রাঙ্গদার ঈর্ষা ও আক্রোশ প্রবল, তাহাকে সে ঘৃণা করে। কিন্তু দেহ তাহার নিজের, তাহা ত সে ধার করে নাই; সেই দেহেই তাহার 'আমি', তাহার গভীরতর সত্তার বাস, সেই দেহের প্রতি অণু প্রতি রক্তবিন্দু জুড়িয়াই ত আত্মার, অর্থাৎ গভীরতর সত্তার বিস্তৃতি। এবং, সেই জন্যই দেহসুখ যখন সে ভোগ করিতেছে তখন সে শুধু দেহ দিয়াই ভোগ করিতেছে না, সমস্ত

গভীরতম সত্তা দিয়াই ভোগ করিতেছে। আত্মদানধর্মী প্রেমের লীলাই এইরূপ, আত্মবিস্মরণই প্রেমের ধর্ম। অথচ

> আজ প্রাতে উঠে, নৈরাশ্যধিক্কার বেগে
> অন্তরে অন্তরে টুটিছে হৃদয়। মনে
> পড়িতেছে একে একে রজনীর কথা।
> বিদ্যুৎবেদনাসহ হতেছে চেতনা
> অন্তরে বাহিরে মোর হয়েছে সতিন
> আর তাহা নারিব ভুলিতে। সপত্নীরে
> স্বহস্তে সাজায়ে সযতনে, প্রতিদিন
> পাঠাইতে হবে, আমার আকাঙ্ক্ষাতীর্থ
> বাসরশয্যায়; অবিশ্রাম সঙ্গে রহি
> প্রতিক্ষণ দেখিতে হইবে চক্ষু মেলি
> তাহার আদর। ওগো, দেহের সোহাগে
> অন্তর জ্বলিবে হিংসানলে, হেন শাপ
> নরলোকে কে পেয়েছে আর।

ধার করা রূপ-যৌবনের সতিনত্ব কল্পনা কিছু অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নয়; কিন্তু, নিজের দেহ, যে-দেহ পরিপূর্ণ সত্তার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত সেই দেহের পরিপূর্ণ মিলন-সম্ভোগেও আত্মা দূরে দাঁড়াইয়া দেহের সতিনত্ব কল্পনা করিতেছে, ইহা যে বস্তুধর্ম, জীবন-ধর্ম বিরোধী। এই স্বাতন্ত্র্য, এই পৃথক অস্তিত্ব, এই বিরোধ-কল্পনা 'অ্যাবস্ট্রাক্ট' কল্পনা মাত্র; ইহা আত্মাভিমান ও আত্মস্বাতন্ত্র্যের কল্পনা, আত্মদানধর্মী প্রেমের কল্পনা নয়। এই জীবনাদর্শ ও জীবনদর্শন খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ; অখণ্ড জীবনদর্শনে দেহ-আত্মার কোন বিরোধ নাই, একটি আর একটিকে পূর্ণতা দান করে, একটি আর একটির অপেক্ষা রাখে, একজনের সুখে আর একজন সুখী হয়। দুইয়ের ভারসাম্য অনেক সময় নষ্ট হয়, ব্যাহত হয়, আঘাতে প্রত্যাঘাতে বিপর্যস্ত

হয় ; কিন্তু জীবনধর্মের অমোঘ নিয়মেই তাহা ভারসাম্য ফিরিয়া পাইতে চায়। সেই প্রয়াসই ত প্রেমলীলা। এ লীলায় সতিন-কল্পনার স্থান কোথায় ? "চিত্রাঙ্গদা" কাব্যের পরিণতিই সেই তারতম্য প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত, কিন্তু সেই পরিণতিতে পৌঁছিবার জন্য প্রেমবিকাশের আদি ও মধ্য স্তরে দেহকে আত্মার সতিন বলিয়া কল্পনা করা জীবনধর্মের বিরোধিতা। চিত্রাঙ্গদার দেহ-সেতু অবলম্বন করিয়াই ত অর্জুন সম্পূর্ণ চিত্রাঙ্গদাকে পাইল, চিত্রাঙ্গদাও ত নিজের দেহের অসহ্য পুলকের ভিতর দিয়া সম্পূর্ণ অর্জুনকে পাইল, সম্পূর্ণ নিজেকে দিল, অথচ সেই দেহকেই সে করিয়াছিল অস্বীকার, তাহাকেই দিয়াছিল নৈরাশ্য-ধিক্কার। এই কল্পনা যদি রসিক পাঠকেরও সংস্কারে বাধে তাহা হইলে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় কি ? কারণ ইহা ত সামাজিক নীতি-দুর্নীতির সংস্কার নয়, প্রয়োজন-চেতনার সংস্কার নয়, ইহা যে জীবনের গভীরতম সত্যের সংস্কার, ইহা যে জীবনরসরসিকের সংস্কার ! এইজন্যই কি অধ্যাপক রোলো "চিত্রাঙ্গদা" আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "Surely this is heresy both to beauty and to love" ?

কিন্তু, তাহা সত্ত্বেও, বাস্তববিমুখ, আত্মভাবনাকেন্দ্রিক, স্বতন্ত্র ও অন্তর্মুখী কবি-কল্পনায় ইহা সম্ভব হইল। সম্ভব হইল শুধু কবির ব্যক্তি-গত একান্ত স্বতন্ত্র, ভাবসর্বস্ব দৃষ্টিভঙ্গির ফলে, সেই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি ঐকান্তিক প্রত্যয়ের এবং বহুলাংশে খণ্ড খণ্ড স্তবকের অতি সুন্দর অর্থ-ব্যঞ্জক উক্তির, নাটকীয় সংস্থানের এবং সমগ্র কাব্যটির অনবদ্য নির্মাণ-কৌশলের ফলে। ভাবানুভূতির সূক্ষ্মতা, বর্ণনার গৌরব, কামনা-বাসনার মৃদু ও তীব্র সৌরভ, চিত্রমহিমা এবং ভাবব্যঞ্জনা "চিত্রাঙ্গদা"কে অপরূপ কাব্যমূল্য দান করিয়াছে। সত্যই "চিত্রাঙ্গদা"র কাব্যমহিমার দীপ্তিতে নরনারীর প্রেমরহস্য আলোকিত।

(৪)

সোনার তরী (১২৯৮—১৩০০)

বিদায় অভিশাপ (১৩০০)

চিত্রা (১৩০০—১৩০২)

চৈতালি (১৩০২—১৩০৩)

"মানসী" ও "চিত্রাঙ্গদা"য় প্রেম ও সৌন্দর্যকে দেহোত্তীর্ণ করিয়া বৃহত্তর প্রেমলীলার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে পূর্ণ ও অখণ্ডরূপে পাইবার যে আকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিত আমরা পাই, তাহা সমসাময়িক "রাজা ও রানী" নাটকেও লক্ষ্য করা যায়। এই আকাঙ্ক্ষা সার্থকতা লাভ করিল "সোনার তরী," "চিত্রা," ও "চৈতালি,"তে এবং পরবর্তী কয়েকটি কাব্যে। এই কাব্য কয়টিতে, বিশেষভাবে "সোনার তরী" ও "চিত্রা"য় দেহোত্তর প্রেম ও পরিপূর্ণ বিশ্বসৌন্দর্যানুভূতি অপূর্ব গরিমায় ও অনির্বচনীয় ভাব-গভীরতায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই সময়ের রচনা হইতে প্রথমেই যে জিনিসটি আপনি ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহা হইতেছে, মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্মবোধ, কবির একান্ত তন্ময় দৃষ্টি, নিবিড় নিসর্গসম্ভোগ। সৃষ্টির অতি তুচ্ছতম জিনিসও কবির দৃষ্টি এড়াইতেছেনা, সকল কিছুর মধ্যেই তিনি অপরিসীম প্রেম ও সৌন্দর্যের বিকাশ দেখিতে পাইতেছেন, সকল পদার্থ মিলিয়া তাঁহার প্রাণে এক অপরূপ মায়ালোক সৃজন করিতেছে। কিন্তু শুধু এইটুকু মাত্র যদি হইত তবে ভাল করিয়া বুঝিবার তেমন কিছু হয় ত থাকিত না। এই ব্যাপকতর প্রেম ও সৌন্দর্যানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে আর একটি গভীরতম সত্য অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়াইয়া আছে। প্রেম ও সৌন্দর্য শুধু কবি-কল্পনায় ভাসিয়া বেড়াইবার অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া পক্ষ গুটাইয়া 'বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা, বহু দিবসের সুখ দুঃখ আঁকা, লক্ষ যুগের সংগীতমাখা' এই সুন্দরী ধরণীর উপর স্থির হইয়া বসিয়াছে।

সর্বত্র সকল প্রেম, সকল সৌন্দর্য বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করিবার তীব্র চেষ্টা ও আবেগ। জীবনকে গভীর ভাবে স্পর্শ করিতে না পারিলে সকল প্রেম, সকল সৌন্দর্য, সকল অনুভূতি যে ব্যর্থ হইয়া গেল; তাই "সোনার তরী," "চিত্রা," "চৈতালি," এবং পরবর্তী কালের "কল্পনা", "ক্ষণিকা" প্রভৃতি কাব্য কয়খানি জুড়িয়া সকল বৈচিত্র্যকে এক করিবার, খণ্ড খণ্ড সমস্ত ভাব চিন্তা ও অনুভূতির কবিস্বময় গভীর তত্ত্বরহস্যটি আবিষ্কার করিয়া তাহাকে এক অখণ্ডরূপে প্রকাশ করিবার, সকল বিচ্ছিন্ন আনন্দ, সৌন্দর্য ও প্রেমের অন্তর্গূঢ় মহিমা উপলব্ধি করিবার, তাহাকে ভাবময় রূপে অপূর্ব ব্যঞ্জনায় ব্যক্ত করিবার, সমস্ত প্রেম ও সৌন্দর্যকে ভোগলিপ্সা ও পার্থিব আনন্দ হইতে বিচ্যুত করিয়া সম্পূর্ণ প্রেম ও সৌন্দর্যের বিশুদ্ধ 'অ্যাবস্ট্রাক্ট' মূর্তিতে হৃদয়ের মধ্যে ধারণ করিবার সার্থক চেষ্টায় ভরিয়া উঠিয়াছে। "সোনার তরী" ও "চিত্রা" কাব্যেই তাহার জীবন নিজের মনের বস্তুহীন কল্পনার মধ্য হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বস্তুময় বৃহত্তর জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিল সঙ্গে সঙ্গে সংসারের দৈনন্দিন জীবনের রূপও এক নূতন সৌন্দর্যময় আনন্দময়রূপে কবির চোখে ধরা পড়িল; শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান, সবল কল্পনা ও গভীরতর ভাব-রহস্যে সমৃদ্ধিলাভ করিল। বাক্য, পদ ও শব্দ ভাব-ব্যঞ্জনায় অনির্বচনীয় হইয়া উঠিল; ব্যঞ্জনা ও ধ্বনির মূল্য যেন কবি এই প্রথম আবিষ্কার করিলেন।

শুধু ভাবসমৃদ্ধিই এই কাব্য কয়খানির একমাত্র লক্ষণীয় বিষয় তাহা নহে, যে ছন্দ ও অপূর্ব শব্দচয়ননৈপুণ্যকে আশ্রয় করিয়া এই ভাব রূপলাভ করিয়াছে, তাহাতেও এই সমৃদ্ধি সুপরিস্ফুট। ছন্দের যে তারল্য এতকাল কবিকে চঞ্চল তালে নাচাইয়াছে, যে অনির্দিষ্ট রূপ তাঁহাকে এতকাল স্থির হইতে দেয় নাই, সে চঞ্চলতা, সে-অস্থিরতা, এখন নিবৃত্তি লাভ করিয়া সর্বত্র একটা শান্ত সংযম ও অপূর্ব ধ্বনির

গাম্ভীর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। "সোনার তরী"র 'পরশপাথর,' 'যেতে নাহি দিব,' 'সমুদ্রের প্রতি" 'মানস-সুন্দরী,' 'বসুন্ধরা,' প্রভৃতি কবিতায়, "চিত্রা"র 'প্রেমের অভিষেক,' 'এবার ফিরাও মোরে', 'উর্বশী,' 'স্বর্গ হইতে বিদায়' প্রভৃতি কবিতায়, "চৈতালি"র সনেটগুলিতে, "কাহিনী"র কবিতাগুলিতে, "কল্পনা"র 'অসময়,' 'দুঃসময়,' 'অশেষ,' 'বর্ষশেষ', 'বৈশাখ' প্রভৃতি কবিতাগুলিতে এবং এই যুগের আরও অনেক কবিতায় এমন একটা সংযত শক্তি ও গাম্ভীর্য আপনি ধরা দিয়াছে যাহা পূর্বে কোথাও খুঁজিয়া পাই না। জীবনের নূতন দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশের এই অনির্বচনীয় ভঙ্গিমা কবি নিজে সৃষ্টি করিলেন, এবং দুইয়ে মিলিয়া এই সময়ের কবি-জীবনকে অপূর্ব সমৃদ্ধি দান করিল। এই যুগের যে কোনও কাব্য পাঠ করিলেই রসিক বোদ্ধা পাঠকের মনে হইবে, কবি নিজের শক্তির সন্ধান পাইয়াছেন, এবং সে-শক্তি সম্বন্ধে তিনি সচেতন। বস্তুত রূপৈশ্বর্যে, আনন্দোল্লাসে, আবেগময় বর্ণনায়, ভাবরহস্যে, মনন শক্তিতে, ধ্বনির গভীরতায়, ছন্দগরিমায়, কল্পনার সবলতায়, প্রতিভার দীপ্তিতে, এমন কি সংযমহীন বর্ণনার আতিশয্যে রবীন্দ্রনাথের এই যুগের কবিজীবন যে অখণ্ড সৌন্দর্যলোক সৃষ্টি করিয়াছে তাহার তুলনা "বলাকা" ও "পূরবী"র কবি-জীবন ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না।

কিন্তু অপূর্ব অনির্বচনীয় এই কাব্যলোক হইতেও উত্তর জীবনে আমরা দেখিব, কবি একদিন স্বেচ্ছায় বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, রসমাধুর্যে কানায় কানায় ভরা এই কবি-জীবনও তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারেন নাই। কোন্ ভাবলোকে এই যৌবন ও সৌন্দর্যসম্পদ বন্দী হইয়াছিল, এবং পরে "বলাকা" ও "পূরবী"তে নূতন দানে, নূতন ভাবতত্ত্বে ও নূতন ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ হইয়া কি করিয়া তাহা মুক্তিলাভ করিয়াছিল, তাহার পরিচয় আমরা ক্রমশ পাইব।

"সোনার তরী-চিত্রা-চৈতালি"র যুগকে কেহ কেহ জীবনদেবতা ভাব-প্রত্যয়ের যুগ বলিয়া থাকেন, এবং এই বই কয়টির অনেক কবিতাতেই তাঁহারা এই ভাব-প্রত্যয়ের প্রকাশ দেখিয়া থাকেন। জীবন-দেবতা ভাব-প্রত্যয় সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এই গ্রন্থের অন্যত্র ('রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বজীবন' প্রবন্ধ) আমি করিয়াছি। এই ভাব-রহস্যের উৎস যে কোথায় তাহাও কতকটা নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এখানে এইটুকু শুধু বক্তব্য যে, এই ভাব-প্রত্যয় এই যুগেরই বৈশিষ্ট্য নয়; বস্তুত রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের উৎসই এই ভাব-রহস্য। যে-নিসর্গানুভূতি "সন্ধ্যা-সংগীত" হইতে আরম্ভ করিয়া "মানসী," "চিত্রাঙ্গদা" পর্যন্ত তাঁহার কাব্যে প্রাণরস সঞ্চার করিয়াছে, সেই নিসর্গানুভূতিই যত সত্য ও সার্থক হইয়া উঠিয়াছে, জীবনদেবতার ভাব-রহস্যও তত স্পষ্ট ও নিবিড়, সত্য, সার্থক ও গভীর হইয়াছে। "সোনার তরী" অপেক্ষাও "চিত্রা"য় "চৈতালি"তে ও "কল্পনা"য় ইহার স্পষ্টতর গভীরতর পরিচয় আছে। এই ভাব-প্রত্যয়ের সৌন্দর্য ও রহস্য পরবর্তীকালে কখনও রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসকে পরিত্যাগ করে নাই। "খেয়া", "গীতাঞ্জলি", "গীতিমাল্য", "গীতালি"তে তাহা তাঁহার সুগভীর অধ্যাত্ম রসানুভূতির মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে মাত্র এবং ক্রমশ তাঁহার সমগ্র কাব্য-চেতনার অংশ হইয়া পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে। জীবনদেবতা শুধু তাঁহার কাব্যলক্ষ্মী মাত্র হইয়া থাকেন নাই, তিনি কবির সঙ্গে একাসনে বসিয়া, এক চিত্তাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া সমগ্র জীবন, সমগ্র ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়াতীত জগতকে রূপদান করিতেছেন। এই ভাব-প্রত্যয় কতটুকু সত্য, কতখানি বিজ্ঞান-গ্রাহ্য রবীন্দ্র-কাব্যালোচনার দিক হইতে সে প্রশ্ন অবান্তর; তবে কালানুক্রমিক রবীন্দ্রকাব্য পাঠ করিলে এই কথাই সত্য মনে হয় যে, সুনিবিড় নিসর্গানুভূতিই জীবনদেবতা ভাব-প্রত্যয়ের মূলে; এবং এই

অনুভূতি সত্য ও সার্থক হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই "সোনার তরী-চিত্রা-চৈতালি"র কবিতাগুলিতে, বিশেষভাবে যে-সব কবিতায় মানব জীবন ও প্রকৃতির, ব্যাপকভাবে বলিতে গেলে নিসর্গের, সুগভীর রহস্য বিচিত্রভাবে সবল কল্পনায় এবং গভীর প্রেম ও আত্মীয়তায় প্রকাশ পাইয়াছে সেই সব কবিতাই এই যুগের কবিমানসকে অপূর্ব দীপ্তিদান করিয়াছে। এই জন্যই এই যুগের নিসর্গ কবিতাগুলি শুধু অনির্বচনীয় অবর্ণনীয় প্রকৃতি-চিত্র অঙ্কিত করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, অনুভূতি সত্য ও নিবিড় হইয়াছে বলিয়া তাহার মধ্যে একটা সুগভীর প্রেম, একটা করুণ কোমলতা, একটা বেদনা-আনন্দোজ্জ্বল দীপ্তিও সহজেই সঞ্চারিত হইয়াছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানব একাত্ম হইয়া গিয়াছে, একের সুখ ও দুঃখ, বেদনা ও আনন্দ, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অন্যের কাছে সত্য ও নিবিড়, একের সৌন্দর্য ও প্রেম অন্যের ভাব-ভাবনার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং দুইয়ে মিলিয়া এক অনির্বচনীয় অনুভূতির সৃষ্টি করিয়াছে। মানুষের প্রেম মুহূর্তে নিসর্গের মধ্যে বিস্তারিত হইয়া যায়, নিসর্গের যত অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের স্বপ্ন, যত দৃশ্য, যত কথা, যত গান মানুষ সব কিছুকে নিজের মধ্যে প্রেমে টানিয়া লয়, তাহার সঙ্গে ব্যথায় ও আনন্দে জড়াইয়া বাঁধে—কবির এই অনুভূত সত্যই "সোনার তরী" হইতে আরম্ভ করিয়া "কল্পনা" পর্যন্ত এবং পরে "বলাকা" ও "পূরবী"তে অপূর্ব ভাবে ও সৌন্দর্যে ব্যক্ত হইয়াছে। যে সমস্ত কবিতা এই কাব্যগুলিকে তাহাদের কাব্য-মূল্য দান করিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটিতেই আমার এই উক্তির প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

'সোনার তরী' কবিতাটি লইয়া তত্ত্বালোচনা এত বেশি হইয়াছে যে, তাহার আবর্তে পড়িয়া পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ নিজেও খানিকটা তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস করিয়াছেন—হয়তো তত্ত্বান্বেষী পাঠকদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য; কিন্তু শ্রাবণের ঘনবর্ষা, দুকূলভরা খরস্রোতা নদী,

দ্রুতবহমান তরী, দুই তীরের বৃষ্টিমুখর কাশ-বাঁশ-সুপারির বন, তীরের উপর কাটা ধানের স্তূপ, কর্মরত নগ্নগাত্র বৃষ্টিস্নাত কৃষককুলের নিরলস ব্যস্ততা, ধান-বোঝাই নৌকা সমস্ত মিলিয়া মানুষের প্রাণে এক অব্যক্ত আকুলতার সৃষ্টি করে; তাহার সঙ্গে আসিয়া মেশে বর্ষার চিরন্তন সুগভীর বেদনা, এবং দুইয়ে মিলিয়া স্পর্শকাতর চিত্তে এক অপরূপ বেদনাপ্লুত রস ও সৌন্দর্যের অপূর্ব রাগিণী সৃষ্টি করে। সেই রাগিণীই 'সোনার তরী' কবিতাটিতে ধরা পড়িয়াছে। ইহার কাছে তত্ত্ব অবান্তর; তত্ত্ব নাই—এ কথা বলি না, কিন্তু যেটুকু আছে তাহা তুচ্ছ। এই সুনিবিড় রাগিণী যাঁহারা কবি-হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারই জানেন, মানুষ চায় তাহার সমস্ত সঞ্চিত ধন ও ঐশ্বর্য, এমন কি নিজেকেও ইহার কাছে বিসর্জন দিতে, ইহার হাতে তুলিয়া দিতে; এমন ভাব-মুহূর্ত মানুষের জীবনে আসে; কিন্তু মানুষ সব দিতে পারে না; সমস্ত ধন, সমস্ত ঐশ্বর্য নিঃশেষে তুলিয়া দিবার পরও মনে হয়, কোথায় যেন কি এখনও নিজেকে ভারগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে; তখন সে নিজেকে চায় একান্ত ভাবে দান করিতে, কিন্তু মধুর নিষ্ঠুর প্রকৃতি মানুষের সে দান গ্রহণ করে না, মানুষ তখন নিজের ভার লইয়া পড়িয়া থাকে, তাহার অন্তর বেদনায় ভরিয়া উঠে।

যত চাও তত লও তরণী 'পরে।
আর আছে?—আর নাই, দিয়েছি ভরে।
এতকাল নদীকূলে
যাহা লয়ে ছিনু ভুলে
সকলি দিলাম তুলে
থরে বিথরে,
এখন আমারে লহ করুণা করে।

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।
শ্রাবণ-গগন ঘিরে
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি,—
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।

এই যে শূন্য নদীর তীরে একা পড়িয়া থাকার বেদনা, মানুষ যে নিজেকে একান্ত করিয়া দান করিতে পারে না, সে যে কোন কোন ভাব-মুহূর্তে মনে করে নিষ্ঠুর প্রকৃতি তাহার সঞ্চিত ঐশ্বর্য লইয়া যায়, তাহাকে লয় না, ইহা ত কোনও তত্ত্ব নয়, অনুভূত ভাব মাত্র, হয় ত যে-মুহূর্তের অনুভূতির মধ্যে ধরা দিয়াছে এই প্রত্যয় পরমুহূর্তের অনুভূতির মধ্যে নাই। কাজেই তত্ত্ব-প্রত্যয় লইয়া বিব্রত হইবার কারণও নাই; কবি যে বিব্রত হইয়াছেন তাহার প্রমাণও কবিতায় নাই। কিন্তু এই অতৃপ্তি ও বেদনাটুকু জীবনের অমোঘ সত্য, এবং এই সুগভীর বেদনা শ্রাবণবর্ষার চিরন্তন বেদনার সঙ্গে মিলিয়া 'সোনার তরী' সৃষ্টি করিয়াছে। কাব্যরস ও সৌন্দর্য উপলব্ধির জন্য ইহাই যদি যথেষ্ট মনে না হয়, তাহা হইলে তত্ত্ব কতটুকু সাহায্য করিবে। 'সোনার তরী' নিসর্গের অনুভূতিই আমাদের কাছে নিকটতর করিতেছে, মানুষের চিত্তরহস্য তাহার ভাব ও অনুভূতি যে নিসর্গানুভূতির সঙ্গে, নিসর্গ রহস্যের সঙ্গে কতখানি একাত্ম, রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত এই উপলব্ধিই আমাদের মনে জাগাইতেছে। রবীন্দ্র-কাব্য-প্রবাহের দিক হইতে এই কথাটুকুই আমাদের জানিবার; 'সোনার তরী' কবিতা, অথবা এই যুগের অন্যান্য নিসর্গ কবিতাগুলি যে শুধু শব্দচিত্র মাত্র নয় এইটুকুই বুঝিবার।

'শৈশব সন্ধ্যা', 'নিদ্রিতা', 'সুপ্তোত্থিতা,' 'তোমরা ও আমরা' প্রভৃতি কবিতাকেও ব্যাপকভাবে নিসর্গ কবিতা বলা যাইতে পারে;

ইহাদের মধ্যে যে অপরূপ সৌন্দর্য-চিত্র আছে তাহা সেইখানেই শেষ হইয়া যায় না, মানুষের চিত্ত-রহস্যের সঙ্গে এই সৌন্দর্য-সম্বন্ধের মধ্যেই এই জাতীয় কবিতাগুলির কাব্য-মূল্য। এই যে মানুষের সঙ্গে নিসর্গের একাত্মতা, প্রেম, সৌন্দর্য, নিসর্গের যাহা কিছু একান্ত কামনার মানুষই তাহার মূল্য নিরূপণ করে, মানুষের জন্যই তাহার যত মূল্য, এমন কি দেবতার জন্য মানুষের প্রেম যে অনন্তকাল ধরিয়া সঞ্চিত হইয়া আছে, নিসর্গের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া আছে তাহাও মানুষের উপ-ভোগের জন্যই, এই কথাই 'বৈষ্ণব-কবিতা'য় ব্যক্ত হইয়াছে। মানুষের প্রেম, মানুষের ভালবাসা, মানুষের বেদনাই যে নিসর্গের অমোঘ সত্য, মৃত্যু এবং বিচ্ছেদকেও তাহা যে অপরূপ অর্থদান করে, মানুষকে তুচ্ছ অথবা মহিমান্বিত করে, তাহা ব্যক্ত হইয়াছে 'যেতে নাহি দিব' এবং 'প্রতীক্ষা' কবিতায়। নিসর্গের অমোঘ সত্য এবং মানবলোকের একটি সকরুণ মুহূর্ত দুইয়ে মিলিয়া যে কি অনির্বচনীয় কাব্যরূপ লাভ করিতে পারে, 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটি তাহার প্রমাণ; ইহার তুলনা বিশ্বসাহিত্যেও খুব বেশি নাই। প্রকৃতির সঙ্গে সুগভীর একাত্মতা প্রকাশ পাইয়াছে 'মানস-সুন্দরী' 'বসুন্ধরা' 'সমুদ্রের প্রতি' প্রভৃতি কবিতায়, এবং তাহার আনন্দোল্লাস, আবেগোচ্ছ্বাস অপূর্ব ছন্দে ও ধ্বনিতে উৎসারিত হইয়াছে 'বিশ্বনৃত্য' ও 'ঝুলন' কবিতায়।

উল্লিখিত কবিতাগুলির প্রত্যেকটিই এমন এক একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, অনবদ্য সৃষ্টি যে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া ইহাদের ব্যাখ্যার অতীত, বর্ণনার অতীত, বচনের অতীত রস ও সৌন্দর্যের পরিচয় দিবার ব্যর্থ চেষ্টা আমি করিব না।

এই যে নিবিড় নিসর্গ-সম্ভোগ এই নিসর্গের সঙ্গে মানবহৃদয়ের প্রতি মুহূর্তের একটা নিবিড় আত্মীয়তার উপলব্ধি. এই দুইয়ে মিলিয়া "সোনার তরী" ও "চিত্রা"র কবিতাগুলিকে এমন সরস, রমণীয় ও

উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। বস্তুত এমন তন্ময় হইয়া দেখা, এবং শুধু দেখা নয়, দেখার আনন্দে দেহ চিত্ত মন রাঙাইয়া রসাইয়া তোলা এবং সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত বাণীবন্যায় নিজেকে ভাসাইয়া দেওয়া, গীতচ্ছন্দে নূপুর বাজাইয়া নানা ভঙ্গিতে নাচিয়া ছুটিয়া চলা, এমন অপূর্ব ভাবোন্মাদনা এই পর্বের পরে আর দেখা যাইবে না। কবিতাগুলি পড়িতে পড়িতে কত বিচিত্র বর্ণের ও গন্ধের ছবি যে চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে, একটির পর একটি যেন মালা গাঁথিয়া চলিয়াছে। এই চিত্ররূপ যে শুধু 'যেতে নাহি দিব' বা 'মানস সুন্দরী' প্রভৃতি কবিতারই বৈশিষ্ট্য তাহা নয়; মায়াময় স্বপ্নময় সুকোমল চিত্রমোহে এই দুটি গ্রন্থের প্রায় সব কবিতাই আমাদের অভিভূত করিয়া দেয়। আর, সেই চিত্ররূপ একান্তই পদ্মাবিধৌত সুবিস্তীর্ণ সমতট বাংলার স্নিগ্ধ শ্যামল সরস রূপ। সেই রূপকে আশ্রয় করিয়াই অরূপের অনির্বচনীয়ের যত কিছু আভাস ও ব্যঞ্জনা, ইঙ্গিত ও আকুতি। ছবির পর ছবি, উপমার পর উপমা, রঙের পর রং, আবেগে উত্তাপে উচ্ছ্বাসে যেন দুর্বার গতির শোভাযাত্রায় চলিয়াছে—একদিকে এক অপরূপ নিসর্গ-সম্ভোগ, আর একদিকে মানবজীবনের বিচিত্র স্পন্দনে নিজের মধ্যে নিবিড় স্পন্দনানুভূতি। যে মানুষের জীবন ছিল আড়ালে, যাহার সম্বন্ধে চিত্তের সজাগ অনুভূতি এতদিন বিশেষ ছিল না, আজ যেন পদ্মার দুই তীর হইতে সেই মানবজীবন কবিচিত্তের অর্গল দুই হাতে ঠেলিয়া মুক্ত করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল; মানুষ তাহার হৃদয়মনের নিকটতর হইল। একদিকে যেমন 'সোনার তরী,' 'মানস সুন্দরী,' অন্যদিকে তেমনই 'যেতে নাহি দিব,' 'বৈষ্ণব কবিতা'; তারপর মানুষে আর প্রকৃতিতে যোগাযোগ ঘটিতে আর এতটুকু দেরি হইল না। এই মানুষ ও প্রকৃতির নিবিড় যোগের, প্রগাঢ় আত্মীয়তাবোধের পরিচয়, পদ্মাবিধৌত বাংলার বাহির ও অন্তরের পরিচয়, তাহার দুই তীরের স্পন্দমান মানব-

হৃদয়ের পরিচয় একসূত্রে গাঁথা হইয়া আছে শুধু "সোনার তরী"তেই নয়' আরও সুস্পষ্ট রেখায় আঁকা আছে "ছিন্নপত্রে", কবির অসংখ্য ছোট গল্পে। বস্তুত, যদি বলি "সোনার তরী" পদ্মারই কাব্য, তাহা হইলে কিছু অন্যায় বলা হয় না। পদ্মা তাঁহার চিত্তে যে রসপ্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে তাহারই তো বাণীরূপ "সোনার তরী"। কবি নিজেই বলিতেছেন।

"*** বাংলা দেশের নদীতে গ্রামে গ্রামে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি, এর নূতনত্ব চলন্ত বৈচিত্র্যের নূতনত্ব। শুধু তাই নয়, পরিচয়ে অপরিচয়ে মেলামেশা করেছিল মনের মধ্যে। বাংলা দেশকে ত বলতে পারিনে বেগানা দেশ, তার ভাষা চিনি, তার সুর চিনি। ক্ষণে ক্ষণে যতটুকু গোচরে এসেছিল তার চেয়ে অনেকখানি প্রবেশ করেছিল মনের অন্দরমহলে আপন বিচিত্র রূপ নিয়ে। সেই নিরন্তর জানাশোনার অভ্যর্থনা পাচ্ছিলুম অন্তঃকরণে, যে-উদ্বোধন তা স্পষ্ট বোঝা যাবে ছোটগল্পের নিরন্তর ধারায়। সে ধারা আজও থামত না যদি সেই উৎসের তীরে থেকে যেতুম।

"আমি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা মানি নি, কতবার সমস্ত বৎসর ধরে পদ্মার আতিথ্য নিয়েছি; বৈশাখের খর রৌদ্রতাপে, শ্রাবণের মুষলধারা বর্ষণে। পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামশ্রী, এপারে ছিল বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ জনহীনতা, মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানাবর্ণের ছায়ার তুলি। এইখানে নির্জন সজনের নিত্যসংগম চলেছিল আমার জীবনে। অহরহ সুখদুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব এসে পৌঁছচ্ছিল আমার হৃদয়ে। মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল। তাদের জন্য চিন্তা করেছি, কাজ করেছি, কর্তব্যের নানা সংকল্প বেঁধে তুলেছি, সেই সংকল্পের সূত্র আজও বিচ্ছিন্ন হয়নি আমার চিন্তায়। সেই মানুষের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ এবং কর্মের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হতে আরম্ভ হলো আমার জীবনে। আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল এই সময়কার প্রবর্তনা বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্যসচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা। এই সময়কার প্রথম কাব্যের ফসল ভরা হয়েছিল সোনার তরীতে। ***"

রবীন্দ্র-রচনাবলী, (৩য় খণ্ড, সোনার তরীর সূচনা ৫-৬ পৃঃ)

তারপর এই ফসল উঠিয়াছে "চিত্রা" ও কতকটা "চৈতালি" কাব্যেও

কিন্তু আরও স্পর্শগোচর হইয়া ধরা দিয়াছে ছোটগল্পে। এই সমতট বাংলার বুকে বসিয়া রবীন্দ্রনাথ নিসর্গজীবন এবং মানবজীবন, এই দুইটিকে একসঙ্গে গাঁথিলেন। এ দুইয়ের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ এক নূতন আত্মগত সূক্ষ্ম অপ্রত্যক্ষ কল্পভাবনার সূচনা করিল।

"সোনার তরী"তে যে কবিমানসের পরিচয় আমরা পাইলাম, নিসর্গ-সাধনার যে আভাস পাইলাম, সে-সাধনা এখনও যথেষ্ট গভীরতা লাভ করে নাই; করে নাই যে তাহার প্রমাণ কবি নিজেই দিতেছেন "সোনার তরী"র সর্বশেষ কবিতা 'নিরুদ্দেশ যাত্রায়'। কবিচিত্ত যে সোনার তরীর পিছু লইয়াছে, নিসর্গ-সাধনার যে পথে নামিয়াছে, সে পথ কোথায় শেষ হইবে, সে সোনার তরী কোন্ পাড়ে ভিড়িবে?

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরী,
বল কোন্ পার ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী!

* * *

নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি
অকূল সিন্ধু উঠেছে আকুলি
দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন
গগন কোণে।
কী আছে হোথায়—চলেছি কিসের
অন্বেষণে। ('নিরুদ্দেশ যাত্রা')

"চিত্রা"য় মনে হইতেছে এ পথের শেষ কবি পাইয়াছেন, সোনার তরী পারে আসিয়া ভিড়িয়াছে, কিসের অন্বেষণে তিনি চলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা তিনি জানিয়াছেন। নিসর্গের সঙ্গে একাত্মবোধ সম্পূর্ণ হইয়াছে; যে দ্বিধা, যে সংশয়, যে অনিশ্চয়তা "সোনার তরী"র

কবিতাগুলিতে মাঝে মাঝে উঁকিঝুঁকি মারিতেছে, "চিত্রা"য় তাহা আর নাই। একটা সহজ সুখ, সরল আনন্দ, পরম স্থৈর্য ও নিশ্চয়তা "চিত্রা"র কবিতাগুলিকে আশ্রয় করিয়াছে; 'সুখ', 'জ্যোৎস্নারাত্রে', 'প্রেমের অভিষেক', 'সন্ধ্যা', 'পূর্ণিমা', 'সিন্ধুপারে' প্রভৃতি কবিতায় তাহার প্রমাণ আছে। এই একান্ত একাত্মবোধ যখন সম্পূর্ণ হইল, তখন কি যে জাদু কবিচিত্তকে রূপান্তরিত করিল, তাহা কবি নিজেও জানেন না, তিনি শুধু জানেন, 'সুখের ব্যথায় তাঁহার বুক তখন কাঁপে', 'তীব্র তপ্ত দীপ্ত নেশায় চিত্ত মাতিয়া উঠে', 'অসীম বিরহ অপার বাসনা বিশ্ববেদনা তাঁহার বুকে বাজে', সমস্ত কিছুই তাঁহার কাছে কৌতুকময়ী অন্তর্যামীর অপরূপ কৌতুক বলিয়া মনে হয়—

এ কী কৌতুক নিত্য নূতন
ওগো কৌতুকময়ী,
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই।
অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ,
মিশায়ে আপন সুরে।

* * *

বলিতেছিলাম বসি একধারে
আপনার কথা আপন জনারে,
শুনাতেছিলাম ঘরের দুয়ারে
ঘরের কাহিনী যত;
তুমি সে ভাষারে দহিয়া অনলে
ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে,
নবীন প্রতিমা নব কৌশলে
গড়িলে মনের মতো।

সে মায়ামুরতি কী কহিছে বাণী,
কোথাকার ভাব কোথা নিলে টানি,
আমি চেয়ে আছি বিস্ময় মানি
রহস্যে নিমগন। ('অন্তর্যামী,' "চিত্রা")

'রহস্যে নিমগন' শুধু কবি নহেন, তাঁহার অগণিত পাঠকও। কি জাদু যে কবিচিত্তকে স্পর্শ করিল, কবি-মানস যে কি অপরূপ রূপান্তর লাভ করিল, যাহার ফলে ভাষা ও ছন্দ পাইল নূতন রূপ ও প্রাণরস, প্রতিমা হইল নূতন ; এই সংগীত, এই লাবণ্য এই ক্রন্দন কোথা হইতে অন্তর বিদীর্ণ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। এ কি অপরূপ বিস্ময় ! কিন্তু বিস্ময় যাহাই হউক, নিসর্গের সঙ্গে এই একান্ত পরিপূর্ণ একাত্মবোধের ফলেই আমরা পাইলাম 'উর্বশী', 'স্বর্গ হইতে বিদায়', 'বিজয়িনী', '১৪০০ শাল' প্রভৃতির মত কবিতা। ব্যাখ্যার অতীত, বিশ্লেষণের অতীত এই সব রচনার রস ও সৌন্দর্য ভাষায় কতটুকু প্রকাশ করা যায়, অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া কতটুকু দেখানো যায় ? 'উর্বশী'তে কবি মোহিনী নারীর দেহবিচ্যুত নির্বস্তুক ('অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট') সৌন্দর্যের স্তব করিয়াছেন, নিছক অনাবিল সৌন্দর্যকে সমস্ত প্রয়োজন, সমস্ত মানব-সম্বন্ধের বিকার হইতে উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়া তাহার পূজা করিয়াছেন। উর্বশী পূর্ণ সৌন্দর্যের প্রতিমা, বিস্ময় ও আনন্দের পরিপূর্ণ সৃষ্টি, তাহার দ্যুতিই বৈদিক অতীত হইতে বর্তমান অতিক্রম করিয়া সীমাহীন অনাগত ভবিষ্যতের কল্পনার মধ্যে বিস্তৃত, বহু যুগ সঞ্চিত বহু কবিঋষি-উদ্‌গাত স্মৃতি তাহার সঙ্গে জড়িত, মানবের চিরন্তন প্রেম ও সৌন্দর্য-বাসনার মধ্যে তাহার স্মৃতি বিধৃত। সৌন্দর্যের যে অনির্বচনীয়তা উর্বশীর মধ্যে আমরা তাহার রূপ প্রত্যক্ষ করি, এবং সেই মোহিনী মাধুরীকে বাহু-বন্ধনের মধ্যে ধরিতে চেষ্টা করি। কিন্তু এ কথা কবি জানেন, এবং আমরাও জানি

ফিরিবে না, ফিরিবে না—অস্ত গেছে সে গৌরবশশী

* * *

তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে

('উর্বশী')

কিন্তু এ হইল কবিতার অর্থ মাত্র; এই অর্থের মধ্যে রস কোথায়, সৌন্দর্য কোথায়? তাহারা যে রহিয়াছে অর্থ ছাড়াইয়া, অথচ ছন্দ, শব্দ ও বাক্যের অপরূপ ব্যঞ্জনার মধ্যে, অনির্বচনীয় চিত্র-সৃষ্টির মধ্যে, অপূর্ব পরিবেশের মধ্যে, যে পুরাণ-স্মৃতি ইহার ফাঁকে ফাঁকে ধরা দিয়াছে তাহার মধ্যে, যে অপরূপ শব্দচয়ন-নৈপুণ্য ইহাতে আছে তাহার মধ্যে, সবল কল্পনার মধ্যে, সমস্ত কবিতাটির মধ্যে যে মোহ সৃষ্টি হইয়াছে তাহার মধ্যে।

সুরসভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি
হে বিলোল-হিল্লোল উর্বশী,
ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধুমাঝে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল,
তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা,
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা
নাচে রক্তধারা।
দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে
অয়ি অসম্বৃতে।
স্বর্গের উদয়াচলে মূর্তিমতী তুমি হে উষসী
হে ভুবনমোহিনী উর্বশী।
জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা,
ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ-শোণিমা,
মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ববাসনার
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতিলঘুভার।

অখিল মানস স্বর্গে অনন্তরঙ্গিণী
হে স্বপ্নসঙ্গিনী।

ইহার সৌন্দর্য-বিশ্লেষণের স্পর্ধা আমি রাখি না।

উপরে "চিত্রা"র যে সমস্ত কবিতার নাম আমি করিয়াছি সে সমস্ত এবং অন্যান্য আরও অনেক কবিতায় কবির নিসর্গানুভূতির পূর্ণ পরিচয় যে-কোন রসিক পাঠকের কাছেই ধরা পড়িবে। "চিত্রা"র সমস্ত কাব্য-জীবন জুড়িয়া রবীন্দ্রনাথ নিসর্গের সঙ্গে একাত্মতাজাত প্রেম ও সৌন্দর্যসুধা আকণ্ঠ পান করিলেন, "সোনার তরী" হইতেই তাহা আরম্ভ হইয়াছিল, "চিত্রা"য় আসিয়া তাহা পরিপূর্ণতা লাভ করিল। যে অনুভূত প্রত্যয় কবির সমস্ত জীবনকে এমন সম্পদ এমন ঐশ্বর্য দান করিল, সেই সত্যই তো কবির অন্তরতম জীবন-দেবতা। একটা সমগ্র কাব্যযুগ ব্যাপিয়া কবি এই অন্তরতমের সঙ্গ লাভ করিলেন, এবং তাঁহার জীবন প্রেম ও সৌন্দর্যে কানায় কানায় ভরিয়া উঠিল। কিন্তু যে অন্তরতমের অনুভূতি তিনি পাইলেন, সেই অন্তরতম কি কবির সঙ্গ লাভ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার কামনা-বাসনা কি মিটিয়াছে, অন্তরতম কি পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছেন; এ প্রশ্ন কোন এক ভাবমুহূর্তে কবির চিত্তে জাগিয়াছে।

ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম।
দুঃখসুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়,
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ
দলিত দ্রাক্ষাসম।
* * *
গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা
প্রতিদিন আমি করেছি রচনা,

তোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়া
　　মুরতি নিত্যনব।
আপনি বরিয়া লয়েছিলে মোরে
　　না জানি কিসের আশে।
লেগেছে কি ভাল হে জীবননাথ
আমার রজনী আমার প্রভাত,
আমার নর্ম, আমার কর্ম
তোমার বিজন বাসে।
*　　*　　*
মানস কুসুম তুলি অঞ্চলে
গেঁথেছ কি মালা, পরেছ কি গলে,
আপনার মনে করেছ ভ্রমণ
　　মম যৌবনবনে।

('জীবন-দেবতা')

অন্তরতমের সকল তিয়াষ মিটিয়াছে কি না, এ প্রশ্নের উত্তর কবি স্বয়ং; কারণ "চিত্রা"য় দেখিতেছি কবির নিজের সকল প্রেম ও সৌন্দর্য-তৃষ্ণা মিটিয়াছে, তাঁহার কবিমানস পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে, তাঁহার জীবন কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে। "সন্ধ্যা-সংগীতে"র কুয়াশাচ্ছন্ন জীবনের পরে "প্রভাত-সংগীত" হইতে আরম্ভ করিয়া যে পথে কবিচিত্তের যাত্রা শুরু হইয়াছিল 'স্তরে স্তরে বিচিত্র অভিজ্ঞতার, বিচিত্র অনুভূতির ভিতর দিয়া সে পথের শেষে আসিয়া তিনি পৌঁছিয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে। প্রেম-সাধনা সৌন্দর্য-সাধনার জীবন পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে। এবং সার্থকতা লাভ করিয়াছে বলিয়াই কবির নিজের উপর বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে, নিজের শক্তি-সম্বন্ধে তিনি সচেতন হইয়াছেন, তিনি যে যুগোত্তর জীবনোত্তর কবি তাহা তিনি জানিয়াছেন, অনাগত ভবিষ্যতের কবির সঙ্গে,

অনাগত জীবনের সঙ্গে তাঁহার আত্মীয়তা যে নিবিড় ও গভীর তাহা তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন। প্রমাণ, '১৪০০ শাল' কবিতা।

আজি হতে শত বর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি
কৌতূহলভরে,
আজি হতে শত বর্ষ পরে।

* * *

সেদিন উতলা প্রাণে, হৃদয় মগন গানে
কবি এক জাগে,—
কত কথা, পুষ্পপ্রায় বিকশি তুলিতে চায়
কত অনুরাগে,
একদিন শত বর্ষ আগে।

আজি হতে শত বর্ষ পরে
এখন করিছে গান সে কোন নূতন কবি
তোমাদের ঘরে।
আজিকার বসন্তের আনন্দ-অভিবাদন
পাঠায়ে দিলাম তাঁর করে।
আমার বসন্ত-গান তোমার বসন্ত-দিনে
ধ্বনিত হউক ক্ষণতরে
হৃদয়স্পন্দনে তব, ভ্রমর গুঞ্জনে নব,
পল্লবমর্মরে,
আজি হতে শত বর্ষ পরে।

('১৪০০ সাল,')

"চিত্রা"র আর একটি কবিতার উল্লেখ বাকি আছে; সেটি হইতেছে 'এবার ফিরাও মোরে'। একটু অভিনিবেশ-সহকারে রবীন্দ্র-কাব্য-জীবন আলোচনা করিলে কবি-চিত্তের একটা বিশেষ ধর্ম

সহজেই ধরা পড়ে; এবং এ-ধর্ম তাঁহার কাব্যে যতটুকু সত্য তাঁহার জীবনেও ততখানি সত্য। একথা সকলেই জানেন, রবীন্দ্রনাথ বহুদিন একই স্থানে স্থির হইয়া বাস করিতে পারেন না, মাঝে মাঝে বাহিরের কর্মনেশা, ভ্রমণের নেশা, নূতন দৃশ্য নূতন আবেষ্টন নূতন স্থানের নেশা তাঁহাকে পাইয়া বসে, এবং নিজে নিভৃত নিকুঞ্জ নিবাস হইতে তিনি ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়েন। বাহিরের জীবনের দিক হইতে ইহা সকলেরই চোখে পড়ে সহজেই। অন্তরের দিক হইতেও একথা সত্য। কবি নিজের কল্পলোক, অন্তর্লোকের মধ্যে বাস করিতেই ভালবাসেন, কিন্তু মাঝে মাঝে বাহিরের বিচিত্র ঝড়-ঝঞ্ঝা দুঃখ-বেদনা-ক্রন্দন-সংগ্রাম তাঁহাকে এমন গভীরভাবে স্পর্শ করে যে তাঁহার স্পর্শ-কাতর চিত্ত কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না; তখন তিনি স্বতন্ত্র অন্তর্লোক বস্তুবিমুখ কল্পলোক ছাড়িয়া বাস্তব-সংসারের দৈনন্দিন আবর্তের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চাহেন। কবির কাব্যেও তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় আছে। শুধু শিল্পময়, কাব্যময়, আত্মগত কল্পনাময় জীবন যে মাঝে মাঝে তাঁহার ভাল লাগে না, একথা বার বার তিনি কোন কোন পত্রে ও প্রবন্ধে, এমন কি পূর্বজীবনের কবিতায়ও একাধিকবার বলিয়াছেন। এই ধরনের একটি ভাবমুহূর্ত 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় ধরা পড়িয়াছে; সংসারে যত ব্যথিত, উৎপীড়িত, আশাহীন, ভাষাহীন মানুষ আছে তাহাদের ক্রন্দন কবিচিত্তকে স্পর্শ করিয়াছে, কবি ইহাদের জন্যই জীবন উৎসর্গ করিতে চাহেন,—

> এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
> হে কল্পনে, রঙ্গময়ী। দুলায়ো না সমীরে সমীরে
> তরঙ্গে তরঙ্গে আর, ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়।
> বিজন বিষাদঘন অন্তরের নিকুঞ্জচ্ছায়ায়
> রেখো না বসায়ে আর।

কিন্তু এ ভাব-মুহূর্ত পরক্ষণেই কাটিয়া যায়, কবি আবার তাঁহার স্বতন্ত্র অন্তর্মুখী ভাব কল্পনার রাজ্যেই আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন; অন্তঃপুরচারিণী কাব্যলক্ষ্মীর সম্মুখেই নিজের অন্তর-প্রদীপখানি তুলিয়া ধরেন। এই ধরনের অস্বস্তি বোধ তাঁহার কবিজীবনে একাধিকার দেখা গিয়াছে। যাহা হউক, এই কবিতাটির ভাবপ্রেরণা সম্বন্ধে আমি অন্যত্র ইঙ্গিত করিয়াছি, এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

"চিত্রা", "সোনার তরী" অপেক্ষা আরও গাঢ়, সংহত ও গভীরতর অনুভূতির কাব্য। দুইটি কাব্যের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা অনস্বীকার্য, কিন্তু তৎসত্ত্বেও মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যে 'নিত্য সচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা' "সোনার তরী"তে আমরা দেখিয়াছি তাহা আরও গভীর, আরও গাঢ় হইয়াছে। যে উচ্ছ্বসিত জীবনানন্দ, যে স্পন্দমান ইন্দ্রিয়-চেতনা, যে সহজ সুখ-দুঃখের বিচিত্র আন্দোলনের অনুভূতি "সোনার তরী"র বৈশিষ্ট্য, "চিত্রা"য় সেই প্রায় ইন্দ্রিয়-স্পর্শক্ষম আনন্দ, চেতনা ও আন্দোলন মনন-ক্রিয়ার স্পর্শে কেমন যেন দৃঢ় ও সংহত হইয়া উঠিয়াছে। সহজ তাৎক্ষণিক ও প্রত্যক্ষ জীবনানন্দ অপ্রত্যক্ষ জীবন-জিজ্ঞাসায় রূপান্তরিত হইতে চলিয়াছে। "সোনার তরী"র সঙ্গে গোত্রের যোগ পরবর্তী "ক্ষণিকা"র এবং আরও পরবর্তী "পূরবী" ও "মহুয়া"র, "চিত্রা"র সঙ্গে "কল্পনা" ও "খেয়া"র। তবু, "সোনার তরী" ও "চিত্রা" পরস্পর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত। "চিত্রা"য় জীবন-জিজ্ঞাসার চিন্তা "সোনার তরী"র অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট রং ও রেখাকে একটি কঠিন, গাঢ়, স্পর্শসহ রূপ দিয়াছে। "সোনার তরী" "চিত্রা"র ভূমিকা।

সহজ, তাৎক্ষণিক ও প্রত্যক্ষ জীবনানন্দের অনুভূতি যে মনন-ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হইতেছে, তাহার কারণ মানব-জীবনের সঙ্গে গভীরতর যোগ, চিত্তে তাহার বিচিত্র বর্ধমান অভিজ্ঞতার সঞ্চার। তাহারই ফলে স্বতন্ত্র আত্মগত কল্পনা "চিত্রা"র অনেক কবিতায়

ব্যবহারিক জীবনের বিচিত্র কর্মের সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য খুঁজিতেছে। একদিকে কবি-কল্পনার নিভৃত স্বতন্ত্র অন্তর্লোক যাহার সঙ্গে তিনি বহুদিন পরিচিত, আর একদিকে সদাবহমান কর্মময় মানব-জীবনস্রোত যাহার সঙ্গে ক্রমশ পরিচয়লাভ ঘটিতেছে। এ দুইই সত্য এবং দুইয়ের মধ্যে বিরোধ কোথাও নাই। বিশ্বজীবনের অভিজ্ঞতা বিচিত্র, আরও বিচিত্র তাহার রূপ, কিন্তু কবির অন্তর্লোকে যে বিরাজ করে সে 'একা একাকী অন্তর ব্যাপিনী'। এই কবি-কল্পনা যুক্তিসহ কি না সে-প্রশ্ন অবান্তর, কিন্তু ইহাই "চিত্রা"র কাব্যরূপের মূলে। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় এই দুই দিককার বিরোধকে সামঞ্জস্যের এক মিলন-সূত্রে গাঁথা হইয়াছে। এ বিষয়ে কবির নিজের মন্তব্য শোনা যাইতে পারে—

"চিত্রা"র প্রথম কবিতায় তার একটি সূচনায় বলা হয়েছে—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।

তার পর আছে—

অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তরবাসিনী।

আজ ব্যাখ্যা করে যে-কথা বলবার চেষ্টা করেছি সেই কথাটাই এই কবিতার মধ্যে ফুটতে চেয়েছিল। বাইরে যার প্রকাশ বাস্তবে সে বহু, অন্তরে যার প্রকাশ সে একা। এই দুই ধারার প্রবাহেই কাব্য সম্পূর্ণ হয়। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় কর্ম-জীবনের সেই বিচিত্রের ডাক পড়েছে। [কিন্তু সেই কবিতারই পরিণতিতে সেই বিচিত্রের আহ্বান অন্তরের একের আহ্বানে রূপান্তরিত, এবং সেই হিসাবে এই দুই আপাতবিরোধী সত্তার সামঞ্জস্য একই আবেগসত্তায় কি ভাবে রূপান্তরিত হয় তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এই কবিতাটি। গ্রন্থকার] 'আবেদন' কবিতায় ঠিক তার উল্টো কথা। কবি বলেছে, 'কর্মক্ষেত্রে যেখানে কার্যক্ষেত্রের জড়তায় কর্মীরা কর্ম করছে সেখানে আমার স্থান নয়। আমার স্থান সৌন্দর্যের সাধকরূপে একা তোমার কাছে।' জীবনের

দুই ভিন্ন মহলে কবির এই ভিন্ন ভিন্ন কথা। জগতে বিচিত্ররূপিণী আর অন্তরে একাকিনী কবির কাছে এই দুইই সত্য, আকাশ এবং ভূতলকে নিয়ে ধরণী যেমন সত্য। 'ব্রাহ্মণ' 'পুরাতন ভৃত্য,' 'দুই বিঘা জমি' এইগুলির কাব্যকাকলি নীড়ের বাসার, 'স্বর্গ হইতে বিদায়' এখানে সুর নেমেছে উর্ধ্বলোক থেকে মর্ত্যের পথে, "প্রেমের অভিষেক"এর প্রথম যে পাঠ লিখেছিলুম, তাতে কেরানি-জীবনের বাস্তবতার ধূলিমাখা ছবি ছিল অকুণ্ঠিত কলমে আঁকা, লোকেন্দ্রনাথ পালিত অত্যন্ত ধিক্কার দেওয়াতে সেটা তুলে দিয়েছিলুম [কবিতার দিক দিয়া তাহার ফল ভালই হইয়াছে। গ্রন্থকার]; 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় বাঙালী-ঘরের ঘরকন্নার যে আভাস আছে তার প্রতিও লোকে কটাক্ষ বর্ষণ করেছিল, ভাগ্যক্রমে তাতে বিচলিত হইনি, হয়তো দুচারটে লাইন বাদ পড়েছে।"

(রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, "চিত্রার"সূচনা. ৮-৬ পৃঃ)

"চিত্রা"-রচনার অব্যবহিত পূর্বে কবি 'নদী' নামক একটি সুদীর্ঘ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, এবং তাহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিতও হইয়াছিল। 'নদী' পর্বতোৎসারিতা, জনপদবাহিনী, সমুদ্রগামিনী নদীর জীবনেতিহাস; পদ্মাই সেই কবি-কল্পনার উৎস। যে নিরবচ্ছিন্ন চলমানতা নদীর ধর্ম, সেই চলমানতাই এই কবিতাটিরও প্রাণ, কিন্তু গতি মন্থর, কতকটা একতালা একটানাও বটে। সুদীর্ঘ অবকাশেও উচ্ছ্বসিত আবেগ কোথাও নাই, তবে বর্ণনায় চিত্রময়তার আভাস সর্বত্র। নদীই রবীন্দ্র-কবি-প্রাণের প্রতীক; নদীর চলমানতার মধ্যেই যেন কবি আপন অন্তর্নিহিত কবিধর্মের স্বরূপ আবিষ্কার করিয়াছেন! অস্বীকার করিবার উপায় নাই, পদ্মার প্রভাবেই কবি-প্রাণের এই স্বাভাবিক ধর্ম প্রথম স্ফূর্ত হইল। পদ্মার বিরাট জলস্রোতের মধ্যে কবি একদিন জীবনের যে গতিধর্ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাই জীবনের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিরাট জনস্রোতেও প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সেই নিরবচ্ছিন্ন গতির স্রোতের মধ্যে নিজেকে

ভাসাইয়া দিয়া ঢেউয়ের ভাঙা-গড়ায়, জোয়ার-ভাঁটার বিচিত্র রূপে নানা রং, নানা রেখার প্রতিফলন তিনি নয়ন ভরিয়া দেখিয়াছেন, দেখার আনন্দ কখনও আবেগে কখনও মননাভাসে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। সেই প্রকাশই তো রবীন্দ্র-কাব্য।

"বিদায় অভিশাপ" নাট্যাকারে গ্রথিত হইলেও "চিত্রাঙ্গদা"র মত ইহাও গীতিকাব্য, তবে নাটকীয় লক্ষণ একেবারে অনুপস্থিত নয়, বিশেষভাবে ইহার পরিণতিতে নাটকীয় ভঙ্গি সুস্পষ্ট। তবু, ইহাকে গীতিকবিতা-হিসাবে দেখিলেই ইহার প্রতি সুবিচার করা হয় বলিয়া আমরা ধারণা। এই খণ্ডকাব্যটিতে কবির নিজস্ব প্রত্যয়-ভাবনা কিছু নাই। কচ দেবযানী ও তাহার আশ্রম পরিবেশের প্রতি অনুরক্ত; দেবযানীর প্রতি বুঝিবা তাহার অনুরাগাকর্ষণও আছে।

আর যাহা আছে তাহা প্রকাশের নয়
সখী। বহে যাহা মর্মমাঝে রক্তময়
বাহিরে তা কেমনে দেখাব।

কিন্তু যাহা আছে তাহা তাহার কর্তব্যাকর্ষণ অপেক্ষা প্রবল নয়। সেই কর্তব্য ও জীবনের গভীরতর উদ্দেশ্যের বশ্যতাই কচ-চরিত্রের দীপ্তি ও গৌরব। এই সহজ ও সরল অথচ সুদৃঢ় ও আত্মপ্রত্যয়বান চরিত্রের আশ্রয়েই দেবযানীর সহজ মানবিক শঙ্কা-লজ্জা-রাগ-ভয়-কামনা-বাসনা-কম্পিত প্রেমহৃদয়ের বিকাশ। সাধারণ মানবিক প্রেম-বাসনার দীপ্তিই দেবযানীর দীপ্তি, এবং তাহা কিছু অশ্রদ্ধেয়ও নয়। দেবযানীর অভিশাপ ও কচের বর দুইই সত্য, দুইই জীবনধর্মগত; কচের চারিত্র-শক্তির ও দেবযানীর প্রেম-হৃদয়ের রাগাশ্লিষ্ট অভিশাপ জীবনরস-রসিকের কাছে দুইই একই মূল্য বহন করে, এবং দুইয়ের বিকাশ ও পরিণতি অপূর্ব কাব্যময়। একটু শুধু আপত্তি; যে-কৌশল

অবলম্বন করিয়া দেবযানী কচের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে চাহিতেছে, তাহার মনের সন্ধান লইতে চলিয়াছে, অর্থাৎ বনভূমি, বটতল, আশ্রম-হোমধেনু, স্রোতস্বিনী, বেণুমতী প্রভৃতি আবেষ্টনের আলম্বে দেবযানীর যে-প্রয়াস তাহা যেন একটু সুলভ বলিয়া মনে হয়, কতকটা কালিদাসের শকুন্তলার কলা-কৌশলের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

'বিদায়-অভিশাপ' পড়িতে বসিয়া কবির প্রকাশ-ভঙ্গির একটা নূতনত্ব সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। "প্রভাত-সংগীত" হইতেই বিশেষ ভাবে "মানসী-সোনার তরী-চিত্রা"য় যে কল্পনার মুক্তপক্ষ গতি, দুর্বার উচ্ছ্বাস, বেগবহুল বর্ণবহুল দুর্নিবার স্রোতাবেগ লক্ষ্য করা যায়, তাহা যেন এই খণ্ডকাব্যটিতে অনেকটা সংযত ও সংহত রূপ ধারণ করিয়াছে। বস্তুত 'বসুন্ধরা', 'মানসসুন্দরী,' 'সমুদ্রের প্রতি', এমন কি 'প্রেমের অভিষেক', 'বিজয়িনী' 'এবার ফিরাও মোরে' প্রভৃতি সংক্ষিপ্ততর কবিতায়ও মনে হয়, কবি যেন কি এক দুর্বার স্রোতে উচ্ছ্বসিত বেগে ভাসিয়া চলিয়াছেন, থামিবার বা পাঠকদেরও থামাইবার ক্ষমতা তাঁহার নাই; মনে হয়, তিনি নিজে লিখিতেছেন না বা বলিতেছেন না, তাঁহাকে আর কেহ লেখাইয়া বলাইয়া ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে। এমন উচ্ছ্বসিত আবেগ, এ যেন পূর্ণিমার জোয়ারের স্রোত! আশ্চর্য "বিদায়-অভিশাপ" এ আবেগ অনেকাংশে সংযত, স্রোত বহুলাংশে সংহত। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, নাটকীয় বন্ধনের প্রয়োজনেই বোধ হয় এই সংযত রূপের প্রয়োজন হইয়াছে; কিন্তু একটু পরেই মনে হয়, কচ-চরিত্রের সংযমও হয়ত ইহার অন্যতম কারণ, অর্থাৎ বিষয়বস্তু দ্বারা এই রূপ অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত।

"চৈতালি" প্রথম প্রকাশিত হয় মোহিতবাবু-সম্পাদিত "কাব্যগ্রন্থাবলী"র মধ্যে। ইহার নাম সম্বন্ধে কবি "কাব্যগ্রন্থাবলী"র

ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন, "চৈতালি শীর্ষক কবিতাগুলি লেখকের সর্ব শেষের লেখা। তাহার অধিকাংশই চৈত্র মাসে লিখিত বলিয়া বৎসরের শেষ উৎপন্ন শস্যের নামে তাহার নামকরণ করিলাম।" হয়ত কবি একথা মনে করিয়া থাকিতে পারেন যে এই কবিতাগুলি তাঁহার কবি জীবনের শেষ ফসল; এই ধরনের ধারণা উত্তর-জীবনে বার বার কবির মনে জাগিয়াছে। তবে সত্য সত্যই "চৈতালি" একটি সুদীর্ঘ জীবন-পর্যায়ের শেষ ফসল বলিলে অন্যায় কিছু বলা হয় না।

"চিত্রা"তেই আমরা দেখিয়াছি এক জীবন তাহার পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে, প্রেম-সৌন্দর্য-মাধুর্য-সুধায় জীবন একেবারে কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে; বুঝি বা উপছাইয়া পড়িয়া যাইবে, এমন মনে হইতেছে। "চৈতালি"র প্রথম কবিতাতেই কবি তাই বলিতেছেন, আমার জীবনের দ্রাক্ষাকুঞ্জ বনে গুচ্ছ গুচ্ছ ফল ধরিয়াছে, পূর্ণ পরিপক্ক ফলে সমস্ত জীবন ফলবান হইয়া উঠিয়াছে, এখনই বুঝি তাহা ফাটিয়া পড়িয়া যাইবে এমনই মনে হইতেছে, অথচ তাহা ফাটিয়া পড়িতেছে না। তুমি তোমার শুক্তিরক্ত নখর-দ্বারা এই বৃন্তগুলি ছিন্ন কর, দশন-দংশনে পূর্ণ ফলগুলি টুটাইয়া দাও।

আজি মোর দ্রাক্ষা কুঞ্জবনে
গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল।
পরিপূর্ণ বেদনার ভরে
মুহূর্তে'ই বুঝি ফেটে পড়ে,
বসন্তের দুরন্ত বাতাসে
নুয়ে বুঝি নমিবে ভূতল,
রসভরে অসহ উচ্ছ্বাসে
থরে থরে ফলিয়াছে ফল।

* * *

শুক্তিরক্ত নখরে বিক্ষত
ছিন্ন করি ফেল বৃন্তগুলি,—
সুখাবেশে বসি লতামূলে
সারাবেলা অলস অঙ্গুলে
বৃথা কাজে যেন অন্যমনে
খেলাচ্ছলে লহো তুলি তুলি ;
তব ওষ্ঠে দশন-দংশনে
টুটে যাক্ পূর্ণ ফলগুলি।

('উৎসর্গ')

যে মুহূর্তে মনের মধ্যে এই অনুভূতি জাগিল, মুহূর্তে মনে হইল একটা জীবন তাহার পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে, সেই মুহূর্ত হইতেই সেই জীবন হইতে মুক্তি পাইবার, সেই জীবন অতিক্রম করিবার একটা ইচ্ছা মনের গহনে মাথা তুলিতে আরম্ভ করিল। "চৈতালি"তেই তাহার প্রথম আভাস পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু আভাস মাত্রই ; তাহা এখনও রূপ-পরিগ্রহ করে নাই, এবং "কল্পনা"র আগে সে-রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি না, যদিও "চৈতালি" এবং "কল্পনা"তেও পাশে পাশেই এমন কবিতা আছে যাহার মধ্যে আমরা "সোনার তরী-চিত্রা"র জীবনের নিসর্গানুভূতিরই পরম প্রকাশ দেখিতে পাই। ইহা কিছু অস্বাভাবিক নয় ; কারণ এক জীবন হইতে অন্য জীবনে কবিচিত্তের যাত্রাপথ এত সহজ ও সরল নয়। প্রথমত যে-জীবন হইতে মুক্তি কবি কামনা করিতেছেন তাহা রূপপরিগ্রহ করিতে সময় লয়, এবং দ্বিতীয়ত রূপপরিগ্রহ করা হইলেও অনাগত জীবনের মূর্তি সহসা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে না। জীবনান্তর যে হইবে "চৈতালি"তে তাহার আভাস কিছু কিছু আমরা পাই, কিন্তু তাহা কতকটা স্পষ্ট হইয়া উঠিল "কল্পনা"য়, তবুও "খেয়া" এবং "নৈবেদ্য"র আগে অনাগত

জীবনের মূর্তি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল না। "চৈতালি"র পর হইতে "খেয়া"র পূর্ব পর্যন্ত যে কবিজীবন, সে-জীবনকে আমরা এই হেতু একটা জীবনসন্ধি-যুগ বলিতে পারি।

"চৈতালি"তে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছে চতুর্দশপদী কবিতা-গুলি; কতকটা আলগা ভাবে সনেটও ইহাদের বলা যাইতে পারে। "কড়ি ও কোমলে"ই চতুর্দশপদী রূপের প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, এবং পরে "নৈবেদ্যে" ইহার সুনির্দিষ্ট রূপ ধরা পড়ে! এই ছোট ছোট কবিতাগুলি যাঁহারা ভাল করিয়া পড়িয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, "সোনার তরী-চিত্রা"র জগৎ হইতে কবি ক্রমশ দূরে সরিয়া আসিতেছেন, মনের ভাবনা, কল্পনা ও অনুভূতি ধীরে ধীরে ভিন্ন রূপ লইতেছে। "চৈতালি"র প্রথম কবিতাতেই দেখিতেছি যে-সুরটি ধ্বনিত হইতেছে তাহা পূর্ণতার সুর, তৃপ্তির সুর। এই পূর্ণতা, এই তৃপ্তি আসিয়াছে একটি অখণ্ড নিসর্গানুভূতি হইতে; মানুষ, প্রকৃতি, প্রেম, সৌন্দর্য, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, কোনও বস্তুই বিচ্ছিন্ন নয়, একে অন্যের সঙ্গে নিবিড় প্রেমে আবদ্ধ, কোথাও কোনও ছেদ নাই—এই অনুভূতি হইতে। "চৈতালি"র ছোট ছোট কবিতাগুলিতেও এই পূর্ণতার সুরটি ধরা পড়ে। মানুষ ও প্রকৃতি দুইয়ে মিলিয়া কবিতা-গুলিকে অপরূপ মাধুর্য দান করিয়াছে। শুধু নিসর্গ নয়, মানবতার মহিমাও এই কবিতাগুলিতে সুস্পষ্ট; "চিত্রা"র 'স্বর্গ হইতে বিদায়,' সোনার তরী"র 'বৈষ্ণব কবিতা' প্রভৃতি কবিতায় মানব-মহিমা যে ভাবে পূজা পাইয়াছে "চৈতালি"তে দেখিতেছি সেই মানব-মহিমাকে কবি উপলব্ধি করিতেছেন আরও তুচ্ছতর বস্তু ও ঘটনার মধ্যে, এবং পরে "নৈবেদ্য"-গ্রন্থে এই উপলব্ধি আরও সত্য আরও স্পষ্ট হইতেছে। কবি মনে করেন, এই মানব-মহিমার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হইয়াছিল প্রাচীন ভারতের সাধনা ও ঐতিহ্যের মধ্যে; ভারতীয়

প্রতিভার প্রধান বিশেষত্বই এই মানব-মহিমা। এই পরিপূর্ণ-মানব মহিমার আদর্শের সঙ্গে যখন তিনি আমাদের বর্তমান বাঙালী জীবনের তুলনা করেন, তখন আমাদের জীবনের পঙ্গুতা, খর্বতা ও দৈন্য তাঁহাকে পীড়িত করে; আমরা যখন বিশ্বের সমগ্রতার কথা ভুলিয়া জীবনকে খণ্ড খণ্ড করিয়া 'দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে ক্ষয়' করি, তখন কবিচিত্ত ক্ষুব্ধ হয়, পরিপূর্ণ মানব-মহিমার খর্বতায় চিত্ত পীড়িত হয়; সে-বেদনার আভাস "চৈতালি"র অনেক কবিতায় সুস্পষ্ট।

এই মাত্র "চৈতালি"র কবি-মানসের যে পরিচয় উল্লেখ করিলাম, তাহার পূর্ণতর প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় "নৈবেদ্য" গ্রন্থে! এইজন্য একাধিক টীকাকার 'চৈতালি"কে "নৈবেদ্য" কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এ বর্ণনা সত্য। যে মানব-মহিমা, যে মাটির প্রতি আকর্ষণ প্রাচীন ভারতের আদর্শের প্রতি যে মুগ্ধ সশ্রদ্ধ দৃষ্টি "চৈতালি"র কবিতাগুলিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে তাহারই পরিপূর্ণ প্রকাশ আমরা লাভ করি ' নৈবেদ্য" গ্রন্থে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, একটা জীবন-পর্যায় শেষ হইতে না হইতেই আর একটা জীবনের অরুণাভাস ধীরে ধীরে দেখা দিতেছে। তাহার আরও সুস্পষ্ট প্রমাণ "চৈতালি"র কবিতাগুলির মধ্যে সহজেই ধরা পড়ে; এই সুগভীর শান্তি, স্নিগ্ধ দীপ্তি, এবং সমাহিত চৈতন্য "কল্পনা" গ্রন্থে আরও সুস্পষ্ট।

রবীন্দ্র-কাব্যের মনোযোগী পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন, কবি-মানসের ইতিহাসে "চৈতালি" একটু আকস্মিক, আঙ্গিক ও ভাব-প্রসঙ্গ উভয়তই। "সোনার তরী-চিত্রা"র ভাবযুক্তিগত ধারাবাহিকতা "চৈতালি"তে অনুপস্থিত; "চৈতালি" কাব্যেতিহাসের ক্রমিক পরিণতির বাহিরে না হইলেও কতকটা একপাশে। "সোনার তরী"র প্রত্যক্ষ জীবনানন্দ, "চিত্রা"র জীবনজিজ্ঞাসাগত মনন-সমৃদ্ধি, এবং দুইয়েরই

ভাবগভীর চিত্র-সৌন্দর্য, "চৈতালি"র মৃদু, ক্ষীণ, স্বল্পপরিসর এবং কতকটা চিন্তালেশহীন অর্ধ-উদাসীন দৃষ্টি এই দুইয়ের মধ্যে জীবনেতিহাসের বিবর্তন খুঁজিতে গেলে ভুল করা হইবে। এই হিসাবে "চৈতালি" একটু 'আকস্মিক' ও অপ্রত্যাশিত'। কবি নিজেও "চৈতালি"র এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সচেতন। "রচনাবলী"তে ৫ম খণ্ড "চৈতালি"র সূচনায় তিনি বলিতেছেন, "চৈতালি···এক টুকরো কাব্য, যা অপ্রত্যাশিত। স্রোত চলছিল যে রূপ নিয়ে অল্প কিছু বাইরের জিনিসের সঞ্চয় জমে ক্ষণকালের জন্য তার মধ্যে আকস্মিকের আবির্ভাব হল।" "সোনার তরী-চিত্রা"র সঙ্গে যেমন "চৈতালি" ক্রমবিবর্তনের অচ্ছেদ্যসূত্রে গাঁথা নয়, তেমনই নয় পরবর্তী "কল্পনা-ক্ষণিকা-কাহিনী"র সঙ্গে। "সোনার তরী-চিত্রা"র বর্ণ ও বর্ণনা-প্রাচুর্য, ভাবোচ্ছ্বাসের উন্মাদনা "চৈতালি"তে অনুপস্থিত।

"চৈতালি"র বিশিষ্ট অংশ তাহার চতুর্দশপদীগুলি; বলাই বাহুল্য ইহারা কতকটা শিথিল, আঙ্গিকের দিক হইতে অত্যন্ত সরল, সনেটের দৃঢ়পিনদ্ধতা ইহাদের নাই। ইহাদের সুরও অত্যন্ত মৃদু, ক্ষীণ, ইহাদের রং একরঙা, রেখা লঘু। এই চতুর্দশপদীগুলিকে যদি একরঙা লঘু রেখাচিত্র বলা যায় তাহা হইলে খুব অন্যায় বলা হয় না। বস্তুত "চৈতালি" ত বিরাট পদ্মার কাব্য নয়, "চৈতালি" ক্ষীণকায়া মন্থরগামিনী গ্রাম্য শাখা-নদীর কাব্য; তাহার দুই তীরে সরল মৃদু, ক্ষীণ একরঙা গ্রাম্য-জীবন; নৌকার ছাতে বা জানালায় বসিয়া সেই জীবন কবি দুই চোখ ভরিয়া দেখিয়াছেন, সরল রেখায় বিরল বর্ণে তাহারই নিরলংকার ছবি তিনি ছোট ছোট কবিতায় গাঁথিয়া তুলিয়াছেন। গীতিকবিতার যে প্রাণধর্মে "চৈতালি"-গ্রন্থের উন্মেষ, যে উত্তাপ ও উন্মাদনা 'আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জ বনে' ইত্যাদি কবিতায় সুস্পষ্ট "চৈতালি"র বিশিষ্ট কবিতাগুলিতে তাহা নাই। মানুষের সহজ সরল

গ্রাম্য জীবনযাত্রার টুক্‌রা টুক্‌রা ছবির মধ্যে সে উত্তাপ ও উন্মাদনার স্থানই বা কোথায়? বরং এই সব ছবির মধ্যে যাহা আছে তাহা কিছু বর্ণনা, কিছু গল্প, কিছু বা তত্ত্ব বা নীতিকথা। এই সব গল্প ও বর্ণনা, এমন কি তত্ত্বকথাগুলি পর্যন্ত এত নিরলংকার ও বিরল-সৌষ্ঠব, এবং আমাদের অতি-পরিচিত বাংলার নদী, নদীর দুই তীর, কাশবন, ধানক্ষেত, নদীর চর, এক কথায় সমতটীয় গাঙ্গেয় বাংলা-দেশের প্রেক্ষাপটে এমন একটি মৃদু সৌরভের, অর্ধ উদাসীন স্মৃতি-চিত্রের বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে, যাহার ফলে আঙ্গিকের তরল শৈথিল্য সত্ত্বেও "চৈতালি" কাব্যরসিকের পরম সমাদরের যোগ্য। "রচনাবলী"তে (৫ম খণ্ড) "চৈতালি"র সূচনায় কবির মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

"পতিসরের নাগর নদী নিতান্তই গ্রাম্য। অল্প তার পরিসর, মন্থর তার স্রোত। তার এক তীরে দরিদ্র লোকালয়, গোয়ালঘর, ধানের মরাই, বিচালি স্তূপ অন্য তীরে বিস্তীর্ণ ফসল কাটা শস্যক্ষেত ধূ ধূ করছে। কোনো এক গ্রীষ্মকাল এইখানে আমি বোট বেঁধে কাটিয়েছি। দুঃসহ গরম; মন দিয়ে বই পড়বার মতন অবস্থা নয়। বোটের জানালা বন্ধ করে খড়খড়ি খুলে সেই ফাঁকে দেখছি বাইরের দিকে চেয়ে। মনটা আছে ক্যামেরার চোখ নিয়ে ছোটো ছোটো ছবির ছাপ দিচ্ছে অন্তরে। অল্প পরিধির মধ্যে দেখছি বলেই এত স্পষ্ট করে দেখছি। সেই স্পষ্ট দেখার স্মৃতিকে ভরে রাখছিলুম নিরলংকৃত ভাষায়। অলংকার প্রয়োগের চেষ্টা জাগে মনে যখন প্রত্যক্ষ বোধের স্পষ্টতা সম্বন্ধে সংশয় থাকে। যেটা দেখছি মন যখন বলে এটাই যথেষ্ট তখন তার উপর রং লাগাবার ইচ্ছাই থাকে না। "চৈতালি"র ভাষা এত সহজ হয়েছে এই জন্যই।"

এই যে দেখা এ একান্তই চোখ দিয়া দেখা, মন প্রায় অর্ধ উদাসীন অর্ধ নিদ্রিত।

(৫)

কথা (১৩০৪—১৩০৬*)

কাহিনী (১৩০৪—১৩০৬)

কথা ও কাহিনী (১৩১৫ প্র)

কল্পনা (১৩০৪—১৩০৮)

কণিকা (১৩০৬)

ক্ষণিকা (১৩০৭)

"এই গ্রন্থে যে সকল বৌদ্ধ কথা বর্ণিত হইয়াছে তাহা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সংকলিত নেপালী বৌদ্ধ-সাহিত্য সম্বন্ধীয় ইংরেজি গ্রন্থ হইতে গৃহীত। রাজপুত কাহিনীগুলি টডের রাজস্থান ও শিখ বিবরণগুলি দুই-একটি ইংরেজি শিখ ইতিহাস হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। ভক্তমাল হইতে বৈষ্ণব গল্পগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি। মূলের সহিত এই কবিতাগুলির কিছু কিছু প্রভেদ লক্ষিত হইবে। ***।" গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন, প্রথম সং, "কথা।"

"মোহিত চন্দ্র সেন কর্তৃক সম্পাদিত, বিষয়ানুক্রমে সজ্জিত কাব্য গ্রন্থে (১৩১০) কথার কবিতাগুলি দুই অংশে প্রকাশিত হয়, 'কাহিনী' ও 'কথা'। কথার প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত 'দেবতার গ্রাস' ও 'বিসর্জন' এবং সোনার তরীর 'গানভঙ্গ' চিত্রার 'পুরাতন ভৃত্য' ও 'দুই বিঘা জমি', মানসীর 'নিষ্ফল উপহার,' ও কোনো গ্রন্থে অপ্রকাশিত 'দীন দান '(ভারতী, ১৩০৭) কাহিনী অংশের অন্তর্গত হয়। কথার অবশিষ্ট কবিতাগুলি, ও চিত্রার 'ব্রাহ্মণ' এবং মানসীর 'গুরুগোবিন্দ' কবিতা কথা অংশে মুদ্রিত হয়। পরে দুই অংশের কবিতা লইয়া ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে, স্বতন্ত্রভাবে 'কথা ও কাহিনী' নামে পুস্তক প্রকাশিত হয়। তদবধি এই গ্রন্থ এইভাবেই পরিচিত ও প্রচলিত।" রচনাবলী, ৭ম খণ্ড, ৫২৭ পৃঃ।

"প্রথম প্রকাশিত 'কাহিনী' গ্রন্থে নাট্যকাব্য ও কয়েকটি কবিতা ছিল, মাঝে সে গ্রন্থ প্রচলিত ছিল না। 'কথা'ও বর্তমানে প্রচলিত আছে। তবে 'কথা ও কাহিনী' নামে যে-গ্রন্থ বর্তমানে সুপরিচিত—তাহার 'কাহিনী' অংশ নূতন সংগৃহীত পুস্তক। মোহিতচন্দ্র সেন ১৩১০ সালে যখন রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ সংগ্রহ ও সম্পাদন করেন,

---

* "কথা" ১৩০৬ সালের মাঘ মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

তখন পুরাতন বইগুলির অনেক ভাঙাচোরা হয়। সেই সময় 'কাহিনী'র নাট্যগুলিকে পৃথক করিয়া 'নাট্যকাব্য' বলিয়া গ্রন্থ প্রণীত হয়; আর কতকগুলি কাহিনী 'সোনার তরী,' 'চিত্রা' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া 'কাহিনী' নামে একটি খণ্ড প্রস্তুত করেন। পরে ১৯১০ সালে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস 'কথা ও কাহিনী' নামে গ্রন্থ প্রকাশ করেন।" (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, "রবীন্দ্র-জীবনী" ১ম খণ্ড, ৩৪২—৪৩ পৃঃ)

"কথা" গ্রন্থ হইতে আরম্ভ করিয়া "ক্ষণিকা" পর্যন্ত যে কবি-জীবন তাহাকে একটা জীবনসন্ধিযুগ বলা যাইতে পারে, একথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি; এবং তাহার কারণ নির্দেশ করিতেও চেষ্টা করিয়াছি ইহার সত্যতা আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ আরও প্রকাশ পাইবে। "সোনার তরী-চিত্রা"র প্রেম ও সৌন্দর্য-তন্ময় জীবন ক্রমশ দূরে সরিয়া যাইবে, তাহা শুধু কবির কাব্য-চেতনার অংশ মাত্র হইয়া থাকিবে; এখন হইতে জীবন নবতর সাধনার পথে ক্রমশ অগ্রসর হইবে, জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা ধীরে ধীরে জাগিবে "কথা ও কাহিনী" গ্রন্থ হইতেই ইহার সূত্রপাত, কিন্তু পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় "কল্পনা"-গ্রন্থে। সৌন্দর্য-তন্ময় ছিল যে-চিত্ত, নিসর্গ-সাধনায় নিমগ্ন ছিল যে-চিত্ত সেই চিত্ত ক্রমশ একটা মহাজীবনকে উপলব্ধি করিবার জন্য কি ভাবে ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে, একটা শান্তসমাহিত সাধনা কি করিয়া ধীরে ধীরে কবিচিত্তকে সবলে টানিতেছে তাহার ইতিহাস বাস্তবিকই বিস্ময়কর।

"কাহিনী," "কথা," "কণিকা" রচনার সঙ্গে সঙ্গেই "কল্পনা"র জগৎ পাশাপাশি চলিতেছিল, কাজেই গ্রন্থ-প্রকাশের ক্রম পর পর হইলেও সব কয়টি গ্রন্থই মোটামুটি ভাবে একই মানস-জগতের সৃষ্টি। একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে একই মনের প্রকাশ বিচিত্রভাবে এই সময়ের রচনাগুলিতে ধরা পড়িয়াছে, অথচ রূপের দিক হইতে "কাহিনী"র সঙ্গে "কণিকা"র অথবা, "কথা"র সঙ্গে "কল্পনা"র কত প্রভেদ।

"কাহিনী"তে কয়েকটি নাট্যকবিতা আছে; 'গান্ধারীর আবেদন,' 'সতী' 'নরকবাস' 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' এবং 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' সব কয়টি রচনাই একান্তভাবে গীতধর্মী; কিন্তু ইহাদের নাটকীয় গুণও অনস্বীকার্য। নাটক ও নাটিকা অধ্যায়ে ইহাদের সম্বন্ধে বিশদতর আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু সাহিত্যরসের দিক হইতে ইহাদের কবিতা হিসাবেও আলোচনা করা চলে। এক 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' ছাড়া আর চারিটি নাট্য-কবিতার উপাদানই আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য হইতে আহৃত, এবং সব কয়টিতেই কবি প্রচলিত লোকধর্ম, সমাজধর্ম প্রভৃতির বিরুদ্ধে মানবের চিরন্তন সত্য নিত্যধর্মের জয়ঘোষণা করিয়াছেন।

"কথা"-গ্রন্থের উপাদানও আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য হইতে আহৃত, এবং আমাদের অতীত ইতিহাসের অসংখ্য ছোট ছোট আপাত তুচ্ছ ঘটনা ও কাহিনীর মধ্যে যে ত্যাগ, ক্ষমা, বীরধর্ম এবং মানব-মহত্ত্বের অন্যান্য যে সব গুণ প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই এই সুন্দর গাথা ও কবিতা-গুলির প্রাণরস জোগাইয়াছে। মানব-মহত্ত্বের, মানবের চিরন্তন সত্য নিত্যধর্মের যে মহান রূপ আমাদের প্রাচীন ইতিহাসে থাকিয়া থাকিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাই কবিচিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছে, তাঁহার উপলব্ধিতে ধরা দিয়াছে, এবং "কাহিনী" ও "কথা"-গ্রন্থে তাহাই রূপ ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য কিশোর বয়স হইতেই রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। বৈষ্ণব পদকর্তাদের জগৎ, কালিদাসের জগৎ তাঁহার কাছে অত্যন্ত পরিচিত ছিল, এবং তাহা হইতে প্রেম ও সৌন্দর্যসুধারস তিনি কম আহরণ করেন নাই। তাঁহাদের জগৎকে তিনি নিজের চিত্তের মধ্যে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, কল্পনায় রঞ্জিত করিয়াছেন, এবং তাহারা তাঁহার কাব্য-চেতনার অংশ হইয়া গিয়াছে। "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী" হইতে আরম্ভ করিয়া "চিত্রা" পর্যন্ত কত

অসংখ্য কবিতায় যে এ কথার প্রমাণ আছে, তাহা পাঠককে দেখাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, যে প্রাচীন ভারতীয় জগৎ ও জীবনের পরিচয় এই সব কাব্যে আমরা পাই, সে-জগৎ ও জীবন, এবং "চৈতালি" হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর-জীবনে রচিত কাব্যে যে অতীত ভারতীয় জীবন ও জগতের পরিচয় পাওয়া যায়, এই দুই জগৎ ও জীবন এক নয়। পূর্বজীবনের রচিত কাব্যে ভারতীয় সাধনার যে খণ্ড অংশ তাঁহার কবিচিত্তে প্রাণরস সঞ্চার করিয়াছে, অনুভূতিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে তাহা প্রেম ও সৌন্দর্য-সাধনা, নিসর্গ-সাধনা। কিন্তু উত্তর-কবিজীবনে ভারতীয় সাধনার অন্য আর একটি গভীর দিক ক্রমশ কবিচিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে, ইহাই বিশেষ-ভাবে আমাদের বোধের মধ্যে ধরা দেয়। "চৈতালি," হইতেই তাহার সূত্রপাত হইয়াছে; এই গ্রন্থের অধিকাংশ চতুর্দশপদী কবিতায় তাহার প্রমাণ আছে। তিনি যে ক্রমশ ভারতবর্ষের প্রাচীন তপোবনাদর্শের দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন, আমাদের খণ্ড বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র জীবন যে কবিকে পীড়িত করিতেছে, মানবের চিরন্তন মহিমা ও মহত্ত্ব যে শত আবরণ ভেদ করিয়াও তাঁহার মন ও দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতেছে এবং কল্পনাকে সবল করিতেছে, মানুষের এই তুচ্ছ সংসারের মধ্যেই যে দেবতার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত, "কুমারসম্ভবে"র অসমাপ্ত গানই যে তাঁহার ভাল লাগিতেছে, এ সমস্ত হইতেই বোঝা যায়, তাঁহার কবিচিত্ত কোন্ দিকে মোড় ফিরিতেছে। একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, শুধু প্রেম, সৌন্দর্য, এমন কি নিসর্গ-সাধনাও কবিকে আর তৃপ্তি দিতে পারিতেছে না, তাঁহাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না, ভারতীয় ঐতিহ্যের সৌন্দর্য ও নিসর্গ সাধনার মূল্য তাঁহার কাছে ক্রমশ কমিয়া আসিতেছে। কালিদাস, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসও অন্য দিক দিয়া, গভীরতর দিক দিয়া তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছেন। পূর্বজীবনের 'মেঘদূতে'র সঙ্গে

"চৈতালি"র 'কালিদাসের প্রতি', 'কুমারসম্ভব গান,' 'মানসলোক' 'কাব্য' এই চারিটি কবিতা তুলনা করিলেই একথার সত্যতা ধরা পড়িবে। বেশ বুঝা যাইতেছে, জগৎ ও জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করিবার, তাহার মর্মমূলে প্রবেশ করিবার, মানস-সৌন্দর্য শুধু নয়, মানব-মহত্ত্বকে গভীরভাবে জানিবার একটা চেষ্টা কবিচিত্তে জাগিয়াছে। এই তপস্যা রূপ ধরিল "কাহিনী" ও "কথা" গ্রন্থে ভারতীয় ঐতিহ্যকে অবলম্বন করিয়া, এবং সেই ঐতিহ্যেরও সেই দিক যে-দিকে মানব-মহত্ত্ব বিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই মানব-মহত্ত্বের সঙ্গে রবীন্দ্র-কবিচিত্ত সুগভীর আত্মীয়তা স্থাপন করিল। এই কথাটি উপলব্ধি করিলে "কথা" ও "কাহিনী"র মূল্য নির্ধারণ সহজ হইবে। অবশ্য খণ্ড খণ্ড প্রত্যেকটি কবিতার একটা স্বাধীন মূল্য আছে, একথা বলাই বাহুল্য ; কিন্তু সমগ্রভাবে, রবীন্দ্র-কাব্য-প্রবাহের দিক হইতে "কথা" ও "কাহিনী" গ্রন্থের উপরোক্ত এই বিশেষ মূল্য আছে, একথা স্বীকার না করিলে রবীন্দ্র-কাব্যজীবনের প্রবাহ বোধ-গোচর হইবে না।

"কথা" ও "কাহিনী"-গ্রন্থের এই ঐতিহ্য-অবগাহন সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন,

"একদিন এল যখন আর-একটা ধারা বন্যার মতো মনের মধ্যে নামলো। কিছুদিন ধরে দিল তাকে প্লাবিত করে। ইংরেজি অলংকার শাস্ত্রে এই শ্রেণীর ধারাকে বলে ন্যারেটিভ। অর্থাৎ কাহিনী। এর আনন্দ-বেগ যেন থামতে চাইল না। * * * মনের সেই অবস্থায় কখনো কখনো কাহিনী বড়ো ধারায় উৎসাহিত হয়ে নাট্যরূপ নিল।

এ সব লেখার ভালোমন্দ বিচার করা অনাবশ্যক, চিন্তার বিষয় এর মনস্তত্ত্ব। * * * ভালো করে ভেবে দেখলে দেখা যাবে কথার কবিতাগুলিকে ন্যারেটিভ শ্রেণীতে গণ্য করলেও তারা চিত্রশালা। * * *

ছবির অভিমুখিতা বাইরের দিকে, নিরাবিল দৃষ্টিতে স্পষ্ট রেখায়। সেইজন্যে মনের মধ্যে এই ছবির প্রবর্তনা এমন বিষয়বস্তুকে স্বভাবত বেছে নেয় যার ভিত্তি

বাস্তবে। এই সন্ধানে এক সময়ে গিয়ে পড়েছিলুম ইতিহাসের রাজ্যে। সেই সময়ে এই বহির্দৃষ্টির প্রেরণা কাব্যে ও নাট্যে ভিড় করে এসেছিল ইতিহাসের সঞ্চয় নিয়ে। এমনি করে এই সময়ে আমার কাব্যে একটা মহল তৈরি হয়ে উঠেছে যার দৃশ্য জেগেছে ছবিতে, যার রস নেমেছে কাহিনীতে, যাতে রূপের আভাস দিয়েছে নাটকীয়তায়।" (রচনাবলী, ৭ম খণ্ড, "কথা" ও "কাহিনী" গ্রন্থের সূচনা)।

কবির ব্যাখ্যা যাহাই হউক, এই ঐতিহ্য-অবগাহনের একটু ইঙ্গিত বাংলা দেশের সমসাময়িক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ-মানসের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন। "কথা" ও "কাহিনী" গ্রন্থের চিত্রমালার পশ্চাতে সেই সমাজ-মানস ক্রিয়াশীল। বঙ্গাব্দ দ্বাদশ শতকের শেষপাদ হইতে, বিশেষভাবে ত্রয়োদশ শতকের সূচনা হইতেই বাংলা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজের দেশের ঐতিহ্যবোধ প্রবল হইতেছিল। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, বিশেষভাবে রমেশচন্দ্র হইতেই তাহার সূচনা। শুনিতে হঠাৎ খট্‌কা লাগিতে পারে কিন্তু একথা সত্য যে বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষাও রমেশচন্দ্রে এই বোধ প্রবল ছিল। বঙ্কিম-মানস প্রধানত রোম্যান্স-নির্ভর, রমেশচন্দ্র অধিকতর ইতিহাসানুগামী। কিন্তু সে যাহাই হউক, বহুদিন পর্যন্ত এই ঐতিহ্যসন্ধান উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, পুরাণপ্রসঙ্গের সীমা অতিক্রম করিতে পারে নাই। বঙ্কিম-রমেশই বোধ হয় সর্বপ্রথম নিকটতর বাস্তবতর ঐতিহ্যের আহ্বান স্বীকার করিয়াছিলেন, এবং এই স্বীকৃতির মধ্যেই শিক্ষিত বাঙালীর স্বাদেশিকতার সূচনা। তবু তাঁহাদের স্বীকৃতি প্রথমত ও প্রধানত আদর্শমূলীয়। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে স্বাদেশিকতার বোধও বিবর্তিত হইতে আরম্ভ করে, এবং ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এবং তাহাকে অতিক্রম করিয়া এই বোধ প্রবল হইতে থাকে। এই সময়ই দেশের প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাসের বিশদ আলোচনার সূচনাও দেখা যায়, এবং সে-ইতিহাস অধিকাংশক্ষেত্রেই

প্রত্যক্ষ ও বাস্তবমূলীয়। এ সমস্তই পরবর্তী স্বদেশী আন্দোলনের ভাবভূমিকা। বাঙালীর স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে ইহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই ঐতিহ্যবোধগত ভাবভূমির উপরই তো স্বদেশী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা। যে-ঐতিহ্যবোধ ও সন্ধানের কথা বলিলাম, ঠাকুরবাড়ি তাহার একটি কেন্দ্র, এবং "জীবন-স্মৃতি"র রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রসঙ্গ এই সম্পর্কে একান্তভাবে স্মরণীয়। সূক্ষ্ম ও বোধপ্রবণ রবীন্দ্রচিত্তে ইহার এবং নবজাগ্রত দেশবোধের ইঙ্গিত ব্যর্থ যায় নাই। সজ্ঞানে, তীক্ষ্ণ বোধ ও বুদ্ধির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ইহাকে স্বীকার করিলেন; স্বীকার যে করিলেন তাহার প্রমাণ তদানীন্তন রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস গ্রন্থ-সংগ্রহ, এবং অত্যন্ত যত্নে ভারত-ইতিহাস পাঠ। কি সুকঠোর অধ্যবসায়ে তিনি তদানীন্তন ঐতিহাসিক গবেষণাগুলি পাঠ করিতেন এবং ছাত্রের মতন করিয়া টীকা-টিপ্পনী উদ্ধার করিতেন তাহার কিছু কিছু সাক্ষ্য ত এখনও আমরা দেখিতে পাই। এই ভাবে ভারতবর্ষের যে ঐতিহ্যের সন্ধান তিনি লাভ করিলেন তাহাই ত তাঁহার স্বদেশিকতার মূলে, এবং অনেক সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং ঐতিহাসিক নিবন্ধে (এ জাতীয় অধিকাংশ নিবন্ধ ১৩০০-১৩১৫এর লেখা) তিনি যে সমস্ত মতামত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার মূলে। নিবন্ধগুলিতে যাহা বিচারবুদ্ধিতে বিশ্লেষিত হইয়াছে, ব্যাখ্যাত হইয়াছে, "কথা" ও "কাহিনী"র আখ্যানগুলিতে তাহাই শিল্পরূপে ও রসে উৎসারিত হইয়াছে। পববর্তীকালে স্বদেশীযুগে কর্মে ও চিন্তায়, বক্তৃতা ও রচনায় যে ভাবে তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন তাহার সমস্ত কিছুর মানসমূল এই সময়কার ঐতিহ্যচর্চা, এবং এই সময়ই তাঁহার দেশ তাঁহার নিকট সর্বপ্রথম সত্য ও বস্তুরূপে প্রতিভাত হইল। তিনি যে ভাবে দেখিলেন তাহাই যে দেশের যথার্থ বস্তুরূপ একথা মনে করা কঠিন, অথবা তাহা একতম রূপও হয়ত নয়। ইতিহাসের গভীরতর চর্চার

সঙ্গে সঙ্গে সে রূপ ত আমাদের দৃষ্টির সম্মুখেই বদলাইয়া গিয়াছে। অন্য রূপও যে আছে এ-প্রসঙ্গে আমরা সচেতন হইয়াছি ; তবু একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে রবীন্দ্রচিত্তে ভারতীয় ঐতিহ্য ও ইতিহাস যে-দৃষ্টিতে যে-রূপে ধরা দিয়াছিল সেই দৃষ্টি ও রূপই বহুদিন পর্যন্ত আমাদের পরবর্তী সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মপ্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল, সেই দৃষ্টি ও রূপই আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের মানস-ভূমি। একথা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা কবিবার স্থান এই গ্রন্থ নয়। তবে একথা বলা যাইতে পারে যে, এই দৃষ্টিরূপ ইতিহাসের সমগ্র জ্ঞান হইতে উদ্ভূত নয়, বস্তুমূলীয় হওয়া সত্ত্বেও বস্তুকে সমগ্ররূপে দেখা হয় নাই, পৌর্বাপর্যের ঐতিহাসিক যুক্তি এই দৃষ্টিরূপের অন্তর্গত নয়। উত্তর জীবনে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাহা বার বার স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, কবিতায়, উপন্যাসে, নাটকে ও নিবন্ধে।

কিন্তু, তাহা বলিয়া "কথা" বা "কাহিনী"র আখ্যানগুলি রসসমৃদ্ধ নয়, একথা কিছুতেই বলা চলিবে না। ইতিহাসের খণ্ডিত দৃষ্টি লইয়া বিশিষ্ট আখ্যানের বা পরিবেশের কাব্যরূপের মধ্যে রসসঞ্চার চলে না, একথা যাঁহারা বলেন তাঁহারা সাহিত্যের সঙ্গে ঐতিহ্যের সম্বন্ধ-বিষয়ে মিথ্যা ধারণা পোষণ করেন। রসসঞ্চার বা রূপায়ন বিষয়বস্তুগত ঐতিহাসিক গুণাগুণের অপেক্ষা রাখে না ; তাহা শুধু রচয়িতার মানস প্রকৃতিকে উদ্‌ঘাটিত করে, তাহার চেয়ে বেশি কিছু নয়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সে-প্রকৃতি যে কি তাহা তো আগেই উল্লেখ করিয়াছি।

"কথা"-গ্রন্থের আখ্যানগুলি সমস্তই ঐতিহাসিক ; "কাহিনী"র কবিতাগুলি কাল্পনিক, কিন্তু কাল্পনিক হইলেও তাহা ঐতিহ্যগত, অর্থাৎ ভারতীয় চিত্তধর্মের যে প্রকাশ "কথা"র আখ্যানগুলিতে, 'কাহিনী" অংশের আখ্যানগুলিও সেই একই চিত্তধর্মী। কিন্তু 'কাহিনী" নাট্যকবিতার আখ্যানগুলির উৎস একটু পৃথক। লক্ষ্মীর পরীক্ষা' ও 'সতী' ছাড়া

আর তিনটি নাট্যকবিতারই উৎস ভারতীয় পুরাণ কথা, 'সতী'র উৎস মারাঠি গাথা যাহা প্রায় ইতিহাসেরই অন্তর্গত। 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' কাল্পনিক। কিন্তু পুরাণ-কথা যে তিনটি নাট্যকবিতার উৎস, সে তিনটি একান্তভাবে পুরাণানুগামী একথা মনে করিলে ভুল করা হইবে। "কাহিনী"র অন্তর্গত 'পতিতা' কবিতাটিও পুরাণানুগামী নয়। বস্তুত ইহাদের প্রত্যেকটি চরিত্রই রবীন্দ্রনাথের নূতন সৃষ্টি, প্রত্যেকটি কাহিনীই নূতন পথনির্দেশে এবং নূতন ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ। পৌরাণিক অথবা ভারত-কথার মূল হইতে তাহারা স্বতন্ত্র শুধু নয়, তাহারা অনেক বেশি জটিল, অনেক বেশি পীড়িত ও সংক্ষুব্ধ; সমস্যা ও সংগ্রামে, প্রেরণা ও আদর্শে অনেক বেশি সমৃদ্ধ ও আবেগগভীর।

'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ', 'গান্ধারীর আবেদন', বিশেষভাবে 'সতী' ও 'নরকবাসে'র নাটকীয় গুণও সুস্পষ্ট; সে কথা আমি অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। এগুলি ত নাটকাকারেই লিখিত। কিন্তু "কথা" ও "কাহিনী"র ঐতিহাসিক বা কাল্পনিক আখ্যানগুলি নাটকাকারে লিখিত নয়; তবু কতকগুলি আখ্যানের কাব্যরূপের মধ্যে নাটকীয় আভাস লক্ষ্য করিবার মতন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায় 'দেবতার গ্রাস' বা 'বন্দী বীরে'র মত. কবিতা। এই জাতীয় আরও দৃষ্টান্ত অপ্রতুল নয়। এই অ্যাখ্যানগুলির চিত্রপ্রবর্তনার মধ্যে একটা নাটকীয় পরিকল্পনা ধরা পড়িতে বিলম্ব হয় না, এবং ইহাদের ট্র্যাজিক্ পরিণতির মধ্যে কবি একটা নাটকীয় সম্ভাবনাও লক্ষ্য করিয়াছিলেন। "কথা" ও "কাহিনী"র অনেক আখ্যানমূলক কবিতাতেই এই নাট্যীয় রসের সঞ্চার কাব্যরসিকের সমাদরের যোগ্য।

"কণিকা"র অধিকাংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা 'লিমারিক' জাতীয়। ইহাদের প্রেরণা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোথাও তত্ত্বমূলক, কোথাও

উপদেশমূলক, কোথাও ব্যঙ্গ-হাস্যমূলক। কতকগুলি দুই অথবা চার লাইনের ছড়া আছে যাহা কতকটা 'বচন' জাতীয় যেমন—

দেহটা যেমনি করে ঘোরাও যেখানে
বাম হাত বামে থাকে ডান হাত ডানে।

উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে,
তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে।

যথার্থ কাব্যরসের সার্থক প্রকাশ প্রায় অনুপস্থিত, তবে এমন কবিতাও আছে—

ওগো মৃত্যু, তুমি যদি হতে শূন্যময়
মুহূর্তে নিখিল তবে হয়ে যেত লয়।
তুমি পরিপূর্ণ রূপ—তব বক্ষে কোলে
জগৎ শিশুর মতো নিত্যকাল দোলে।

এই ধরনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা পরবর্তী কালে কবিকে অনেক লিখিতে হইয়াছে, নানা উপলক্ষে নানা জনকে অনুগৃহীত করিবার জন্য। তাহার অনেকগুলি "লেখন" গ্রন্থে একত্রে প্রকাশিতও হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে "লেখনে"র রচনাগুলি অনেক বেশি ভাবগভীর ও রসসমৃদ্ধ; তাহাদের সঙ্গে "কণিকা"র টুকরাগুলির তুলনাই হয় না।

"কল্পনা" কাব্য রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব অপরূপ সৃষ্টি। নিছক অনাবিল কল্পনার সৌন্দর্যমহিমা ও অপার বিস্তারের দিক হইতে ইহার কবিতাগুলি "চিত্রা"র কবিতা অপেক্ষা কম সমৃদ্ধ নয়; কারণ ইতিমধ্যে "চিত্রা"র কবিমানস কবির কাব্যচেতনার অংশ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু "কল্পনা"র কবিতাগুলি উপভোগ্যতর হইয়াছে অন্য কারণে। "কথা" ও "কাহিনী"-গ্রন্থেই আমরা দেখিতেছি, মহাজীবনের আহ্বান কবির কানে আসিয়া

পৌঁছিয়াছে, মানব-মহত্ত্বের গভীর আবেদন তাঁহার চিত্তকে স্পর্শ করিয়াছে, শান্ত সমাহিত তপস্যার জীবনের প্রতি তাঁহার কবিচিত্ত আকৃষ্ট হইতেছে, একটা নিগূঢ় গভীর চেতনা তাঁহার সমগ্র কবি-মানসকে রূপান্তরিত করিবার উপক্রম করিতেছে। "কল্পনা"-গ্রন্থে "সোনার তরী-চিত্রা"র সৌন্দর্য-তন্ময়তার সঙ্গে আসিয়া মিশিয়াছে নবলব্ধ এই নিগূঢ় গভীর চেতনা, এবং দুইয়ে মিলিয়া কবির কাব্য চেতনাকে যে নূতন রূপ-দান করিল তাহাই "কল্পনা"র কবিতাগুলিকে অপরূপ ঐশ্বর্যে ভরিয়া দিয়াছে।

গানগুলি বাদ দিলে "কল্পনা"য় কবি-চিত্তের দুইটি ধারা সহজেই ধরা পড়ে; একদিকে "সোনার তরী-চিত্রা"র প্রেম ও নিসর্গ-সাধনার প্রকাশ স্মৃতি ও ঐতিহ্য সম্পদে, শব্দ ও ধ্বনিগাম্ভীর্যে, ছন্দে ও লালিত্যে, ভাবগরিমায় এবং সৌন্দর্যমহিমায় অধিকতর সমৃদ্ধি লাভ করিতেছে,—'বর্ষামঙ্গল,' 'স্বপ্ন,' 'মদনভস্মের পূর্বে', 'মদনভস্মের পরে', 'পসারিণী', 'শরৎ' প্রভৃতি কবিতা তাহার প্রমাণ। আর একদিকে, যে নিগূঢ় গভীর সমাহিত চৈতন্যের কথা আগে উল্লেখ করিয়াছি, সেই চৈতন্য আপনাকে প্রকাশ করিতেছে 'দুঃসময়', 'ভ্রষ্টলগ্ন' 'বিদায়', 'অশেষ', 'বর্ষশেষ', 'অসময়', 'বৈশাখ', 'রাত্রি' প্রভৃতি কবিতায়। কিন্তু ইহাদের মধ্যে নিসর্গ-সাধনার প্রকাশ জড়াইয়া নাই একথা বলা যায় না। আসল কথা, কোনও কাব্যকে, বিশেষ করিয়া রবীন্দ্র-কাব্যকে কোনও বিশেষ চিহ্নে, কোনও বিশেষ নামে চিহ্নিত অথবা নামাঙ্কিত করা যায় না। নানা বিভিন্ন ধারা, আপাতবিরোধী ভাব ও অনুভূতি একই কবিতায় হয়ত একটা সমগ্ররূপ ধরিয়া প্রকাশ পায়, বিশেষভাবে কবিজীবনের যুগসন্ধিকালে যে সব কাব্যের রচনা কবির সেই সব কবিতায়। তবু আলোচনা ও বিশ্লেষণ যখন আমরা করিতে বসি তখন নিজেদের বোধের সুবিধার জন্য প্রবলতর ভাব ও অনুভূতি অনুসারেই কাব্য-পর্যায়ের নামকরণ আমরা করিয়া থাকি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও একথা ভুলিলে

চলিবে না, কবির কাব্যে যে-মনের প্রকাশ আমরা দেখি সে- মনের মধ্যে জড়াজড়ি করিয়া থাকে বিচিত্র ভাব ও অনুভূতির ধারা, শতেক যুগের গীতি, রসের সরু মোটা সহজ জটিল উপলব্ধি। তবু, সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্য, সকল বিচিত্রতা, সকল জটিলতা অতিক্রম করিয়া এক এক সময় এক একটা সুর, এক একটা অনুভূতি প্রবলতর হইয়া প্রকাশের মধ্যে ধরা দেয়। "কল্পনা"য় ভাব ও উপলব্ধির এই জটিলতা ও বৈচিত্র্য খুব স্পষ্ট, এবং খুব স্বাভাবিকও; কারণ আমি পূর্বেই বলিয়াছি "কল্পনা" কবি-জীবনের একটি যুগসন্ধিক্ষণের সুগভীর প্রকাশ। সেই হেতু "কল্পনা"র কতকগুলি কবিতায় ভাব ও রসের প্রকাশ একভাবে ধরা দিয়াছে, কতকগুলি কবিতায় অন্যভাবে।

নিসর্গ মহিমার অপরূপ সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে 'বর্ষামঙ্গল' কবিতায়।

> ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
> জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ-রভসে
> ঘন গৌরবে নবযৌবনা বরষা
> শ্যামগম্ভীর সরসা।
> গুরু গর্জনে নীল অরণ্য শিহরে
> উতলা কলাপী কেকা-কলরবে বিহরে;
> নিখিল চিত্ত হরষা
> ঘন গৌরবে আসিছে মত্ত বরষা। ('বর্ষামঙ্গল')

ইহার ধ্বনি ও ছন্দে, পদ-বিন্যাসে, শব্দ-চয়নে ও চিত্র-গরিমায় মত্ত নববর্ষার যে সুগম্ভীর রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার পরিচয় ইহার শব্দার্থের মধ্যে পাওয়া যায় না, যে মোহ-মাধুর্য ইহাকে আশ্রয় করিয়াছে তাহার সৃষ্টি হইয়াছে অতীত ভারতের বর্ষা-বিজড়িত স্মৃতি-ঐতিহ্য হইতে, তাহার উপাদান জোগাইয়াছে শতেক যুগের কবি; ঘনবর্ষার ধারায় যে গীত ধ্বনিত হয় তাহা ত এই কবিদেরই গীত—

শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্ত মদির বাতাসে।
শতেক যুগের গীতিকা। ('বর্ষামঙ্গল')

এই যে প্রাচীন যুগের স্মৃতি-ঐতিহ্য ইহা রবীন্দ্র-কবি-মানসের একটি বিশেষ অংশ, একটি বিশেষ সম্পদ। "মানসী-সোনার তরী-চিত্রার" অনেক কবিতাতেই এই স্মৃতি-ঐতিহ্য মোহ-মাধুর্য বিস্তার করিয়াছে। "কল্পনা"রও তাহার পরিচয় কম নয়; 'বর্ষামঙ্গল,' 'চৌরপঞ্চাশিকা,' 'স্বপ্ন,' 'মদনভস্মের পূর্বে'; 'ভ্রষ্টলগ্ন' প্রভৃতি কবিতার মাধুর্য এই স্মৃতি-ঐতিহ্য হইতেই আহরিত হইয়াছে।

'স্বপ্ন' কবিতাটিকে একটি কোমল মধুর স্নিগ্ধ প্রেমের কবিতা বলা যাইতে পারে, এবং এক হিসাবে 'ভ্রষ্টলগ্ন' কবিতাটিকেও। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতার একটি বৈশিষ্ট্য আছে; দেহ-আত্মা-লীলার যে প্রেম অত্যন্ত নিবিড় ইন্দ্রিয়-মিলনের মধ্যে প্রকাশ পায় সেই একান্ত মর্মান্তিক প্রেমের পরিচয় রবীন্দ্র-কাব্যে-নাই, একথা আমি এই আলোচনাতেই অন্যত্র বলিয়াছি। দেহ-আত্মা-মিলনের মধ্যে যে সৌন্দর্য-মাধুর্য সেইটুকু পান করিয়াই রবীন্দ্রনাথ পরিতৃপ্ত, তাহার বেশি তিনি চাহেন না, এবং এই সৌন্দর্য-মাধুর্য আস্বাদনের পরমুহূর্তেই তাঁহার প্রেম নিসর্গ-মাধুর্যের মধ্যে পরিব্যাপ্ত, বিশ্বসৌন্দর্যের মধ্যে একটা শান্ত সংযমের মধ্যে বিস্তারিত হইয়া যায়, ইন্দ্রিয়বন্ধ টুটিবার উপক্রম করিয়াও টুটিয়া যায় না, ইন্দ্রিয়াকাঙ্ক্ষা বিশ্বসৌন্দর্যের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। অসংখ্য কবিতায় তাহার প্রমাণ আছে, "কল্পনা"-গ্রন্থে 'স্বপ্ন' কবিতায়ও আছে। প্রিয়ার দেহ-সৌন্দর্য অতি কোমল অঙ্গুলি দিয়া কবি আঁকিলেন পরিবেশ সম্পূর্ণ হইল, উদ্বেলিত হৃদয় একে অন্যের সম্মুখীন হইল।

দুজনে ভাবিনু কত বার চক্ষুঃ।
নাহি জানি কখন কী ছলে

সুকোমল হাতখানি লুকাইল আসি
আমার দক্ষিণ করে,—কুলায়প্রত্যাশী
সন্ধ্যার পাখির মতো; মুখখানি তার
নতবৃন্ত পদ্মসম এ বক্ষে আমার
নমিয়া পড়িল ধীরে;—ব্যাকুল উদাস
নিঃশব্দে মিলিল আসি নিশ্বাসে নিশ্বাস।

কিন্তু তার পরেই—ভিন্ন তালে, ভিন্ন লয়ে

রজনীর অন্ধকার
উজ্জয়িনী করি দিল লুপ্ত একাকার।
দীপ দ্বারপাশে
কখন নিবিয়া গেল দুরন্ত বাতাসে।
শিপ্রানদীতীরে
আরতি থামিয়া গেল শিবের মন্দিরে। ('স্বপ্ন')

একদিকে এই প্রেম ও সৌন্দর্যের মধ্যে কবিচিত্ত থাকিয়া থাকিয়া সুধা আহরণ করিতেছে—এ যে বহু দিনের বহু বৎসরের সাধনাভ্যাস, ইহাকে ছাড়িতে চাহিলেই তন্মুহূর্তেই ছাড়া যায় না, তাহার বেদনা হইতে মুক্তিও পাওয়া যায় না। তাহা ছাড়া অন্যদিকে যে নিগূঢ় গভীর চৈতন্য চিত্তকে ক্রমশ অধিকার করিতেছে তাহা এখনও সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে নাই; এই অস্পষ্টতার অনিশ্চয়তারও একটা বেদনা আছে। এই দুই বেদনার দ্বন্দ্ব-ক্রন্দন "কল্পনা"র অনেক কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে। এই জীবন-দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়িয়া কবিতাগুলি নূতন ভাব-রূপও পাইয়াছে, এবং ছন্দ-রূপও অপূর্ব শক্তি এবং গাম্ভীর্য লাভ করিয়াছে।

'দুঃসময়,' 'অসময়,' 'অশেষ,' 'বিদায়,' 'বৈশাখ,' 'রাত্রি,' 'বর্ষশেষ' প্রভৃতি কবিতায় এই দ্বন্দ্ব-বেদনা স্বপ্রকাশ। এই যে নিগূঢ় চৈতন্য চিত্তকে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতেছে, কবি তাহা জানেন, কবি জানেন

'মুখর বন মর্মর গুঞ্জিত, কুঞ্জ কুন্দ কুসুম রঞ্জিত' প্রেম ও সৌন্দর্য-সাধনার জীবন এখন দূরে সরিয়া যাইতেছে। এখন অসময়, বড় দুঃসময়, এখন 'অজগর গরজে সাগর ফুলিছে, ফেন হিল্লোল কল কল্লোলে দুলিছে', এখন 'মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে, দিক-দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা,' 'এখন সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে', এখন 'সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,' এতদিন 'বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি, এখন বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিল আকাশে'। কিন্তু বন্ধ্যা সন্ধ্যার অস্পষ্ট ম্লানিমা বেশি দিন কবিচিত্তকে বুঝি আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারিল না; কোন্ অপরিচিত জগতের, কোন্ নিগূঢ় শক্তির অমোঘ আহ্বাহন বুঝি শুনা যাইতেছে—সে-আহ্বান কবিকে শান্তি ও তৃপ্তির মধ্যে থাকিতে দিবে না, ক্লান্ত দেহমনকে বিশ্রাম দিবে না। কবি বুঝি কোনও ভাবমুহূর্তে ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনের কাজ তিনি শেষ করিয়াছেন, বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিয়াছে, দিনাবসানের শ্রান্ত ক্লান্ত দেহমন রাত্রির কোলে বিছাইয়া দিয়া বিশ্রাম লাভ করিবেন—কিন্তু এ যে কত মিথ্যা তাহা প্রমাণ করিয়া দিলেন তাঁহার নিষ্ঠুর কঠোর জীবন-দেবতা। তাহার আহ্বান বিদ্যুতের মত কবির কানে আসিয়া বাজিল। জীবনের শেষ কি আছে, এক জীবন-পর্যায়ের শেষকে আর এক নূতন মহাজীবন ডাকিতেছে,—

নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা, সোনার আঁচলখসা
হাতে দীপশিখা,
দিনের কল্লোল 'পর টানি দিল ঝিল্লিস্বর
ঘন যবনিকা।
ওপারের কালো কূলে কালি ঘনাইয়া তুলে
নিশার কালিমা,
গাঢ় সে তিমির তলে চক্ষু কোথা ডুবে চলে
নাহি পায় সীমা।

নয়ন-পল্লব 'পরে স্বপ্ন জড়াইয়া ধরে
থেমে যায় গান ;
ক্লান্তি টানে অঙ্গে মম প্রিয়ার মিনতি সম
এখনো আহ্বান !

* * *

রহিল রহিল তবে আমার আপন সবে,
আমার নিরালা,
মোর সন্ধ্যাদীপালোক পথ-চাওয়া দুটি চোখ
যত্নে গাঁথা মালা।

* * *

রাত্রি মোর, শান্তি মোর রহিল স্বপ্নের ঘোর,
সুস্নিগ্ধ নির্ব্বাণ,
আবার চলিনু ফিরে বহি ক্লান্ত নতশিরে
তোমার আহ্বান।

* * *

হবে, হবে, হবে জয় হে দেবী করিনে ভয়,
হব আমি জয়ী।
তোমার আহ্বান বাণী সফল করিব রাণী,
হে মহিমাময়ী।
কাঁপিবে না ক্লান্ত কর ভাঙিবে না কণ্ঠস্বর
টুটিবে না বীণা,
নবীন প্রভাত লাগি দীর্ঘ রাত্রি র'ব জাগি,
দীপ নিভিবে না।
কর্মভার নবপ্রাতে নবসেবকের হাতে
করি যাব দান,
মোর শেষ কণ্ঠস্বরে যাইব ঘোষণা করে
তোমার আহ্বান। ('অশেষ')

নূতন মহাজীবনের আহ্বানকে কবি স্বীকার করিলেন যে মুহূর্তে, তাহার পরমুহূর্তেই পুরাতন জীবন হইতে 'বিদায়' লইতে হইল। এতকালের খেলা ও বাসনা ছাড়িয়া তিনি চাহিলেন শান্তি, হাসি-অশ্রু পরিত্যাগ করিয়া চাহিলেন 'উদার বৈরাগ্যময় বিশাল বিশ্রাম,' প্রেম-সৌন্দর্য-গীত-মুখরিত জগৎ ছাড়িয়া 'পরম নির্বাক নিস্তব্ধ' জগতের মধ্যে, আশ্রয় লাভ করিতে চাহিলেন। মহাজীবন যে কোন দিকে ইঙ্গিত করিতেছে, কোথায় কোন নিগূঢ় সুগভীর রহস্যের জগতে কবিচিত্তকে লইয়া যাইতেছে তাহা ত এই সব কবিতায় অত্যন্ত স্পষ্ট; অধিকতর স্পষ্ট 'বর্ষশেষ', 'বৈশাখ,' 'রাত্রি' প্রভৃতি কবিতায়। যে সুগভীর অনুভূতি এই সব কবিতায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহার কাছে পূর্ববর্তী প্রেম ও সৌন্দর্য-তন্ময়তার জীবন যেন লজ্জায় সংকুচিত হইয়া যায়।

'বর্ষশেষ' কবিতাটি '১৩০৫ সালে ৩০শে চৈত্র ঝড়ের দিনে রচিত'। ঝড়ের বর্ণনা হিসাবে এবং চিত্র-মহিমায় কবিতাটি অপরূপ; ঝড়ের পূর্বাভাস, তাহার বিক্ষোভ, তাহার ক্রন্দন, তাহার উন্মত্ততা, তাহার উল্লাস এবং সর্বশেষে শেষ গুচ্ছে তাহার শান্ত বিরতি স্তরে স্তরে তালে লয়ে এমন সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে যে শুধু ব্যাখ্যা করিয়া অর্থ করিয়া ইহার কাব্য মহিমা উদ্‌ঘাটিত করা অসম্ভব বলিলেই চলে। যে দ্বিধা, যে সংকোচ, যে বিদায়-বেদনা 'অশেষ' কবিতায় এখনও অবশিষ্ট ছিল তাহা যেন এই দুর্দম দুর্দান্ত ঝড়ে একেবারে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া কোথায় উড়িয়া গেল তাহার ঠিকানাও পাওয়া গেল না। যে মহাজীবন, নিগূঢ় সুগভীর রহস্যময় জীবন কবিকে আহ্বান করিল, 'বর্ষশেষ', কবিতায় তাহাকে তিনি প্রকাশ করিলেন,—

> হে নূতন, এস তুমি সম্পূর্ণ গগন পূর্ণ করি
> পুঞ্জ পুঞ্জ রূপে,

ব্যাপ্ত করি, লুপ্ত করি, স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে
ঘনঘোর স্তূপে।

* * *

তোমার ইঙ্গিতে যেন ঘনগূঢ় ভ্রূকুটির তলে
বিদ্যুতে প্রকাশে,—
তোমার সংগীত যেন গগনের শত ছিদ্রমুখে
বায়ুগর্জে আসে,—
তোমার বর্ষণ যেন পিপাসারে তীব্র তীক্ষবেগে
বিদ্ধ করি হানে,
তোমার প্রশান্তি যেন সুপ্ত শ্যাম ব্যাপ্ত সুগম্ভীর
স্তব্ধ রাত্রি আনে।

* * *

হে দুর্দম, হে নিশ্চিত, হে নূতন নিষ্ঠুর নূতন,
সহজ প্রবল।
জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুর্দিকে
বাহিরায় ফল—
পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব আকারে
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ,—
প্রণমি তোমারে।
তোমারে প্রণমি আমি, হে ভীষণ, সুস্নিগ্ধ শ্যামল,
অক্লান্ত অম্লান।
সদ্যোজাত মহাবীর, কি এনেছ করিয়া বহন
কিছু নাহি জান।
উড়েছে তোমার ধ্বজা মেঘরন্ধ্র-চ্যুত তপনের
জলদর্চি-রেখা;
করজোড়ে চেয়ে আছি ঊর্ধ্ব মুখে, পড়িতে জানি না
কী তাহাতে লেখা। ('বর্ষশেষ')

এই যে বর্ষশেষের ঝড় এ ত কবির নিজের জীবনেরই ঝড়। জীবনের এক অধ্যায়ের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহা ধুইয়া মুছিয়া গিয়া আর এক নব অধ্যায় উদ্‌ঘাটিত হইতে চলিয়াছে। এই কবিতাটির ইতিহাস ও তাৎপর্য সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন,

"১৩০৫ সালে বর্ষশেষ ও দিনশেষের মুহূর্তে একটি প্রকাণ্ড ঝড় দেখেছি * * * এই ঝড়ে আমার কাছে রুদ্রের আহ্বান এসে'ছল। যা কিছু পুরাতন ও জীর্ণ তার আসক্তি ত্যাগ করতে হবে—ঝড় এসে শুকনো পাতা উড়িয়ে দিয়ে সেই ডাক দিয়ে গেল এমনি ভাবে, চির নবীন যিনি তিনি প্রলয়কে পাঠিয়েছিলেন মোহের আবরণ উড়িয়ে দেবার জন্যে। তিনি জীর্ণতার আড়াল সরিয়ে দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করলেন। ঝড় থাম্‌ল। বললুম—অভ্যস্ত কর্ম নিয়ে এই যে এতদিন কাটালুম, এতে তো চিত্ত প্রসন্ন হ'ল না। যে আশ্রয় জীর্ণ হয়ে যায়, তাকেও নিজের হাতে ভাঙতে মমতার বাধা দেয়। ঝড় এসে আমার মনের ভিতরে তার ভিতকে নাড়া দিয়ে গেল, আমি বুঝলুম বেরিয়ে আসতে হবে" * * * ("শান্তিনিকেতন পত্রিকা," ১৩৩২, বৈশাখ)।

এই অবস্থা সম্বন্ধে কবি অন্যত্র লিখিতেছেন,

"এমনি করে ক্রমে ক্রমে জীবনের মধ্যে ধর্মকে স্পষ্ট করে স্বীকার করবার অবস্থা এসে পৌঁছল। যতই এটা এগিয়ে চল্‌ল, ততই পূর্বজীবনের সঙ্গে আসন্ন জীবনের একটা বিচ্ছেদ দেখা দিতে লাগ্‌ল। অনন্ত আকাশে বিশ্বপ্রকৃতির যে শান্তিময় মাধুর্য-আসনটা পাতা ছিল সেটাকে হঠাৎ ছিন্নবিচ্ছিন্ন ক'রে বিরোধ-বিক্ষুব্ধ মানবলোকে রুদ্র-বেশে কে দেখা দিল। এখন থেকে দ্বন্দ্বের দুঃখ, বিপ্লবের আলোড়ন। সেই নূতন বোধের অভ্যুদয় যে কি-রকম ঝড়ের বেশে দেখা দিয়েছিল, এই সময়কার 'বর্ষশেষ' কবিতার মধ্যে সেই কথাটি আছে।" ("আমার ধর্ম", "প্রবাসী", পৌষ, ১৩২৪)।

রুদ্রের আহ্বান যে জীবনে আসিয়াছে, মহাজীবনের গভীর সুগম্ভীর রূপ যে কবিচিত্তকে আলোড়িত করিয়াছে, 'বৈশাখ' কবিতায়ও তাহার প্রমাণ আছে—রুদ্র, ভৈরব, বৈরাগী জীবনের রূপ। কিন্তু "কল্পনা"-গ্রন্থে কল্পনার সবল ও মহিমান্বিত প্রকাশ দেখা যায় 'রাত্রি' কবিতাটিতে। কবি অবগুণ্ঠিতা শর্বরীর ধ্যান-মৌন সভায় সভাকবি

হইতে চাহিতেছেন, রাত্রির যে ধ্যান-গম্ভীর মূর্তি তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন, সেই ধ্যান-গাম্ভীর্যের জগতে তিনি উত্তীর্ণ হইতে চাহিতেছেন।

মোরে করো সভাকবি ধ্যানমৌন তোমার সভায়
হে শর্বরী, হে অবগুণ্ঠিতা!
তোমার আকাশ জুড়ি যুগে যুগে জপিছে যাহারা
বিরচিব তাহাদের গীতা।
তোমার তিমিরতলে যে বিপুল নিঃশব্দ উদ্যোগ
ভ্রমিতেছে জগতে জগতে
আমারে তুলিয়া লও সেই তার ধ্বজচক্রহীন
নীরব ঘর্ঘর মহারথে।

*   *   *   *

স্তম্ভিত তমিস্রপুঞ্জ কম্পিত করিয়া অকস্মাৎ
অর্ধরাত্রে উঠেছে উচ্ছ্বাসি
সদ্যস্ফুট ব্রহ্মমন্ত্র আনন্দিত ঋষিকণ্ঠ হতে
আন্দোলিয়া ঘন তন্দ্রারাশি।
পীড়িত ভুবন লাগি মহাযোগী করুণা-কাতর,
চকিতে বিদ্যুৎরেখাবৎ
তোমার নিখিল-লুপ্ত অন্ধকারে দাঁড়ায়ে একাকী
দেখেছে বিশ্বের মুক্তিপথ।

জগতের সেই সব যামিনীর জাগরূকদল
সঙ্গিহীন তব সভাসদ
কে কোথা বসিয়া আছে আজি রাত্রে ধরণীর মাঝে
গনিতেছে গোপন সম্পদ;
কেহ কারে নাহি জানে, আপনার স্বতন্ত্র আসনে
আসীন স্বাধীন স্তব্ধচ্ছবি;
হে শর্বরী, সেই তব বাক্যহীন জাগ্রত সভায়
মোরে করি দাও সভাকবি। ('রাত্রি')

"কল্পনা"র শেষ কবিতা ১৩০৬ সালের শেষাশেষি রচিত হয়, এবং "নৈবেদ্য"-গ্রন্থের প্রথম কবিতা রচিত হয় ১৩০৭ সালের শেষাশেষি। "কল্পনা"র জীবন হইতে "নৈবেদ্য"র জীবনের মধ্যে একটা স্বাভাবিক পরিণতি আছে। যে ধ্যানমৌন গভীর সুগম্ভীর জীবনের আকৃতি "কল্পনা"য় লক্ষ্য করা যায়, তাহার পরিণতি "নৈবেদ্য" হইতেই সূত্রপাত। কিন্তু এই স্বাভাবিক বিবর্তনের মাঝখানে একটি অপরূপ কাব্য-গ্রন্থ কয়েকমাসের ফাঁকের মধ্যে একটি স্থায়ী আসন দখল করিয়া বসিয়া আছে, সেটি "ক্ষণিকা"। "ক্ষণিকা" নামটি সার্থক। এক জীবন হইতে অন্য জীবনে রূপান্তরের মাঝখানে কয়েক মাসের জন্য ক্ষণিকার মতই "ক্ষণিকা"র উদয় ও অস্ত। "ক্ষণিকা" বিস্ময়কর কাব্য; আরও বিস্ময়-কর মনে হয়, কি করিয়া এই আপাতচটুল কৌতুক-বিলাসপূর্ণ কাব্যটি এমন গভীর সুগম্ভীর আবর্ত-বিবর্তের মাঝখানে আসিয়া নিজের আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া লইল, এই ভাবিয়া। কবিও বুঝিতেছেন, প্রেম ও সৌন্দর্য-তন্ময়, রসমাধুর্যময় গতজীবনের কাছে বিদায় লইতেই হইবে, কিন্তু বুঝিলেও বিচ্ছেদের বেদনা হইতে ত সহজেই মুক্তি পাওয়া যায় না, এবং সে-বেদনা সহজে সান্ত্বনা লাভ করিতেও চাহে না। "ক্ষণিকা"য় কবি ভাবিতেছেন, অতি তুচ্ছ কথায় বার্তায় হাসিয়া খেলিয়া এই বেদনা-ভারকে লঘু করা যায় কিনা। ক্ষণিক দিনের আলোকে ক্ষণিকের গান গাহিয়াই কবি তৃপ্ত হইতে চাহিয়াছেন, নিজের কথাটা, নিজের ব্যথাটা ঠাট্টা করিয়া হালকা করিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিতেছেন, যে তপঃক্লিষ্ট জীবনের মহিমা তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে সেই জীবনকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া পরিহাসছলে যেন বলিতেছেন, 'আমি হব না তাপস, হব না, হব না, যেমনি বলুন যিনি, আমি হব না তাপস, নিশ্চয় যদি না মেলে তপস্বিনী'। কিন্তু, এই সব আপাতচটুলতা ও পরিহাসের তলে তলে গতজীবনের প্রিয়া-বিরহের কি যে অসহ্য গভীর বেদনা গুমরিয়া

গুমরিয়া মরিতেছে, তাহাকে কবি কিছুতেই আর গোপন করিতে পারেন নাই।

এই ধরনের অভিজ্ঞতা ত সাধারণ মানুষের জীবনেও বার বার ঘটে। যে মানুষ প্রেম ও সৌন্দর্য-তন্ময় জীবনের সহজ ভাব ও রসের মাধুর্যের মধ্যে দিনের পর দিন কাটাইতে থাকে, তাহারই জীবনে যখন একদিন কঠোর কঠিন গভীর সুগম্ভীর মহাজীবনের, মহান আদর্শের, মহান ত্যাগের আহ্বান আসিয়া সমস্ত অন্তরকে মূল ধরিয়া টান দেয়, তখন হঠাৎ ক্ষণিকের মত এই কথা মনে হয়, কোথায় কোন্ অনিশ্চয়তার মধ্যে, সুকঠিন নির্মম জীবনের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িব, কাজ কি এই সুকঠোর তপস্যায়, তাহার চেয়ে এই ত বেশ আছি সহজ সৌন্দর্য মাধুর্যের মধ্যে, এই তৃপ্তির মধ্যে। কিন্তু এইখানেই কথা শেষ হইয়া যায় না। মুখে এই কথা বলিলেও মনের মধ্যে অতীত জীবন হইতে বিচ্ছেদের বেদনা বাজিতে থাকে, এবং ভবিষ্যৎ জীবন অনুক্ষণ ডাকিতে থাকে। এই দুই দিক হইতে টানের মুখে পড়িয়া স্পর্শ-কাতর চিত্ত অত্যন্ত পীড়িত বোধ করে; এই পীড়ার আভাস "ক্ষণিকা"র প্রায় প্রত্যেকটি কবিতায় বিদ্যমান। সাধারণ মানুষের জীবনে অতীত জীবনের পিছন টানই হয়ত সত্য হয়, অথবা ক্ষণিকের চটুলতা ও কৌতুক-বিলাস চিরন্তন হইয়া যায়, কিন্তু কবির জীবনে সত্য হইল, প্রবল হইল, ভবিষ্যতের অমোঘ কঠোর সুগম্ভীর আহ্বান।

"ক্ষণিকা"য় ক্ষণিক কালের জন্য কবি সহজ সাধনার পথে নামিয়াছেন। কৌতুক ও মর্মানুভূত প্রত্যয় হাত ধরিয়া পাশাপাশি চলিয়াছে "ক্ষণিকা"র কবিতাগুলিতে। এই ধরনের পাশাপাশি চলা কতক পরিমাণে দেখা যায় "কণিকা"-গ্রন্থে, এবং প্রায় সমসাময়িক "চিরকুমার সভা" প্রহসনে। হালকা ভাব ও ছন্দের সঙ্গে গভীর তত্ত্বের সমাবেশ "ক্ষণিকা"র প্রায় সব কবিতাতেই। কিন্তু এই ভাবজগৎ সম্পূর্ণতা

পাইল "ক্ষণিকা" গ্রন্থে। হসন্ত শব্দের নির্বাধ ব্যবহারে ছন্দ পাইল এক অপূর্ব লঘুরূপ যাহা বাংলা কবিতায় ইতিপূর্বে দেখা যায় নাই—লঘু কথা লঘু ছন্দ-লয়ে অত্যন্ত সহজ ভাবে বলা—বাংলা গীতিকাব্য যেন এক সম্পূর্ণ নূতন রূপ পাইল তীক্ষ্ণ শাণিত বিদ্যুতোজ্জ্বল প্রকাশ-ভঙ্গিমায়। ব্যথা, বিচার, সন্ধান, সমস্যা, চিন্তা,—সব কিছুকে যেন কবি দূরে ঠেলিয়া দিয়া ক্ষণিক দিনের আলোকে, অকারণ পুলকে ক্ষণিকের গানের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দিলেন। কিন্তু বলার চটুল ভঙ্গিমার ফাঁকে ফাঁকে যখন কবির অন্তরের মর্মস্থলে আমাদের দৃষ্টি পড়ে তখন বুঝিতে পারা যায় কোন্ গভীর বেদনার উৎস হইতে কবির চটুল কৌতুক কথাগুলি উৎসারিত হইতেছে। কবি বলিতেছেন,

> শুধু অকারণ পুলকে
> ক্ষণিকের গান গা রে আজি প্রাণ
> ক্ষণিক দিনের আলোকে!
> যারা আসে যায়, হাসে আর চায়,
> পশ্চাতে যারা ফিরে না তাকায়,
> নেচে ছুটে ধায়, কথা না শুধায়,
> ফুটে আর টুটে পলকে,
> তাহাদেরি গান গা রে আজি প্রাণ
> ক্ষণিক দিনের আলোকে!
>
> ('উদ্বোধন')

অথবা,

> হাল ছেড়ে আজ ব'সে আছি আমি
> ছুটিনে কাহারো পিছুতে,
> মন নাহি মোর কিছুতেই, নাই কিছুতে।
>
> ('উদাসীন')

অথবা,

শপথ ক'রে ছেড়ে দিলাম আজই
যা আছে মোর বুদ্ধি বিবেচনা,
বিদ্যা যত ফেলবো ঝেড়ে ঝুড়ে
ছেড়ে ছুড়ে তত্ত্ব আলোচনা!
* * *
ভদ্রলোকের তক্মা-তাবিজ ছিঁড়ে
উড়িয়ে দেবো মদোন্মত্ত হাওয়া।
শপথ করে বিপথ-ব্রত নেবো—
মাতাল হয়ে পাতাল পানে ধাওয়া।
('মাতাল')

অথবা,

মনেরে আজ কহ যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।
('বোঝাপড়া')

অথবা

চাইনেরে মন চাইনে।
মুখের মধ্যে যেটুকু পাই,
যে হাসি আর যে কথাটাই,
যে কলা আর যে ছলনাই
তাই নেরে মন তাই নে। ('অচেনা')

কিন্তু আর একটু গভীরতর কথা শুনা যাইতেছে,—

গভীর সুরে গভীর কথা
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই।
* * *

ঠাট্টা ক'রে ওড়াই সখি
নিজের কথাটাই।
হাল্‌কা তুমি কর পাছে
হাল্‌কা করি তাই
আপনা ব্যথাটাই। ('ভীরুতা')

অথবা

বাহিরে থাকে হাসির ছটা
ভিতরে থাকে আঁখির জল

গ্রন্থের মাঝামাঝি ও শেষের দিকে চটুল বিলাস ক্রমশ কমিয়া আসিতেছে বলিয়া যেন মনে হইতেছে। 'কল্যাণী', 'সমাপ্তি', 'পরামর্শ', 'অন্তরতম', 'আবির্ভাব' প্রভৃতি কবিতায় একটা শান্ত সৌন্দর্য, সমাহিত চৈতন্য সুস্পষ্ট ভাবে ধরা পড়িয়াছে। 'পরামর্শ' কবিতার

অনেকবার ত হাল ভেঙেছে
পাল গিয়েছে ছিঁড়ে
ওরে দুঃসাহসী!
সিন্ধুপানে গেছিস্ ভেসে
অকূল কালো নীরে
ছিন্ন রশারশি।
এখন কি আর আছে সে বল?
বুকের তলা তোর
ভরে উঠছে জলে।
অশ্রু সেঁচে চল্‌বি কত
আপন ভারে তোর
তলিয়ে যাবি তলে। ('পরামর্শ')

কবি নিজেকে নিজে বুঝাইতেছেন, এখন তরী না হয় ঘাটেই বাঁধা থাকুক, কাজ কি দুঃসাহসে ভর করিয়া নূতনপথে যাত্রা? কিন্তু মিথ্যা নিজেকে এই প্রবোধ দেওয়া।

হায়রে মিছে প্রবোধ দেওয়া
অবোধ তরী মম
আবার যাবে ভেসে।

* * *

ঘাটে সে কি রইবে বাঁধা
অদৃষ্টে যাহার
আছে নৌকা-ডুবি। ('পরামর্শ')

সংশয় তাহা হইলে ঘুচিয়া গেল। তরী তো ভাসিল। অন্তরতম জীবন-দেবতার আহ্বানই অমোঘ সত্য হইল। অচঞ্চল গভীর জীবনই দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত হইল; কিছুতেই আর তাহাকে ঠেকাইয়া রাখা গেল না, নৈবেদ্য নিবেদনের জন্য কবি প্রস্তুত হইলেন।

আমি যে তোমায় জানি, সে ত কেউ জানে না
তুমি মোর পানে চাও, সে ত কেউ মানে না।

* * *

তোমার পথ যে তুমি চিনায়েছ
সে-কথা বলিনে কাহারে;
সবাই ঘুমালে জনহীন রাতে
একা আসি তব দুয়ারে।
স্তব্ধ তোমার উদার আলয়,
বীণাটি বাজাতে মনে করি ভয়,
চেয়ে থাকি শুধু নীরবে;
চকিতে তোমার ছায়া দেখি যদি
ফিরে আসি তবে গরবে।
('অন্তরতম')

'সমাপ্তি' কবিতায় কবি বলিতেছেন,

কখন সে পথ আপনি ফুরাল
সন্ধ্যা হ'ল যে কবে

পিছনে চাহিয়া দেখিনু, কখন
চলিয়া গিয়াছে সবে।

একদিন কবি প্রেম ও সৌন্দর্যের দৃষ্টি দিয়া বিশ্বজীবনকে দেখিয়াছিলেন, সেই 'বিপুল পথের বিবিধ কাহিনী'র লেখা কি ললাটে অঙ্কিত আছে? যতদিন তিনি পথে পথেই ছিলেন, অনেকের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইয়াছে, কিন্তু

সব শেষ হ'ল যেখানে সেথায়
তুমি আর আমি একা।

এইবার 'তুমি আর আমি একা'র জীবন আরম্ভ হইল। প্রেম-সৌন্দর্য মাধুর্যমাখা যৌবন বিদায় লইল—হয়ত সে জীবন আবার ফিরিয়া আসিবে, হয়ত আসিবে না। কবি কি সে কথা নিশ্চয় করিয়া জানিতেন?

(৬)

নৈবেদ্য (১৩০৪ ও ১৩০৭)
স্মরণ (১৩০৯)
শিশু (১৩১০)
উৎসর্গ (১৩০৮ ও ১৩১০)
খেয়া (১৩১২-১৩)

"নৈবেদ্য" গ্রন্থের মধ্যে কতকগুলি কবিতা ১৩০৭ বঙ্গাব্দে লেখা হয়, এবং পরে ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসে নবপর্যায় "বঙ্গদর্শনে" সেগুলি একত্র প্রকাশিত হয়।* কিন্তু অধিকাংশ কবিতা ১৩০৭ সালে রচিত, এবং এই কবিতাগুলিতেই "নৈবেদ্য"র মূল সুরটি ধ্বনিত হইয়াছে।

---

* (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় "রবীন্দ্রজীবনী," ১ম খণ্ড, ৩৫২—৫৩ পৃঃ)।

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, ১৩০৪ সালে রচিত কবিতাগুলির মধ্যে দুই তিনটি ছাড়া আর সবগুলিরই উপাদান জোগাইয়াছে কবির দেশাত্মবোধ। "চৈতালি"র (১৩০৩) চতুর্দশপদী কবিতাগুলিতেই আমরা দেখিয়াছি, প্রাচীন ভারতের সাধনা ও ঐতিহ্যের মধ্যেই কবি মানব-মহিমার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ দেখিতে পাইয়াছিলেন; দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তাঁহার স্পর্শ-কাতর কবিচিত্তকে আলোড়িত করিয়াছিল। "চৈতালি"র অব্যবহিত পরবর্তী কালেই রচিত "কথা" ও "কাহিনী-" গ্রন্থেও দেখা যায়, আমাদের ভারতীয় ঐতিহ্যের যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুচ্ছ ঘটনার মধ্যে মানব-মহত্ত্বের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ধরা দিয়াছে, কবি তাহাদের মধ্যে বিহার করিতেছেন, এবং সেই সব আপাততুচ্ছ ঘটনা কবির অনুভূতিকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। "নৈবেদ্য"র প্রথম পর্বের কবিতাগুলি ঠিক এই সময়েই রচিত, কাজেই এই কবিতাগুলিতে কতকটা সেই সুরই ধ্বনিত হইবে, ইহা কিছু আশ্চর্য নয়। তবে "নৈবেদ্য"র এই চতুর্দশপদী কবিতাগুলি ভাব-গভীরতায় আরও পূর্ণতর, আরও দৃঢ় এবং স্পষ্ট, কারণ জীবনের আদর্শই যে ক্রমশ দৃঢ়, স্পষ্ট এবং পূর্ণ হইয়া আসিতেছে।

এই পর্বের কবিতাগুলির কয়েকটি খুব উল্লেখযোগ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূর্যাস্ত-সন্ধ্যায় দক্ষিণ-আফ্রিকায় ব্রিটিশ বুয়র যুদ্ধ উপলক্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ক্রূর নিষ্ঠুর উন্মত্ততা কবি এবং কবির দেশবাসীর মনে পীড়া ও উত্তেজনার সঞ্চার করিয়াছিল; রবীন্দ্রনাথ কখনও পরজাতি-নিপীড়নের অস্ত্র এই সাম্রাজ্যবাদকে ক্ষমার চক্ষে দেখেন নাই; যেখানে যখন মানবাত্মা পীড়িত ও অত্যাচারিত হইয়াছে কবি বজ্র-নির্ঘোষে তখন তাহার প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। "নৈবেদ্য" গ্রন্থে পর পর তিনটি কবিতায় এই প্রতিবাদ সুস্পষ্ট কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে,

> শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ মাঝে
> অস্ত গেল—হিংসার উৎসবে আজি বাজে

অন্ত্রে অন্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী
ভয়ংকরী। দয়াহীন সভ্যতা-নাগিনী
তুলিছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমিষে।
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে

(৬৪ নং, "নৈবেদ্য")

এই পশ্চিমের কোণে রক্তরাগ রেখা
নহে কভু সৌম্যরশ্মি অরুণের লেখা
তব নব প্রভাতের। এ শুধু দারুণ
সন্ধ্যার প্রলয়দীপ্তি। চিতার আগুন
পশ্চিমে সমুদ্রতটে করিছে উদ্‌গার
বিস্ফুলিঙ্গ—স্বার্থদীপ্ত লুব্ধ সভ্যতার
মশাল হইতে লয়ে শেষ অগ্নিকণা।

(৬৬নং, "নৈবেদ্য")

"নৈবেদ্য"র সব কবিতাই প্রার্থনা। স্বদেশ এবং স্বদেশ-মহিমা সম্বন্ধে প্রার্থনা উচ্চারিত হইয়াছে কয়েকটি কবিতায়; সব কয়টিই একটা মহান অধ্যাত্ম-আদর্শে বাঁধা, কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থনা ধ্বনিত হইয়াছে বহুকণ্ঠ-গীত বহুজনবন্দিত এই কবিতাটিতে,—

চিত্ত যথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী,
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নিবারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,
যেথা তুচ্ছ আচারের মরু বালি রাশি
বিচারের স্রোতপথ ফেলে নাই গ্রাসি

পৌরুষেরে করেনি শতধা ; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,—
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিত
ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত।

(৭২নং, "নৈবেদ্য")

কোনও রাষ্ট্রীয় অথবা অর্থনৈতিক স্বর্গের প্রার্থনা কবি কোথাও করেন নাই, তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন উন্নত মানব-মহিমার স্বর্গ, সেই স্বর্গ যে-স্বর্গে মানবের চিত্ত ভয়শূন্য, মানুষের শির অনবনত, জ্ঞান যেখানে মুক্ত। আর একটি কবিতায় তিনি প্রার্থনা করিতেছেন,—

এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়
দূর করে দাও তুমি সর্বতুচ্ছ ভয়,—
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।

(৪৮নং, "নৈবেদ্য")

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-সাধনা তাঁহার অধ্যাত্ম-সাধনা হইতে পৃথক নয়। আমার মনে হয়, মহাজীবনের মধ্যে আত্মবিসর্জন করিবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা যে কবির মনের ভিতর ক্রমশ রূপ গ্রহণ করিতেছিল সেই আকাঙ্ক্ষাই প্রথম স্বদেশ-সাধনার ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু যখন সেই খণ্ড সাধনার ক্ষেত্র তাঁহাকে আর শান্তি ও তৃপ্তিদান করিতে পারিল না তখন তিনি এমন একটা জগতে আসিয়া নবজন্ম লাভ করিলেন, দ্বিজত্ব পাইলেন, যে জগতের প্রান্তসীমায় পৌঁছিবার পূর্বেই পার্থিব জনের নিকট হইতে তাঁহার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ ঘটিল। সেই জগতের যাত্রা-মুহূর্তে "নৈবেদ্য"র দ্বিতীয় পর্বের সূত্রপাত।

এই দ্বিতীয় পর্বের কবিতাগুলির মধ্যে একটা স্পষ্টতর পূর্ণতর অধ্যাত্ম-জীবনের আকৃতি স্বপ্রকাশ; যে গভীর ধর্মবোধ, ভাগবত সাধনার প্রেরণা এই কবিতাগুলিতে দেখা যায় তাহা উপনিষদ দ্বারা, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাধন জীবন-দ্বারা অনুপ্রেরিত। এই "নৈবেদ্য"

গ্রন্থ যে 'পিতৃদেবের শ্রীচরণকমলে' উৎসর্গীকৃত তাহার সার্থকতাও ঐখানে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথেরও অধ্যাত্ম-সাধনা মানুষ ও সংসার নিরপেক্ষ সাধনা নহে, দেবেন্দ্রনাথেরও তাহা ছিল না। সেই "কড়ি ও কোমল" হইতে আরম্ভ করিয়া "চৈতালি" ও পরবর্তী কাব্যে যখন মহাজীবন তাঁহাকে ডাক দিয়াছে তখনও মানুষের জয়গানই তিনি গাহিয়াছেন। যে কবি যৌবনে বলিয়াছিলেন,—

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই—

অধ্যাত্ম-জীবনের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া সেই কবির পক্ষেই বলা সম্ভব হইল,

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।

* * *

ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।
মোহ মোর মুক্তি রূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।

(৩০নং, "নৈবেদ্য")

কতকগুলি প্রার্থনায় উপনিষদের ভাব ও তত্ত্ব কবির ভাষায় নূতন রূপ পাইয়াছে,—

একদা এ ভারতের কোন্ বনতলে
কে তুমি মহান প্রাণ, কি আনন্দবলে
উচ্চারি উঠিলে উচ্চে, "শোনো বিশ্বজন,
শোন অমৃতের পুত্র যত দেবগণ

দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে,
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পারে, অন্যপথ নাহি।"

*   *   *

রে মৃত ভারত
শুধু সেই এক আছে, নাহি অন্য পথ।

(৬০নং, "নৈবেদ্য")

আমাদের ভারতীয় অধ্যাত্ম-আদর্শ বার বার বলিয়াছে, শাস্ত্রজ্ঞানের মধ্যে, পুঁথির পাতার মধ্যে, আচারের মরুবালিরাশির মধ্যে, ধর্মসংস্কারের মধ্যে ভাগবত-সাধন নাই, ভাগবত-উপলব্ধি নাই। কবিও এই কথা নানা কবিতায় নানা ভাবে বলিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ মানব-মহিমা, মহাজীবন, পরিপূর্ণ অধ্যাত্মবোধ, ভাগবতোপলব্ধি। এই পরিপূর্ণ সমগ্রতার আদর্শকে লাভ করিবার জন্যই প্রতিদিন সকল অবস্থার ভিতরে জীবন-স্বামীর সম্মুখে আসিয়া তিনি দাঁড়াইতে চাহিতেছেন,

প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে,
করি জোড়কর হে ভুবনেশ্বর
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।

(১নং নৈবেদ্য")

"নৈবেদ্য"-গ্রন্থের প্রথম দিকের সবগুলিই প্রার্থনা-সংগীত। বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে, কবির চিত্ত শান্ত অচপল সমাহিত দৃষ্টি লাভ করিয়াছে, লক্ষ্য স্থির হইয়াছে, নহিলে এমন পূর্ণ প্রার্থনা ধ্বনিত হইতে পারিত না—

ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে
জীবন সমর্পণ।

(১৬নং, "নৈবেদ্য")

এই প্রার্থনা-সংগীতগুলির মধ্যে আত্মসমর্পিত ভক্তের বিচিত্র আকুতি নানা সুরে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু প্রভুর চরণে জীবন সমর্পণ যে করে, প্রভু যে তাহার হাতেই তুলিয়া দেন তাঁহার পতাকাটি বহন করিবার ভার। সমর্পিত জীবনের দায়িত্বভার যে কত বেশি কবি তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন, এবং সেইজন্য এই আকুল প্রার্থনা তাঁহার মনে জাগে—

> তোমার পতাকা যারে দাও, তারে
> বহিবারে দাও শকতি।
> তোমার সেবার মহৎ প্রয়াস
> সহিবারে দাও ভকতি।
> আমি তাই চাই ভরিয়া পরান
> দুঃখেরি সাথে দুঃখের ত্রাণ,
> তোমার হাতের বেদনার দান
> এড়ায়ে চাহি না মুকতি।
> দুখ হবে মোর মাথার মানিক
> সাথে যদি দাও ভকতি।
>
> (২০নং, "নৈবেদ্য")

কিন্তু প্রার্থনার এই ভক্তি সমস্ত ভাবমুহূর্ত অধিকার করিয়া নাই; ক্রমশ যেন এই ভারবোধ, দায়িত্ববোধ সহজ হইয়া আসিতেছে—একটা সহজ আনন্দ, পরিপূর্ণ আসঙ্গবোধ ক্রমশ যেন চিত্তকে অধিকার করিতেছে, এবং ভাগবতোপলব্ধিও সহজ ও সরল হইয়া আসিতেছে। বিশ্বজীবনের যে অনন্ত কল্লোল এতদিন কবিচিত্তে প্রেরণা জাগাইয়াছে, সেই অনন্ত কল্লোল, অণুপরমাণুদের নৃত্যকলরোল সব কিছুই যে দেবতার আসনের চতুর্দিকে, এই উপলব্ধি কবিচিত্তে জাগিয়াছে (২৩নং)। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বার, মন ও কল্পনার দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়া কবি বিশ্বজীবনকে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই না অন্তর্যামী দেবতা তাঁহার

চিত্তের মধ্যে আসিয়া আসন বিছাইতে পারিয়াছেন (৩২ ও ৩৩ নং); গত জীবনের একটি দিন, একটি বেলাও কবির ব্যর্থ হয় নাই,—

নষ্ট হয় নাই, প্রভু, সে সকল ক্ষণ
আপনি তাদের তুমি করেছ গ্রহণ
ওগো অন্তর্যামী দেব।

(২৪নং "নৈবেদ্য")

সমস্ত বিশ্বজীবনের 'যুগ যুগান্তের বিরাট স্পন্দন' কবির নাড়ীতে নাড়ীতে নৃত্য করিতেছে, অনন্ত প্রাণ, আত্মার অপরূপ জ্যোতি ও মহিমা তিনি ক্রমশ উপলব্ধি করিতেছেন (২৬ নং), এবং মাঝে মাঝে নিজেই চমকিয়া উঠিতেছেন এই অপরূপ লীলায়,—

দেহে আর মনে প্রাণে হয়ে একাকার
এ কী অপরূপ লীলা এ অঙ্গে আমার।
এ কী জ্যোতি, এ কি ব্যোম-দীপ্ত দীপ-জ্বালা,
দিবা আর রজনীর চির নাট্যশালা?
এ কী শ্যাম বসুন্ধরা, সমুদ্রে চঞ্চল,
পর্বতে কঠিন, তরুপল্লবে কোমল,
অরণ্যে আঁধার। এ কি বিচিত্র বিশাল
অবিশ্রাম রচিতেছে সৃজনের জাল
আমার ইন্দ্রিয়-যন্ত্রে ইন্দ্রজালবৎ।
প্রত্যেক প্রাণীর মাঝে প্রকাণ্ড জগৎ
তোমারি মিলন শয্যা, হে মোর রাজন,
ক্ষুদ্র এ আমার মাঝে অনন্ত আসন
অসীম বিচিত্রকান্ত। ওগো বিশ্বভূপ,
দেহে মনে প্রাণে আমি একী অপরূপ।

(২৭নং, "নৈবেদ্য")

উপলব্ধি যে ক্রমশ সহজ ও সরল হইয়া আসিতেছে, কবি নিজেই তাহা স্বীকার করিতেছেন,

তোমার ভুবন মাঝে ফিরি মুগ্ধসম
হে বিশ্বমোহন নাথ।

(৩১নং, "নৈবেদ্য")

কবিচিত্তও সর্বদা যেন অন্তর্যামী দেবতার দিকেই উন্মুখ হইয়া আছে, এবং থাকিয়া থাকিয়া শত কর্মকোলাহল হাস্য-পরিহাসের মধ্যেও মাঝে মাঝে যোগমগ্ন ধ্যানরত হইয়া পড়িতেছে—

কালি হাস্যে পরিহাসে গানে আলোচনে
অর্ধরাত্রি কেটে গেল বন্ধুজন সনে;
আনন্দের নিদ্রাহারা শ্রান্তি বহে লয়ে
ফিরি আসিলাম যবে নিভৃত আলয়ে
দাঁড়াইনু আঁধার অঙ্গনে। শীতবায়
বুলায় স্নেহের হস্ত তপ্ত ক্লান্ত গায়
মুহূর্তে চঞ্চল রক্তে শান্তি আনি দিয়া।
মুহূর্তেই মৌন হ'ল স্তব্ধ হ'ল হিয়া
নির্বাণ-প্রদীপ রিক্ত নাট্যশালা সম।
চাহিয়া দেখিনু ঊর্ধ্বপানে; চিত্ত মম
মুহূর্তেই পার হয়ে অসীম রজনী
দাঁড়াল নক্ষত্রলোকে। হেরিনু তখনি—
খেলিতেছিলাম মোরা অকুণ্ঠিত মনে
তব স্তব্ধ প্রাসাদের অনন্ত প্রাঙ্গণে।

(৩৫নং, "নৈবেদ্য")

কিন্তু কবির এই যে সমাহিতচিত্ততা ইহার মধ্যে ভাবাবেশের স্থান কোথাও নাই, জ্ঞানহারা ভাবোন্মাদ মত্ততায় যে ভক্তির প্রকাশ সেই ভক্তি এই যোগী কবি চাহেন না (৪৫নং)। কৈশোরে একদিন বিহ্বল হর্ষে ভাবরস তিনি পান করিয়াছেন, পুষ্পগন্ধে মাখা নানাবর্ণ মধু তাঁহার চিত্তে আনন্দরস জোগাইয়াছে; সেই বিহ্বলতা সেই ভাবাবেশ আজ কাটিয়া গিয়াছে বলিয়া তাঁহার কোনও দুঃখ নাই—আজ তিনি সত্যের

কঠিন নির্মম মূর্তিই দেখিতে চান (৪৬ নং), ভাবের ললিত ক্রোড় ছাড়িয়া আঘাত সংঘাত মাঝে আসিয়া দাঁড়াইতে চান (৪৭ নং), বীর্যবান জ্যোতিষ্মান পূর্ণ মনুষ্যত্বই তাঁহার কাম্য, এবং তাহাই ভগবৎ নির্দেশ। সেইজন্যই তাঁহার প্রার্থনা—

এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়,—
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর
দীনপ্রাণ দুর্বলের এ পাষাণ ভার,
এই চিরপেষণ-যন্ত্রণা, ধূলিতলে
এই নিত্য অবনতি।

* * *

এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ আঘাতে
চূর্ণ করি দূর করো।

(৪৮নং, "নৈবেদ্য")

অথবা,

হে রাজেন্দ্র, তোমা কাছে নত হতে গেলে
যে ঊর্ধ্বে উঠিতে হয়, সেথা বাহু মেলে
লহ ডাকি সুদুর্গম বন্ধুর কঠিন
শৈলপথে—

(৫১নং, "নৈবেদ্য')

অথবা,

এ মৃত্যু ছেদিতে হবে, এই ভয়জাল,
এই পুঞ্জপুঞ্জীভূত জড়ের জঞ্জাল,
মৃত আবর্জনা। ওরে জাগিতেই হবে
এ দীপ্ত প্রভাতকালে, এ জাগ্রত ভবে
এই কর্মধামে।

(৬১নং, "নৈবেদ্য")

অথবা,

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে; যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি উঠে খর খড়্গ সম
তোমার ইঙ্গিতে। * * *
অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে।
(৭০নং, "নৈবেদ্য")

অথবা,

দুর্দিন ঘনায়ে এল ঘন অন্ধকারে,
হে প্রাণেশ। দিগ্‌বিদিক বৃষ্টিবারি ধারে
ভেসে যায়, কুটিল কটাক্ষে হেসে যায়
নিষ্ঠুর বিদ্যুৎশিখা,—উত্তরোল বায়
তুলিল উতলা করি অরণ্য কানন।
* * * দুঃখের বেষ্টনে
দুর্দিন রচিল আজি নিবিড় নির্জন,
হোক আজি তোমা সাথে একান্ত মিলন।
(৮৫নং, "নৈবেদ্য")

অথবা,

তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন—
সকল ক্ষীণতা মম করহ ছেদন
দৃঢ়বলে, অন্তরের অন্তর হইতে
প্রভু মোর। বীর্য দেহ সুখের সহিতে,
সুখেরে কঠিন করি। বীর্য দেহ দুখে,
যাহে দুঃখ আপনাকে শান্তস্মিত মুখে
পারে উপেক্ষিতে। ভকতিরে বীর্য দেহ
কর্মে যাহে হয় সে সফল, প্রীতি স্নেহ

পুণ্যে ওঠে ফুটি। বীর্য দেহ ক্ষুদ্র জনে
না করিতে হীনজ্ঞান,—বলের চরণে
না লুটিতে। বীর্য দেহ, চিত্তেরে একাকী
প্রত্যহের তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দিতে রাখি।
বীর্য দেহ তোমার চরণে পাতি শির
অহর্নিশি আপনারে রাখিবার স্থির।

(৯৯নং, "নৈবেদ্য")

ইহাই জাগ্রত বলিষ্ঠ সত্য-সন্ধানী জীবনের প্রার্থনা। ভক্তিতে সমস্ত দেহ-মন আনত হইয়া পড়িয়াছে অন্তর্যামীর চরণে, কিন্তু এ ভক্তি জ্ঞান ও কর্মনিরপেক্ষ নয়, এ ভক্তি ভাবোন্মাদ মত্ততা নয়, রসাবেশ নয়, এ ভক্তির অন্তরে রহিয়াছে বীর্য ও জ্যোতি। এই যে একটি মুক্ত বলিষ্ঠ, জাগ্রত, 'অমত্ত গম্ভীর সত্য-সন্ধানী, আত্মার সৃষ্টি আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম "নৈবেদ্য"র কবিতাগুলিতে, এইখানেই এই কাব্যটির সার্থকতা। মনুষ্যত্বের একটি পরিপূর্ণ আদর্শ এই কবিতাগুলির মধ্যে অপূর্ব বলিষ্ঠ ভাষা ও ভঙ্গিতে ফুটিয়া উঠিল। কবির এক নূতন পরিচয় আমরা পাইলাম। "কথা" বা "কাহিনী" গ্রন্থে বা অন্যান্য কবিতায় পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের যে-আদর্শ যে-সাধনা তিনি ইতস্তত সন্ধান করিয়া বেড়াইতে-ছিলেন, সে-আদর্শকে সে-সাধনাকে তিনি যে নিজের জীবনে উপলব্ধি করিলেন তাহার প্রমাণ "নৈবেদ্য"র এই পর্যায়ের কবিতাগুলি। রবীন্দ্র-কাব্যে যাঁহারা বৈষ্ণব ভক্তি-সাধনার প্রভাব দেখিতে পান তাঁহারা যদি "নৈবেদ্য"-গ্রন্থের ভক্তি-সাধনার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মতামত সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্টতর হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। যে ভক্তি বীর্যে পরিপূর্ণ, মানব মহত্ত্বের আদর্শে জ্যোতিষ্মান, জ্ঞানের আলোয় ভাস্বর, কর্মের প্রেরণায় বলিষ্ঠ, আমাদের ব্রাহ্মণ ও সূত্র সাহিত্যে সেই ভক্তিবাদের বন্দনা করা হইয়াছে;

রবীন্দ্রনাথও সেই মার্গের সাধনা করিয়াছেন, পরবর্তী বৈষ্ণব মার্গের সাধনা নয়, অন্তত "নৈবেদ্য"-গ্রন্থে তাহার পরিচয় পাই। যে-জীবন তিনি কামনা করিতেছেন তাহা এই সময়কার একটি কবিতায় অতি সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার এই সময়কার প্রার্থনা,—

> যে জীবন ছিল তপোবনে,
> যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
> মুক্ত দৃপ্ত সে মহাজীবনে
> চিত্ত ভরিয়া লব।
> মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ
> দাও সে মন্ত্র তব
>
> ('নববর্ষের গান,' "বঙ্গদর্শন," জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯)

১৩০৯,৭ অগ্রহায়ণ রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীর মৃত্যু হয়; কবির তখন বয়স একচল্লিশ। কবির স্পর্শ-কাতর চিত্তে স্ত্রীর মৃত্যু নিশ্চয়ই খুব গভীর হইয়া বাজিয়াছিল, কিন্তু সুবিস্তৃত রবীন্দ্র-সাহিত্যে এক "স্মরণ"-গ্রন্থের কবিতাগুলি ছাড়া আর কোথাও স্ত্রী-সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ নাই, একান্ত নিবিড় ব্যক্তিগত বিরহজনিত দুঃখ এই কবিতাগুলি ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না, জীবনেও আর কোথাও কোন প্রকাশ নাই। রবীন্দ্র-প্রকৃতি যাঁহারা জানেন, তাঁহারা একথা সাক্ষ্য দিবেন যে, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ইহা কিছু অস্বাভাবিক নয়। যে-শোক, যে-দুঃখ একান্ত ব্যক্তিগত, একান্ত অন্তরগত তাহা চিরকাল তাঁহার অন্তরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেই তিনি অভ্যস্ত; যেখানে যতটুকু ব্যক্তিগত শোক দুঃখ ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়া সমগ্র বিশ্বের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে ততটুকুর প্রকাশই কবির রচিত সাহিত্যে ও জীবনের বাহিরের অভি-ব্যক্তিতে ধরা পড়ে, তাহার বেশি নয়, এবং সেখানে ব্যক্তিগত শোক

দুঃখ সহজে ধরা পড়িতে চায় না, এবং ধরা পড়িলেও তাহার গভীরতা পরিমাপ করা যায় না।*

"স্মরণ"-গ্রন্থের কবিতাগুলি অত্যন্ত শান্ত, সংযত ও সংক্ষিপ্ত; শোকের উচ্ছ্বাস কোথাও নাই, প্রেমের বা শোকের উদভ্রান্ততার পরিচয় কোথাও নাই। তাহার কারণ বুঝিতে পারা একটুও কঠিন নয়, যদি একথা মনে রাখা যায়, কবি ইতিমধ্যে "নৈবেদ্য"র সাধনার মধ্যে বহুদিন কাটাইয়া আসিয়াছেন, একটা শান্ত সংযম তাঁহার সমগ্র জীবনকে অধিকার করিয়াছে। সমস্ত কবিতাগুলি মিলিয়া যেন একটি পূর্ণ অশ্রুবিন্দু নয়নকোণে টলমল করিতেছে—শোকের দুঃসহ আবেগেও বদন প্রশান্ত, অমত্ত, গম্ভীর।

মৃত্যু যে আসিতেছে তাহার আভাস যেন কবি পূর্বাহ্ণেই পাইয়াছিলেন; "নৈবেদ্য"-গ্রন্থে

পাঠাইলে আজি মৃত্যুর দূত
আমার ঘরের দ্বারে,
তব আহ্বান করি সে বহন
পার হয়ে এল পারে।

(১৮নং, "নৈবেদ্য")

* "রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীর মৃত্যুতে তিনি যে আঘাত পাইয়াছিলেন তাহার একমাত্র প্রকাশ কবিতায়। তাঁহার সুবিস্তৃত সাহিত্যে স্ত্রীর সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ নাই, কোনো গ্রন্থ তাঁহাকে উৎসর্গ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিয়োগে যে কাতরতা অনুভব করিলেন, তাহা জীবনের আর কোথাও প্রকাশ করেন নাই—একবার মাত্র কেবল কাব্যের মধ্যেই তাঁহার অনুভবগুলিকে অমর করিলেন। তিনি কখনো নিজের দুঃখ শোক কাহারও কাছে প্রকাশ করেন না; অতি বেদনার সময়ে তাঁহাকে কর্মে রত দেখিয়াছি। তাঁহার বেদনাকে তিনি অন্যের কাছে বিন্দুমাত্র প্রকাশ করিয়া বেদনার গুরুত্বকে হ্রাস করিতে চান না।"

(প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, "রবীন্দ্র-জীবনী," ১ম খণ্ড, ৩১৪-১৫ পৃঃ)

অথবা,

মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর। আজি তার তরে
ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া কাঁপিতেছি ডরে।
সংসারে বিদায় দিতে, আঁখি ছলছলি
জীবন আঁকড়ি ধরি আপনার বলি
দুই ভুজে।

(৯০নং, "নৈবেদ্য")

অথবা,

অত চুপি চুপি কেন কথা কও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
অতি ধীরে এসে কেন চেয়ে রও
ওগো একি প্রণয়েরি ধরন।

("বঙ্গদর্শন," ১৩০৯, ভাদ্র, ২৫৫ পৃঃ)

এই সব কবিতা পড়িলে এই কথাই মনে হয়, মৃত্যুর পূর্বাভাস তিনি পাইয়াছিলেন, এবং ধীরে ধীরে তাহার জন্য প্রস্তুতও হইতেছিলেন। তারপর যখন মৃত্যু-জনিত বিচ্ছেদ পূর্ণ হইয়া গেল, তখন মরণের সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া প্রেম এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করিল,—

মৃত্যুর নেপথ্য হতে আরবার এলে তুমি ফিরে
নূতন বধূর সাজে হৃদয়ের বিবাহ-মন্দিরে
নিঃশব্দ চরণপাতে। ক্লান্ত জীবনের যত গ্লানি
ঘুচেছে মরণস্নানে। * * *
সংসার হইতে তুমি অন্তরে পশিলে আসি, প্রিয়া।

(১১নং, "স্মরণ")

জীবন ও মরণ একই সঙ্গে প্রেম-বাহুবন্ধনে বাঁধা পড়িয়া গেল, মৃত্যুর মাধুরী জীবনের মধ্যে বিস্তারিত হইয়া গেল,—

তুমি মোর জীবনের মাঝে মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী।
চির-বিদায়ের আভা দিয়া
রাঙায়ে গিয়াছ মোর হিয়া,

এঁকে গেছো সব ভাবনায় সূর্যাস্তের বরন-চাতুরী।
জীবনের দিকচক্র-সীমা
লঙ্ঘিয়াছে অপূর্ব মহিমা,
অশ্রুধৌত হৃদয়-আকাশে দেখা যায় দূর স্বর্গপুরী।

(১৩নং, "স্মরণ")

রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীর মৃত্যুকালে তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা মীরার বয়স দশ ও কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের বয়স আট। এই মাতৃহীন শিশু সন্তান দুটি এখন একান্ত ভাবেই পিতার আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল; পিতার কাছে পিতা এবং মাতা দুজনেরই স্নেহলাভ করিতে আরম্ভ করিল। শোকাশ্রু-ধৌত জীবনে ইহারাই তখন পরম সান্ত্বনা, ইহাদের অবলম্বন করিয়াই তখনকার দিনগুলি কাটিতেছে। বিচ্ছেদের পর পরম শান্তির মধ্যে মধুর বাৎসল্যরস ইহাদের ঘিরিয়া অপরূপ রূপ লাভ করিল। এই সময় পুত্র সমীন্দ্রনাথ অন্তিম রোগশয্যায়। তাহার আনন্দ-বিধানের জন্য সন্তান-বৎসল পিতা রোগশয্যায় শিশুপুত্রেকে কবিতা রচনা করিয়া শুনাইতেন। এইরূপ পরিবেশের মধ্যেই "শিশু"-গ্রন্থের সৃষ্টি। কিন্তু কেবল মধুর বাৎসল্যরসই "শিশু"র শেষ কথা নয়; ইহার সঙ্গে আসিয়া মিশিয়াছে এক অপূর্ব রহস্যরস। শিশুকে তিনি দেখিতেছেন বিশ্বজীবনের একটি খণ্ড অংশ রূপে, ভাগবত-দীপ্তির একটি পরম প্রকাশ দেখিতেছেন তিনি শিশুর মধ্যে। "শিশু"র কবিতা শিশুর মুখের কথা নয়, শিশুমনের কথাও নয়; শিশুকে আশ্রয় করিয়া বাৎসল্যরস রহস্যরস যাহার মধ্যে মূর্তি লইয়াছে তাহার মুখের কথা, মনের কথা; শিশুর যাহা সহজ খেয়াল মাত্র সেইখানে জাগিয়াছে কবির মনে তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা, তাহার মূলে তিনি দেখিয়াছেন পরম রহস্য; কোনও কোনও কবিতায় ব্যথার আভাসও সুস্পষ্ট। এই জন্যই শিশুচিত্তের পরিচয় হিসাবে নয়, নিছক কাব্য হিসাবে "শিশু" বাংলা

সাহিত্যের চির সম্পদ, অদ্বিতীয় এবং অতুলনীয়। মধুর বাৎসল্য-রসের পরিচয় বৈষ্ণব সাহিত্যে অপ্রতুল নয়, কিন্তু সে-রসের সঙ্গে কোনও রহস্যের পরিণয় হয় নাই; কোনও জিজ্ঞাসার আভাস সেখানে নাই, কিংবা এমন কাব্যরূপের পরিচয়ও তাহাতে নাই।

"উৎসর্গ" প্রকাশিত হয় ১৩২১ সালে, কিন্তু ইহার অধিকাংশ কবিতাই রচিত হইয়াছিল ১৩০৮ ও ১৩১০ সালে, যখন মোহিতবাবু "কাব্যগ্রন্থ" সম্পাদনে নিয়োজিত ছিলেন। কবিতাগুলির মধ্যে কোনও ভাবপ্রসঙ্গের যোগাযোগ বিশেষ নাই, থাকিবার কথাও নয়। তাহার কারণ, "উৎসর্গে"র অধিকাংশ কবিতা রচিত হইয়াছিল মোহিতবাবু সম্পাদিত "কাব্যগ্রন্থে"র এক একটি গুচ্ছের এক একটি ভূমিকা রূপে। সমস্ত গ্রন্থটির একটা সমগ্রতা না থাকিলেও ইহার মধ্যে এমনি কয়েকটি কবিতা আছে, যাহা শুধু কাব্য হিসাবে মূল্যবান নয়, রবীন্দ্র-কবিজীবনের মর্মবাণীও তাহাদের মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে।* কবিমানসের ইতিহাসের

* "মোহিতচন্দ্র সেন মহাশয় রবীন্দ্রনাথের যে "কাব্যগ্রন্থ" সম্পাদন করেন তাহাতে কবির কবিতাগুলি ভাবানুযায়ী গুচ্ছবদ্ধ করিয়া সাজানো হইয়াছিল, এবং এক একটি নামকরণ করা হইয়াছিল।

"রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেকটি কবিতাগুচ্ছের একটি করিয়া ভূমিকা কবিতায় লিখিয়া দেন, সেই কবিতাটি গ্রন্থমধ্যস্থিত কবিতাগুলির অর্থ ব্যক্ত করিয়াছে। যেমন 'যাত্রা' শ্রেণীর কবিতার প্রারম্ভে আছে—

কেবল তব মুখের পানে চাহিয়া
বাহির হনু তিমির রাতে
তরণীখানি বাহিয়া।

'হৃদয়ারণ্য' নামে কবিতাগুলি অধিকাংশই "সন্ধ্যা সংগীতে"র—ইহার ভূমিকায় আছে 'কুঁড়ির ভিতর কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে'। * * 'হৃদয়ারণ্য' হইতে বাহির হইয়া যেখানে কবি আসিলেন—সেখানকার কবিতাগুলির নাম 'নিষ্ক্রমণ'; হৃদয়ারণ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কবি 'বিশ্বের' মধ্যে আসিলেন। ইহার ভূমিকায় আছে 'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী'। এইরূপে প্রত্যেকটি শ্রেণীর মুখবন্ধ স্বরূপ একটি কবিতা আছে।

দিক হইতে দেখিতে গেলে বলিতে হয় ইহাদের ভাবপ্রসঙ্গের যোগ "কল্পনা"র কবিতাগুলির সঙ্গে, এবং এই গ্রন্থের কবিতাগুলি সম্বন্ধে যে মন্তব্য ইতিপূর্বেই করা হইয়াছে তাহা মোটামুটি উৎসর্গের কবিতাগুলি সম্বন্ধেও প্রয়োজ্য।

"খেয়া"-গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৩১৩ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে। কবিতাগুলি লেখা আরম্ভ হইয়াছিল ১৩১২ সালের আষাঢ় মাস হইতেই। ১৩১০ সালেই "শিশু" ও "উৎসর্গ"-গ্রন্থের কবিতাগুলি লেখা সব শেষ হইয়া যায়; মাঝখানে বৎসরাধিক কাল কবিজীবন অপেক্ষাকৃত স্তব্ধ। এই স্তব্ধতা বহির্জগতে এক কাল-বৈশাখীর পূর্বাভাস, অন্তর-জগতে এক নূতন জীবন-যাত্রা সূচনার পূর্ব-মুহূর্ত। কবি যে লিখিয়াছেন,

বাহির হইতে দেখোনা এমন করে
আমায় দেখোনা বাহিরে।
আমায় পাবেনা আমার দুখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজোনা আমার বুকে,
আমায় দেখিতে পাবেনা আমার মুখে
কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহিরে।

এই কবিতাগুলি 'উৎসর্গ' নামে ১৩২১ সালে প্রকাশিত হয়; কিন্তু ইহার অধিকাংশ কবিতাই রচিত হইয়াছিল ১৩০৮ ও ১৩১০ সালে। ১৩০৯ সালে অগ্রহায়ণ মাসে যেগুলি রচিত হয়, সেগুলি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'স্মরণ' নামে প্রথম সন্নিবেশিত হয়।

"শিশু" গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ নূতন। আলমোড়া বাসকালে ইহার অনেকগুলি রচিত; রবীন্দ্রনাথ সেখান হইতে লিখিয়া মোহিতবাবুকে কবিতাগুলি পাঠাইতেন। মোহিতবাবু এই 'শিশু' কবিতা ও "সোনারতরী" প্রভৃতি হইতে শিশুর উপযুক্ত কবিতাগুলি সংগ্রহ করিয়া "শিশু" কাব্যখণ্ড প্রণয়ন করেন। ১৩১০ সালের আশ্বিন মাসে 'শিশু' পুস্তাকাকারে প্রকাশিত হইল।"

(প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, "রবীন্দ্র জীবনী," ১ম খণ্ড, ৪০৬ পৃঃ)

* * *

কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে।

(২১নং, "উৎসর্গ")

এ কথা "খেয়া"র কবিজীবন সম্বন্ধে যতখানি সত্য, রবীন্দ্র-কবি-জীবনের আর কোনও পর্ব সম্বন্ধেই তত সত্য নয়; "খেয়া"-গ্রন্থ রচনার সময়ে কবির বাহিরের জীবন সম্বন্ধে যত তথ্যই জানা যাউক না কেন, কোন তথ্য অথবা তত্ত্বের মধ্যেই "খেয়া"র মর্ম কথাটি ধরা পড়িবে না, "খেয়া"র কবিকে তদানীন্তন জীবন-চরিতের মধ্যে পাওয়া যাইবে না। অথচ সে জীবনচরিতটুকু না জানিলে কবির জীবন যে আবার কত রহস্যময়, কত গভীর, কত বিপরীতমুখীন্ তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না।

বঙ্গাব্দ চতুর্দশ শতকের প্রথম দশকের শেষাশেষি বাংলা দেশে একটা নবজীবনের সাড়া জাগিতেছিল; বাঙালী জীবনে শতাব্দী ধরিয়া যে গ্লানি ও অপমান, যে দুঃসহ বেদনা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল তাহা একদিন বঙ্গচ্ছেদের নির্মম আদেশকে উপলক্ষ করিয়া দেশের উপর ভাঙিয়া পড়িল; এক মুহূর্তে দেশের মূর্তি বদলাইয়া গেল। শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্র, সর্ববিষয়ে যেন দেশ সচেতন হইয়া উঠিল, একটা প্রবল ভাবোন্মাদনায় দেশ মাতিয়া উঠিল, এবং সে উন্মাদনা ভাষা পাইল রবীন্দ্রনাথের গানে, বক্তৃতায়। বাংলা দেশের সেই কয়েক বৎসরের (১৩১০-১৩১২) ইতিহাস যাঁহারা জানেন, তাঁহারাই একথা বলিবেন, রবীন্দ্রনাথই ছিলেন সেই স্বদেশী-যজ্ঞের প্রধান উদ্‌গাতা। যে-সমস্ত গানকে আশ্রয় করিয়া বাঙালীর মর্মবাণী সেদিন ভাষা পাইয়াছিল, সে-সব গান প্রায় সমস্তই রবীন্দ্রনাথের রচনা, এবং এই সময়কার রচনা। 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে,' 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে', 'বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি', 'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়বো

না,' 'বাংলার মাটি, বাংলার জল,' 'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে,' 'বিধির বিধান কাটবে তুমি,' ইত্যাদি সমস্ত গানই ১৩১১-১৩১২ বঙ্গাব্দের রচনা। কিন্তু, শুধু গান লিখিয়াই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হন নাই। এই দুই তিন বৎসর সমানে চলিয়াছে প্রবন্ধ ও বক্তৃতা, এবং তাহাদের বিষয় আমাদের শিক্ষা, আমাদের সমাজ, আমাদের ধর্ম, আমাদের রাষ্ট্রজীবন, আমাদের জীবনাদর্শ। এই সময়ই শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মবিদ্যালয় ক্রমশ গড়িয়া উঠিতেছে, 'স্বদেশী সমাজে'র পরিকল্পনাও এই সময়ে। অর্থাৎ, আমাদের দেশাত্মবোধ, স্বাজাত্যবোধ জাগিবার সঙ্গে সঙ্গেই কবি একেবারে তাহার মর্মমূলে প্রবেশ করিবার, ভারতীয় ইতিহাস ও সাধনার ধারা ও অর্থটিকে বুঝিবার চেষ্টা করিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীকেও তাহা বুঝাইলেন। 'স্বদেশী সমাজ,' 'ছাত্রগণের প্রতি সম্ভাষণ,' 'সফলতার সদুপায়,' 'অত্যুক্তি' 'ভারতবর্ষের ইতিহাস,' 'ঘুষাঘুষি,' 'ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত,' 'নববর্ষ,' 'ব্রাহ্মণ,' 'চীনাম্যানের চিঠি,' 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য,' 'রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি,' 'রাজকুটুম্ব,' 'দেশীয় রাজ্য,' 'বিজয়া সম্মিলন,' 'বিলাসের ফাঁস,' রাজভক্তি,' 'রাজনিগৃহীতদের প্রতি নিবেদন,' 'শিক্ষা সমস্যা,' 'আবরণ,' 'জাতীয় শিক্ষা,' 'ততঃ কিম্,' 'পথ ও পাথেয়,' প্রভৃতি সুবিখ্যাত প্রবন্ধ, বক্তৃতা ও আলোচনাগুলিও এই সময়েরই (১৩০৯-১৩১৪) রচনা। কিন্তু গান, বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও আলোচনাতেই তাঁহার স্বদেশ-কর্মৈষণা শেষ হইয়া যায় নাই। সভায় সভাপতিত্ব অথবা প্রধান বক্তার কাজ, রাজপথে গণযাত্রায় পুরোধা হইয়া যোগদান, রাখিবন্ধন দিবসের নায়কত্ব সব কিছুর মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথকে। সমসাময়িক রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক সমস্যা এবং ঘটনাও তাঁহার কবিচিত্তকে যে প্রবলভাবে আন্দোলিত করিতেছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় "বঙ্গদর্শন" ও "ভাণ্ডারে"র সাময়িক প্রসঙ্গের বিচিত্র মন্তব্যগুলির মধ্যে। বস্তুত, বাহিরের কর্মপ্রবাহের মধ্যে পূর্ব-

জীবনে অথবা উত্তর জীবনে রবীন্দ্রনাথ আর কখনও নিজেকে এমনভাবে জড়িত করেন নাই।

বাহিরের জীবনে যখন এইরূপ উচ্ছ্বাস, উত্তেজনা, বিচিত্র কর্মপ্রবাহ চলিতেছে ঠিক তখন ঘরের জীবনে মৃত্যু আসিয়া একে একে তাঁহার একান্ত আপনার জনদের ছিনাইয়া লইয়া যাইতেছে। ১৩০৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে গেলেন স্ত্রী, ১৩১০ সালে গেল প্রিয়তমা কন্যা রেণুকা, ১৩১১ সালে গেলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ১৩১৪ সালে গেল কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্রনাথ। অথচ এই যে একের পর এক মর্মান্তিক বিচ্ছেদ বাহিরের জীবনে ইহার কোনও পরিচয় নাই, বাহিরের কর্মপ্রবাহ যথারীতি চলিতেছে। কিন্তু অন্তর-জীবনেও কি ইহার পরিচয় নাই? সেখানে কি এই সব মর্মান্তিক বিচ্ছেদ কোথাও তাহাদের পদচিহ্ন রাখিয়া যায় নাই—ইহার পরিচয় কি অন্তর-জীবনে নাই? কাব্যে অথবা কর্মে অথবা তাঁহার এই সময়কার বিচিত্র সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে এই সব মর্মান্তিক দুঃখের পরিচয় কোথাও নাই, একথা সত্য, কিন্তু অন্তর জীবনে যে একটা আমূল আবর্তন চলিতেছে তাহার আভাস "খেয়া"-গ্রন্থে এবং পরবর্তী কয়েকটি কাব্যগ্রন্থে সুস্পষ্ট। "নৈবেদ্য"-নিবেদন ত আগেই হইয়া গিয়াছে, কিন্তু যাঁহার চরণে এই নৈবেদ্য নিবেদিত হইয়াছে তাঁহাকে আরও নিবিড় করিয়া পাইবার আকুল আগ্রহ ক্রমশ সমস্ত চিত্তকে অধিকার করিতেছে। সেই তিনি এখনও রহস্যের আবরণে আবৃত, এখনও তাঁহার উপলব্ধি সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই, রহস্যের ভিতর দিয়াই, অস্পষ্টতার ভিতর দিয়াই এখনও তাঁহার আনাগোনা চলিতেছে, দেবতা আসিতেছেন বলিয়া মনে হইতেছে, এখনও আসিয়া পড়েন নাই। একের পর এক মৃত্যু হয়ত সেই আগমনকে নিকটতর করিতেছে। মৃত্যুও রহস্যময়, আর দেবতার আনাগোনাও রহস্যময়, দুইই বোধ ও বুদ্ধিগোচর হয় কেবল রূপকের মধ্য দিয়া। সেই জন্যই "খেয়া"র

অধিকাংশ কবিতাই রূপকের ভিতর দিয়া এক অনির্বচনীয় রহস্যের অভিব্যক্তি। "খেয়া"র কবিতা সেই জন্যই সর্বত্র ততটা অর্থগ্রাহ্য নয় যতটা বোধগ্রাহ্য, অনুভূতিগ্রাহ্য। রূপক এবং রহস্যের বাক্যার্থ কতটুকু, মর্মার্থই তাহার সবখানি, এবং সেই মর্মার্থ ধরা পড়ে শুধু ভাবব্যঞ্জনার মধ্যে।

"নৈবেদ্য" গ্রন্থের গান ও কবিতাগুলিতে বিশেষভাবে দুইটি ভাব-তরঙ্গের পরিচয় পাওয়া যায়। কতকগুলি কবিতায় আমরা দেখিয়াছি কবি মানব-মহত্ত্বের এবং পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বাদর্শের বন্দনা করিয়াছেন, এবং তাঁহার মাতৃভূমিকে সেই স্বর্গে উন্নীত করিতে চাহিতেছেন চিত্ত যেখানে ভয়শূন্য, উচ্চ যেখানে শির, জ্ঞান যেখানে মুক্ত, যেখানে মানব-জীবন শতধা খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন ও ক্ষুদ্রীকৃত নয়। তাঁহার এই আদর্শ কর্মরূপ লাভ করিল বাংলার স্বদেশী যজ্ঞকে উপলক্ষ করিয়া; রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা সেইজন্য শুধু patriotism নয়, সংকীর্ণ nationalismও নয়। তাঁহার সমসাময়িক গানে, প্রবন্ধে, বক্তৃতায়, আলোচনায় স্বাদেশিকতার যে রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শের, চিরন্তন মানব-মহিমার।

কিন্তু "নৈবেদ্য"-গ্রন্থে আর একটি ধারাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার। কতকগুলি কবিতায় অন্তর-জীবনে ভাগবতোপলব্ধির একটা আকুলতা অত্যন্ত স্পষ্ট। ভারতবর্ষের চিরন্তন ভাগবত-সাধনাও যে কবিচিত্তকে একান্তভাবে নিজের গভীরতার মধ্যে টানিয়া লইতেছে, "নৈবেদ্য"র অধিকাংশ কবিতায় তাহা গভীরভাবে ধরা পড়িয়াছে; অন্তর-জীবনের এই ফল্গুধারার পরিচয় স্বদেশী-যজ্ঞের বিচিত্র কর্মপ্রবাহের মধ্যে কোথাও ধরা পড়ে না, পড়িবার সুযোগও নাই। কিন্তু কর্ম-প্রবাহের বিচিত্র উত্তেজনার মরুভূমির মধ্যে এই ধারা হারাইয়া গিয়াছিল, একথা মনে করিবারও কোন কারণ নাই।

বাহিরের জীবনে তিনি অসংখ্য মানুষের মধ্যে একজন মাত্র, সেখানে বিচিত্র কোলাহলের মধ্যে সকলের সঙ্গে তিনি সমসুখদুঃখভাগী, তাহাদের সকলের সঙ্গে নিজেকে তিনি জড়াইয়াছেন। কিন্তু আন্তর-জীবনে তিনি একা, সেখানে তাঁহার সঙ্গী কেহ নাই, থাকার প্রয়োজনও নাই—সেখানে একা একা প্রতিদিন তিনি অন্তরদেবতার সম্মুখীন হইতেছেন, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার বোঝাপড়া চলিতেছে। বাহিরের জীবনে যখন তিনি বিক্ষুব্ধ, চঞ্চল, কর্মনিরত, ঠিক সেই সময় আন্তর-জীবনে তিনি শান্ত, স্থির, অচঞ্চল, মধুর। "খেয়া"য় সেই আন্তরজীবনের পরিচয় পাওয়া যায়, ঠিক যেমন বহির্জীবনের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার এই সময়ের প্রবন্ধে, বক্তৃতায়, আলোচনায়। যে আত্মগত অনুভূতির প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছিল "নৈবেদ্য"-গ্রন্থে, তাহাই একান্ত হইয়া যথার্থ কাব্যরূপ লইয়া প্রকাশ পাইল "খেয়া"য়। "নৈবেদ্য"-গ্রন্থে প্রার্থনা আছে, উপদেশ আছে, ব্যাখ্যান আছে; কিন্তু "খেয়া"য় আছে যথার্থ কবিতা; রূপে রূপকে রসে রহস্যে গীতিমাধুর্যে "খেয়া" অপূর্ব কাব্য। আধ্যাত্মিক আকূতি "নৈবেদ্য"-গ্রন্থেও আছে, কিন্তু রূপক, রহস্য ও গীতমাধুর্য এই আকূতিকে "খেয়া"য় যে কাব্যমূল্য, দান করিয়াছে, তাঁহার তুলনা "নৈবেদ্য"-গ্রন্থে নাই, "গীতাঞ্জলি গীতিমাল্যে"ও নাই। নিসর্গ চৈতন্য, আধ্যাত্মিক আকূতি ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতির এই মিলন, ইহাও আরম্ভ হইল এই "খেয়া"-গ্রন্থ হইতে।

"খেয়া"র প্রায় প্রত্যেক কবিতাই একটু বিষাদ-হতাশে ভারাক্রান্ত। এ-বিষাদ ব্যর্থতাজনিত নয় এ-হতাশা বঞ্চনাজনিত নয়; কবি ভাবিতেছেন, এই যে কর্মজীবনের চঞ্চলতা,এই যে বিক্ষোভ, উন্মাদনা, এই যে আবর্ত, জীবনের লক্ষ্য ত ইহার মধ্যে নাই, তৃপ্তিও নাই; জীবন ত আজিও ফুলে-ফসলে ভরিয়া উঠিল না, অথচ এদিকে দিনের আলো ত ফুরাইয়া আসিল। এই প্রেম-সৌন্দর্য-মাধুর্যময় জীবন, এই

কর্মময় জীবনের তট হইতে খেয়া পার হইয়া অধ্যাত্মজীবনের তটে না পৌঁছিলে ত জীবনে তৃপ্তি নাই, জীবনের লক্ষ্যকে ত পাওয়া যাইবে না ; ঘাটের কিনারায় আসিয়া বসিয়াছেন, অথচ ওপারে লইয়া যাইবার খেয়া ত এখনও এ জীবনের তটে আসিয়া ভিড়িতেছে না ; "খেয়া"র কবিতায় যে বিষাদ ও হতাশ প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে, তাহা এই অনুভবের জন্যই। প্রথম কবিতায়ই কবি বলিতেছেন,—

ঘরেই যারা যাবার তারা কখন গেছে ঘরপানে
পারে যারা যাবার গেছে পারে ;
ঘরেও নহে পারেও নহে যে-জন আছে মাঝখানে
সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে।
ফুলের বার নাইক আর ফসল যার ফলল না,
চোখের জল ফেলতে হাসি পায়,
দিনের আলো যার ফুরাল সাঁঝের আলো জ্বলল না
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়।
ওরে আয়।
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
বেলা শেষের শেষ খেয়ায়।

('শেষ খেয়া')

'শুভক্ষণ' কবিতায়

রাজার দুলাল যাবে আজি মোর
ঘরের সমুখপথে,
শুধু সে নিমেষ লাগি না করিয়া বেশ
রহিব বল কী মতে ?
* * *
রাজার দুলাল গেল চলি মোর
ঘরের সমুখপথে,
মোর বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া
রহিব বল কী মতে ?

অথবা, 'আগমন' কবিতায়

ওরে দুয়ার খুলে দে রে,
বাজা শঙ্খ বাজা।
গভীর রাতে এসেছে আজ
আঁধার ঘরের রাজা।
বজ্র ডাকে শূন্য তলে,
বিদ্যুতেরি ঝিলিক ঝলে,
ছিন্নশয়ন টেনে এনে
আঙিনা তোর সাজা,
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এল
দুঃখরাতের রাজা।

অথবা,

ওগো নিশীথে কখন এসেছিলে তুমি
কখন যে গেছ বিহানে
তাহা কে জানে।
আমি চরণশবদ পাইনি শুনিতে
ছিলেম কিসের ধেয়ানে
তাহা কে জানে।
* * *
রুদ্ধদুয়ার ঘরে কতবার
খুঁজেছিল মন পথ পালাবার,
এবার তোমার আশাপথ চাহি
বসে রব খোলা দুয়ারে,—
তোমারে ধরিতে হইবে বলিয়া
ধরিয়া রাখিব আমারে।
হে মোর পরানবঁধু হে
কখন যে তুমি ফিরে চলে যাও
পরানে পরশমধু হে

('মুক্তিপাশ')

অথবা,

হের হের মোর অকূল অশ্রু—
সলিলমাঝে
আজি এ অমল কমলকান্তি
কেমন রাজে।
* * *
আজি একা ব'সে ভাবিতেছি মনে
ইহারে দেখি.
দুখ-যামিনীর বুকচেরা ধন
হেরিনু এ কী।
ইহারি লাগিয়া হৃদ্‌ বিদারণ,
এত ক্রন্দন, এত জাগরণ,
ছুটেছিল ঝড় ইহারি বেদন
বক্ষে লেখি।
দুখ-যামিনীর বুকচেরা ধন
হেরিনু এ কী।

('প্রভাতে')

প্রভৃতি কবিতায় পরিষ্কার বোঝা যাইতেছে, খেয়া পার হইবার জন্য কবিচিত্ত উন্মুখ প্রতীক্ষায় দিন গুনিতেছে। প্রায় সমস্ত কবিতাই এই প্রতীক্ষার সুরে গাঁথা। 'গোধূলি-লগ্ন,' 'নিরুদ্যম', 'জাগরণ', 'মিলন', 'পথের শেষ', 'দিনশেষ', 'সমাপ্তি', 'প্রতীক্ষা', 'অনুমান', 'খেয়া' প্রভৃতি কবিতায় এই প্রতীক্ষার আভাস সুস্পষ্ট; কবিচিত্ত অধ্যাত্মজীবনকে গ্রহণ করিবার জন্য পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত হইয়াছে। বাহিরের কর্ম-কোলাহল, বিচিত্র উন্মাদনা ও উত্তেজনা তাঁহার কাছে বোঝা বলিয়া মনে হইতেছে,নিজেকে নিজে আপন-গড়া কর্মশালায় বন্দী বলিয়া মনে করিতেছেন,—

ভেবেছিলেম আমার প্রতাপ
করবে জগৎ গ্রাস,
আমি রব একলা স্বাধীন
সবাই হবে দাস।
তাই গড়েছি রজনীদিন
লোহার শিকলখানা—
কত আগুন কত আঘাত
নাইকো তার ঠিকানা।
গড়া যখন শেষ হয়েছে
কঠিন সুকঠোর,
দেখি আমায় বন্দী করে
আমারি এই ডোর।

('বন্দী')

অথবা,

যেখানে যা কিছু পেয়েছি, কেবলি
সকলি করেছি জমা,—
যে দেখে সে আজ মাগে যে হিসাব,
কেহ নাহি করে ক্ষমা।
এ বোঝা আমার নামাও, বন্ধু,
নামাও।
ভারের বেগেতে ঠেলিয়া চলেছে
এ যাত্রা মোর থামাও।

('ভার')

'বিদায়' কবিতায় কবি স্পষ্টই বলিতেছেন,

বিদায় দেহ ক্ষম আমায় ভাই।
কাজের পথে আমি তো আর নাই।
এগিয়ে সবে যাও না দলে দলে,
জয়মালা লও না তুলি গলে,
আমি এখন বনচ্ছায়াতলে

অলক্ষিতে পিছিয়ে যেতে চাই,
তোমরা মোরে ডাক দিও না ভাই।

*　　*　　*

তোমরা আজি ছুটেছ যার পাছে
সে-সব মিছে হয়েছে মোর কাছে।
রত্ন খোঁজা, রাজ্য ভাঙা-গড়া,
মতের লাগি দেশবিদেশে লড়া,
আলবালে জল সেচন করা
উচ্চশাখা স্বর্ণচাঁপার গাছে।
পারিনে আর চলতে সবার পাছে।

('বিদায়')

'পথের শেষ' কবিতায়ও কবি বলিতেছেন, একদিন পথের নেশায় তাঁহাকে পাইয়াছিল, পথ তাঁহাকে ডাক দিয়াছিল, 'নিত্য কেবল এগিয়ে চলার সুখ' তাঁহার সমস্ত চিত্তকে অধিকার করিয়াছিল; কিন্তু

অনেক দেখে ক্লান্ত এখন প্রাণ,
ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা।
এখন কেবল একটি পেলেই বাঁচি,
এসেছি তাই ঘাটের কাছাকাছি.
এখন শুধু আকুল মনে যাচি
তোমার পারে খেয়ার তরী ভাসা।
জেনেছি আজ চলেছি কার লাগি,
ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা।

('পথের শেষ')

কবি এখন অনন্যচিত্ত, তাঁহার অন্তর আঁখির সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছে, 'সব-পেয়েছি'র দেশের কল্পনা. যে-দেশে

নাইকো পথে ঠেলাঠেলি
নাইকো ঘাটে গোল
ওরে কবি এইখানে তোর
কুটিরখানি তোল্।
ধুয়ে ফেল্‌রে পথের ধুলো,
নামিয়ে দে রে বোঝা,
বেঁধে নে তোর সেতারখানা
রেখে দে তোর খোঁজা।
পা ছড়িয়ে বোস্‌রে হেথায়
সারাদিনের শেষে,
তারায়-ভরা আকাশতলে
সব-পেয়েছির দেশে।

('সব পেয়েছির দেশ')

(৭)

গীতাঞ্জলি (১৩১৩-১৩১৭)
গীতিমাল্য (১৩১৫-১৬ ; ১৩১৮-২১)
গীতালি (১৩২১)

"খেয়া"তে কবির এক নবজন্মলাভের সূচনা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু শুধু ভাবের জগতেই কবি নবজন্মলাভ করিলেন এমন নয়, রূপের জগতেও কবির নবজন্মলাভ ঘটিল। ছন্দের সচল অথচ সংযত গতিবেগ, শান্ত-গভীর গাম্ভীর্য অন্তর্হিত হইয়া ভাব এখন গানের সুরে আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। গানের সুর যেখানে ভাবের বাহন, সেখানে কথার লীলার স্থান অত্যন্ত কম, দুই একটি কথা স্তব্ধ মনের পরিপূর্ণতা হইতে অজ্ঞাতে বাহির হইয়া পড়িয়া কানের কাছে কেবলই অস্পষ্ট গুঞ্জনে মুখর হইয়া উঠে ; মুখ ফুটিয়া সকল কথা বলিবার অবসর থাকে

না, প্রয়োজনও হয় না। সুর সেখানে সকল কথা মন হইতে টানিয়া বাহির করে, সকল অকথিত বাণী সকল মূক কথাকে ভাষা দান করে; ছন্দলীলার স্থান সেখানে নাই। "খেয়া" হইতে, বিশেষ করিয়া "খেয়া"র পর হইতেই এই সুরের জগতের সৃষ্টি হইল, এবং সুদীর্ঘ বৎসরের পর বৎসর কবি সুরের সেই অনির্বচনীয় রাজ্যে নিজেকে একেবারে ডুবাইয়া দিলেন। কবির এই পরিবর্তন বিস্ময় উদ্রেক না করিয়া পারে না। যে-কবিকে আমরা শুনিয়াছি গভীর জ্ঞানলব্ধ কথা গম্ভীর উদাত্ত ধ্বনিতে শুনাইতে, যাঁহাকে দেখিয়াছি উর্বশীর সৌন্দর্য নয়ন ও মন ভরিয়া উপভোগ করিতে, বসুন্ধরার সুবিস্তৃত বক্ষে আপনাকে বিস্তারিত করিতে, বিজয়িনীর দৃপ্ত বিজয়-মহিমা প্রাণ-ভরিয়া আঁখি-ভরিয়া দেখিতে, কালবৈশাখীর ঝড়ের উন্মত্ততায় নাচিতে, সেই বিচিত্র বলিষ্ঠ সৌন্দর্যপিপাসু কবিচিত্তের আজ এ কি হইল! এ কি বিরাট অন্তহীন গভীর প্রেম ও আবেগ কবিচিত্তকে আকর্ষণ করিল, যাহার ফলে সমস্ত দেহমন বালিকা-বধূর মতন কাঁপিয়া শিহরিয়া উঠিতে লাগিল, সমস্ত বল অন্তর্হিত হইয়া গেল, নিজেকে একান্ত দীন কাঙাল বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কোথায় গেল বুদ্ধির যত দীপ্তি, ভাষার যত শক্তি ও উচ্ছ্বাস, কল্পনার সবল উদ্দীপনা! সমস্ত অলংকার এক মুহূর্তে খসিয়া পড়িল, সমস্ত বাহুল্য অন্তর্হিত হইয়া গেল, সমস্ত বুদ্ধি ও জ্ঞান লজ্জায় মুখ লুকাইল; কবি যেন হৃদয়কে একেবারে অনাবৃত করিয়া দেবতার সম্মুখে অঞ্জলি করিয়া তুলিয়া ধরিলেন— যে কয়টি কথা সুরের রূপ ধরিয়া চিত্ত বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল তাহা একান্তই সহজ, সরল, অনাবৃত, বিরলসৌষ্ঠব।

"সোনার তরী-চিত্রা-কল্পনা-ক্ষণিকা"র কবি, মানব ও প্রকৃতির, প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি, বিচিত্র রসানুভূতির কবি যে "খেয়া-গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"তে এক অনাস্বাদিতপূর্ব অধ্যাত্মজীবনে দ্বিজত্ব লাভ

করিলেন, তাহা কিছুই অস্বাভাবিক বা আশ্চর্যজনক ব্যাপার নহে। সৌন্দর্য-মাধুর্য-প্রেম-আনন্দ সকল রসের সায়রে যিনি এতদিন ডুবিয়া ছিলেন তিনি যে প্রেম-সৌন্দর্য-মাধুর্য-স্বরূপকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইবেন, সকল রসের মূলে পৌঁছিতে চাহিবেন, ইহা ত খুবই স্বাভাবিক। এই প্রচেষ্টা "খেয়া" হইতেই শুরু হইয়াছিল, "গীতাঞ্জলি"তে তাহা একটা স্পষ্ট রূপ ধারণ করিল, পরিপূর্ণ সার্থকতা পাইল "গীতিমাল্যে"। কয়েকটি ঋতু-উৎসবের গান, কিছু নিসর্গ-প্রকৃতির গান এবং আরও কয়েকটি গান ও কবিতা ছাড়িয়া দিলে "গীতাঞ্জলি"র প্রত্যেকটি গানে ও তাহাদের সুরে রস-স্বরূপকে পাইবার জন্য অন্তরের কি আকুলতা, সর্বত্র তাহার অস্তিত্বকে অনুভব করিবার জন্য কি তীব্র আবেগ, নিজের সকল অহংকার চূর্ণ করিয়া জীবন-কুসুমটি দেবতার পায়ে উৎসর্গ করিবার জন্য কি প্রাণপাত নিবেদন! কিন্তু "গীতাঞ্জলিতে" এই অধ্যাত্মসাধনায় কবিচিত্তের সহজ আনন্দ, সরল উপলব্ধি, অপরূপ লীলার কোনও আভাস আমরা পাই না; পাই সাধনার বেদনা ও তাহার বিভিন্ন স্তর, পাই সংগ্রামের আভাস, পাই ব্যর্থতার ও বিরহের অস্পষ্ট ক্রন্দন। অথচ যতদিন পর্যন্ত জীবনে এই সাধনার আনন্দ সহজ হইয়া না উঠিল, উপলব্ধি সরল না হইল, দেবতার বিচিত্র ও অপরূপ লীলা সমস্ত চিত্তকে রাঙাইয়া রসে ভরিয়া না দিল, সমগ্র জীবনের হাসিখেলার সঙ্গে ভাগবত-উপলব্ধির আনন্দ জড়াইয়া মিশিয়া না রহিল ততদিন লীলা ও সৌন্দর্যানুভূতির কবি রবীন্দ্রনাথ কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। সে তৃপ্তি ও শক্তি, সে শান্তি ও আরাম, সে মুক্তি ও আনন্দ লাভ হইল "গীতিমাল্যে"। "গীতাঞ্জলি" ও "গীতিমাল্য" নাম দুইটিতেও আমার এই কথার প্রমাণ ও সার্থকতা আছে। কাব্য ও সৌন্দর্যের দিক হইতে সহজ, স্বচ্ছ আনন্দ ও উপলব্ধির দিক হইতে, অধ্যাত্মজীবনের সার্থক প্রকাশের দিক হইতে "গীতিমাল্য" এবং

"গীতালি" যে "গীতাঞ্জলি" হইতে শ্রেষ্ঠতর একথা বলিতে আমার কোনও দ্বিধাবোধ নাই।

"গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি" সম্বন্ধে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন। এই গ্রন্থ কয়টির প্রায় সব কবিতাই গান; কথার মূল্য কিছু নাই একথা বলি না, কিন্তু যেহেতু কথার যাহা কিছু ব্যঞ্জনা তাহা সুরের মধ্যে, সেই হেতু কথা কতকটা গৌণ হইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছে। কথা ও সুর মিলিয়া সৃষ্টি করিয়াছে এই গ্রন্থ কয়টির কাব্য-জগৎ; শুধু কথার মধ্যে ইহাদের সৌন্দর্য ধরা পড়ে না, সুরও ইহাদের অপরিহার্য অঙ্গ, এবং সেই হিসাবেই ইহারা বিচার্য।

"খেয়া"-গ্রন্থে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি উন্মুখ চিত্তের অধীর প্রতীক্ষা। "গীতাঞ্জলি"তে দেখিতেছি এই উন্মুখ অধীর প্রতীক্ষা বিরহের ক্রন্দনে যেন গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতেছে। বিরহের বেদনা, দেবতাকে একান্ত না পাওয়ার দুঃখ "গীতাঞ্জলি"র গানগুলির উপর সুগভীর ছায়াপাত করিয়াছে। নানা অবস্থায় নানা পরিবেশের মধ্যে কবি নানাভাবে দেবতার সান্নিধ্যলাভ করিতে চাহিয়াছেন, নানা-ভাবে কবি তাঁহাকে পাইতে চাহিয়াছেন, কিন্তু কোথাও যেন পাওয়া সম্পূর্ণ হয় নাই, সত্যকার সম্পূর্ণ উপলব্ধি যেন এখনও হয় নাই; সেইজন্যই একটা ব্যথা ও বেদনার সুর "গীতাঞ্জলি"র অনেক গানেই অত্যন্ত সুস্পষ্ট। দুঃখ-আঘাত-বিপদের ভিতর দিয়া যে-সাধনা সে-সাধনাকে কবি স্বীকার করিয়াছেন, এবং সে-সাধনার ভিতর দিয়া, তাহা উত্তীর্ণ হইয়া দেবতার স্পর্শ তিনি চাহিয়াছেন; দুঃখ-আঘাত-বেদনা যে দেবতারই স্পর্শ এই উপলব্ধি তাঁহার চিত্তে জাগিয়াছে। আবার নিজের অহংকারকে চূর্ণ করিবার যে-সাধনা সে-সাধনাকেও কবি স্বীকার করিয়াছেন এবং নিজের সকল অহংকারকে চোখের জলে ডুবাইয়া দিবার সাধনা অভ্যাস করিয়াছেন। আবার কর্মযোগের যে-

সাধনা সে-সাধনাও কবি স্বীকার না করিয়া পারেন নাই; এ কথা তাঁহার উপলব্ধির মধ্যে ধরা দিয়াছে যে, আমাদের দেশে ভগবান তাঁহার সুউচ্চ স্বর্ণসিংহাসন ছাড়িয়া নামিয়া আসিয়াছেন 'সবার পিছে, সবার নিচে, সবহারাদের মাঝে', নামিয়া আসিয়াছেন সেইখানে যেখানে

* * * মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ,
পাথর ভেঙে কাটছে যেথা পথ
খাটছে বারো মাস।

("গীতাঞ্জলি")

সেইখানে ভগবানকে তিনি স্পর্শ করিতে চাহিয়াছেন। "গীতাঞ্জলি"র গানগুলিতে তাই বেশির ভাগ কবির এই সাধনার ইঙ্গিতই পাওয়া যায়; পরিপূর্ণ উপলব্ধির আনন্দের বার্তা অত্যন্ত কম; সাধনার পরিপূর্ণ ফল যে সহজ আনন্দরস তাহা "গীতাঞ্জলি"তে নাই বলিলেই চলে। সেইজন্যই "গীতাঞ্জলি"র অধিকাংশ গান ও কবিতা রসসমৃদ্ধ হইতে পারে নাই, সহজ আনন্দরসের আভাস ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায় না; বিশেষ ভাবে একথা সত্য, অধ্যাত্ম-সাধনার ইঙ্গিত যে গান-গুলিতে আছে, সেই গানগুলি-সম্বন্ধে। "গীতাঞ্জলি"র অধিকাংশ গানে তাই রসের কথা অপেক্ষা সাধনার কথা বড়, আনন্দ অপেক্ষা বেদনার কথা অধিক।

"কাব্য হিসাবে এই সাধনার ইঙ্গিত সম্বলিত কবিতাগুলি নিকৃষ্ট। * * বাংলা 'গীতাঞ্জলি'র গানগুলিতে কবির অধ্যাত্ম-সাধনার বার্তার ভাগই বেশি, পরিপূর্ণ উপলব্ধির বাণী কম। * * * বাংলা 'গীতাঞ্জলি'র যে-সকল গানে কবির অধ্যাত্ম-সাধনার আভাস ইঙ্গিত আছে সেগুলি পরে পরে সাজাইলে কবির সাধনার একটা সুস্পষ্ট চেহারা ধরিতে পারা যায়। মোটামুটি সাধনার তিনটি ধারা আমি ধরিতে পারিয়াছি। * * *

'গীতাঞ্জলি'র এই সাধনার কবিতাগুলি কবিতা হিসাবে নিকৃষ্ট সে-বিষয়ে সন্দেহ

নাই—কিন্তু ইহাই আশ্চর্য যে কবির সমস্ত স্বরূপটি কেমন সহজে কেমন অনায়াসে এই কাব্যের মধ্যে ধরা দিয়াছে। এ যেন কবির প্রতিদিনের ডায়ারি—শুধু প্রভেদ এই যে মানুষ ডায়ারি লিখিবার কালে প্রায়ই আপনার সম্বন্ধে কিছু না কিছু সচেতন না হইয়া যায় না। এই কাব্যে কবির অজ্ঞাতসারে তাঁহার হৃদয়ের অন্তরতম অভিজ্ঞতাগুলি পরে পরে বাহির হইয়া আসিয়াছে। * * * শিল্পীর মত কোন শিল্পের শ্রেষ্ঠ ফল দান করিয়া কবি বিদায় লন নাই, তিনি এই কাব্যে আপনাকে সম্পূর্ণ করিয়া দান করিয়াছেন। এইখানেই 'গীতাঞ্জলি'র বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বের জন্যই পশ্চিমে এই শ্রেণীর অন্যান্য সকল কাব্যের অপেক্ষা 'গীতাঞ্জলি'র সমাদর এত অধিক হইয়াছে। এই কাব্য মানুষের অন্তরের মধ্যে কবির সাধনা গিয়া আঘাত করিয়াছে। * * *"
—(অজিতকুমার চক্রবর্তী, "কাব্য পরিক্রমা," ২য় সং, ১৩৮—১৪১ পৃঃ)

সকলেই জানেন ইংরেজি "গীতাঞ্জলি" উপলক্ষ করিয়াই রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন, এবং এই গ্রন্থ-সম্বন্ধেই সমগ্র পাশ্চাত্ত্য জগৎ প্রশংসামুখর হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরেজি "গীতাঞ্জলি" বাংলা "গীতাঞ্জলি"র সব গানের অনুবাদ নয়; "নৈবেদ্য" ও "খেয়া"-গ্রন্থের অনেক কবিতা, "গীতাঞ্জলি"র অনেক গান, "গীতিমাল্যে"রও ১৫।১৬টি গানের অনুবাদ ইংরেজি "গীতাঞ্জলি"তে স্থান পাইয়াছে; তবে "গীতাঞ্জলি"র গানের অনুবাদই সব চেয়ে বেশি। কিন্তু সে যাহাই হউক, "গীতাঞ্জলি"র মধ্যে পাশ্চাত্ত্য জগৎ এমন কি মায়ামন্ত্রের সন্ধান, কি সোনার কাঠির স্পর্শ পাইল যাহার ফলে সমস্ত পিপাসু আত্মা এক মুহূর্তে একেবারে বিস্ময়ে স্তব্ধ ও অভিভূত হইয়া পড়িল। ইহার হেতু কি সে-সম্বন্ধে অজিতকুমার চক্রবর্তী মহাশয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন, এবং আমি মনে করি তাঁহার অনুমান ও বিচার মোটামুটি সত্য।* কাজেই এ-সম্বন্ধে আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু আমরা, যাহারা ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনা ও উপলব্ধির পরিবেশের মধ্যে মানুষ হইয়াছি, অতীন্দ্রিয় জগৎ ও অধ্যাত্মচেতনার

---

* অজিতকুমার চক্রবর্তী, "কাব্য-পরিক্রমা," ১২১—১৩৭ পৃঃ।

রাজ্য যাহাদের কাছে অপরিচিত নয়, তাহাদের কাছে "গীতাঞ্জলি"র অধ্যাত্ম-সাধনা ও উপলব্ধির মর্মবাণী এমন কিছু বিস্ময়কর ব্যাপার নহে। অতীন্দ্রিয় লোকের রূপ ও রহস্য, অধ্যাত্ম-সাধনার বেদনা, বিরহানন্দ ইত্যাদি বিচিত্র গূঢ় অনুভূতি আমাদের মধ্যযুগের কবি-সাধক অথবা সাধককবিদের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বাণীর ভিতর, বৈষ্ণব পদকর্তাদের পদাবলীর ভিতর, আউল-বাউলদের মধুর গানের ভিতর হইতে অহরহই আমাদের মন ও প্রাণকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। আমাদের দেশে আদি ও মধ্যযুগে অনেক কবিই ছিলেন সাধক, অনেক সাধকই ছিলেন কবি; কাজেই আমাদের দেশের ধর্ম-সাধনা রূপ ও রস-সাধনাকে জীবন হইতে নির্বাসন দেয় নাই; ভারতীয় ধর্ম-সাধনা এই হেতুই কোনও দিনই একান্ত শুষ্ক নীরস হইয়া উঠে নাই। বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের আদি যুগে ব্রাহ্মধর্মে একসময়ে আত্যন্তিক নীতিবোধ ও পাপবোধের ফলে ভারতীয় ধর্ম-সাধনা শুষ্ক নীরস জীবন-নিরপেক্ষ এক মরুপথকেই জীবন-পথ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু সে-পথ চিরন্তন পথ বলিয়া আমাদের দেশ কখনও গ্রহণ করে নাই। মধ্যযুগের ধর্ম-সাধনা একেবারেই সে-পথকে অস্বীকার করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মের পরিবেশের মধ্যে মানুষ হইয়াছেন, কিন্তু যেহেতু তিনি হইলেন মূলত কবি, তাঁহার অধ্যাত্ম-সাধনা এবং উপলব্ধি রূপ ও রস-সাধনাকে কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারে নাই, বরং তাহাকে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। এই হিসাবে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-সাধনার জগৎ, অতীন্দ্রিয় লোকের বিচিত্র রস ও রহস্যের জগৎ পাশ্চাত্য জগতের দৃষ্টিতে এক নূতন গ্রহলোক আবিষ্কার বলিয়া মনে হইলেও আমাদের ভারতীয় মানসের দৃষ্টিতে এমন কিছু নূতন নয়; সে জগৎ আমাদের কাছে নূতন জগৎ নয়, শুধু নূতন করিয়া নূতন ভাষায় নূতন

ভঙ্গিমায় আমাদের কাছে তাহা উপস্থিত করা হইয়াছে মাত্র। "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"র কবি-সাধক রবীন্দ্রনাথ এই হিসাবে নানক-কবীর-দাদূ-রজ্জব-চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাস-একনাথ-মীরা-বাঈ প্রভৃতি সাধক কবিদেরই সমগোত্রীয়। বিশ্বজীবনের সকল রূপের মধ্যেই অপরূপের লীলা এই সাধক-কবিদের অধ্যাত্মদৃষ্টির সম্মুখে ধরা দিয়াছিল; রবীন্দ্রনাথও জীবনের ও নিসর্গের সকল রূপের মধ্যে এক নিত্য অপরূপের লীলাই দেখিয়াছেন। সেইজন্যই তাঁহার অধ্যাত্ম-মানসের আশ্রয় হইতেছে প্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশ. মানব-জীবনের বিচিত্র লীলা। "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"র প্রায় প্রত্যেক গানে ও কবিতায় তাহার প্রমাণ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। উদাহরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

কথা উঠিয়াছে, "গীতাঞ্জলি"র অধ্যাত্ম-সাধনা ও উপলব্ধির মর্মবাণী এমন কিছু বিস্ময়কর নাই বা হইল, কিন্তু তাই বলিয়া "গীতাঞ্জলি"র গান ও কবিতাগুলি রসসমৃদ্ধ নয়, কিংবা কবিত্বের দিক হইতে তাহাদের মূল্য কম, একথা কি করিয়া বলা চলিতে পারে? আগেই বলা প্রয়োজন, এই যে রসসমৃদ্ধির অল্পতার কথা বা কবিত্বের অপূর্ণতার কথা বলিতেছি তাহা শুধু "গীতাঞ্জলি"র অধ্যাত্ম-সাধনার ইঙ্গিত-সম্বলিত গানগুলি-সম্বন্ধে; এবং আমার ধারণা, এই গানগুলিতেই "গীতাঞ্জলি"র ভাববৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট ধরা পড়িয়াছে। আমাদের দেশের মধ্যযুগীয় কবি-সাধকদের হিন্দি, রাজস্থানী প্রভৃতি ভাষায় রচিত গান, দোহা, ভজন; মধ্য, উত্তর ও পশ্চিম ভারতীয় রাগ-রাগিণী চিত্রশালা; এবং বাংলা বাউল, বৈষ্ণবদের পদ, গীত ইত্যাদির সঙ্গে যাঁহাদের বিস্তৃত ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, তাঁহারাই জানেন যে ভারতীয় অধ্যাত্ম-মানসের রূপে ও রসে কতকটা ঠিক এই জাতীয় ভাব-পরিবেশ সুপরিচিত, এবং তাহাদের কবিত্বরসও একেবারে তুচ্ছ করিবার মতন নয়। "গীতাঞ্জলি"র গান-

গুলির অনেক চিত্র-পরিবেশ, অনেক উপমা, অনেক আকৃতি ও বেদনার সঙ্গে আমাদের মুখোমুখি পরিচয় ঘটে মধ্যযুগীয় এই সব গান, ভজন, দোহা, পদ, গীত প্রভৃতিতে এবং রাজস্থানী পদ্ধতির চিত্রশালায়। 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে', আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই,' 'কত অজানারে জানাইলে তুমি,' 'তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে,' 'আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে গোপন তব চরণ ফেলে,' 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার,' 'অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চল্‌বে না,' 'প্রভু, তোমা লাগি আঁখি জাগে,' 'তুমি কেমন করে গান কর যে গুণী,' 'আসন তলের মাটির পরে লুটিয়ে রবো,' 'রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি, অরূপ রতন আশা করি,' 'নিভৃত প্রাণের দেবতা,' 'সে যে পাশে এসে বসেছিল, তবু জাগিনি,' 'তব সিংহাসনের আসন হ'তে,' 'তোরা শুনিস্ নি কি শুনিস্‌নি তার পায়ের ধ্বনি,' 'তারা তোমার নামের বাটের মাঝে মাশুল লয় যে ধরি,' 'একদা আমি বাহির হলেম তোমার অভিসারে' প্রভৃতি সুবিখ্যাত গানের ভাব ও রূপ-পরিবেশ আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতি বিচ্যুত পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মানসে নূতন সন্দেহ নাই, কিন্তু জনসাধারণের চিত্তে ইহাদের ভাব ও রূপ-জগৎ একটি অখণ্ডরূপে আজও বিধৃত, তাহারা এই জগতের সঙ্গে পরিচিত, যদিও রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও আঙ্গিকের সঙ্গে পুরোপুরি নয়। তাহাদের কাছে এই জগতের রূপ ও রস-অভিজ্ঞতা বিশেষ কিছু নূতনত্ব বহন করে না। অথচ অভিজ্ঞতার নূতনত্ব বা স্বাতন্ত্র্য এবং প্রকাশের অভিনবত্বের মধ্যে রসের অঙ্কুর অনেকাংশে নিহিত। এই স্বাতন্ত্র্য ও অভিনবত্ব "গীতাঞ্জলি"র সাধনার ইঙ্গিত-সম্বলিত গান-গুলিতে প্রায় অনুপস্থিত। তবে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে অধ্যাত্ম-সাধনার ইঙ্গিত যেখানে নিসর্গ সাধনার অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত সেখানে গানগুলি নূতন অর্থ-নির্দেশ, নূতন ব্যঞ্জনা-লাভ করিয়াছে; সে গান-

গুলির কবিত্বরস কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। যেমন, 'আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে গোপন তব চরণ ফেলে' সুবিখ্যাত গানটির আরম্ভ যদিও অতি সুপরিচিত চিত্র-পরিবেশে, এবং ভাবপরিবেশে যদিও পুরাতন ঐতিহ্য-অভিজ্ঞতা হইতে আহৃত, তবু সূচনার পরই নিসর্গ অভিজ্ঞতার ও চিত্র-পরিবেশের একটি মোড় দেখা দিয়াছে প্রথম স্তবকের দ্বিতীয় পর্যায়ে—

> **প্রভাত আজি মুদেছে আঁখি,**
> **বাতাস বৃথা যেতেছে ডাকি,**
> **নিলাজ নীল আকাশ ঢাকি,**
> **নিবিড় মেঘ কে দিল মেলে।**
> **কূজনহীন কাননভূমি**
> **দুয়ার দেওয়া সকল ঘরে**
> **একেলা কোন্ পথিক তুমি**
> **পথিকহীন পথের পরে।**

অথবা, 'মেঘের পর মেঘ জমেছে' গানটিতে

> **দূরের পানে মেলে আঁখি**
> **কেবল আমি চেয়ে থাকি,**
> **পরান আমার কেঁদে বেড়ায়**
> **দুরন্ত বাতাসে।**

এই ধরনের দৃষ্টান্ত আরও আহরণ করা কিছুই কঠিন নয়।

এই যে 'দুরন্ত বাতাসে পরান কাঁদিয়া বেড়ান'—অধ্যাত্মাকৃতির সঙ্গে সূক্ষ্ম নিসর্গাভূতির এই ধরনের শুভ পরিণয়, এই ধরনের মিলনের মধ্যে একটি নূতন অভিজ্ঞতার পরিচয় কতকগুলি গানে পাওয়া যায়। সর্বত্র এই সংযোগের মধ্যে চিত্র বা ভাব-পরিবেশের খুব নূতনত্ব নাই; কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাহা ঐতিহ্য-স্বীকৃত; তবু বহুক্ষেত্রে যে আছে তাহাও অস্বীকার করা যায় না। এবং যে-সব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার এই

স্বাতন্ত্র্য ও অভিনবত্বের প্রকাশ আছে, সেই সব গানই নূতন রসরূপ লাভ করিয়াছে; তবে, অধ্যাত্ম-সাধনার ইঙ্গিত-সম্বলিত গানগুলিতে এই পরিচয় কম। যেটুকু আছে তাহাও এমন কিছু নয়, যাহার সঙ্গে রবীন্দ্র-কাব্যে ইতিপূর্বেই আমাদের পরিচয় লাভ ঘটে নাই।

তবে, "গীতাঞ্জলি"তে এমন কতকগুলি গান আছে, যেখানে নিসর্গানুভূতির প্রকাশই প্রবল, অধ্যাত্মানুভূতি তাহাদের মধ্যে একটু মৃদু সৌরভ মাত্র সঞ্চার করিয়াছে, তাহার বেশি কিছু নয়। এই ধরনের গানগুলির চিত্র-গরিমাই শুধু উপভোগ্য নয়, ভাব গরিমায়ও ইহারা সরস, এবং যেহেতু অধ্যাত্মানুভূতির ইঙ্গিত এসব ক্ষেত্রে নিসর্গানুভূতির পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন, সেই হেতু ইহাদের রসব্যঞ্জনাও গভীর। "গীতাঞ্জলি"র যাহা কিছু রস-সমৃদ্ধি তাহা এই জাতীয় গানগুলির। কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা,' 'তোমার সোনার থালায় সাজাবো আজ দুখের অশ্রুধার,' 'আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা গেঁথেছি শেফালি মালা,' 'লেগেছে অমল ধবল পালে মন্দ মধুর হাওয়া,' 'আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে,' 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে,' 'আমার নয়ন ভুলানো এলে,' 'আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, গেলোরে দিন বয়ে,' 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার', 'আর নাইরে বেলা নামলো ছায়া ধরণীতে,' 'আজ বারি ঝরে ঝর ঝর ভরা বাদরে,' 'এসো হে এসো, সজল ঘন বাদল বরিষণে,' 'শরতে আজ কোন্ অতিথি এল প্রাণের দ্বারে,' 'গায়ে আমার পুলক লাগে,' 'আজি গন্ধ বিধুর সমীরণে', 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে,' 'আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে,' 'আজি বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে' ইত্যাদি কোনও কোনও গানে অধ্যাত্মানুভূতির বেশ একটু নূতন ব্যঞ্জনা, নূতন অভিজ্ঞতার রস ধরা পড়িয়াছে, কিন্তু "গীতাঞ্জলি"র ১৫৭টি গানের অনুপাতে ইহাদের সংখ্যা

খুব বেশি নয়। অধিকাংশ গানেই ত সাধনার বেদনা অথবা আনন্দ অত্যন্ত সুপরিচিত অভিজ্ঞতার সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত; গভীরতর ব্যঞ্জনা বা সূক্ষ্মতর অনুভূতি প্রায় অনুপস্থিত। এই কারণেই "গীতাঞ্জলি"র গান-গুলিকে যখন সমগ্রভাবে দেখি, তখন তাহাদের রসসমগ্রতা মনকে আবেশাভিভূত করে না; কল্পনা ও মননকে যেন পরিপূর্ণ তৃপ্তি দেয় না। তাহাদের যাহা কিছু মাধুর্য তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুরের মাধুর্য এবং সেই সুর-পরিবেশ আমাদের চিত্তের মধ্যে অনুক্ষণ সঞ্চিত ও সঞ্চারিত।

যাহাই হউক, "গীতিমাল্য" ও "গীতালি"তে কিন্তু কবি এই সুপরিচিত অধ্যাত্ম-অভিজ্ঞতার সুস্পষ্ট প্রকাশের ধারাটা কাটাইয়া উঠিয়াছেন, অধ্যাত্মাভিজ্ঞতাও ইতিমধ্যে গভীরতর হইয়াছে। যে-অনুভূতি তাঁহার গভীরতর কবি-প্রকৃতির, সূক্ষ্মতর কল্পমানসের আত্মীয় সেই নিসর্গানুভূতিই ক্রমশ প্রবলতর হইয়াছে; অধ্যাত্মানুভূতির যাহা কিছু প্রকাশ তাহাও আশ্রয় করিয়াছে এই নিসর্গানুভূতিকে এবং তাহারই ভিতর দিয়া সঞ্চারিত হইয়াছে। এই ধরনের ব্যঞ্জনাময় সূক্ষ্ম আভাসসমৃদ্ধ অধ্যাত্মানুভূতির পরিচয় বহুলাংশে নূতন। আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের এই ধরনের গান, দোহা, পদ, ভজন প্রভৃতিতে এক ধরনের নিসর্গ পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা ছিল, কিন্তু তাহা একান্ত রীতিগত, কতকটা যেন বাঁধা গৎ; সেই শ্রাবণের ধারা বর্ষণ, সেই কদম ও তমাল-বন, সেই মাঘের কুয়াশা ও শীত, বসন্তের দক্ষিণ বাতাস ও বিচিত্র রং ইত্যাদি বিভিন্ন ঋতুর বিভিন্ন প্রকাশের সাহায্যে কেবল যেন একটি একটি চিত্র-পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা, তাহার চেয়ে বেশি কিছু নয়। অধ্যাত্মানুভূতির সঙ্গে সেই চিত্র-পরিবেশের কোনও সূক্ষ্ম অনুভূতির গভীর ভাব সংযোগ কিছু ছিল না। "গীতাঞ্জলি"র কতকগুলি গানে এই ধরনের সংযোগের ইঙ্গিত আগেই করিয়াছি, এবং সেই গান-

গুলিরই যাহা কিছু রসসমৃদ্ধি। "গীতিমাল্য" এবং "গীতালি"তে এই ধরনের সংযোগ গভীরতর হইয়াছে, এবং অধ্যাত্মানুভূতিও সহজতর হইয়াছে; সেইজন্যই এই দুই গ্রন্থের রসসমৃদ্ধিও "গীতাঞ্জলি" অপেক্ষা অনেক গভীর, স্বচ্ছ ও স্বচ্ছন্দ। "গীতিমাল্য" ও "গীতালি"কে যে "গীতাঞ্জলি" অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়াছি, তাহা এই কারণেই। গভীর নিসর্গচেতনার সঞ্চারই রবীন্দ্র-অধ্যাত্মানুভূতির বৈশিষ্ট্য এবং এই ধরনের গানগুলির রসপ্রেরণার মূলে; যে গানগুলিতে তাহা নাই তাহাদের রসপ্রেরণাও দুর্বল।

"গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"রচনার পূর্বেও রবীন্দ্রনাথ ধর্মসংগীত অনেক রচনা করিয়াছেন, এবং তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ব্রাহ্মসমাজে এবং ব্রাহ্মসমাজের বাহিরেও খুব পরিচিত, বহুল পরিমাণে গীত ও ব্যাখ্যাত। 'অন্ধজনে দেহ আলো,' 'শুনেছে তোমার নাম,' 'জানি হে যবে প্রভাত হবে' ইত্যাদি গান কবির যৌবনের রচনা, যখন অধ্যাত্মচেতনা কবিচিত্তকে স্পর্শও করে নাই। এই ধরনের ধর্মসংগীত-রচনা "মানসী"র যুগ হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল;

"কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পূর্বেকার ধর্মসংগীতগুলি প্রচলিত ব্রহ্মোপাসনার ভাব অবলম্বন করিয়াই রচিত। তখন কবির স্বকীয় কোন অধ্যাত্ম অনুভূতি জাগে নাই—তিনি আপনার অভিজ্ঞতাকে আপন বাণীরূপে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন নাই। সুতরাং তখনকার গানগুলি প্রচলিত উপাসনার সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়াছে। কিন্তু তাঁহার আধুনিক গানগুলি যে তাঁহার কাব্যজীবনের চরম পরিণতি স্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। ইহারা তো প্রথাগত নহে, আত্মগত—দশের জিনিস নহে, একেলার।"
—অজিতকুমার চক্রবর্তী, "কাব্য পরিক্রমা," ১১০—১১১ পৃঃ।

পূর্বেকার ধর্মসংগীতগুলি ধর্মপ্রবণ চিত্তে ধর্মবোধের সঞ্চার কতটুকু করে বা করে না, আমাদের বিচার্য তাহা নহে; কিন্তু একথা নিসংশয়ে বলা যাইতে পারে, সে-সংগীতগুলি রবীন্দ্রনাথের নিজের অধ্যাত্ম-

চৈতন্যের কথা নয়, প্রচলিত ধর্মধারণার কথা। কিন্তু "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"র গানগুলি কবির স্বীয় অধ্যাত্ম-অভিজ্ঞতার কথা, মর্মছেঁড়া বাণী, জাগ্রত অধ্যাত্ম-চৈতন্যের গোপন গুঞ্জন।

ইতিপূর্বে বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ মধ্যযুগীয় সাধক-কবি কবীর-নানক-রজ্জব-দাদূ-মীরাবাঈ-চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাস প্রভৃতির সমগোত্রীয়। ভক্তি-রসাশ্রিত গান ইঁহারা অনেক রচনা করিয়াছেন, নিজেরা গাহিয়াছেন, ভক্তশিষ্যেরা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছে, গাহিয়া ধর্মসাধনায় শক্তি লাভ করিয়াছে; এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রম করিয়া সে-সব গানের কিছু কিছু পদ আমাদের চিত্ত-তটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কিন্তু সে সব অধ্যাত্ম-রসাশ্রিত গান ও রবীন্দ্রনাথ-রচিত গানগুলি কি একই রস ও রূপাশ্রিত, তাহারা কি একই মূল্য বহন করে? বোধ হয় নয়; কারণ যে-সব সাধক-কবিদের কথা বলিলাম, তাঁহারা সকলেই জীবনে শুধু ঐ ভক্তিসাধনা, অধ্যাত্ম-সাধনাই করিয়াছেন, ভক্তিরস অধ্যাত্মরসই জীবনের একমাত্র রস বলিয়া জানিয়াছেন; অন্য কোন রস বা সাধনা তাঁহাদের জীবনকে স্পর্শ করে নাই, করিলেও তাহা কাব্যের মধ্যে উৎসারিত হয় নাই। কিন্তু জীবনের বিচিত্র রস ও সাধনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটিয়াছে, তিনি নিসর্গের কবি, নরনারীর দেহ-আত্মার প্রেমলীলার কবি, জীবনের বিচিত্র রস ও রহস্যের কবি। তিনি "সোনার তরী-চিত্রা চৈতালি-কল্পনা-ক্ষণিক"ার কবি; তিনি তো শুধু "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"র কবি নহেন।

"যিনি প্রকৃতির কবি, মানবপ্রেমের কবি, যিনি সকল বিচিত্র রস ও নিগূঢ় জীবনের গান গাহিয়াছেন, তিনিই যে এখন রসানাং রসতমঃ, সকল রসের রসতম ভগবৎপ্রেমের গান গাহিতেছেন—ইহাতে ভারতবর্ষের ও অন্যান্য দেশের ভক্তিসংগীতের সঙ্গে এই নূতন ভক্তিসংগীতের প্রভেদ ঘটিয়াছে। এমন ঘটনা জগতে আর কোথাও ঘটিয়াছে কিনা জানি না। কারণ ধর্ম চিরকালই জীবনের অন্যান্য বৈচিত্র্য হইতে আপনাকে সরাইয়া লইয়া সযত্নে সন্তর্পণে আপনাকে এক কোণে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছে। * * *

জীবনের সকল রস, সকল অভিজ্ঞতার এমন আশ্চর্য প্রকাশ জগতের অল্পকবির মধ্যেই দেখা গিয়াছে। পরিপূর্ণ জীবনের গান যিনি গাহিয়াছেন, তিনি যখন অধ্যাত্ম উপলব্ধির গান গাহেন, তখন এসরাজের মূল তারের ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তাহার পাশাপাশি যে তারগুলি থাকে তাহারা যেমন একই অনুরণনে ঝংকৃত হইতে থাকে এবং মূল তারের সংগীতকে গভীরতর করিয়া দেয়, সেইরূপ অধ্যাত্ম উপলব্ধির সুরের সঙ্গে জীবনের অন্যান্য রসোপলব্ধির সুর মিলিত হইয়া এক অপূর্ব অনির্বচনীয়তার সৃষ্টি করে। এইজন্য রবীন্দ্রনাথকে যে সকল বিলাতি সমালোচক খৃষ্টান ভক্ত কবিদের সঙ্গে বা হিব্রু প্রফেটদের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন, তাঁহাদের তুলনা যেমন সত্য হয় নাই, সেইরূপ যাঁহারা এতদ্দেশীয় ভক্ত কবিদের সঙ্গে তাঁহার তুলনা করেন, তাঁহাদেরও তুলনা ঠিক বলিয়া মনে করি না। বরং আধুনিক কালের যে-সকল কবি জীবনের সকল বিচিত্রতার রসানুভূতিকে অধ্যাত্ম-রসবোধের মধ্যে বিলীন করিয়া দিতে চান—সেই সকল কবিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তুলনীয় হইতে পারেন।"—(অজিতকুমার চক্রবর্তী, "কাব্য-পরিক্রমা," ১৫৩—১৫৪ পৃঃ)

অনেকেই "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"র কবি রবীন্দ্রনাথকে বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতাদের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু ঠিক উপরোক্ত কারণেই এই তুলনা খুব সত্য ও সার্থক নয়, ঠিক যেমন সত্য ও সার্থক নয় উপনিষদের ঋষি কবিদের সঙ্গে তাঁহার তুলনা। অথচ উপনিষদের অধ্যাত্মযোগ কিংবা বৈষ্ণব লীলাতত্ত্ব তাঁহার কবিমানসকে নূতন ঐশ্বর্য দান করিয়াছে, একথাও অস্বীকার করা চলে না। "গীতাঞ্জলি"র অনেক গানে বিরহের সুগভীর ব্যথা ও বেদনা, "গীতমাল্যে"র কোন কোন গানে মিলন ও বিরহের আনন্দ খুব স্পষ্ট ; বৈষ্ণব পদকর্তাদের ভাবজগৎ কল্পনা-জগৎ, "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"র অনেক গানেই ছায়া পাত করিয়াছে ; তবু একটু গভীরভাবে আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়, মূর্তিসাপেক্ষ যে-প্রেম বৈষ্ণব পদাবলীতে মান, বিরহ, মিলন, অভিসার প্রভৃতি বিচিত্র রসকে প্রস্ফুটিত করিয়াছে, ঠিক সেই প্রেমই রবীন্দ্র-কবি-মানসের উপজীব্য নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রেম রহস্যময়, তাঁহার দেবতাও রহস্যময়, নব নব বিচিত্র তাঁহার রূপ, গভীর বিচিত্র রহস্যের

মধ্যে কোথায় কখন যে তাঁহার প্রকাশ ক্ষণে ক্ষণে ধরা দেয় তাহা কবি নিজেও ভাল করিয়া জানেন না। বৈষ্ণব পদাবলীতে এই রহস্যের আভাস পাওয়া যায় না; তাহাদের বিচিত্র প্রেমলীলা যেন অত্যন্ত সহজ ও সুস্পষ্ট; তাহাদের সব কথাই যেন আমাদের জানা, বুদ্ধির ও কল্পনার গোচর; কোন্ পথ যে কোন্ বাঁকে মোড় ফিরিবে, সবই যেন আমরা জানি। বৈষ্ণব কর্তাদের সহজ ভক্তির সুরও রবীন্দ্রনাথের গান-গুলিতে ধরা যায় না। তাহার কারণও আছে। বৈষ্ণব পদকর্তারা একটি প্রচলিত ধর্মমত ও বিশ্বাসকে জীবনে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই জন্য তাঁহারা সহজ ভক্তি-সাধনাকেও তাহার অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, এবং সহজেই তাহা তাঁহাদের হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোন প্রচলিত ধর্মমত ও বিশ্বাসকে স্বীকার করিয়া যাত্রা শুরু করেন নাই, সেইজন্য বৈষ্ণবের সহজ ভক্তিও তাঁহার হৃদয়ে পূর্ব হইতেই সঞ্চারিত হয় নাই; সহজ হইবার সাধনা তিনি করিয়াছেন, কিন্তু নিজেই আবার দারুণ অস্বস্তিতে বলিয়াছেন,

> জড়িয়ে গেছে সরু মোটা
> দুটো তারে,
> জীবন বীণা ঠিক সুরে তাই
> বাজে না রে। ("গীতাঞ্জলি," ১২৮ নং)

এই যে সরু-মোটা দুইটি তারে জীবন-বীণা জড়াইয়া যাওয়া, ইহাও ত এক অধ্যাত্মলীলা। এই লীলার প্রকাশ বৈষ্ণব পদাবলীতে নাই। সেইজন্য "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"তে যে বিরহের দুঃখ-বেদনা, মিলনের যে আনন্দ, ভক্তের সঙ্গে ভগবানের যে নিবিড় সঙ্গোপন আলাপন তাহার সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর বিরহ-মিলন প্রভৃতি বিচিত্র রসের একটি গভীর সাদৃশ্য থাকিলেও, এ কথা স্বীকার করিতে হয়, এই

দুই অধ্যাত্ম সাধনার ধর্ম এক নয়। রবীন্দ্র-অধ্যাত্মরসের বৈচিত্র্যও বৈষ্ণব অধ্যাত্ম-সাধনায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

রবীন্দ্রনাথ উপনিষদতত্ত্বের আবহাওয়ায় বর্ধিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু উপনিষদের অধ্যাত্মযোগতত্ত্বও "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"র অধ্যাত্ম-রসকে অনুপ্রাণিত করে নাই; উপনিষদের অধ্যাত্মযোগ গভীর জ্ঞান-সাপেক্ষ ধ্যানসাপেক্ষ—জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।

"উপনিষদের সাধনা এই অন্তর্মুখীন ধ্যানপরায়ণ সাধনা—অধ্যাত্মযোগের সাধনা। উপনিষদের ব্রহ্ম—দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং। তিনি লীলারসময় বিশ্বরূপ ভগবান নহেন। * * উপনিষদের যোগতত্ত্বে বেদান্তশাস্ত্র তৈরি হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইতে কাব্যকথা সমুৎসারিত হয় না।"—(অজিতকুমার চক্রবর্তী, "কাব্য-পরিক্রমা," ২য় সং, ১৫০—৫১ পৃঃ)

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, "গীতাঞ্জলি"র গানগুলিতে সাধনার বেদনা, ব্যর্থতা ও বিরহের ক্রন্দনের সংবাদই বেশি পাওয়া যায়; অথচ অধ্যাত্ম-সাধনার পরিণত ফলটির সন্ধান পাওয়া যায় না। সাধনার বৈচিত্র্যকে আমাদের দেশ স্বীকার করিয়াছে বটে, এবং বিভিন্ন পন্থা লইয়া কলহ-কোলাহলও কম করে নাই, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমাদের অধ্যাত্ম-সাধনা সর্বদাই লক্ষ্য রাখিয়াছে পরিণত ফলটির দিকে, এবং তাহার মাপকাঠিতেই সাধন-পন্থার মূল্য নির্ধারণ করিয়াছে। যে-জীবনে ভাগবতোপলব্ধি আসিয়াছে, সেই জীবনের রস ও আনন্দ-হিল্লোলই আমাদের দেশের অধ্যাত্মচিত্তে আনন্দসঞ্চার করিয়াছে এবং অধ্যাত্মজীবনে জন-সাধারণকে আকর্ষণ করিয়াছে; এই রস ও আনন্দ-হিল্লোলই মুখ্য, সাধন-পন্থা গৌণ, সে-পন্থার ব্যথা এবং বেদনাও গৌণ। এই হিসাবে ভারতীয় চিত্তে "গীতাঞ্জলি" খুব বৃহৎ মূল্য বহন করে না। এই কথাটাই শ্রদ্ধেয় অজিতকুমার চক্রবর্তী খুব সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন,—

"* * * আমাদের দেশের লোক সাধনার বিচিত্রতাকে * * বৈজ্ঞানিক

ভাবে বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক, একটা বিষয়ে এদেশের লোকের বোধ সুপরিণত হইয়াছে। অধ্যাত্ম-সাধনার ফলটিতে ঠিক পাক ধরিল কিনা, তাহা আমরা বিলক্ষণ বুঝি। কথায় আমাদের চিড়া ভিজাইতে পারে না। আমাদের দেশের লোক শ্রুতি-ধারণের মত করিয়া যে-সকল ভক্তদের বাণী ও সংগীত রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, তাহা শ্রবণ মাত্র আমরা এবিষয়ে জাতির প্রতিভা বুঝিতে পারিব। * * *

"আমরা রবীন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনবৃক্ষের পরিণামের দিকে চাহিয়া আছি; একটা 'গীতাঞ্জলি'কেই আমরা সেই জীবন-মহাবৃক্ষের পরিণত ফল বলিতে যাইব কেন? 'গীতাঞ্জলি'কে পশ্চিম বেশি বুঝিয়াছে, একথা তাহারা গর্ব করিয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিলেও আমরা তাহা সত্য নয় জানি। * * * আমরা যে কবিকে তাঁহার সমগ্র কাব্যজীবনের ভিতর হইতে দেখিতেছি—তাঁহার জীবনের পশ্চাতে যে বহুযুগের অধ্যাত্মরসধারা তাঁহাকে পরিপুষ্ট করিতেছে তাহাকে দেখিতেছি,—কিছুই আমাদের কাছে ঝাপ্‌সা নহে। আমরা জানি তাঁহার প্রাণের মূল জীবনের সুখদুঃখময় সকল বিচিত্র রসের মধ্যে কতদূরে গভীরতম তত্ত্বে আপনাকে প্রেরণ করিয়াছে এবং সমস্ত বিশ্বের আলোকে সমীরণে নানা আঘাতে বিকাশ লাভ করিয়া দিকে দিকে সেই বিচিত্র জীবনের রসপুষ্ট কাব্যের শাখা-প্রশাখা কি আশ্চর্য পত্রপুষ্পে শোভিত হইয়া আপনাকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। ক্রমে যখন শাখাগ্রভাগে পরিণত জীবনের ফল ধরিল তখন তাহার কাঁচা রং আমরা দেখিয়াছি—তখনও তাহা রসে মধুর হয় নাই, জীবনের ভোগের বৃন্তে তাহার জোড় দৃঢ়বদ্ধ। ক্রমে ভিতরে ভিতরে রসে যখন সে পূর্ণ হইতে লাগিল, তখন ভিতরের সেই পূর্ণতা তাহার বাহিরে আত্মদান-রূপে অত্যন্ত অনায়াসে যখন প্রকাশ পাইল, তাহার ভোগের বৃন্ত শিথিল হইল—তখন তাহার সেই বিশ্বের কাছে নিবেদিত অঞ্জলিকে আমরা যে চিনি নাই, একথা স্বীকার করি না। কিন্তু সেই অঞ্জলিকেই সম্পূর্ণ বলিতে যাইব কেন? সে তো রসের ভারে একেবারে অবনত হয় নাই—তাহার রসের কথার চেয়ে সাধনার কথা বেদনার কথা যে অধিক। এই নবপ্রকাশিত "গীতিমাল্যে"র গানগুলি রসে টুসটুসে ফলের মত—স্পর্শ মাত্রেই যেন ফাটিয়া পড়িবে। ইহার মধ্যে সাধনার বিশেষ কোন বার্তা নাই—সেইজন্য বেদনার মেঘ-মলিনিমা নাই।"—(অজিতকুমার চক্রবর্তী, কাব্য-পরিক্রমা," ২য় সং ১৪২—৪৩ পৃঃ।)

আগেই বলা হইয়াছে, "গীতাঞ্জলি"তে শুধু সাধনার কথা, বেদনার

কথা, শুধু ভাগবত বিরহের ক্রন্দনই বড় হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথম চৌদ্দটি গান ১৩১৩ হইতে ১৩১৫-র মধ্যে রচিত, বাকি সবগুলিই আষাঢ় ১৩১৬ হইতে শ্রাবণ ১৩১৭-র মধ্যে লেখা। "গীতাঞ্জলি"র মূল সুর শেষোক্ত পর্যায়ের গানগুলির মধ্যেই ধরা পড়ে। ভাগবত বিরহের আভাস আমরা "খেয়া"-গ্রন্থেই লক্ষ্য করিয়াছি, সেখানেই আমরা দেখিয়াছি কবির অপরিসীম ব্যাকুলতা, অধীর প্রতীক্ষা। "গীতাঞ্জলি"তে সেই ব্যাকুলতা, সেই প্রতীক্ষা কান্নায় যেন ফাটিয়া পড়িল,

কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো
বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো।
রয়েছে দীপ না আছে শিখা
এই কি ভালে ছিল রে লিখা,
ইহার চেয়ে মরণ সে যে ভালো।
বিরহানলে প্রদীপখানি জ্বালো।

("গীতাঞ্জলি," ১৭ নং)

ভাগবত অনুভূতি-লাভ এখনও ঘটে নাই, সেই তাঁহাকে পাওয়া এখনও হয় নাই, অথচ পাইবার জন্য সমস্ত চিত্ত উন্মুখ; অধীর বিরহী চিত্ত দুয়ার খুলিয়া সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া বসিয়া আছে। মাঝে মাঝে তাঁহার মৃদু পদধ্বনি শুনা যাইতেছে, মাঝে মাঝে তাঁহার মধুর সৌরভ গায়ে আসিয়া লাগিতেছে, অথচ তিনি আসিতেছেন না, মনোমন্দিরে আসিয়া বসিতেছেন না—ইহার বেদনা কবিকে পীড়িত করিতেছে। নানা পরিবেশের মধ্যে, নানা অবস্থায় এই বেদনার ক্রন্দন ধ্বনিত হইতেছে,—মেঘাচ্ছন্ন দিবসে

তুমি যদি না দেখা দাও
করো আমায় হেলা,
কেমন করে কাটে আমার
এমন বাদল-বেলা।

দূরের পানে মেলে আঁখি
কেবল আমি চেয়ে থাকি,
পরান আমার কেঁদে বেড়ায়
দুরন্ত বাতাসে।
আমায় কেন বসিয়ে রাখো
একা দ্বারের পাশে। ("গীতাঞ্জলি", ১৬ নং)

অথবা, শ্রাবণঘনঘটায়

হে একা সখা, হে প্রিয়তম,
রয়েছে খোলা এ ঘর মম,
সমুখ দিয়ে স্বপন সম
যেয়ো না মোরে হেলায় ঠেলে।
("গীতাঞ্জলি," ১৮নং)

অথবা,

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার,
পরান-সখা বন্ধু হে আমার।
আকাশ কাঁদে হতাশ সম,
নাই যে ঘুম নয়নে মম,
দুয়ার খুলি, হে প্রিয়তম,
চাই যে বারে বার!
পরান-সখা বন্ধু হে আমার। ("গীতাঞ্জলি," ২০নং)

অথবা,

অমন আড়াল দিলে লুকিয়ে গেলে চলবে না
এবার হৃদয়মাঝে লুকিয়ে বোসো, কেউ জানবে না,
কেউ বলবে না। ("গীতাঞ্জলি," ২৩নং)

অথবা,

শুধু আসন পাতা হলো আমার
সারাটি দিন ধ'রে,

ঘরে হয়নি প্রদীপ জ্বালা, তারে
ডাকবো কেমন ক'রে।
আছি পাবার আশা নিয়ে, তারে
হয়নি আমার পাওয়া। "গীতাঞ্জলি," ৩৯নং)

অথবা,

যতবার আলো জ্বালাতে চাই
নিবে যায় বারে বারে।
আমার জীবনে তোমার আসন
গভীর অন্ধকারে।
যে লতাটি আছে শুকায়েছে মূল
কুঁড়ি ধরে শুধু, নাহি ফোটে ফুল,
আমার জীবনে তব সেবা তাই
বেদনার উপহারে। ("গীতাঞ্জলি," ৭২নং)

অথবা,

তোমার সাথে নিত্য বিরোধ
আর সহে না,—
দিনে দিনে উঠছে জমে
কতই দেনা। ("গীতাঞ্জলি," ১৫০নং)

কোনও কোনও গানে নিজের অসম্পূর্ণতার বেদনা, সাধনার ত্রুটির আভাসও আছে। নিজেকে একান্তভাবে সমর্পণ করিয়া দিবার প্রার্থনাও আছে। তাঁহাকে পাওয়া হয় নাই, কিন্তু তাঁহারই পথ চাহিয়া আছেন, এই 'পথ চাওয়াতেই আনন্দ,' এই পথ পানে চাহিয়া থাকিতেও ভাল লাগিতেছে,—

প্রভু, তোমা লাগি আঁখি জাগে ;
দেখা নাই পাই,
পথ চাই,
সেও মনে ভালো লাগে। ("গীতাঞ্জলি," ২৮নং)

ধনে জনে কবি জড়াইয়া আছেন, তবু মন সব ছাড়িয়া সব কিছুর মধ্যে একান্তভাবে তাঁহাকেই চাহিতেছে। কবি প্রতি মুহূর্তেই ভাবিতেছেন, তাঁহার আসার সময় হইয়াছে, এখন মলিনবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে—

এখন তো কাজ সাঙ্গ হলো
দিনের অবসানে
হলোরে তাঁর আসার সময়
আশা এলো প্রাণে।
স্নান করে আয় এখন তবে
প্রেমের বসন পরতে হবে,
সন্ধ্যাবনের কুসুম তুলে
গাঁথতে হবে হার।
ওরে আয় সময় নেই যে আর।

("গীতাঞ্জলি," ৪১নং)

অথবা,

তোরা শুনিস্‌নি কি শুনিস্‌নি তার পায়ের ধ্বনি
ঐ যে আসে, আসে, আসে।
যুগে যুগে পলে পলে দিন-রজনী
সে যে আসে, আসে, আসে।
গেয়েছি গান যখন যত
আপন মনে খ্যাপার মতো
সকল সুরে বেজেছে তার
আগমনী—
সে যে আসে, আসে, আসে।

("গীতাঞ্জলি," ৬২নং)

কিন্তু, সাধনার আনন্দের আভাসও যে কোথাও নাই, একথা সত্য

নয়। মাঝে মাঝে দেবতার স্পর্শ তিনি পাইতেছেন, চিত্ত তখন বিপুল আনন্দে ভরিয়া উঠিতেছে, বিরহও তখন মধুর বলিয়া মনে হইতেছে—

গায়ে আমার পুলক লাগে
চোখে ঘনায় ঘোর,
হৃদয়ে মোর কে বেঁধেছে
রাঙা রাখির ডোর।
* * *
আনন্দ আজ কিসের ছলে
কাঁদিতে চায় নয়ন-জলে
বিরহ আজ মধুর হয়ে
করেছে প্রাণ ভোর।
("গীতাঞ্জলি," ৪২নং)

অথবা,

জগতে আনন্দ-যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।
ধন্য হলো ধন্য হলো মানব-জীবন।
নয়ন আমার রূপের পুরে
সাধ মিটায়ে বেড়ায় ঘুরে,
শ্রবণ আমার গভীর সুরে
হয়েছে মগন। ("গীতাঞ্জলি," ৪৪নং)

অথবা,

আলোয় আলোকময় ক'রে হে
এলে আলোর আলো।
আমার নয়ন হতে আঁধার
মিলালো মিলালো।
সকল আকাশ সকল ধরা
আনন্দে হাসিতে ভরা,

যে দিক পানে নয়ন মেলি
ভালো সবি ভালো।
("গীতাঞ্জলি," ৪৫নং)

তবে এমন সার্থক আনন্দক্ষণের প্রকাশ "গীতাঞ্জলি"তে খুব বেশি নাই; এই যে মাঝে মাঝে নিজের ঘরের দুয়ারে দেবতার পদধ্বনি তিনি শুনিয়াছেন, ঘুমের ভিতর, প্রভাত স্বপ্নের মধ্যে দেবতার স্পর্শ তাঁহার গায়ে আসিয়া লাগিয়াছে অথচ মুখোমুখি দেখা হইল না, তাহার আনন্দ এবং বেদনা দুইই দুঃসহ।

সে যে পাশে এসে বসেছিলো
তবু জাগিনি।
কী ঘুম তোরে পেয়েছিলো
হতভাগিনী।

* * *

কেন আমার রজনী যায়
কাছে পেয়ে কাছে না পায়,
কেন গো তার মালার পরশ
বুকে লাগেনি।
("গীতাঞ্জলি," ৬১নং)

অথবা,

সুন্দর, তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে
অরুণ-বরন পারিজাত লয়ে হাতে।
নিদ্রিত পুরী, পথিক ছিল না পথে,
একা চলি গেলে তোমার সোনার রথে,
বারেক থামিয়া মোর বাতায়নপানে।
চেয়েছিলে তব করুণ নয়নপাতে।

কতবার আমি ভেবেছিনু উঠি উঠি,
আলস ত্যাজিয়া পথে বাহিরাই ছুটি,
উঠিনু যখন তখন গিয়েছ চলে—
দেখা বুঝি আর হলোনা তোমার সাথে
সুন্দর, তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে।

("গীতাঞ্জলি," ৬৭নং)

"নৈবেদ্য"-গ্রন্থে আমরা দেখিয়াছি, একটি মুক্ত সবল প্রাণের প্রার্থনা; "গীতাঞ্জলি"তে সে প্রাণ ভক্তিতে আনত হইয়াছে, একান্তভাবে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে একথা সত্য, কিন্তু এই ভক্তি দুর্বল প্রাণের করুণ আত্মনিবেদন মাত্র নয়, হীনবল দাসচিত্তের অশ্রুজলের নৈবেদ্য নয়। কবি বলিতেছেন,

আমার এ প্রেম নয় ত ভীরু
নয় ত হীনবল,
শুধু কি এ ব্যাকুল হয়ে
ফেল্‌বে অশ্রুজল।

* * *

নাচো যখন ভীষণ সাজে
তীব্র তালের আঘাত বাজে,
পালায় ত্রাসে পালায় লাজে
সন্দেহ-বিহ্বল।
সেই প্রচণ্ড মনোহরে
প্রেম যেন মোর বরণ করে,
ক্ষুদ্র আশার স্বর্গ তাহার
দিক সে রসাতল॥

("গীতাঞ্জলি," ৮৯নং)

কবির প্রার্থনা

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি,
সে কি সহজ গান।

সেই সুরেতে জাগবো আমি
দাও মোরে সেই কান।

* * *

সে ঝড় যেন সই আনন্দে
চিত্তবীণার তারে
সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত
নাচাও যে ঝংকারে।
আরাম হতে ছিন্ন ক'রে
সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায়
শান্তি সুমহান॥

("গীতাঞ্জলি," ৭৪নং)

অথবা,

আমোঘ যে ডাক সেই ডাক দাও
আর দেরি কেন মিছে।
যা আছে বাঁধন বক্ষ জড়ায়ে
ছিঁড়ে প'ড়ে যাক পিছে।
গরজি গরজি শঙ্খ তোমার
বাজিয়া বাজিয়া উঠুক এবার,
গর্ব টুটিয়া নিদ্রা ছুটিয়া
জাগুক তীব্র চেতনা।

("গীতাঞ্জলি," ৭৭নং)

অথবা,

লাগে না গো কেবল যেন
কোমল করুণা,
মৃদু সুরের খেলায় এ প্রাণ
ব্যর্থ করো না।

জ্বলে উঠুক সকল হুতাশ,
গর্জি উঠুক সকল বাতাস,
জাগিয়ে দিয়ে সকল আকাশ
পূর্ণতা বিস্তারো ॥

("গীতাঞ্জলি," ৯০নং)

এই সবল সতেজ নিবেদন হইতেই হয়ত এই অনুভূতি কবিচিত্তে জাগিয়াছে যে আমাদের এই প্রতিদিনের ধূলামাটির সংসারে সকলের মাঝখানেই তাঁহার আসন। এই অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের কাছে কিছু নূতনও নয়। বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি ত তাঁহার নয়, সংসারের ধূলামাটি ছাড়িয়া ত তিনি সাধনার ধন লাভ করিতে চাহেন না! "গীতাঞ্জলি"তে তাঁহার নিবেদন,

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।
নয়কো বনে, নয় বিজনে,
নয়কো আমার আপন মনে,
সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়,
সেথায় আপন আমারো॥

("গীতাঞ্জলি," ৯৪নং)

অথবা,

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নিচে
সব-হারাদের মাঝে।

("গীতাঞ্জলি," ১০৭নং)

অথবা,

মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।

বিধাতার রুদ্ররোষে
দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান॥

("গীতাঞ্জলি," ১০৮নং)

অথবা,

ভজন পূজন সাধন আরাধনা
সমস্ত থাক্ পড়ে।
রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে
কেন আছিস্ ওরে ?
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে
কাহারে তুই পূজিস্ সঙ্গোপনে,
নয়ন মেলে দেখ্ দেখি তুই চেয়ে
দেবতা নাই ঘরে।

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ,—
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ
খাটছে বারো মাস।
রৌদ্র জলে আছেন সবার সাথে,
ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে।
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি
আয় রে ধূলার 'পরে।

("গীতাঞ্জলি," ১১৯নং)

কিন্তু বিরহের বেদনাবোধ, অথবা ভাগবত অস্তিত্বের অনুভূতিই ত সাধনার সবটুকু কথা নয়, শেষ কথা ত নয়ই। বোধ ও বুদ্ধির মধ্যে ভাগবত প্রতিষ্ঠা হয়ত হইয়াছে, কিন্তু জীবন জুড়িয়া যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার আসন প্রতিষ্ঠিত না হইল উচ্ছ্বসিত আনন্দে দেহচিত্তমন যতক্ষণ

পর্যন্ত নৃত্যময় হইয়া না উঠিল, সমগ্রজীবনের হাসিখেলার সঙ্গে তিনি নিত্যসঙ্গী হইয়া না রহিলেন, প্রিয় হইতেও প্রিয়তম হইয়া বক্ষলগ্ন হইয়া না রহিলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত শান্তি কোথায়, কোথায় তৃপ্তি, কোথায় আরাম, কোথায় আনন্দ? এই শান্তি, এই তৃপ্তি, এই আনন্দ, এই আরাম "গীতাঞ্জলি"তে নাই। "গীতাঞ্জলি" অসমাপ্ত সুরের, অসমাপ্ত সাধনার কাব্য। এ পর্যন্ত রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহ যাঁহারা অনুসরণ করিয়াছেন তাঁহারা স্বীকার করিবেন, কবিজীবনের এক একটি পর্যায় স্তরে স্তরে বিচিত্র ভাবরসের ভিতর দিয়া প্রত্যেক স্তরের বিচিত্র সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করিয়া' সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষিত করিয়া অবশেষে তাহার সহজ স্বাভাবিক পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে, এবং সমাপ্তির সীমায় পৌঁছিয়া পরমুহূর্তেই আবার সেই সীমাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া নূতন প্রবাহের সূচনা করিয়াছে। নিত্য নূতন করিয়া নূতন সৃষ্টির মধ্যে বিহারই রবীন্দ্র-কবিজীবনের ধর্ম, কিন্তু কোনও নূতন সৃষ্টিই ততক্ষণ তাঁহার মানসদৃষ্টির সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হয় নাই যতক্ষণ না পূর্বতন সৃষ্টির সমগ্র রস তিনি নিঃশেষে পান করিয়াছেন, যতক্ষণ না তিনি তাহার সমস্ত সম্ভাবনা পরিপূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। "কল্পনা-নৈবেদ্য-খেয়া" হইতে যে নবজীবনপ্রবাহের সূচনা হইয়াছিল, গীতা-ঞ্জলি"র সুরের মধ্যে তাহার সমস্ত সম্ভাবনা নিঃশেষে আত্মপ্রকাশ করে নাই, সে জীবন এখনও পূর্ণ পরিণতি লাভ করে নাই, একটা বিশেষ স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে মাত্র।

এই আত্মপ্রকাশ, এই পূর্ণ পরিণতি লাভ ঘটিল "গীতিমাল্য" ও "গীতালি"তে। এই দুইটি গ্রন্থের অধিকাংশ গানগুলির মুক্ত গতি, কোমল সৌন্দর্য, উদ্বেলিত আনন্দ, স্বচ্ছ সহজ আবেগ এব সুনিবিড় ঐক্যানুভূতি যে কোনও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারে না।

"গীতাঞ্জলি"তে যে ভক্ত কবি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধায় দেবতাকে চাহিয়াও ভয়ে ভয়ে দূরে দাঁড়াইয়াছিলেন, "গীতিমাল্য"-গ্রন্থে সেই ভক্ত কবি দেবতাকে বন্ধু মানিয়া তাঁহার দুই হাত ধরিলেন। কবে যে একদিন

ফুটলো কমল কিছুই জানি নাই
আমি ছিলেম অন্যমনে। (১৭নং)

কবে যে একদিন কোন্ শুভমুহূর্তে দেবতা আসিয়া তাঁহার অন্তরে আসন বিছাইয়া গিয়াছেন, তাহা কি কবি নিজেই জানেন? কিন্তু সোনার কাঠির ছোঁয়া লাগিয়া সব যে সোনা হইয়া গেল, দুঃখ, বেদনা, দহনজ্বালা সব যে এক মুহূর্তে জুড়াইয়া গেল, আনন্দে খুশিতে সমস্ত দেহচিত্তমন যে নাচিয়া উঠিল,—

আকাশ জুড়ে আজ লেগেছে
তোমার আমার মেলা
দূরে কাছে ছ'ড়িয়ে গেছে
তোমার আমার খেলা। (১৫নং)

অথবা,

সোনালি রূপালি সবুজে সুনীলে
সে এমন মায়া কেমনে গাঁথিলে
তারি সে আড়ালে চরণ বাড়ালে
ডুবালে সে সুধাসরসে। (২২নং)

অথবা,

মনে হলো আকাশ যেন
কইল কথা কানে কানে
মনে হলো সকল দেহ
পূর্ণ হলো গানে গানে।
হৃদয় যেন শিশিরনত
ফুটলো পূজার ফুলের মত,
জীবননদী কূল ছাপিয়ে
ছড়িয়ে গেল অসীমদেশে। (৩৫নং)

অথবা,

প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে
ভয়-ভাবনার বাধা টুটেছে
দুঃখকে আজ কঠিন ব'লে
জড়িয়ে ধরতে বুকের তলে
উধাও হয়ে হৃদয় ছুটেছে। (৩৬নং)

অথবা,

তোমারি নাম বলবো নানা ছলে
বলবো একা ব'সে, আপন
মনের ছায়াতলে
* * *
বিনা-প্রয়োজনের ডাকে
ডাক্‌বো তোমার নাম
সেই ডাকে মোর শুধু শুধুই
পূরবে মনস্কাম। (৩২নং)

অথবা,

বাজাও আমারে বাজাও।
বাজালে যে সুরে প্রভাত-আলোরে
সেই সুরে মোরে বাজাও।
যে সুর ভরিলে ভাষাভোলা-গীতে
শিশুর নবীন জীবন-বাঁশিতে
জননীর মুখ-তাকানো হাসিতে—
সেই সুরে মোরে বাজাও। (৩৯নং)

অথবা,

তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
আলোয় আকাশ ভরা।

তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
ফুলশ্যামল ধরা ॥

*　　*　　*

তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
যুগে যুগে বিশ্বভুবন তলে
পরান আমার বধুর বেশে চলে
চিরস্বয়ম্বরা ॥　　　　(৫২নং)

কিন্তু আর দৃষ্টান্ত উল্লেখের কি-ই বা প্রয়োজন আছে? "গীতিমাল্য"-গ্রন্থের প্রায় সকল গান ও কবিতায়ই এই তৃপ্তির, এই আনন্দের সুর সহজেই ধরা পড়ে। সহসা এই তৃপ্তি, এই আনন্দ আসিল কোথা হইতে? ১৩১৬ বঙ্গাব্দের শেষাশেষি কবি য়ুরোপ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় যাত্রা স্থগিত রাখিতে হইল, কবি চলিয়া গেলেন শিলাইদহ। সেখানে অসুস্থতার মধ্যে কতকগুলি গান ও কবিতা রচনা করিলেন (৪নং-২১নং); বাহিরের কাজকর্ম চঞ্চলতা সমস্তই তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে,—

কোলাহল ত বারণ হলো
এবার কথা কানে কানে।
এখন হবে প্রাণের আলাপ
কেবলমাত্র গানে গানে।　　　(৮নং)

গানে গানে প্রাণের আলাপ যখন শুরু হইল তখন ধীরে ধীরে যে ছিল অজানা তাঁহাকে অত্যন্ত প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহাকে অত্যন্ত নিকটে পাইলেন,—

নামহারা এই নদীর পারে
ছিলে তুমি বনের ধারে
বলেনি কেউ আমাকে।

জানি যেন সকল জানি,
ছুঁতে পারি বসনখানি
একটুকু হাত বাড়ালে ॥ (৯নং)

মনে হইল,

অপূর্ব তার চোখের চাওয়া,
অপূর্ব তার গায়ের হাওয়া,
অপূর্ব তার আসা-যাওয়া গোপনে ॥ (১১নং)

ধীরে ধীরে কবি তাঁহাকে পাইলেন; উপলব্ধির শান্তি ও তৃপ্তি লাভ ত ঘটিল, কিন্তু এই তৃপ্তি, এই শান্তির মধ্যেও কবি অতৃপ্তির চিরগতি প্রার্থনা করিলেন, বেদনার আঘাত প্রার্থনা করিলেন,

প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে
মোরে আরো আরো—আরো দাও প্রাণ।

* * *

আরো বেদনা আরো বেদনা
দাও মোরে আরো চেতনা।
দ্বার ছুটায়ে বাধা টুটায়ে
মোরে করো ত্রাণ মোরে করো ত্রাণ। (২৮নং)

"গীতিমাল্য" গ্রন্থের শান্তি ও তৃপ্তির মধ্যে এই বেদনাময় চৈতন্যের প্রার্থনা থাকিয়া থাকিয়া উঁকি মারিতেছে।

২৮নং হইতে ৪১নং পর্যন্ত গানগুলি ইংলণ্ড যাইবার পথে, ইংলণ্ডে, এবং ইংলণ্ড হইতে ফিরিবার পথে রচিত,। বাকি গানগুলি প্রায়ই শান্তিনিকেতন অথবা রামগড়ে রচিত, সর্বশেষেরটি কলিকাতায়। "গীতিমাল্য"-গ্রন্থের গানগুলি সম্বন্ধে অজিতবাবু বলিতেছেন,

"কবির সৌন্দর্যসাধনা যেমন কড়ি ও কোমল ও চিত্রাঙ্গদার ভোগপ্রদীপ্ত বর্ণ-উজ্জ্বলতায় প্রথম সূচনা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে সোনার-তরী-চিত্রার 'মানস-সুন্দরী,' 'উর্বশী' প্রভৃতি কবিতার বর্ণ-প্রাচুর্যে ও বিলাসে বিচিত্র হইয়া অবশেষে কণিকার বর্ণ-বিরল

ভোগবিরহিত সুগভীর স্বচ্ছতায় পরিণতি লাভ করিয়াছিল, সেইরূপ নৈবেদ্য, খেয়া. গীতাঞ্জলির ভিতর দিয়া ক্রমশ কবির অধ্যাত্ম-সাধনা এই গীতিমাল্যে বিচিত্রিতা হইতে ঐক্যে, বেদনা হইতে মাধুর্যে, বোধ-প্রার্থনা হইতে সরল উপলব্ধিতে পরিণত হইয়াছে।"

("কাব্য পরিক্রমা, ১৬৫ পৃঃ)

সত্যই "গীতিমাল্যে"র গানগুলির মধ্যে কোনও তত্ত্বকথা নাই, কোনও সাধনার কথা নাই, ইহারা স্বচ্ছ, ভারমুক্ত, সহজ আনন্দময়।

আমার মুখের কথা তোমার
নাম দিয়ে দাও ধুয়ে,
আমার নীরবতায় তোমার
নামটি রাখ থুয়ে। (৪৪নং)

অথবা,

আমার সকল কাঁটা ধন্য করে
ফুটবে গো ফুল ফুটবে।
আমার সকল ব্যথা রঙিন হয়ে
গোলাপ হয়ে উঠবে। (৪৯নং)

অথবা,

শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে পড়ুক ঝরে
তোমারই সুরটি আমার মুখের পরে, বুকের পরে।

* * *

নিশিদিন এই জীবনের তৃষার 'পরে ভুখের 'পরে। (৬৮নং;

অথবা,

তোমার আনন্দ ঐ এল দ্বারে
এল এল এল গো। (ওগো পুরবাসী)
বুকের আঁচলখানি ধূলায় পেতে
আঙিনাতে মেলো গো। (৯৮নং)

এই সব গানে তত্ত্বকথা, সাধনার কথা কোথায়? উপলব্ধি এত গভীর,

এত পরিপূর্ণ, এত সরল যে ইহার মধ্যে বসিয়াই স্থির সার্থক তৃপ্তিতে ও শান্তিতে বলিতে পারা যায়—

মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দরবেশে এসেছো
তোমায় করি গো নমস্কার।
মোর অন্ধকারের অন্তরে তুমি হেসেছো
তোমায় করি গো নমস্কার।

*　　*　　*

এই কর্ম-অন্তে নিভৃত পান্থশালাতে
তোমায় করি গো নমস্কার।
এই গন্ধ-গহন সন্ধ্যা-কুসুম-মালাতে
তোমায় করি গো নমস্কার। (১১১নং)

"গীতালি"র সব কয়টি গানই (১০৮) ১৩২১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ হইতে ৩রা কার্তিকের মধ্যে রচিত। এই গ্রন্থের সব গানেই একটা শান্তি ও সার্থকতার সুর ধ্বনিত ; দেবতার সঙ্গে বিচিত্র লীলা, বিচিত্র গভীর রহস্য নিসর্গ সৌন্দর্যদ্বারা মণ্ডিত। সাধনার বেদনা ও দুঃখের কথা কবি আজ একেবারে ভুলিতে চাহিতেছেন,

যখন তুমি বাঁধছিলে তার
সে যে বিষম ব্যথা ;
আজ বাজাও বীণা, ভুলাও ভুলাও
সকল দুখের কথা। (১৭নং)

প্রেম এত নিবিড় যে কবি আর যেন সহ্য করিতে পারেন না,—

আমি যে আর সইতে পারিনে
সুর বাজে মনের মাঝে গো
কথা দিয়ে কইতে পারিনে। (১১নং)

অথবা,

বক্ষ আমার এমন করে
বিদীর্ণ যে করো
উৎস যদি না বাহিরায়
হবে কেমনতরো ? (৩২নং)

রহস্য-লীলার আভাসও আছে অনেক গানে—

পুষ্প দিয়ে মারো যারে
চিন্‌ল না সে মরণকে
বাণ খেয়ে যে পড়ে, সে যে
ধরে তোমার চরণকে। (৭৩নং)

অথবা,

কোন্ সাহসে একেবারে
শিকল খুলে দিলি দ্বারে,
জোড় হাতে তুই ডাকিস্ কারে
প্রলয় যে তোর ঘরে ঢোকে। (১০নং)

কবির 'হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে' তাঁহার -প্রিয়তম নিদ্রিত, তাঁহাকে তিনি প্রণয়ের আকর্ষণে আহ্বান করিতেছেন জাগিবার জন্য। কিন্তু সে আহ্বানে কোনও শঙ্কা নাই ; কোনও বেদনা নাই সেই সুরে ; পরিপূর্ণ প্রেম ও বিশ্বাসে নিবিড় সেই আহ্বান।

মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে
একেলা রয়েছ নীরব শয়ন 'পরে—
প্রিয়তম হে জাগো জাগো জাগো।
রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে দাঁড়ায়ে আমি
আর কতকাল এমনে কাটিবে স্বামী—
প্রিয়তম হে জাগো জাগো জাগো।

* * *

মিলাবো নয়ন তব নয়নের সাথে,
মিলাবো এ-হাত তব দক্ষিণ হাতে
প্রিয়তম হে জাগো জাগো জাগো।
হৃদয়পাত্র সুধায় পূর্ণ হবে,
তিমির কাঁপিবে গভীর আলোর রবে—
প্রিয়তম হে জাগো, জাগো জাগো। (৫০নং)

প্রেম যেখানে এত নিবিড় সেইখানেই পরম বিশ্বাসে, সবল গর্বে বলা চলে,—

ভেঙেছে দুয়ার, এসেছো জ্যোতির্ময়,
তোমারি হউক জয়।
তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়!

* * *

প্রভাতসূর্য, এসেছ রুদ্র সাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে,
অরুণবহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে
মৃত্যুর হোক্ লয়।
তোমারি হউক জয়। (১০১নং)

অথবা,

আজ ত আমি ভয় করিনে আর
লীলা যদি ফুরায় হেথাকার।
নূতন আলোয় নূতন অন্ধকারে
লও যদি বা নূতন সিন্ধু পারে
তবু তুমি সেইত আমার তুমি,
আবার তোমায় চিনব নূতন করে। (৯৭নং)

ভাগবত উপলব্ধি ত এইবার পরিপূর্ণতা লাভ করিল, সাধনা

পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিল; এইবার সকৃতজ্ঞ অঞ্জলি নিবেদনের পালা,—

এই তীর্থ-দেবতার ধরণীর মন্দির প্রাঙ্গণে
যে পূজার পুষ্পাঞ্জলি সাজাইনু সযত্ন চয়নে
সায়াহ্নের শেষ আয়োজন; যে পূর্ণ প্রণামখানি
মোর সারাজীবনের অন্তরের অনির্বাণ বাণী
জ্বালায়ে রাখিয়া গেনু আরতির সন্ধ্যাদীপ মুখে,
সে আমার নিবেদন তোমাদের সবার সম্মুখে।
হে মোর অতিথি যত তোমরা এসেছ এ জীবনে
কেহ প্রাতে, কেহ রাতে, বসন্তে, শ্রাবণ-বরিষণে;
কারো হাতে বীণা ছিল, কেহ বা কম্পিত দীপশিখা
এনেছিলে মোর ঘরে; দ্বার খুলে দুরন্ত ঝটিকা
বার বার এনেছ প্রাঙ্গণে। যখন গিয়েছ চ'লে
দেবতার পদচিহ্ন রেখে গেছ মোর গৃহতলে।
আমার দেবতা নিল তোমাদের সকলের নাম;
রহিল পূজায় মোর তোমাদের সবারে প্রণাম (১০৮নং)

জীবন ত এইখানে পৌছিয়া একটা পরিপূর্ণতা লাভ করিল; কৈশোরের চঞ্চলতা, যৌবন উন্মেষের অনিশ্চিত বিরহ উন্মাদনা যৌবন-মধ্যাহ্নের তীব্র প্রেম ও সৌন্দর্যানুভূতি এবং ভোগ ও বিলাস-প্রাচুর্য, যৌবন-সায়াহ্নের ভোগ-বিরতি, তারপর পরিণত জীবনের অধ্যাত্ম-আকূতি, অধ্যাত্ম-সাধনা এবং সর্বশেষে ভাগবত উপলব্ধি—এই ত সাধারণ মানুষের জীবনপর্যায়। কবি ত ইহাদের প্রত্যেকটিই পরিপূর্ণ করিয়া নিঃশেষ করিয়া পাইলেন, জীবনের সমস্ত সুধা আহরণ করিলেন। পথের শেষ তো পাইলেন, আর কি বাকি রহিল?

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কি পথের শেষ চাহিয়াছিলেন? তিনি ত চিরচঞ্চল, চির-পথিক; এই পথের শেষ কি তাঁহাকে তৃপ্তি দিতে

পারিল? "গীতিমাল্যে"র শান্তি ও তৃপ্তির মধ্যেও যে তিনি অতৃপ্তির চিরগতি প্রার্থনা করিয়াছেন, তিনি যে চাহিয়াছেন, 'আরও আরও আরও আলো, আরও আরও আরও প্রাণ' তাঁহার যাত্রা যে অশেষের সন্ধানে, অসীমের পানে; এই সীমা কি তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে? কবি-কণ্ঠের গান "গীতিমাল্যে" বলিতেছে, 'পথ আমারে পথ দেখাবে, এই জেনেছি সার', কবি যে বলিতেছেন, 'আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না'। "গীতালি"তে চিরপথিকের কাছে সম্মুখ পথের আহ্বান যেন আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল, পথ ত এইখানেই ফুরাইয়া যায় নাই, সীমা যেন অসীমের দিকে ডাকিতেছে,—

আমি পথিক, পথ আমারি সাথী।

* * *

যত আশা পথের আশা,
পথে যেতেই ভালোবাসা,
পথে চলার নিত্যরসে
দিনে দিনে জীবন ওঠে মাতি। (৮৩নং)

অথবা,

পথে পথেই বাসা বাঁধি,
মনে ভাবি পথ ফুরালো।

* * * *

কখন দেখি আঁধার ছুটে
স্বপ্ন আবার যায় যে টুটে,
পূর্বদিকের তোরণ খুলে
নাম ডেকে যায় প্রভাত আলো। (৯৪নং)

অথবা,

পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে,
পথে চলাই সেই তো তোমার পাওয়া! (৯৫ নং)

অথবা,

জীবন-রথের হে সারথি,
আমি নিত্য পথের পথী,
পথে চলার লহ নমস্কার। (১৮ নং)

আরও তিনি জানিয়াছেন, অথবা পুরাতন জানাকেই নূতন করিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন,—

পথের ধূলায় বক্ষ পেতে রয়েছে যেই গেহ
সেই তো তোমার গেহ।
* * * *
বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি
সেই তো স্বর্গভূমি।
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি
সেই তো আমার তুমি। (১৯নং)

এই উপলব্ধি যখন জাগিল তখন পুরাতন ধূলিময় স্বর্গভূমি, সুখদুঃখ-ময় ধরণীর প্রতি বহু পুরাতন প্রেম নূতন করিয়া জাগিল, পুরাতন পথ নূতন হইয়া চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল, সীমারেখা অস্পষ্ট হইয়া অসীমের দিকে ছড়াইয়া গেল। অধ্যাত্ম-অভিজ্ঞতার পরিণতির সুউচ্চ শিখরে দাঁড়াইয়া চিরপরিচিত ধরণীর দিকে তাকাইয়া এই গান কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হইল,—

আবার যদি ইচ্ছা করো
আবার আসি ফিরে
দুঃখ-সুখের ঢেউ-খেলানো
এই সাগরের তীরে।
আবার জলে ভাসাই ভেলা,
ধূলার পরে করি খেলা,
হাসির মায়ামৃগীর পিছে
ভাসি নয়ন নীরে।

কাঁটার পথে আঁধার রাতে
আবার যাত্রা করি ;
আঘাত খেয়ে বাঁচি, কিংবা
আঘাত খেয়ে মরি।
আবার তুমি ছদ্মবেশে
আমার সাথে খেলাও হেসে,
নূতন প্রেমে ভালোবাসি
আবার ধরণীরে। (৮৬ নং)

জীবনদেবতা তাহাই ইচ্ছা করিলেন।

(৮)

বলাকা (১৩২১—২৩)
পলাতকা (১৩২৫)
শিশু ভোলানাথ (১৩২৮)

"গীতিমাল্য" গাঁথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক নূতন কাব্যসৃষ্টির সূত্রপাত হইল, সেটি "বলাকা"। ১৩২১ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসের মধ্যে "গীতিমাল্য" গাঁথা সমাপ্ত হইল ; "গীতালি"র সবগুলি গান ও কবিতা আষাঢ় হইতে কার্তিক মাসের মধ্যে রচিত। এই কয়মাস কেবল অফুরন্ত গানের ফোয়ারা, সঙ্গে সঙ্গে "বলাকা"র আরম্ভ। "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"র কবি রবীন্দ্রনাথ কি করিয়া যে হঠাৎ "বলাকা"র জন্মলাভ করিলেন তাহা বাস্তবিকই এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

মানুষ সারাজীবন সুখ দুঃখ, মিলন বিরহ, আশা ও নৈরাশ্যের ভিতর দিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়া যখন কিছুর মধ্যেই চরমশান্তি লাভ করিতে পারে না, তখন সে ভগবানকে একমাত্র আশ্রয় জানিয়া

তাঁহাতেই আত্মসমর্পণ করে, এবং তাঁহার সহিত মিলনের আনন্দ ছাড়া আর কোনও কিছুরই অপেক্ষা বা আকাঙ্ক্ষা রাখে না। ইহাই সাধারণ মানুষের কথা, কবি-জীবনেও প্রায় তাহাই ঘটিয়া থাকে। দেশের কবিদের কথা ছাড়িয়া দিয়াও বিদেশের কবি, যাঁহারা মানব জীবনের বিচিত্র পর্যায়ের সূক্ষ্ম রস ও অনুভূতির মধ্যে জীবন যাপন করিয়াছেন এমন কবিদের মধ্যে—যথা ব্রাউনিং, ফ্রান্‌সিস্ টম্পসন্, ওয়াল্‌ট্ হুইটম্যান—দেখা গিয়াছে তাঁহারা নানা বৈচিত্র্যময় রসানুভূতিকে সর্বশেষ অধ্যায়ে অধ্যাত্ম রসানুভূতিতে ডুবাইয়া দিবার মানবচিত্তের যে একটা স্বাভাবিক গতি আছে, তাহারই সুস্পষ্ট আভাস প্রদান করিয়াছেন। আমরাও হয়ত ভাবিয়াছিলাম, "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"র বিচিত্র রসবোধ বিলীন করিয়া দিয়া অনন্যশরণ ভগবানের চরণে আত্মনিবেদনই বুঝি রবীন্দ্র-কবিচিত্তের শেষ আশ্রয় হইল। তাহা হইলে মানব-মনের যাহা পরিণতি তাহাই হইত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তাহা হইল না। কেন হইল না, তাহার আভাস পূর্বেই দিয়াছি, এবং রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহের সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহাদের কাছে সে কারণ অবিদিত নয়। রবীন্দ্রনাথ চিরচঞ্চল, তাঁহার চিরপথিক কবি-চিত্ত কোনও নির্দিষ্ট ভাবক্ষেত্র হইতে অধিকদিন রস আহরণ করিয়া নিজেকে সতেজ রাখিতে পারে না, কেবল অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে নূতন নূতন রসাস্বাদ করিবার আকুল প্রেরণা তাঁহাকে পাগল করিয়া তোলে। অধ্যাত্ম রসবোধ ও অধ্যাত্ম উপলব্ধির একটা স্বচ্ছ, সহজ ইন্দ্রিয়াতীত আনন্দ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সেই স্থির শান্ত গতিবিহীন আনন্দক্ষেত্র তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। "গীতিমাল্যে"র শেষের দিকে এবং "গীতালি"তে আধ্যাত্মিক রসানু-ভূতিকেও ছাড়াইয়া মাঝে মাঝে স্বপ্রকাশ হইয়া উঠিয়াছে নিসর্গ সৌন্দর্য-প্রেরণা ; "গীতালি"র শেষের দিকে ত আমরা স্পষ্টই দেখিয়াছি, পথের

আহ্বান আবার তাঁহার কানে আসিয়া পৌছিয়াছে! এই সময়েই অন্য দিকে "বলাকা"য় নূতন করিয়া ফিরিয়া-পাওয়া নিসর্গ-সৌন্দর্য বোধ এবং পুরাতন ধরণীর প্রতি মমত্ববোধের সঙ্গে সঙ্গে কবিজীবনকে যৌবনের উৎসবে ধীরে ধীরে পুনরাহ্বান করিবার চেষ্টাও দেখা দিয়াছে। আমার মনে হয় তাহার একটা কারণ ছিল; অবান্তর হইলেও সে কথা এখানে বলা প্রয়োজন মনে করি।

একথা বোধ হয় কবির অজ্ঞাত ছিল না যে, আমাদের এই জড়তার দেশে কিংবা পশ্চিমের কর্মচঞ্চলতার দেশে সর্বত্রই জীবনের শেষ অবস্থায় যে পরমব্রহ্মে আত্মসমর্পণ করিবার মানবচিত্তের একটা স্বাভাবিক পরিণতি লক্ষ্য করা যায় তাহার মধ্যে খানিকটা দুর্ব্বলতা, অসহায়তা এবং নির্ভরতার একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে এবং যৌবনের তেজোময় স্বাধীনতা ও অকারণে উচ্ছুসিত আনন্দবেগকে অস্বীকার করিবার একটা চেষ্টা আছে। ভাল হউক, মন্দ হউক, আমার বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ ইহার সবখানি স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই, এবং বোধ হয় সেইজন্যই "গীতিমাল্য" ও "গীতালি"র অনেক গানেই তিনি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের ভাবকে বিসর্জন দিয়া নিজের স্বাধীন সত্তাকে ভগবানের সঙ্গে একাসনে স্থান দিবার আভাস দান করিয়াছেন। দেবতার নিকট হইতে যে তিনি আঘাত ও বেদনা প্রার্থনা করিয়াছেন, এবং দেবতার রুদ্র রূপও যে তাঁহার কাছে সমান প্রিয়, তাহার মধ্যেও বোধ হয় এই মনোভাবের পরিচয় আছে। আমার বিশ্বাস, মনের এই ভাবপন্থাই পরে "বলাকা"য় তাঁহাকে যৌবনের জয়গানে এবং গতিবেগের প্রশস্তিতে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। এই সময় য়ুরোপের ক্ষমতা-মদ-মত্ত যৌবন যে প্রাণের তাণ্ডব-নৃত্যে মাতিয়াছিল তাহার প্রতি কবির আন্তরিক অশ্রদ্ধা থাকিলেও যৌবনের সেই অদ্ভুত চাঞ্চল্য ও সংঘাত যে কবিচিত্তকে একটুও দোলা দেয় নাই এবং "বলাক"য় তাহার

ছায়াপাত হয় নাই, একথাই বা কে বলিবে? যেমন করিয়াই হউক, "বলাকা"র রবীন্দ্রনাথ "গীতাঞ্জলি-গীতালি"র রবীন্দ্রনাথ হইতে পৃথক— শুধু ভাবৈশ্বর্যে পৃথক নহেন, কলাকৌশলেও পৃথক। "বলাকা"র ছন্দ যেন যৌবনের ছন্দ, দৃপ্তবেগে কলনৃত্যে ছুটিয়া চলিয়াছে, যেন ভাদ্রের ভরা জোয়ারের বিরাট নদী। আর যৌবন যে ফিরিয়া আসিল তাহ' ত কবি নিজেই স্বীকার করিলেন,—

বহু দিনকার
ভুলে-যাওয়া যৌবন আমার
সহসা কী মনে ক'রে
পত্র তার পাঠায়েছে মোরে
উচ্ছৃঙ্খল বসন্তের হাতে
অকস্মাৎ সংগীতের ইঙ্গিতের সাথে।

(১৩ নং)

কিন্তু একটা কথা এইখানেই বলিয়া রাখা প্রয়োজন। মানুষের গভীরতর জীবনের, অধ্যাত্ম-জীবনের অন্তর ও বাহিরের অনেক অমর-তত্ত্ব, সৃষ্টিনিহিত অনেক সুগভীর রহস্য কবিচিত্তের সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহা ছাড়া কবি ক্রমশ স্বদেশ ও স্বসমাজের গণ্ডির ভিতর হইতে বিশ্বজীবনের বিচিত্র কর্ম ও চিন্তার রাজ্যের মধ্যে ধীরে ধীরে পদচারণা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই বৃহত্তর জীবনের নাড়িস্পন্দনের সঙ্গে তাঁহার যোগ ক্রমশ নিকটতর ও গভীরতর হইতে-ছিল এবং তাহার ফলে বিচিত্র গভীর চিন্তাও তাঁহার মনকে আলোড়িত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। "বলাকা"র প্রায় সকল কবিতাতেই প্রেম, যৌবন, সৌন্দর্য অথবা জীবনগতিবেগের জয়গানের অদ্ভুত প্রকাশ-ভঙ্গির আড়ালে সেই সকল তত্ত্ব ও সত্য, চিন্তা ও কল্পনা অতি নিপুণভাবে আপন অস্তিত্ব জানাইতেছে। মাঝে তত্ত্বপ্রচারের চেষ্টাও আছে, একথা বলিলে অন্যায় বলা হইবে কি? লক্ষণীয় বিষয়

তাই "বলাকা"র কবিতাগুলিতে খুব উঁচু দরের একটা intellectual appeal যাহা মানুষের চিন্তার প্রসব-স্থানটিকে নাড়া না দিয়া পারে না।

১৩২৩ বঙ্গাব্দের মধ্যেই প্রায় "বলাকা"র সব রচনা শেষ হইয়া গেল। "পলাতকা"র সবগুলি কবিতা ১৩২৫ বঙ্গাব্দে লেখা। রবীন্দ্রনাথ যদি আজও "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"র জীবনে বাস করিতেন তাহা হইলে তাঁহার হাত হইতে এ সময় "পলাতকা" সৃষ্টি সম্ভব হইত না। সকল হাসিকান্না, সুখ-দুঃখ তিনি আপনার সঙ্গে সঙ্গে ত দেবতার চরণেই উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন; অধ্যাত্মানুভূতির মধ্যেই ত সকল অনুভূতি বিলীন হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু "পলাতকা"য় দেখিতেছি মানব জীবনের সুখ-দুঃখ অতি তুচ্ছ ঘরকন্নার ইতিহাস আবার তাঁহাকে নূতন করিয়া দোলা দিতে আরম্ভ করিল; সেগুলিকে তিনি সকল সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, মিলন-বিরহের যিনি কাণ্ডারী তাঁহার চরণে নিবেদন করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তাই দেখিতে পাইতেছি শৈল'র শিশুহাতের কয়টি আঁচড় কবির বুকেও চিরদিনের জন্য দাগা দিয়া গেল; আর, রেল-ইস্‌টিশনের কুলিমেয়ে রুক্‌মিনীকে ফাঁকি দিয়া বঞ্চিত করিবার দুঃখ কি শুধু বিনুর স্বামীর বুকেই চিরস্থায়ী হইয়া রহিল, কবির চিত্তও সেইজন্য ভারাক্রান্ত হইয়া রহিল না? মনে হয় "পলাতকা"র কবিতাগুলিতে শুধু নানা ভাবে, নানা ছলে, গল্প-কথায় মানবচিত্তের নানা খুঁটিনাটির ভিতর, সংসারের বিচিত্র মাধুর্যরস-পূর্ণ জীবনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ার চেষ্টাই প্রকাশ পাইয়াছে। তাহা না হইলে এর পরই "শিশু ভোলানাথ"-গ্রন্থে শিশুজীবনের আনন্দ-লোকের রহস্য-উদ্‌ঘাটনের মধ্যে কবি নিজে যে আনন্দলাভ করিলেন, এবং সেই জীবনের মধ্যে যে আনন্দ-উৎসের সন্ধান সকলকে জানাইলেন তাহা সম্ভব হইত কি?

কিন্তু আমার বক্তব্য ইহা নয় যে, অধ্যাত্ম-জীবনে অতৃপ্ত হইয়া রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত অন্যদিকে গতি ফিরাইয়াছিল। আমি শুধু বলিতে চাই, জীবনের বিচিত্র রসানুভূতিকে কবি যে স্বাভাবিক গতিতে অধ্যাত্ম-রসবোধের মধ্যে বিলীন করিয়া দিয়াছিলেন, সেই সর্বজনানু-মোদিত সর্বশেষ আশ্রয় তাঁহার কবিচিত্তকে অধিক দিন অমৃতরস জোগাইতে পারিল না। তাই, তিনি যে জীবনের মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন তাহাতে এই দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের বিচিত্র রসানুভূতিই বড় হইয়া দেখা দিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহাতে গভীরতর জীবনের রসবোধ অতি বিপুলভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিল, এবং সকল রসের মধ্যেই অতি দূরের ইন্দ্রিয়াতীত জগতের একটি ক্ষীণ অথচ গভীর গম্ভীর ধ্বনি অনুরণিত হইতে লাগিল।

১৩২১ বঙ্গাব্দের বৈশাখে "সবুজপত্র" মাসিক সাহিত্য-পত্রিকার সূচনা রবীন্দ্র-জীবনে এক নূতন জোয়ার আনিল। "বঙ্গদর্শন" ও "সাধনা"র যুগে যেমন করিয়া কবিজীবনে বান ডাকিয়াছিল, কাব্যে, গল্পে প্রবন্ধে, বক্তৃতায় জীবনের প্রতিমুহূর্ত ভরিয়া উঠিয়াছিল, তেমনই "সবুজ-পত্র" উপলক্ষ করিয়া আবার কাব্য গল্প, প্রবন্ধের বান ডাকিল। একদিকে"বলাকা"র কবিতা রচনা; যেখানে যখন আছেন তখনই এক একটি করিয়া কবিতা রচনা করিয়া চলিতেছেন, এবং "সবুজ-পত্রে" তাহা প্রকাশিত হইতেছে; অন্যদিকে প্রবন্ধ, গল্প, গান, উপন্যাস রচনা, ধর্ম-সমাজ-সাহিত্যালোচনায় বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে বাদ প্রতিবাদ। * 'হালদার গোষ্ঠী,' 'হৈমন্তী,' 'বোষ্টমী,' 'স্ত্রীর পত্র,' 'ভাইফোঁটা,' 'শেষের রাত্রি,' প্রভৃতি সুবিখ্যাত গল্প এই সময়কার রচনা, "চতুরঙ্গ" উপন্যাসও এই সময়ের রচনা, এবং ইহার কিছুদিনের পরেই (বৈশাখ, ১৩২২) "ঘরে বাইরে" উপন্যাসের সূচনা। "ফাল্গুনী" নাটকের সৃষ্টিও

* প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, "রবীন্দ্র জীবনী," ২য় খণ্ড, ৫৬—৬২ পৃঃ।

এই সময়ে। 'বিবেচনা ও অবিবেচনা,' 'বাস্তব,' 'লোকহিত,' 'আমার জগৎ' 'মা মা হিংসী,' 'কর্মযজ্ঞ,' 'পল্লীর উন্নতি,' 'শিক্ষার বাহন,' 'ছাত্র শাসনতন্ত্র,' প্রভৃতি সুপরিচিত প্রবন্ধ এবং বক্তৃতাও এই সময়কার রচনা। তাহা ছাড়া অনুবাদ, সভা-সমিতিতে বক্তৃতা, নানা আলোচনা, বিতর্ক, নাট্যাভিনয়, অধ্যাপনা ইত্যাদি ত চলিতেছেই।

১৩২১ বঙ্গাব্দের বৈশাখে "সবুজ পত্র" বাহির হইল; ভূমিকায় সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী মহাশয় লিখিলেন—

"আমাদের বাংলা সাহিত্যের ভোরের পাখিরা যদি আমাদের প্রতিষ্ঠিত সবুজ-পত্রমণ্ডিত নব শাখার উপর অবতীর্ণ হন, তাহলে আমরা বাঙালী জাতির সবচেয়ে বড় অভাব তা কতকটা দূর করতে পারব। আমরা যে আমাদের সে-অভাব সম্যক উপলব্ধি করতে পারিনি তার প্রমাণ এই যে আমরা নিত্য লেখায় ও বক্তৃতায় দৈন্যকে ঐশ্বর্য ব'লে, জড়তাকে সাত্ত্বিকতা ব'লে, আলস্যকে ঔদাস্য ব'লে, শ্মশান-বৈরাগ্যকে ভূমানন্দ ব'লে, উপবাসকে উৎসব ব'লে, নিষ্কর্মাকে নিষ্ক্রিয় ব'লে প্রমাণ করতে চাই। এর কারণও স্পষ্ট। ছল দুর্বলের বল। যে দুর্বল সে অপরকে প্রতারিত করে আত্ম-প্রসাদের জন্য। আত্মপ্রবঞ্চনার মত আত্মঘাতী জিনিস আর নেই। সাহিত্য জাতির খোরপোশের ব্যবস্থা করে দিতে পারে না, কিন্তু আত্মহত্যা থেকে রক্ষা করতে পারে। বাঙালীর মন যাতে বেশি ঘুমিয়ে না পড়ে, তার চেষ্টা আমাদের আয়ত্তাধীন। মানুষকে ঝাঁকিয়ে দেবার ক্ষমতা অল্পবিস্তর সকলের হাতেই আছে।"

ভাষা প্রমথবাবুর সন্দেহ নাই, কিন্তু ভাব যেন রবীন্দ্রনাথেরই; এ ধরনের কথা ত আমরা কবির মুখে বার বার শুনিয়াছি। যাহাই হউক "সবুজ পত্রে"র যাত্রা শুরু হইল 'বলাকা"র প্রথম কবিতা "সবুজের অভিযান" ললাটে আঁকিয়া। সুদীর্ঘ ভাগবতা সাধনা ও তপশ্চর্যার শান্ত সমাহিত শক্তি ও আনন্দে দেহচিত্তমন যখন পরিপূর্ণ তখন কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হইল যৌবনের আহ্বান, যে-যৌবন অবুঝ, জীবন্ত, অশান্ত, যে-যৌবন প্রচণ্ড, প্রমুক্ত, যে-যৌবন অমর। কবিতা হিসাবে এই কবিতাটি অথবা প্রায় দুই বৎসর পরে লেখা 'যৌবনরে, তুই কি র'বি সুখের

খাঁচাতে' (৪৫), ইহার কোনটিই খুব উল্লেখযোগ্য নয়; কিন্তু যে ভাব-ইঙ্গিত এই কবিতা দুইটির মধ্যে মুক্তি লাভ করিয়াছে, রবীন্দ্র-কবিজীবন এবং কাব্য-প্রবাহের দিক হইতে তাহার একটা বিশেষ মূল্য আছে।

সকল রবীন্দ্র-পাঠকই জানেন, কবি চিরকাল প্রেম, যৌবন ও সৌন্দর্যের পূজারী, কিন্তু পূর্বজীবনে যে-যৌবনের পূজা তিনি করিয়াছেন সে-যৌবন প্রধানত এবং প্রথমত বাসনানুরাগী; সে-যৌবনের পরিচয় আমরা পাই "কড়ি ও কোমল" হইতে আরম্ভ করিয়া "চিত্রা" পর্যন্ত। সে যৌবন-বসন্ত আসিয়াছিল তাহার সঙ্গে লইয়া

> * * * কত কোলাহল
> লয়ে দলবল
> আমার প্রাঙ্গণ তলে কলহাস্য তুলে
> দাড়িম্বে পলাশগুচ্ছে কাঞ্চনে পারুলে;
> নবীন পল্লবে বনে বনে
> বিহ্বল করিয়াছিল নীলাম্বর রক্তিম চুম্বনে। (২৫নং)

তাহার মধ্যে ছিল সুতীব্র মোহ, ছিল রক্তিম বিহ্বলতা। তাহার পর এক যুগ কাটিয়া গিয়াছে। "নৈবেদ্য-খেয়া-গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"র সুদীর্ঘ সাধনার স্তর তিনি অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন, এবং এই সাধনায় তিনি লাভ করিয়াছেন শক্তি, লাভ করিয়াছেন রুদ্রের প্রসাদ। তাই, সেই যৌবন-বসন্ত,

> সে আজ নিঃশব্দে আসে আমার নির্জনে;
> অনিমেষে
> নিস্তব্ধ বসিয়া থাকে নিভৃত ঘরের প্রান্তদেশে
> চাহি সেই দিগন্তের পানে
> শ্যামশ্রী মূর্ছিত হবে নীলিমায় মরিছে যেখানে। (২৫নং)

গীতিমাল্য" অথবা "গীতালি"তে যে তৃপ্তি ও শান্তি তিনি লাভ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যেও কবি হয়ত দেখিয়াছিলেন, অনুভব

করিয়াছিলেন, একটা স্তব্ধ শান্তি বিলাস, তৃপ্তির মোহ, যাহা হয়ত তাঁহার মনে হইয়াছিল জড়ত্ব ও নিষ্ক্রিয়তারই আর একটা দিক। সেই জন্যই সেই শান্তি ও তৃপ্তির মধ্যেও "গীতিমাল্য-গীতালি"তে তিনি বার বার প্রার্থনা করিয়াছিলেন দুঃখের আঘাত, রুদ্রের লাঞ্ছনা; তিনি চাহিয়াছিলেন অতৃপ্তির চিরগতি, নব নব বেদনাময় চৈতন্য। এখন যেন তাহাই চিত্তকে অধিকার করিয়া বসিল।

চিত্তের এই ভাব-পরিবর্তনের একটা কারণ বাহিরের দিকেও খুঁজিয়া পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ চিরকালই সামাজিক প্রগতি সম্বন্ধে স্বাধীন উদারনীতি পোষণ করিয়া আসিয়াছেন; ধর্মসম্বন্ধেও তিনি স্বাধীন-মতাবলম্বী, কোনও প্রচলিত ধর্মমতই তাঁহার অন্তরকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, এবং তাঁহার চিন্তানুযায়ী যখন তিনি যাহা সত্য বলিয়া মনে করিয়াছেন, অকুণ্ঠ ও নির্ভীক চিত্তে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন; অনেক সময় তাঁহার মতামত প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসকে আঘাত করিয়াছে। স্বদেশ ও স্বসমাজ সম্বন্ধেও একথা সত্য। তাঁহার স্বকীয় ধর্মসাধনায়ও তিনি কোন প্রচলিত ধর্মমত অথবা সাধনপদ্ধতি গ্রহণ করেন নাই, বরং "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"তে বার বার বলিয়াছেন, 'ওদের কথা আমি বুঝি না, এবং সে সব কথা শুনলেই আমার চোখের সম্মুখে সব অন্ধকার হইয়া যায়, কিন্তু আমি তোমার কথা খুব সহজেই বুঝি'; এক কথায় তিনি সর্বদাই নিজের অন্তরের আলোকে পথ দেখিয়া চলিয়াছেন। এই ধরনের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আমাদের চিরাচরিত সামাজিক বোধ ও বুদ্ধি সহজে সহ্য করিতে রাজি নয়, এবং রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় কথা যখনই যাহা বলিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও হইয়াছে। বাংলা দেশে স্বদেশী আন্দোলনের ফলে মানুষের মনে একটা প্রবল দেশাত্মবোধ ও অভিমান জাগিয়াছিল, এই বোধ ও অভিমান ক্রমশ রূপ লইল একটা উৎকট রক্ষণশীল মনোভাবের মধ্যে, এবং তাহা প্রমাণ করিবার জন্য

শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্কের অভাব হইল না। দেশ, সমাজ ও ধর্মের যাহা কিছু ভাল বা মন্দ সমস্তই নির্বিচারে সমর্থন করিবার একটা প্রবল প্রবৃত্তি আমাদের শিক্ষিত অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে দেখা গেল, এবং আমাদের গণ্য ও মান্য লোকদের অনেকেই এই মনোভাবের আশ্রয় লইলেন। তাঁহারা নির্বিচারে প্রমাণ ও প্রচার করিলেন আমাদের জাতিগত জড়তাকে সাত্ত্বিকতা বলিয়া, আলস্যকে ঔদাস্য বলিয়া, দৈন্যকে ঐশ্বর্য বলিয়া, আত্মপ্রবঞ্চনাকে আত্মপ্রসাদ বলিয়া। রবীন্দ্রনাথ হয় ত অনুমান করিলেন, তাঁহার অধ্যাত্ম সাধনায় নবলব্ধ শান্তি ও তৃপ্তির আরাম ও আনন্দের মধ্যে বোধ হয় এই ধরনের রক্ষণশীল মনোভাবের সমর্থন আছে। যাহাই হউক, যে কারণেই হউক, রবীন্দ্রচিত্ত এই ধরনের মনোভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া প্রচণ্ড, প্রমুক্ত, অশান্ত, অমর যৌবনের জয়গান করিল এবং গতিবেগের প্রশস্তি উচ্চারণ করিল। বার্ধক্যের অথবা অলসের জড়ত্ব নয়, যৌবনের অশান্তিই সত্য; শান্তি ও তৃপ্তির স্থিতি নয়, গতিবেগের আনন্দই সত্য। তাহারই কাব্যময় প্রকাশ "বলাকা"। প্রবন্ধে ও বক্তৃতায়, গল্পে ও উপন্যাসেও এই নূতন মর্মবাণীই ব্যক্ত হইল। 'সবুজের অভিযান' কবিতায় যাহা বলিলেন, তাহাই বিস্তৃত করিয়া বলিলেন 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধে,—

"সমাজে যে চলার ঝোঁক আসিয়াছিল সেটা কাটিয়া গিয়া আজ বাঁধিবোলের বেড়া বাঁধিবার দিন আসিয়াছে। * * * আমাদের সমাজে যে পরিমাণে কর্ম বন্ধ হইয়া আসিয়াছে সেই পরিমাণে বাহবার ঘটা বাড়িয়া গিয়াছে। চলিতে গেলেই দেখি সকল বিষয়েই পদে পদে কেবলি বাধা। * * * দেশের নবযৌবনকে সমাজপতিরা আর নির্বাসিত করিয়া রাখিতে পারিবেন না। তারুণ্যের জয় হউক। তাহার পায়ের তলায় জঞ্জাল মরিয়া যাক, জঞ্জাল সরিয়া যাক, কাঁটা দলিয়া যাক, পথ খোলসা হউক, তাহার অবিবেচনার উদ্দাম বেগে অসাধ্য সাধন হইতে থাক।" (সবুজ-পত্র, বৈশাখ, ১৩২১, ২০—৩১ পৃঃ)।

যে-যৌবন রুদ্রের প্রসাদ সেই-যৌবন বাঙালী-চিত্তকে অধিকার করুক, ইহাই হইল কবির প্রার্থনা। ১৩২৩ বঙ্গাব্দের নববর্ষের প্রার্থনাও তাহাই,—

পুরাতন বৎসরের জীর্ণক্লান্ত রাত্রি
ওই কেটে গেল, ওরে যাত্রী।
তোমার পথের 'পরে তপ্ত রৌদ্র এনেছে আহ্বান
রুদ্রের ভৈরব গান।
*   *   *
ক্ষতি এনে দিবে পদে অমূল্য অদৃশ্য উপহার।
চেয়েছিলি অমৃতের অধিকার—
সে তো নহে সুখ, ওরে, সে নহে বিশ্রাম,
নহে শান্তি, নহে সে আরাম।
মৃত্যু তোরে দিবে হানা,
দ্বারে দ্বারে পাবি মানা,
এই তোর নব বৎসরের আশীর্বাদ,
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ। (৪৫নং)

'সবুজের অভিযান' কবিতায় অথবা 'যৌবন' কবিতায় যে-সুর আমরা শুনিয়াছি সেই সুর 'আহ্বান' এবং 'শঙ্খ' কবিতায়ও সহজেই ধরা পড়ে।

আমরা চলি সমুখ পানে
কে আমাদের বাঁধবে।
রৈল যারা পিছন টানে
কাঁদবে তারা কাঁদবে।
*   *   *
রুদ্র মোদের হাঁক দিয়েছে
বাজিয়ে আপন তূর্য।
মাথার 'পরে ডাক দিয়েছে
মধ্যদিনের সূর্য।

মন ছড়াল আকাশ ব্যেপে,
আলোর নেশায় গেছি খেপে,
ওরা আছে দুয়ার ঝেঁপে,
চক্ষু ওদের ধাঁধবে।
কাঁদবে ওরা কাঁদবে। (৩নং)

অথবা,

তোমার শঙ্খ ধুলায় প'ড়ে
কেমন করে সইব।
বাতাস আলো গেল ম'রে
এ কী রে দুর্দৈব!

* * *

যৌবনেরি পরশমণি
করাও তবে স্পর্শ।
দীপক-তানে উঠুক ধ্বনি'
দীপ্ত প্রাণের হর্ষ। (৪নং)

কিন্তু রুদ্রের প্রসাদ যৌবনের জয়গানই "বলাকা"র শেষ কথা নয়, মূল কথাও নয়, শুধু এইটুকু হইলে "বলাকা" তাহার যথার্থ কাব্যমূল্য কিছুতেই দাবি করিতে পারিত না। কারণ, যৌবন-সত্য যে বাণীতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহার মধ্যে ভাব-কল্পনার সৌন্দর্য অপেক্ষা প্রচারের শক্তিই স্বপ্রকাশ হইয়া উঠিয়াছে বেশি, বোধ ও বুদ্ধির ঐশ্বর্যকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে বাক্যের প্রাখর্য।

"বলাকা" গতিরাগের কাব্য। সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে এক অফুরন্ত গতিবেগ, এই গতিবেগই অচল পাষাণের মধ্যে, আপাতদৃষ্টিতে যাহা স্থাণু, জড়, নিশ্চল তাহার মধ্যে প্রাণরসের সঞ্চার করিয়া তাহাকে

জীবন্ত করিয়া তোলে, যাহার বলে তরুশ্রেণী পাখা মেলিয়া শূন্যে উড়িয়া যাইতে চায়, পর্বত বৈশাখের মেঘের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যাইতে চায়, পটে লিখা ছবি জীবনের মধ্যে ফিরিয়া আসে; এই তৃণ এই ধূলি এরা অস্থির, সচল বলিয়াই এরা সত্য হইয়া উঠে। গতি, **eternal flux**, ইহাই সত্য; স্থিতি মিথ্যা, মায়া মাত্র! যাহাকে আমরা স্থাণু, জড় অথবা স্থিতিশীল বলিয়া মনে করি, তাহা আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম; জড় জগতের মধ্যেই বিধৃত, জগৎ হইতে জড় পৃথক নয়, এবং আমরা যাহাকে পরিবর্তন বলিয়া ব্যাখ্যা করি, তাহা জড় হইতে জড়ে পরিণতি নয়, নিরন্তর গতিচক্রাবর্তের এক একটি মুহূর্ত মাত্র। তত্ত্ব হিসাবে এই তত্ত্ব কিছু নূতন নয়; হিন্দু ও বৌদ্ধ চিন্তা-জগতে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য চিন্তারাজ্যে এ তত্ত্ব অজ্ঞাত ছিল না। ফরাসী মনীষী আরি বের্গস তাঁহার চারিটি সুবিখ্যাত গ্রন্থে এই তত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন; আমাদের হিন্দু ও বৌদ্ধ দার্শনিকেরাও করিয়াছেন।

কিন্তু তত্ত্ব কাব্য নয়, এবং তত্ত্ব হিসাবে "বলাকা" বিচার্যও নয়। এই **theory of perpetual change** বুঝিবার জন্য কেহ "বলাকা", অথবা **John Masefield**'র **"The Passing Strange,"** অথবা **Thomas Hardy**'র **"The Dynasts"**, অথবা **Robert Bridges**'র কাব্য পড়িবে না। সে কথা অবান্তর। চিন্তাশীল দার্শনিক যিনি তিনি যুক্তিপরম্পরার ভিতর দিয়া যখন কোনও তত্ত্ব অথবা সত্যকে লাভ করেন, সেই মুহূর্তেই তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া যায়; পরে হয়ত তিনি তাঁহার চিন্তা ও যুক্তিগুলিকে সাজাইয়া অপরের বোধ ও বুদ্ধির গোচর করিতে চেষ্টা করেন। তিনি চিন্তাসূত্রগুলি উপভোগ করেন না, সেগুলি তাঁহার কাছে উপায় মাত্র, এবং সেই উপায় অবলম্বন করিয়া যখন সত্যে আসিয়া উপনীত হন, তখন নিজেকে সার্থকজ্ঞান করেন। কিন্তু যে কবি বহুদিন আগেই ইন্দ্রিয়ানুভূতির আনন্দস্তর অতিক্রম করিয়া

আসিয়াছেন, যাঁহার বোধ ও বুদ্ধি ক্ষুরের ধারের মত শাণিত এবং চিন্তার আনন্দস্তরে যাঁহারা চিত্ত জাগ্রত তিনি শুধু চিন্তার তত্ত্বজাল উপভোগ করেন তাহাই নয়, চিন্তা-উদ্ভূত সত্যটিকেও রূপাশ্রিত করিয়া রসবস্তুতে পরিণত করিয়া তাহাকে নিবিড়ভাবে উপভোগ করেন। এই রূপরসাশ্রিত সত্যই কাব্য হইয়া দেখা দেয়।

কোন্ চিন্তান্তরপর্যায়ের ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ এই তত্ত্বকে লাভ করিয়াছিলেন তাহা অনুমান করা কঠিন, এবং কাব্য-প্রবাহের পরিচয়ের জন্য তাহা অবান্তরও; হিন্দু-বৌদ্ধ দর্শন অথবা বের্গস-তত্ত্বের সঙ্গে তাঁহার কতটুকু মিল আছে বা নাই, তাহার আলোচনাও নিরর্থক। তবে, কি করিয়া এবং কেন এই তত্ত্ব রবীন্দ্র-কবিচিত্তকে অধিকার করিল, তাহা কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। রবীন্দ্র-জীবন ও কাব্য-প্রবাহের সঙ্গে যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা জানেন, এই উভয়ই **perpetual change**'র উৎকৃষ্ট উদাহরণ, হেরাক্লিটাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও বলিতে পারেন, **I cannot bathe in the same river twice.** বস্তুত রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রবাহের ইতিহাস নিরন্তর এক ভাব ও অনুভূতির পর্যায় হইতে আর এক ভাব ও অনুভূতির পর্যায়ে যাত্রার ইতিহাস। অতৃপ্তির চিরগতিই তাঁহার চিরকাম্য, নব নব চৈতন্যে উদ্বোধিত চিত্তই তিনি প্রার্থনা করেন। চিরযৌবনই তাঁহার পূজা লাভ করিয়াছে জীবনের সকল অবস্থায়; এবং যৌবনের ধর্মই গতি-চঞ্চল প্রাণ-বেগ। এই কারণেই কি গতিতত্ত্ব কবির সমগ্র চিত্ত অধিকার করিয়া বসিল?

যাহাই হউক, এই গতিতত্ত্ব কবিচিত্তকে অধিকার করিল এবং ক্রমশ কবিকে মুগ্ধ করিয়া অন্তরে এক নূতন অনাস্বাদিতপূর্ব রহস্যানুভূতি জাগাইয়া তুলিল। কবিচিত্তে যখন কোনও তত্ত্ব অথবা সত্য অনুভূতির স্তরে আসিয়া পৌঁছায় তখন তাহা কোনও নির্দিষ্ট রূপের আশ্রয় গ্রহণ

করে এবং তত্ত্ব কবির মায়া কাঠির স্পর্শে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপবস্তু হইয়া উঠে। "বলাকা"য় এই গতিতত্ত্বই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপাভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে, কখনও আপাতদৃষ্ট জড় বস্তুকে আশ্রয় করিয়া (যেমন, 'ছবি' অথবা 'তাজমহল' কবিতায়) কখনও চঞ্চল গতিময় বস্তুকে আশ্রয় করিয়া (যেমন, 'চঞ্চলা' অথবা 'বলাকা' কবিতায়)।

'ছবি' (৬ নং) কবিতা হইতেই "বলাকা"র মূল সুরটির সূত্রপাত। একটি ছবির রূপবস্তুকে আশ্রয় করিয়া কবিগতিতত্ত্বের চিন্তাতন্তুটিকে উপভোগ করিয়াছেন। এই গতিতত্ত্বের সত্যতা সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোনও সন্দেহ নাই, সত্যে তিনি আগেই পৌঁছিয়াছেন, কিন্তু এই সত্যকে তিনি যে চিন্তাধারা অবলম্বন করিয়া লাভ করিয়াছেন, সেই চিন্তাধারাটিকে রূপাভিব্যক্তি দান করিয়াছেন এই কবিতায়।

তুমি কি কেবল ছবি, শুধু পটে লিখা।
ওই যে সুদূর নীহারিকা
যারা করে আছে ভিড়
আকাশের নীড়;
ওই যারা দিনরাত্রি
আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী
গ্রহ তারা রবি
তুমি কি তাদের মতো সত্য নও।
হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি?

* * *

এই ধূলি
ধূসর অঞ্চল তুলি
বায়ুভরে ধায় দিকে দিকে;
বৈশাখে সে বিধবার আভরণ খুলি
তপস্বিনী ধরণীরে সাজায় গৈরিকে;

অঙ্গে তার পত্রলিখা দেয় লিখে
বসন্তের মিলন-উষায়—
এই ধূলি এও সত্য হায়;—
এই তৃণ
বিশ্বের চরণতলে লীন
এরা যে অস্থির, তাই এরা সত্য সবি,—
তুমি স্থির, তুমি ছবি,
তুমি শুধু ছবি।

কিন্তু এই যে পটে লিখা ছবিকে জড় বলিয়া স্থিতিশীল বলিয়া মনে করা, ইহা ত মিথ্যা, মায়া মাত্র; সৃষ্টির প্রত্যেক অণুপরমাণু পর্যন্ত গতি-ছন্দে ছুটিয়া চলিয়াছে, এই গতি আছে বলিয়াই ত জগৎ। কবি নিজেই তাই উত্তর দিতেছেন,

কী প্রলাপ কহে কবি।
তুমি ছবি?
নহে, নহে, নও শুধু ছবি।
কে বলে রয়েছ স্থির রেখার বন্ধনে
নিস্তব্ধ ক্রন্দনে।
মরি মরি সে-আনন্দ থেমে যেত যদি
এই নদী
হারাত তরঙ্গ বেগ;
এই মেঘ
মুছিয়া ফেলিত তার সোনার লিখন।

*　　*　　*

তোমায় কি গিয়েছিনু ভুলে।
তুমি যে নিয়েছ বাসা জীবনের মূলে
তাই ভুল।

অন্যমনে চলি পথে, ভুলিনে কি ফুল
ভুলিনে কি তারা।
তবুও তাহারা
প্রাণের নিশ্বাস বায়ু করে সুমধুর,
ভুলের শূন্যতা মাঝে ভরি দেয় সুর।
ভুলে থাকা নয় সে তো ভোলা,
বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা।
নয়নসম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।
* * *
নাহি জানি, কেহ নাহি জানে
তব সুর বাজে মোর গানে;
কবির অন্তরে তুমি কবি
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি।

যে শব্দ-চয়ন নৈপুণ্য, ভাব-গাম্ভীর্য, ছন্দ-সজ্জা এবং কল্পনার প্রসার এই কবিতাটিতে লক্ষ্য করা যায়, "বলাকার" প্রায় সব কবিতাতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা লক্ষ্য করিবার বিষয় কবিতাগুলির সচেতন শক্তিসম্পদ; এই শক্তি কতটা আসিয়াছে ইহাদের নূতন ছন্দ গরিমা হইতে, কতকটা চিন্তার গভীরতা ও ভাবের গাম্ভীর্য আশ্রয় করিয়া, এবং কিছুটা সংস্কৃত শব্দ-সম্পদের সুনির্বাচিত প্রয়োগের ফলে।

'ছবি'র পরেই অতি সুপরিচিত 'শা-জাহান' কবিতায়ও কবি নিজের বিপরীতমুখীন চিন্তাধারা উপভোগ করিয়াছেন, অনবদ্য ভাষায় ও ছন্দে, এবং সবল কল্পনায় সেই চিন্তাধারাকে রূপদান করিয়াছেন। কিন্তু যে যুক্তি-শৃঙ্খলা, ভাব-পারম্পর্য, চিন্তার যে স্বচ্ছ অবারিত গতি, যে অনুভূতির দীপ্তি "বলাকা"র কবিতাগুলির সম্পদ, তাহা এই 'শা-জাহান'

কবিতাটিতে দেখা যায় না—চিন্তাসূত্রের মধ্যে কোথায় যেন একটা জট পাকাইয়া গিয়াছে, এই কথাই কেবল মনে হয়। কবি বলিতেছেন, দিল্লীশ্বর শাজাহান স্ত্রীবিয়োগের অন্তর-বেদনা চিরন্তন করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে তাজমহল রচনা করিয়াছিলেন, সর্বশোকাপহারী যে কাল মানুষের সকল শোক ভুলাইয়া দেয়, তাজমহলের সৌন্দর্যে ভুলাইয়া সেই কালের হৃদয় তিনি হরণ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাজমহল সম্রাটের হৃদয়ের ছবি, নব-মেঘদূত। সেই সৌন্দর্য-দূত

> যুগ যুগ ধরি
> এড়াইয়া কালের প্রহরী
> চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্তা নিয়া
> "ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।"

কিন্তু দিল্লীশ্বর আজ নাই, তাঁহার অতুল বৈভব, তাঁহার বিপুল সাম্রাজ্যও আজ নাই!

> তবুও তোমার দূত অমলিন
> শ্রান্তিক্লান্তিহীন,
> তুচ্ছ করি রাজ্যভাঙাগড়া,
> তুচ্ছ করি জীবনমৃত্যুর ওঠাপড়া,
> যুগে যুগান্তরে
> কহিতেছে একস্বরে
> চিরবিরহীর বাণী নিয়া
> "ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া!"

কিন্তু তাহার পরই কবি বলিতেছেন, এই যে "ভুলি নাই" একথা মিথ্যা। স্মৃতির পিঞ্জর-দুয়ার খুলিয়া অতীতের চিরঅস্ত-অন্ধকার বাহির হইয়া যায়। সমাধি-মন্দির স্মরণের আবরণে মরণকে যত্নে ঢাকিয়া রাখে মাত্র।

জীবনেরে কে রাখিতে পারে।
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।
স্মরণের গ্রন্থি টুটে
সে যে যায় ছুটে
বিশ্বপথে বন্ধনবিহীন।

এ-জীবন কাহার জীবন? সম্রাট-মহিষীর জীবনের কথা কবি বলিতেছেন না, বলিতেছেন সম্রাটের জীবনের কথা। সম্রাট-মহিষীর মৃত্যু-স্মৃতিকে সম্রাট স্মরণের আবরণে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু, তাঁহার নিজের জীবন জীবন-উৎসবের শেষে এই ধরাকে মৃৎপাত্রের মতন দুই পায়ে ঠেলিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাঁহার জীবনের রথ তাঁহার কীর্তিকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে।

প্রিয়া তারে রাখিল না, রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ,
রুধিল না সমুদ্র পর্বত।
আজি তার রথ
চলিয়াছে রাত্রির আহ্বানে
নক্ষত্রের গানে
প্রভাতের সিংহদ্বার পানে।

জীবন সম্বন্ধে এই তত্ত্ব সম্রাট-মহিষী সম্বন্ধেও সত্য। কিন্তু তাহা হইলেও 'ভুলি নাই, ভুলি নাই' একথা হয়ত মিথ্যা হইয়া যায় না। মানুষমাত্রেই স্মরণের আবরণে মরণকে যত্নে ঢাকিয়া রাখিতে চায়, অর্থাৎ জীবন ও মৃত্যুর স্মৃতিকে বাঁচাইয়া রাখিতে চায়। সম্রাটও তাহাই চাহিয়াছিলেন, তিনি জীবনকে বাঁধিয়া রাখিতে চাহেন নাই, পারেনও নাই; তাঁহার নিজের জীবনকেও কেহ বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই।

প্রিয়জনের জীবন ও মৃত্যুর স্মৃতিকে মানুষ বাঁচাইয়া রাখিয়া বলিতে চায় "ভুলি নাই, ভুলি নাই", একথা যেমন সত্য, জীবনকে মানুষ ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারেনা, একথাও তেমনই সত্য — এই দুইয়েতে ত সত্যকার কোনও বিরোধ নাই।

তাজমহলকে উপলক্ষ করিয়া আর একটি কবিতা "বলাকা"য় আছে (৯নং)। কবিতাটি সুন্দর, মধুর, এবং "বলাকা"র মূল সুর যে গতিতত্ত্ব সেই সুরে এই কবিতাটি বাঁধা নয়। সম্রাট তাঁহার প্রিয়তমার প্রেমের স্মৃতি এই সমাধি-মন্দিরের মধ্যে অমর করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন, তাজমহলের সৌন্দর্যে সেই প্রেমের স্মৃতি মহীয়সী হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তাজমহলের বস্তুপুঞ্জের মধ্যে অথবা সম্রাটের মধ্যেই সেই স্মৃতি আবদ্ধ হইয়া থাকে নাই, সম্রাট ও সম্রাট-মহিষীকে অতিক্রম করিয়া তাহা আজ ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে সর্বমানবের আনন্দ বেদনার মধ্যে— রবীন্দ্র-কবি-চিত্তের অতি পুরাতন অনুভূতি।

সম্রাট-মহিষী,
তোমার প্রেমের স্মৃতি সৌন্দর্যে হয়েছে মহীয়সী।
সে-স্মৃতি তোমারে ছেড়ে
গেছে বেড়ে
সর্বলোকে
জীবনের অক্ষয় আলোকে।
অঙ্গ ধরি সে-অনঙ্গস্মৃতি
বিশ্বের প্রীতির মাঝে মিলাইছে সম্রাটের প্রীতি।
রাজ-অন্তঃপুর হতে আনিল বাহিরে
গৌরবমুকুট তব, পরাইল সকলের শিরে
যেথা যার রয়েছে প্রেয়সী
রাজার প্রাসাদ হতে দীনের কুটিরে;—
তোমার প্রেমের স্মৃতি সবারে করিল মহীয়সী।

কিন্তু গতিতত্ত্ব সর্বোচ্চ সুসম্বদ্ধ কাব্যাভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে "চঞ্চলা" ও "বলাকা" কবিতা দুইটিতে।

বিরাট নদীর অদৃশ্য নিঃশব্দ জল অবিচ্ছন্ন অবিরল ছুটিয়া চলিয়াছে, কবির কল্পনাদৃষ্টির সম্মুখে তাহার যতটুকু দেখা যাইতেছে তাহার আদিও নাই, অন্তও নাই; ভৌগোলিক তথ্যের কোন মূল্য নাই এই দৃষ্টির সম্মুখে। এই অবিরত চলার কায়াহীন বেগে সমস্ত বিরাট শূন্য স্পন্দিত শিহরিত হইয়া উঠে; ভৈরবী বৈরাগিনী সেই রুদ্ররূপ, তাহার প্রেম সর্বনাশা, সে তাই ঘরছাড়া। উন্মত্ত তাহার অভিসার, কিছুই সে সঞ্চয় করে না, শোক ভয় কিছুই তাহার নাই, পথের আনন্দবেগে অবাধে সে পাথেয় ক্ষয় করিয়া চলে; প্রতি মুহূর্তে সে নূতন, পবিত্র, তাহার চরণস্পর্শে মৃত্যুও প্রাণ হইয়া উঠে। তাহার রূপ নটীর, চঞ্চল অপ্সরীর। তাহার নৃত্য-মন্দাকিনী প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবনকে নূতন ও পবিত্র করিয়া তুলিতেছে। নদী সম্বন্ধে চিন্তা ও কল্পনা যখন অনুভূতির এই স্তরে আসিয়া পৌঁছিল তখন কবির ব্যক্তিগত জীবনও এক মুহূর্তে গভীর ভাবে আলোড়িত হইয়া উঠিল, অনুভূতি তখন উপায় ও উপলক্ষকে ছাড়াইয়া কবির চিত্তমূল ধরিয়া টান দিল। নদীর অবিচ্ছিন্ন অবিরাম রুদ্রগতি নিজের চিত্তে সংক্রামিত হইল, কবি বলিয়া উঠিলেন,—

ওরে কবি, তোরে আজ করেছে উতলা
ঝংকারমুখরা এই ভুবনমেখলা,
অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা।
নাড়ীতে নাড়ীতে তোর চঞ্চলের শুনি পদধ্বনি,
বক্ষ তোর উঠে রনরনি।
নাহি জানে কেউ
রক্তে তোর নাচে আজি সমুদ্রের ঢেউ
কাঁপে আজি অরণ্যের ব্যাকুলতা।(৮নং)

নদী স্রোতকে উপলক্ষ করিয়া কবির মনে পড়িতেছে নিজের জীবন স্রোতের কথা। তিনিও ত প্রতিদিন চলিয়া আসিয়াছেন রূপ হইতে রূপে. প্রাণ হইতে প্রাণে, যাহা কিছু পাইয়াছেন তাহাই ক্ষয় করিয়া আসিয়াছেন দান হইতে দানে, গান হইতে গানে। তারপর একদিন তিনি অরূপের নিস্তব্ধ গহনে, একের নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানে নিজেকে নিমগ্ন করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু আজ আবার পুরাতন

> সেই স্রোত হয়েছে মুখর
> তরণী কাঁপিছে থরথর।
> তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক্ তীরে,
> তাকাস্নে ফিরে।
> সম্মুখের বাণী,
> নিক্ তোরে টানি
> মহাস্রোতে
> পশ্চাতের কোলাহল হতে
> অতল আঁধারে,—অকূল আলোতে। (৮নং)

'চঞ্চলা'য় দেখিলাম নদীর চলমান রুদ্ররূপ দেখিয়া কবির চিত্তস্রোতও চঞ্চল এবং মুখর হইয়া উঠিল। 'বলাকা' কবিতায় (৩৬ নং) দেখিতেছি, হংসবলাকার উন্মুক্ত ডানাব নিরুদ্দেশ যাত্রাধ্বনি শুনিয়' একমুহূর্তে কবির চিত্তে মনে বিশ্বজীবনের অনন্ত অলক্ষিত ব্যাকুল অবারিত অনির্দেশ যাত্রার কল্পনা জাগিয়া উঠিল। এই অনুভূতির এমন অপূর্ব অপরূপ কাব্যাভিব্যক্তি অতুলনীয়; এবং সর্বাপেক্ষা এই একটি কবিতাই 'বলাকা"-গ্রন্থকে তাহার মহার্ঘ কাব্যমূল্য দান করিয়াছে। এমন সুন্দর পরিবেশ, সবল কল্পনা, মননের এমন স্বচ্ছ অবারিত গতি, এমন ভাব-ব্যঞ্জনা, এমন নিখুঁত অপরূপ শব্দ-সজ্জা ও গাম্ভীর্য, সর্বোপরি এমন কাব্যময় প্রকাশ "বলাকা"র আর কোনও কবিতাতে দেখা যায় না।

শ্রীনগরে ঝিলম নদীর উপর নৌকায় কবি তখন বাস করিতেছেন। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে, অন্ধকার কাল জলের উপর তারায় খচিত আকাশের ছায়া পড়িয়া মনে হইতেছে যেন তারাকুল ভাসিতেছে। নিস্তব্ধ দুই তীরে পর্বতশ্রেণী, তাহারই পাদমূলে সারি সারি দেওদার বন। মনে হইল, সৃষ্টি যেন স্বপ্নে কথা কহিতে চাহিতেছে; স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিতেছে না শুধু অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতেছে। এমন সময় এমনই পরিবেশের মধ্যে এক ঝাঁক হংসবলাকা স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করিয়া অন্ধকারের বক্ষবিদীর্ণ করিয়া মাথার উপর দিয়া মুহূর্তের মধ্যে দূর হইতে দূরান্তরে শূন্যতা হইতে শূন্যতায় উড়িয়া চলিয়া গেল। দেওদার বন, তিমিরমগ্ন গিরি-শ্রেণী শিহরিয়া উঠিল। শিহরিয়া উঠিল কবির অন্তর, শিহরিয়া উঠিল কবির চিত্ত, শিহরিয়া উঠিল কবির চিন্তা ও কল্পনা; হংসবলাকার শব্দায়মান উন্মুক্তপক্ষ স্পর্শ করিল কবিচিত্তের গভীরতম স্তর, এক মুহূর্তে কবির অনুভূতি সচকিতে জাগিয়া উঠিল,

মনে হলো এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।
পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ;
তরুশ্রেণী চাহে, পাখা মেলি,
মাটির বন্ধন ফেলি
ওই শব্দরেখা ধ'রে চকিতে হইতে দিশাহারা
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।
এ সন্ধ্যার স্বপ্ন টুটে বেদনার ঢেউ উঠে জাগি
সুদূরের লাগি,
হে পাখা বিবাগী।

বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে,—
"হেথা নয়, হেথা নয় আর কোন্‌খানে।"

কবি তখন শূন্যে জলে স্থলে সর্বত্র উদ্দাম চঞ্চল পাখার শব্দই কেবল শুনিতেছেন। তাঁহার মনে হইতেছে, মাটির তৃণ মাটির আকাশে ডানা ঝাপটাইতেছে, পাহাড়, বন সমস্তই উন্মুক্ত ডানায় উড়িয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে অন্ধকার চমকিয়া উঠিতেছে। আরও

শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।
শুনিলাম আপন অন্তরে
অসংখ্য পাখির সাথে
দিনেরাতে
এই বাসাছাড়া পাখি ধায় আলো অন্ধকারে
কোন্ পার হতে কোন্ পারে।
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখায় এ-গানে—
"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।"

এ পর্যন্ত আমরা দেখিলাম, কবি সৃষ্টির গতি-সত্যকে রূপাশ্রিত করিয়া রসমণ্ডিত করিয়া অত্যন্ত নিবিড় ভাবে গভীর ভাবে উপভোগ করিলেন, অনুভূতির মধ্যে উপলব্ধি করিলেন, এবং তাহাকে অপূর্ব কাব্যাভিব্যক্তি দান করিলেন। কিন্তু একদিন এই গতি-সত্য নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে স্পর্শ করিল; 'ঝংকার-মুখরা, এই ভুবনমেখলা, অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা' কবিকে উতলা করিয়া তুলিল, শুধু তাহাই নয়, তাঁহার কল্পনা-দৃষ্টির সম্মুখে এক গভীরতর সমস্যারও সৃষ্টি করিল। জীবনরথচক্রের গতিই যদি একমাত্র সত্য হয়, তাহা হইলে ত একদিন জীবন মৃত্যুতে আসিয়া তাহার চরম বিরতি লাভ

করিবে, জীবনের গতি-আবর্ত সেইখানে আসিয়া সমাপ্ত হইবে। এই প্রত্যক্ষ মৃত্যু-ভাবনা তখন কবি-চিত্তকে অধিকার করিল; সৃষ্টির অনন্ত গতিশীলতার মধ্যে ত নিজের চলিয়া যাওয়ার ইঙ্গিতটুকুও প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। কিন্তু, এই চিন্তার প্রথম স্তরে কোনও বেদনাবোধ নাই, বরং পথযাত্রার আনন্দই যেন কবি উপভোগ করিতেছেন বলিয়া মনে হইতেছে,—

যতক্ষণ স্থির হয়ে থাকি
ততক্ষণ জমাইয়া রাখি
যতকিছু বস্তুভার।

*   *   *

যখন চলিয়া যাই সে চলার বেগে
বিশ্বের আঘাত লেগে
আবরণ আপনি যে ছিন্ন হয়,
বেদনার বিচিত্র সঞ্চয়
হতে থাকে ক্ষয়
পুণ্য হই সে চলার স্নানে,
চলার অমৃতপানে
নবীন যৌবন
বিকশিয়া উঠে প্রতিক্ষণ।
ওগো আমি যাত্রী তাই—
চিরদিন সম্মুখের পানে চাই।
কেন মিছে
আমারে ডাকিস্ পিছে।
আমি তো মৃত্যুর গুপ্ত প্রেমে
রবো না ঘরে কোণে থেমে।
আমি চির-যৌবনেরে পরাইব মালা

ওরে মন,
যাত্রার আনন্দগানে পূর্ণ আজি অনন্ত গগন।
তোর রথে গান গায় বিশ্বকবি,
গান গায় চন্দ্র তারা রবি। (১৮নং)

কিন্তু ক্রমশ যেন মৃত্যুর এই চিন্তা চিত্তের কোণে একটু বেদনার সঞ্চার করিতে আরম্ভ করিল; যে-কবি এই জগৎ ও জীবনকে এমন নিবিড় করিয়া ভালবাসিয়াছেন, মৃত্যু-ভাবনা তাঁহাকে ব্যথিত করিবে বই কি। কবি যেন এই মৃত্যু-বিরহের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজিবার চেষ্টা করিতেছেন। জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে কোথাও কোনও মিল আছে, তাহাই কবি অনুভব করিতে চাহিতেছেন,—

আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে;
পাকে পাকে ফেরে ফেরে
আমার জীবন দিয়ে জড়ায়েছি এরে;
*　　*　　*
এক হয়ে গেছে আজ আমার জীবন
আর আমার ভুবন।
ভালোবাসিয়াছি এই জগতের আলো
জীবনেরে তাই বাসি ভালো।

তবুও মরিতে হবে, এও সত্য জানি।
মোর বাণী
একদিন এ-বাতাসে ফুটিবেনা,
মোর আঁখি এ আলোকে লুটিবেনা,
মোর হিয়া ছুটিবেনা
অরুণের উদ্দীপ্ত আহ্বানে;
মোর কানে কানে
রজনী ক'বে না তার রহস্য বারতা,
শেষ করে যেতে হবে শেষ দৃষ্টি, মোর শেষ কথা। (১৯নং)

এই ভাবনার সঙ্গে বেদনা জড়িত আছেই, কিন্তু সান্ত্বনাও কি নাই? কবি বলিতেছেন, নিশ্চয়ই আছে।

এমন একান্ত করে চাওয়া
এও সত্য যত
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া
সেও সেই মতো।
এ দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল,
নহিলে নিখিল
এত বড় নিদারুণ প্রবঞ্চনা
হাসিমুখে এতকাল কিছুতে বহিতে পারিত না।
সব তার আলো
কীটে-কাটা পুষ্পসম এতদিনে হয়ে যেত কালো। (১২নং)

য়ুরোপে তখন প্রবল সমরানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে, মরণের তাণ্ডব নৃত্য তখন দিকে দিকে। দূর হইতে সেই গর্জন কানে আসিয়া পৌঁছিতেছে। এই যে মরণে মরণে আলিঙ্গন ইহার মধ্যেও জীবন-সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে। জীবনের হাটে পুরানো সঞ্চয় নিয়া বেচা কেনা আর কত কাল চলিবে, দিনে দিনে সত্যের পুঁজি ফুরাইতেছে, বঞ্চনা বাড়িয়া উঠিতেছে, মরণ সমুদ্র পার হইয়া, মৃত্যুস্নানে শুচি হইয়া জীবনকে নূতন করিয়া পাইতে হইবে—

কাণ্ডারী ডাকিছে তাই বুঝি,
"তুফানের মাঝখানে
নূতন সমুদ্রতীর পানে
দিতে হবে পাড়ি।"

ঘরে ঘরে বিচ্ছেদের হাহাকার, মাতৃকণ্ঠের ক্রন্দন, প্রেয়সীর আর্তনাদ; কিন্তু সমস্ত তুচ্ছ করিয়া মানুষ নূতন উষার স্বর্ণদ্বার অতিক্রম

করিবার আশায় নবজীবনের অভিসারে মরণ-মহোৎসবে ছুটিয়া চলিয়াছে দলে দলে, 'কানে নিয়ে নিখিলের হাহাকার, শিরে লয়ে উন্মত্ত দুর্দিন, চিত্তে নিয়ে আশা অন্তহীন।' দেশে দেশে দিকে দিকে মানুষের যত পাপ যত অন্যায়, 'লোভীর নিষ্ঠুর লোভ, বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ, জাতি-অভিমান, মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান' আজ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে, মৃত্যুযজ্ঞে আজ তাহা বিসর্জন দিতে হইবে। এই যে অভ্রভেদী বিরাট মৃত্যুর রূপ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া,—

বলো অকম্পিত বুকে,—
"তোরে নাহি করি ভয়,
এ-সংসারে প্রতিদিন তোরে আমি করিয়াছি জয়।
তোর চেয়ে আমি সত্য এ-বিশ্বাসে প্রাণ দিব, দেখ্‌!
শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।" (৩৭নং)

ইহাই কবির সান্ত্বনা, মৃত্যুযজ্ঞের ইহাই সার্থকতা। সৃষ্টির গতিকে একদিন মৃত্যুর সম্মুখীন হইতেই হয়, কিন্তু সেইখানেই সব শেষ হইয়া যায় না, সৃষ্টি ও জীবন মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া নূতন গতির, নূতন মুক্তির সন্ধান লাভ করে।

মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত না পাই যদি খুঁজে,
সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ সাথে যুঝে,
পাপ যদি নাহি মরে যায়
আপনার প্রকাশ-লজ্জায়,
অহংকার ভেঙে নাহি পড়ে আপনার অসহ্য সজ্জায়,
তবে ঘরছাড়া সবে
অন্তরের কী আশ্বাস-রবে
মরিতে ছুটিছে শত শত
প্রভাত-আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মতো।

বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কী ধরার ধুলায় হবে হারা।
স্বর্গ কি হবে না কেনা।
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবেনা
এত ঋণ ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন।
নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা
তখন দিবেনা দেখা দেবতার অমর মহিমা ? (৩৭নং)

এই আশ্বাস ও বিশ্বাসেই কবি মৃত্যুকে স্বীকার করিলেন; সৃষ্টির গতি-সত্যই একমাত্র সত্য নয়, এই গতিবেগ হইতে মুক্তিও গতির অন্যতম সত্য। সৃষ্টি শুধু গতি-সর্বস্ব হইতে পারে না, তাহা হইলে তাহার সার্থকতা কোথায় ? সেই সার্থকতা গতি হইতে মুক্তিতে। সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে এই দুইটি সত্য।

এতক্ষণ যে কবিতাগুলির আলোচনা করা গেল, তাহা ছাড়াও "বলাকা"য় অনেকগুলি কবিতা আছে যেখানে কোনও তত্ত্ব অথবা সত্য কবির কল্পনা অথবা মননের বিষয়বস্তু নয়, যেখানে কোনও সুগভীর সৃষ্টি-রহস্য কবিকে গভীরভাবে আলোড়িত করিতেছে না। এই কবিতাগুলি রবীন্দ্র-সুলভ নিসর্গ সৌন্দর্যে মণ্ডিত, সহজ অনুভূতি ও উপলব্ধিতে সার্থক এবং অন্তর-রহস্যে সুনিবিড়। ১০নং (হে প্রিয়, আজি এ প্রাতে, নিজ হাতে), ১১নং (হে মোর সুন্দর), ১২নং (তুমি দেবে, তুমি মোরে দেবে), ১৪নং (কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে), ১৫নং (মোর গান এরা সব শৈবালের দল), ১৭নং (হে ভুবন, আমি যতক্ষণ তোমারে না বেসেছিনু ভাল), ২০নং (আনন্দ গান উঠুক তবে বাজি), ২২নং (যখন আমায় হাতে ধরে আদর

করে), ২৪নং (স্বর্গ কোথায় জানিস্ কি তা, ভাই), ২৫নং (যে বসন্ত একদিন করেছিল কত কোলাহল), ২৭নং (আমার কাছে রাজা আমার রইল অজানা), ২৮নং (পাখিরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান), ২৯নং (যে দিন তুমি আপনি ছিলে একা), ৩০নং (এই দেহটির ভেলা নিয়ে দিয়েছি সাঁতার গো), ৩২নং (আজ এই দিনের শেষে), ৩৩নং (জানি আমার পায়ের শব্দ), ৩৮নং (সর্ব দেহের ব্যাকুলতা), ৪০নং (এই ক্ষণে মোর হৃদয়ের প্রান্তে), ৪১নং (যে কথা বলিতে চাই), ৪২নং (তোমারে কি বারবার) প্রভৃতি কবিতা সমস্তই এই পর্যায়ের। "গীতিমাল্য" ও "গীতালি"র অধ্যাত্ম-উপলব্ধির শান্তি ও তৃপ্তির সুরের সঙ্গে এই পর্যায়ের অনেকগুলি কবিতার একটা নিবিড় আত্মীয়তা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ভাগবতোপলব্ধি এই সব কবিতায় আরও উচ্চ গ্রামে আসিয়া পৌঁছিয়াছে,—দেবতা প্রিয়তম এবং বন্ধুর আসন অধিকার করিয়াছেন বহুদিনই, দেবতাকে লাভ করিয়া কবি কৃতার্থ এবং পরিপূর্ণ হইয়াছেন, শুধু এ কথাই সত্য নয়, কবিকে লাভ করিয়াও দেবতা কৃতার্থ এবং পরিপূর্ণ হইয়াছেন, এমন কি এই যে ভুবন যতক্ষণ কবি ইহাকে ভাল না বাসিয়াছেন, ততক্ষণ তাহার আলো খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাহার সকল ধনের সন্ধান পায় নাই, ততক্ষণ নিখিল গগন হাতে দীপ লইয়া শূন্য পানে শুধু পথ চাহিয়াছিল; আজ তাহাকে কবি ভালবাসিয়াছেন বলিয়াই সে সার্থক হইয়াছে (১৭নং) যতক্ষণ দেবতা একা ছিলেন, ততক্ষণ তাঁহার নিজকেই নিজে দেখা সম্পূর্ণ হয় নাই,—

> যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা
> আপনাকে ত হয়নি তোমার দেখা

* * *

আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম,
শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনন্দকুসুম।

*   *   *

আমি এলেম, কাঁপল তোমার বুক,
আমি এলেম, এল তোমার দুখ,
আমি এলেম, এল তোমার আগুনভরা আনন্দ,
জীবন-মরণ-তুফান-তোলা ব্যাকুল বসন্ত।
আমি এলেম, তাইত তুমি এলে,
আমার মুখে চেয়ে
আমার পরশ পেয়ে
আপন পরশ পেলে।

*   *   *

আমায় দেখবে ব'লে তোমার অসীম কৌতুহল,
নইলে ত এই সূর্যতারা সকলি নিষ্ফল। (২৯নং)

অথবা,

জানি আমার পায়ের শব্দ রাত্রি দিনে শুনতে তুমি পাও,
খুশি হয়ে পথের পানে চাও।

*   *   *

আমি যতই চলি তোমার কাছে
পথটি চিনে চিনে
তোমার সাগর অধিক করে নাচে
দিনের পরে দিনে। (৩৩নং)

কতকগুলি কবিতা কেবল মিলনের পূর্ণ তৃপ্তি ও শান্তিতে আনন্দ বিভোর, নিসর্গ-সৌন্দর্যে স্বচ্ছ ও নির্মল (১০, ২৬, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৪, ৩৫, ৩৮, ৪০, ৪২ ইত্যাদি) এবং ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতিতে রহস্যময়। নিজের অধ্যাত্ম-উপলব্ধিজনিত আত্মবিশ্বাস এবং মুক্তির আনন্দও কতকগুলি কবিতায় সুপরিস্ফুট। যতদিন দেবতা তাঁহার একান্ত সাথে

সাথে ছিলেন, তখন মনে মনে ভয় ছিল, ভাবনা ছিল, কখন তাঁহাকে হারাই, কখন তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বিরাগভাজন হই ; আজ আর সে ভয় নাই।

যখন আমার হাতে ধরে
আদর করে
ডাক্‌লে তুমি আপন পাশে,
রাত্রি দিবস ছিলাম ত্রাসে
পাছে তোমার আদর হতে অসাবধানে কিছু হারাই,
চলতে গিয়ে নিজের পথে
যদি আপন ইচ্ছা মতে
কোনোদিকে এক পা বাড়াই,
পাছে বিরাগ-কুশাঙ্কুরের একটি কাঁটা একটু মাড়াই !

মুক্তি, এবার মুক্তি আজি
উঠলো বাজি
অনাদরের কঠিন ঘায়ে,
অপমানের ঢাকে ঢোলে সকল নগর সকল গাঁয়ে।
ওরে ছুটি, এবার ছুটি, এই যে আমার হলো ছুটি,
ভাঙলো আমার মনের খুঁটি,
খস্‌লো বেড়ি হাতে পায়ে ;
এই যে এবার
দেবার নেবার
পথ খোলসা ডাইনে বাঁয়ে।

* * *

আঘাত হানি
তোমারি আচ্ছাদন হতে যেদিন দূরে ফেলাও টানি
সে-বিচ্ছেদে চেতনা দেয় আনি
দেখি বদনখানি। (২২নং)

দেবতার নিকট হইতে দূরে সরিয়া আসিয়াই যেন কবি দেবতাকে বেশি করিয়া পাইলেন, আত্ম-প্রত্যয়ও দৃঢ় হইল। এতদিন কবি শুধু নিবেদন করিয়াছেন, আজ ভগবানের পালা কবির কাছে চাহিবার।

তুমি তো গড়েছ শুধু এ মাটির ধরণী তোমার
মিলাইয়া আলোকে আঁধার।
শূন্য হাতে সেথা মোরে রেখে
হাসিছ আপনি সেই শূন্যের আড়ালে গুপ্ত থেকে।
দিয়েছ আমার 'পরে ভার
তোমার স্বর্গটি রচিবার।

আর সকলেরে তুমি দাও।
শুধু মোর কাছে তুমি চাও।
* * *
মোর হাতে যাহা দাও
তোমার আপন হাতে তার বেশি ফিরে তুমি পাও। (২৮নং)

মুক্তির আনন্দ কবির আজ সর্ব অঙ্গে মনে, আত্ম-প্রত্যয়ের উপর সেই আনন্দ প্রতিষ্ঠিত ; আজ তাই কবি আবার অজানার পথে যাত্রী হইয়াছেন—'আমি যে অজানার যাত্রী, সেই আমার আনন্দ * * * অজানা মোর হালের মাঝি, অজানাই ত মুক্তি,'—

ভাবিস বসে যেদিন গেছে সেদিন কী আর ফিরবে।
সেই কূলে কী এই তরী আর ভিড়বে।
ফিরবেনা রে, ফিরবেনা আর, ফিরবেনা,
সেই কূলে আর ভিড়বেনা।
* * *
কোন্ রূপে যে সেই অজানার কোথায় পাব সঙ্গ
কোন্ সাগরের কোন্ কূলে গো কোন্ নবীনের রঙ্গ। (৩০নং)

কবির কল্পনায় ও অনুভূতিতে

বঁধুর দিঠি মধুর হয়ে আছে
সেই অজানার দেশে।
প্রাণের ঢেউ সে এমনি করেই নাচে
এম্‌নি ভালোবেসে।

* * *

সে-গান আমি শোনাব যার কাছে
নূতন আলোর তীরে,
চিরদিন সে সাথে সাথে আছে
আমার ভুবন ঘিরে।

* * *

জোয়ার ভঁাটার নিত্য চলাচলে
তার এই আনাগোনা
আধেক হাসি আধেক চোখের জলে
মোদের চেনাশোনা।
তারে নিয়ে হলো না ঘর-বাঁধা,
পথে-পথেই নিত্য তারে সাধা,
এম্‌নি করেই আসাযাওয়ার ডোরে
প্রেমেরি জাল-বোনা। (৪৩নং)

"বলাকা"য় একটি কবিতা আছে, 'স্বর্গ কোথায় জানিস্ কি তা, ভাই?' আমরা আগে দেখিয়াছি, কবি আর একটি কবিতায় বলিয়াছেন, ভগবান গড়িয়াছেন মাটির ধরণী, আর কবিকে দিয়াছেন স্বর্গ গড়িবার ভার। এই কবিতাটিতে (২৪নং) দেখিতেছি কবির কল্পনা ও অনুভূতিতে সেই স্বর্গের কোনও ঠিকঠিকানা নাই, তাহার আরম্ভ নাই শেষও নাই, দেশ নাই দিশাও নাই, দিবসও নাই রাত্রিও নাই। কবি

সেই শূন্য স্বর্গে, ফাঁকির ফাঁকা ফানুসে বহুদিন বিহার করিয়াছেন, আর নয়। আজ তিনি বলিতেছেন,—

কত যে যুগ-যুগান্তরের পুণ্যে
জন্মেছি আজ মাটির 'পরে ধূলামাটির মানুষ।
স্বর্গ আজি কৃতার্থ তাই আমার দেহে,
আমার প্রেমে, আমার স্নেহে,
আমার ব্যাকুল বুকে,
আমার লজ্জা, আমার সজ্জা, আমার দুঃখে সুখে।
আমার জন্ম-মৃত্যুরি তরঙ্গে
নিত্যনবীন রঙের ছটায় খেলায় সে-যে রঙ্গে।
* * *
স্বর্গ আমার জন্ম নিল মাটি-মায়ের কোলে
বাতাসে সেই খবর ছোটে আনন্দ-কল্লোলে।

"পলাতকা"য় আমরা সেই মাটি-মায়ের স্বর্গের ঠিকানা পাইলাম।

"পলাতকা"র কবিতাগুলি ১৩২৪-২৫র চৈত্র বৈশাখের মধ্যে লেখা। "বলাকা"য় কবি অসমছন্দে কবিতায় এক নূতন আঙ্গিক সৃষ্টি করিয়াছিলেন—শক্তি ও বীর্যে, শব্দ-সজ্জা নৈপুণ্যে, ধ্বনি-গাম্ভীর্যে সেই ছন্দ বাংলা কাব্যে এক নূতন ঐশ্বর্যের সৃষ্টি করিয়াছে। সেই ভঙ্গ, অসমছন্দই "পলাতকা"য় আর এক নূতন রূপে দেখা দিল—সর্বপ্রকার অলংকার বর্জিত, একান্ত সহজ ঘরোয়া শব্দ ও বাক্যভঙ্গিতে সরল ও অনাড়ম্বর অথচ কোথাও অভদ্র নয়, বরং স্বচ্ছ, মুক্ত, সহজ ও স্বাধীন। কবিতাগুলি অনেকটা গল্পের ধরনে বলা, স্বচ্ছ সহজ ভাষায়, তাহাদের কবিত্ব ধরা পড়ে চকিতে বিদ্যুৎ ঝলকের মত এখানে ওখানে কোন উপমায়, হঠাৎ কোনও চিত্রাভাসে অথবা রহস্যগর্ভ কোনও বাক্যে। তাহা ছাড়া কাব্যাভাস বোধ হয় ছড়াইয়া আছে গল্পগুলির টানা-পোড়েনের মধ্যে, গল্পগুলিই যেন কাব্যময়। কবির অতীন্দ্রিয়

জীবনের সুগভীর অনুভূতি এই গল্পগুলির মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে ; তাহার সঙ্গে আসিয়া মিলিয়াছে কবির সুনিবিড় নিসর্গপ্রীতি। প্রথম কবিতাটিতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কবির বাগানে খেলা করে একটি পোষা হরিণ ও একটি কুকুরছানা; একদিন,—

ফাগুন মাসে জাগ্‌ল পাগল দখিন হাওয়া,
শিউরে উঠে আকাশ যেন কোন প্রেমিকের রঙিন-চিঠি-পাওয়া।
শালের বনে ফুলের মাতন হলো শুরু,
পাতায় পাতায় ঘাসে ঘাসে লাগল কাঁপন দুরুদুরু।
হরিণ যে কার উদাস-করা বাণী
হঠাৎ কখন শুন্‌তে পেলে আমরা তা কি জানি।
তাই যে কালো চোখের কোণে
চাউনি তাহার উতল হলো অকারণে,
তাই সে থেকে থেকে
হঠাৎ আপন ছায়া দেখে
চম্‌কে দাঁড়ায় বেঁকে।

তারপর একদিন বিকাল বেলায় ঝিকিমিকি আলোর খেলায় আমলকী বন যখন অধীর, আমের বোলের গন্ধে তপ্ত হাওয়া যখন ব্যথিত, তখন হরিণ মাঠের পর মাঠ পার হইয়া নিরুদ্দেশের আশায় ছুটিয়া গেল —'সম্মুখে তার জীবনমরণ একাকার, অজানিতের ভয় কিছু নেই আর'।

কেন যে তা তা সে-ই কি জানে। গেছে সে যার ডাকে
কোনোকালে দেখে নাই যে তাকে।
আকাশ হতে আলোক হতে, নতুন পাতার কাঁচা সবুজ হতে
দিশাহারা দখিন হাওয়ার স্রোতে
রক্তে তাহার কেমন এলোমেলো
কিসের খবর এলো!

* * *

জন্ম হতে আছে যেন মর্মে তারি লেগে,
আছে যেন ছুটে চলার বেগে,
আছে যেন চল চপল চোখের কোণে জেগে।
কোনো কালে চেনে নাই সে যারে
সেই তো তাহার চেনাশোনার খেলাধুলা ঘোচায় একেবারে।
আঁধার তারে ডাক দিয়েছে কেঁদে,
আলোক তারে রাখ্‌লনা আর বেঁধে।

সেই পুরাতন দু'চার ছত্রে অপূর্ব নিসর্গ-পরিবেশ সৃষ্টির নৈপুণ্য, এবং ইন্দ্রিয়াতীত জীবনের রহস্যময় অনুভূতি, দুইই সহজেই এই কবিতাটিতে লক্ষ্য করা যায়! "পলাতকা"র অন্যান্য কবিতায়ও তাহার আভাস আছে; কিন্তু রহস্যানুভূতির খানিক স্পষ্ট পরিচয় আছে, 'মালা', 'কালো মেয়ে'. এবং আরও স্পষ্ট 'হারিয়ে যাওয়া' কবিতাটিতে।

আরও আছে এই কবিতাগুলিতে—দুঃখের প্রতি, বেদনার প্রতি কবি হৃদয়ের অপূর্ব দরদ, সুকোমল সহানুভূতি। কবি নিজের জীবনে দুঃখ ও বেদনার উপর জয়ী হইয়াছেন, তাহার ঊর্ধ্বে উঠিয়াছেন—তবু, আমাদের প্রতিদিনের সমাজ ও সংসারে যত দুঃখ ও বেদনা পুঞ্জীভূত হইয়া আছে, তাহার প্রতি তিনি তাকাইতেছেন অত্যন্ত দরদ ও সহানুভূতির দৃষ্টি লইয়া, যত দুঃখী ব্যথিত হৃদয় সকলকে তিনি গ্রহণ করিতেছেন নিজের হৃদয়ের ভিতর। শৈলর দুঃখ, বিনুর বঞ্চনার বেদনা, অপূর্বর মাসীর লাঞ্ছনা ও মহত্ত্ব, মঞ্জুলির মায়ের স্মৃতির অপমান, বঞ্চিত পিতৃহৃদয়ে ভোলার স্নেহ-আবদারের স্পর্শ, মনুর ছেঁড়া চিঠির টুকরায় জ্বলে-ওঠা পুরাতন স্মৃতি, পাগল মহেশের আত্মভোলা বৃহৎ প্রাণ, সব কিছু কবি-হৃদয়ের সুকোমল সহৃদয়তার স্পর্শে রসে ও রহস্যে সুনিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। স্বল্প কথায় অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি, দুই চার লাইনে মানব-মনের অন্তর্লোকের রহস্য উদ্‌ঘাটন, হঠাৎ এখানে ওখানে

ছড়ানো স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, দুঃখ ও বেদনার সুকোমল করস্পর্শ, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ইন্দ্রিয়াতীত রহস্যানুভূতির অস্পষ্ট আলোক এই কবিতাগুলিকে অপরূপ মাধুর্য ও সুনিবিড় আত্মীয়তা-বোধের ঐশ্বর্য দান করিয়াছে। একটি কবিতাও বর্ণনা-বাহুল্য দ্বারা পীড়িত ও ভারাক্রান্ত নয়—এত স্বল্প কথায়, এমন অনাড়ম্বরে, এমন স্বচ্ছ সহজ ভাবে যে মানব-মনের সঙ্গে মানব-মনের আত্মীয়তা স্থাপন করা যায়, "পলাতকা"র কবিতাগুলি না পড়িলে সহজে তাহা জানা যায় না। "পলাতকা"র অধিকাংশ কবিতাই শুধু মানব-মনের পরিচয়জ্ঞাপক; আমাদের এই ধরার ধূলা-মাটির স্বর্গে মানব-চিত্ত কত আপাত-তুচ্ছ সুখ ও দুঃখে, ব্যথা ও বেদনায়, প্রেম ও গঞ্জনায়, স্নেহ ও লাঞ্ছনায়, প্রীতি ও অবহেলায় নীরবে দৃষ্টির বাহিরে কি ভাবে আন্দোলিত আলোড়িত হয় তাহাই নিপুণ তুলির স্পর্শে ফুটাইয়া তোলা ছাড়া আর কোনও উদ্দেশ্য নাই। কিন্তু দু'একটি কবিতা আছে যেখানে আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের অন্যায় অবিচারের প্রতি কঠোর ইঙ্গিত সহজেই ধরা পড়ে, যেমন 'মুক্তি' ও নিষ্কৃতি' কবিতায়। 'দশের ইচ্ছা বোঝাই করা' আমাদের একান্নবর্তী পরিবারে নারীত্বের অবহেলা সহজে আমাদের মন ও দৃষ্টি আকর্ষণ করেনা। নারীত্বের পূর্ণ সম্ভাবনার খবর আমাদের বাঁধা-ধরা এই ঘরকন্নার ঠাসবুনান জীবনযাত্রার পথে প্রবেশ করিবার কোনও পথই নাই।

সুখের দুখের কথা

একটুখানি ভাবব এমন সময় ছিল কোথা!
এই জীবনটা ভালো কিংবা মন্দ, কিংবা যা-হোক একটা-কিছু
সে কথাটা বুঝব কখন, দেখব কখন ভেবে আগু-পিছু।
একটানা এক ক্লান্ত সুরে
কাজের চাকা চলছে ঘুরে ঘুরে।

বাইশ বছর রয়েছি সেই এক চাকাতেই বাঁধা
পাকের ঘোরে আঁধা।
জানি নাই তো আমি যে কী, জানি নাই এ বৃহৎ বসুন্ধরা
কী অর্থে যে ভরা।
শুনি নাই তো মানুষের কী বাণী
মহাকালের বীণায় বাজে। আমি কেবল জানি
রাঁধার পরে খাওয়া, আবার খাওয়ার পরে রাঁধা,
বাইশ বছর এক চাকাতেই বাঁধা।

কিন্তু আজ বাইশ বৎসর বিবাহিত-জীবন যাপনের পর দীর্ঘ অসুখের ছল করিয়া মৃত্যু যখন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে, তখন এই মেয়েটির হেলা-ফেলার জীবনে প্রথম বসন্ত দেখা দিল, নারীত্বের পূর্ণ সম্ভাবনার আভাস যেন জাগিল।

প্রথম আমার জীবনে এই বাইশ বছর পরে
বসন্তকাল এসেছে মোর ঘরে।
জান্‌লা দিয়ে চেয়ে আকাশ পানে
আনন্দ আজ ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠ্‌ছে প্রাণে—
আমি নারী, আমি মহীয়সী,
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্না-বীণায় নিদ্রাবিহীন শশী।
আমি নইলে মিথ্যা হোত সন্ধ্যাতারা ওঠা,
মিথ্যা হোত কাননে ফুল-ফোটা।

* * *

এতদিনে প্রথম যেন বাজে
বিয়ের বাঁশি বিশ্ব-আকাশ মাঝে।
তুচ্ছ বাইশ বছর আমার ঘরের কোণের ধুলায় পড়ে থাক।
মরণ-বাসর ঘরে আমায় যে দিয়েছে ডাক্
দ্বারে আমার প্রার্থী সে যে, নয় সে কেবল প্রভু,
হেলা আমায় করবেনা সে কভু!

চায় সে আমার কাছে
আমার মাঝে গভীর গোপন যে সুধারস আছে।
গ্রহতারার সভার মাঝখানে সে
ঐ যে আমার মুখে চেয়ে দাঁড়িয়ে হোথায় রইল নির্নিমেষে।
মধুর ভুবন, মধুর আমি নারী,
মধুর মরণ, ওগো আমার অনন্ত ভিখারী!
দাও, খুলে দাও দ্বার,
ব্যর্থ বাইশ বছর হতে পার করে দাও কালের পারাবার।

আমাদের সমাজে বালবিধবা কন্যা ঘরে রাখিয়া প্রৌঢ় অথবা বার্ধক্যে পিতার দ্বিতীয়বার বিবাহ খুব অসাধারণ নয়। ইহার মধ্যে সমাজ জীবনের যে দুঃখ ও গ্লানি, নারীত্বের যে-অবমাননা, যে নিদারুণ ট্র্যাজেডি আত্মগোপন করিয়া আছে, সচরাচর আমাদের তাহা চোখে পড়েনা। 'নিষ্কৃতি' কবিতায় কবি সেই গ্লানি ও অবমাননা, দুঃখ ও বেদনা সবিস্তারে সুনিপুণ ভাবে উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, এবং উদ্‌ঘাটন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বর্তমান সমাজের যুবক যুবতীর হাতে সেই আঘাতের প্রত্যাঘাত কোথায় তাহারও যেন ইঙ্গিত করিয়াছেন। পিতা যখন দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া

বৌকে নিয়ে শেষে
যখন ফিরে এলেন দেশে,
ঘরেতে নেই মঞ্জুলিকা। খবর পেলেন চিঠি প'ড়ে
পুলিন তাকে বিয়ে ক'রে
গেছে দোঁহে ফরাক্কাবাদ চ'লে
সেইখানেতেই ঘর পাত্‌বে বলে।
আগুন হয়ে বাপ
বারে বারে দিলেন অভিশাপ।

তখন এই ভাবিয়া মন খুশি হয় যে, মঞ্জুলিকা দিনের পর দিন যে আঘাত

পাইয়াছে, অবশেষে সে-আঘাত সে ফিরাইয়া দিতে পারিয়াছে। হয়ত ইহাই একমাত্র পথ, হয়ত ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম, কিন্তু তাহাতে কবিতাটির কাব্য-মূল্য কতটুকু বাড়িয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা কঠিন।

যাহাই হউক, "পলাতকা"র নানা গল্প কথায়, নানা ভাবে কবি এই কথাই স্বীকার করিলেন, এই ধূলামাটির ধরা-স্বর্গবাসী যত জীব ইহারাই কবির পরমাত্মীয়, ইহারাই ত তাহাদের 'আপন হিয়ার পরশ দিয়ে' সকাল সন্ধ্যায় কবির গানের দীপে আলো জ্বালাইয়াছে, কবি-জীবনের যাহা কিছু সাদা কালো তাহা ত ইহাদেরই আলোছায়ার লীলা,—

নানান প্রাণের প্রীতির মিলন নিবিড় হয়ে স্বজনবন্ধু জনে
পরমায়ুর পাত্রখানি জীবনসুধায় ভরছে ক্ষণে ক্ষণে।

আজ জীবন-সায়াহ্নে প্রেম-পূর্ণ অন্তরে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে কবি স্বীকার করিলেন,—

তাই যারা আজ রইল পাশে এই জীবনের সুখ-ডোবার বেলায়
তাদের হাতে হাত দিয়ে তুই গান গেয়ে নে থাকতে দিনের আলো—
ব'লে নে ভাই, এই যে দেখা, এই যে ছোঁওয়া, এই ভালো এই ভালো।
এই ভালো আজ এ সংগমে কান্নাহাসির গঙ্গা-যমুনায়
ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।
এই তো ভালো ফুলের সঙ্গে আলোয় জাগা, গান গাওয়া এই ভাষায়,
তারার সাথে নিশীথ রাতে ঘুমিয়ে-পড়া নূতন প্রাণের আশায়।

(শেষ গান, "পলাতকা")

১৩২৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের ভিতর "পলাতকা"র প্রায় সব কবিতা রচনা শেষ হইয়া গেল। তারপর বহুদিন কবির সঙ্গে কাব্য-লক্ষ্মীর কোনও দেখাশুনা নাই। ১৩২৮ পূজার ছুটির ভিতর দেখিতেছি কবি ধীরে ধীরে একটি একটি করিয়া "শিশু ভোলানাথে"র

কবিতাগুলি লিখিতেছেন ; এবং সেগুলি শেষ হইতে না হইতেই ১৩১৯এ "লিপিকা"র কাব্য-কথিকাগুলি রচনার সূত্রপাত হইতেছে, এবং "প্রবাসী", "ভারতী", "শান্তিনিকেতন পত্রিকা", "সবুজপত্র", "বঙ্গবাণী", "শঙ্খ" প্রভৃতি মাসিক ও সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

"শিশু ভোলানাথ"-গ্রন্থে কবি যেন আবার নূতন করিয়া শিশুজীবন উপভোগ করিলেন, কখনও কেবল খেলাচ্ছলে, কখনও শৈশব-লীলাকে রহস্যজালে মণ্ডিত করিয়া। আগে "শিশু"-গ্রন্থ সম্বন্ধে যে-কথা বলা হইয়াছে, "শিশু ভোলানাথ" সম্বন্ধেও সে-কথা প্রযোজ্য ; তবে "শিশু ভোলানাথে"র কল্পনা-রহস্য আরও গভীর। কবি যেন দূরে দাঁড়াইয়া সুগভীর দরদ দিয়া অনিমেষ আঁখি লইয়া শিশু-জীবনের অন্তরলোকের রহস্যের মধ্যে দৃষ্টি নিমজ্জিত করিতেছেন, তাহাকে উপভোগ করিতেছেন।

"লিপিকা" গদ্যে লিখিত হইলেও তাহাকে অপূর্ব কাব্য বলা যাইতে পারে। সাহিত্য-সৃষ্টিতে ফর্মের নেশা কবিকে চিরকাল নূতন উৎসাহ জোগাইয়াছে ; "লিপিকা"তেও দেখিতেছি কবিতার এক নূতন গদ্যরূপ তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে। কিছুদিন এই নূতন রূপেই সাহিত্য-সৃষ্টি চলিল। ২।৩টি কথিকা ত পরিষ্কার মুক্তচ্ছন্দের কবিতা, গদ্যের আকারে লেখা মাত্র। বেশির ভাগ অবশ্য রূপক-মূলক গদ্যকবিতা, কোনও বিশেষ ভাব-গ্রন্থিকে মুক্ত করিবার চেষ্টা। সূক্ষ্ম ভাবধারা ও বীক্ষণ-নৈপুণ্যে রচনাগুলি সমৃদ্ধ, যদিও সর্বত্র ইহা সুনিবিড় নয়। বাক্য ও পদ-নির্বাচন অনির্বচনীয়, এবং লয় ও তাল নির্দোষ। সুরসমৃদ্ধ গীতি-কবিতার নূতন রূপ হিসাবে "লিপিকা" বাংলা সাহিত্যে অপূর্ব সৃষ্টি সন্দেহ নাই, এবং বোধ হয় অননুকরণীয়।

কিন্তু রবীন্দ্র-কবি-জীবনের ভাব-প্রবাহের দিক হইতে "শিশু ভোলানাথ" ও "লিপিকা"র মূল্য অন্যত্র খুঁজিতে হয়। এই দুইটি গ্রন্থেই কবিজীবনকে দেখি একটু নূতন রূপে। যে রবীন্দ্রনাথ একদিন রূপারূপ সৌন্দর্যের মধ্যে একেবারে ডুবিয়া যাইতেই অভ্যস্ত ছিলেন, যিনি ছিলেন চির-অতৃপ্ত, নব নব অনুভূতি যাঁহার প্রাণে নিত্য নব নব রসের সঞ্চার করিত, তিনি যেন আজ দরদী সহৃদয় দর্শক মাত্র, সমস্ত সৌন্দর্য উৎস হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দূরে রাখিয়া তিনি যেন শান্তি ও তৃপ্তিতে জগৎ ও জীবনের দিকে তাকাইয়া আছেন, অনুভূতির আনন্দ অপেক্ষা বুদ্ধি ও চিন্তার দীপ্তি যেন তাঁহাকে প্রসন্নতায় ভরিয়া তুলিয়াছে। যাহা ছিল এক সময় সুগভীর দুঃখ ও বেদনার হেতু, তাহা যেন চিত্তে আনিয়াছে অপার শান্তি। দুঃখ ও বেদনার আভাস আমরা পরবর্তী কাব্য "পূরবী"তেও দেখিব, কিন্তু সে দুঃখে কোনও গ্লানি নাই। পুরাতন সুখ ও দুঃখের স্মৃতি মনের মধ্যে বেদনার সৃষ্টি করিতেছে—"লিপিকা" ও "পূরবী"-গ্রন্থে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়—কিন্তু সে-বেদনা অপার শান্তি দ্বারা, মাধুর্য দ্বারা মণ্ডিত। এই শান্তি, এই মাধুর্য "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য গীতালি"র দান।

(৯)

পূরবী (১৩৩২)

মহুয়া (১৩৩৬)

বনবাণী (১৩৩৪-১৩৩৮)

১৩৩১ বঙ্গাব্দের আশ্বিনের গোড়াতে পেরু গবর্ণমেণ্টের আমন্ত্রণে দক্ষিণ আমেরিকার স্বাধীনতা শতবার্ষিকী উৎসবে যোগদান করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রা করেন (১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৪)। চারমাস পরে মাঘ মাসের গোড়ায় দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণ শেষ করিয়া

কবি ইতালি হইয়া ৫ই ফাল্গুন দেশে ফিরিয়া আসেন। "পূরবী"র অধিকাংশ কবিতা এই ক'টি মাসের মধ্যে রচিত ("পূরবী", ৬৩-২২৪ পৃঃ ; ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৪ হইতে ২৪শে জানুয়ারি, ১৯২৫)। "পূরবী"-গ্রন্থের প্রথম কবিতাটির সাক্ষাৎ "পলাতকা"-গ্রন্থেই আমরা পাইয়াছি। দ্বিতীয় কবিতা 'বিজয়ী' ১৩২৪ চৈত্রমাসে, তৃতীয় কবিতা 'মাটির ডাক' ১৩২৮ ফাল্গুনে, চতুর্থ কবিতা 'পঁচিশে বৈশাখ' ১৩২৯'র জন্মদিনে, এবং পঞ্চম কবিতা 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' ১৩২৯ আষাঢ়ে কবি-কনিষ্ঠের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত। 'শিলংয়ের চিঠি' হইতে আরম্ভ করিয়া 'বকুল বনের পাখি' পর্যন্ত সবগুলি কবিতাই ১৩৩০ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া ফাল্গুনের ভিতর লেখা। কবি এই কাব্য-পর্বের (অর্থাৎ প্রথম হইতে 'বকুল বনের পাখি' পর্যন্ত) নামকরণ করিয়াছেন 'পূরবী'। দ্বিতীয় পবের অর্থাৎ য়ুরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণকালে রচিত কবিতাগুলির (১৩৩১) নাম দিয়াছেন 'পথিক'; এবং কতক-গুলি পুরাতন কবিতা যাহা এতদিন কোনও গ্রন্থে গ্রথিত হয় নাই, সেগুলিকে গাঁথিয়াছেন 'সঞ্চিতা' নামে। 'সঞ্চিতা' পর্বের কবিতাগুলি আমাদের আলোচনার বহির্ভূত, কারণ "পূরবী"-গ্রন্থের ভাব-প্রবাহের সঙ্গে তাহাদের কোনও যোগ নাই। মূল সুর অথবা ভাব-প্রবাহের দিক হইতে "পূরবী" পর্যায়ের কবিতাগুলির সঙ্গে 'পথিক' পর্যায়ের কবিতাগুলির বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই; কাজেই এই দুই পর্যায়ের কবিতাগুলি এক সঙ্গেই আলোচনা করা যাইতে পারে।

"পূরবী"-গ্রন্থ 'বিজয়ার করকমলে' উৎসর্গীকৃত। দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণ কালে কবির স্বাস্থ্য ভাল ছিল না, আর্জেণ্টাইনের ডাক্তাররা পেরু যাইতে বারণ করিলেন। শেষ পর্যন্ত পেরু আর যাওয়া হইয়া উঠিল না। আর্জেণ্টাইনের নগরবাসীরা শহর হইতে ২০ মাইল দূরে San Isidore নামে একটি সুন্দর বাগান-বাড়িতে কবির বাসের ব্যবস্থা

করিয়া দেন। এখানে Signore Victoria de Estrada নামক একটি অতি বিদুষী বিদগ্ধা মহিলার সঙ্গে কবির পরিচয় হয়, এবং তিনি ক্রমশ কবির প্রতি শ্রদ্ধায় ও প্রীতিতে আকৃষ্ট হন। San Isidoreর বাগান-বাড়িতে এই মহীয়সী মহিলার সঙ্গ ও সেবাই ছিল কবির আনন্দ। এই মহিলাই কবির 'বিজয়া'। ইঁহাকে উপলক্ষ করিয়াই কবি "পূরবী"র 'অতিথি' কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন,—

> প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করি দিলে, নারী,
> মাধুর্যসুধায়; কত সহজে করিলে আপনারি
> দূরদেশী পথিকেরে।*

"পূরবী"র রবীন্দ্রনাথ ষষ্ঠীতম বৎসরোত্তীর্ণ কবি। জীবন-সায়াহ্নের গোধূলি আলোকে এই দিনগুলি আলোকিত। কবির ভাব ও কল্পনায় 'সূর্য আলোর অন্তরালের দেশের' স্পর্শ আসিয়া লাগিয়াছে, বিদায়ের 'বিষণ্ণ মূর্ছনা' শোনা যাইতেছে। "পূরবী"তে একদিকে দেখিতেছি, কবি এই 'বিষণ্ণ মূর্ছনা'কে ছিন্নশৃঙ্খল 'বন্দীযৌবনের ব্যগ্র কলোচ্ছ্বাসে' ডুবাইয়া দিয়াছেন, স্থবিরের শাসন নাশন চূর্ণ করিয়া 'বিদ্রোহী নবীন বীরের' সিংহাসন রচনা করিয়াছেন, তাহাকেই সম্ভাষণ জানাইয়াছেন। আর একদিকে দেখিতেছি, এই সুন্দরী ধরণীর বক্ষলগ্ন জীবনের দিনগুলি ফুরাইয়া আসিতেছে, কবি তাহা অত্যন্ত বেদনার সহিত অনুভব-করিতেছেন,—বেলা চলিয়া যাইতেছে, দিন সারা হইয়া আসিতেছে, পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিণীর বীণা বাজিতেছে, এই ধরণীর প্রাণের

---

* Signore Victoria de Estrada সম্বন্ধে জার্মান মনীষী Count Hermann Keyserlingর স্মৃতিলিপি কয়েক বৎসর আগে Viswa-Bharati Quarterly নামক ত্রৈমাসিকে প্রকাশিত হইয়াছিল। কৌতূহলী পাঠক দেখিয়া লইতে পারেন।

খেলায়, তাহার আনন্দোৎসবে কবি আর বেশি দিন যোগ দিতে পারিবেন না, এই ভাবনা কবি-হৃদয়কে অব্যক্ত বেদনায় ভরিয়া তুলিতেছে। "পূরবী"র অধিকাংশ কবিতা ব্যথার রঙে রঙিন। অথচ দুঃখের আবেগ নাই, বেদনার চঞ্চলতা নাই—স্তব্ধ শান্ত করুণায় মণ্ডিত পূরবীর সুরটি! বার্ধক্যের শান্ত-সমাহিত সাধনা ও তপস্যার স্তব্ধ মাধুর্য কবিচিত্তের এই ফিরিয়া-পাওয়া-যৌবনের তীব্র শক্তি এবং "পূরবী"র ব্যথাভরা করুণ সুরটির উপর এক অপরূপ রসের তুলি বুলাইয়া দিয়াছে। বহুদিন যে যৌবন তাহার সমস্ত আনন্দ ও সৌন্দর্য লইয়া অতীত হইয়া গিয়াছে, সেই অতীত এক দুস্তর কালসমুদ্র পার হইয়া আসিয়া এই জীবনের অপরাহ্নবেলায় কবিচিত্তে অভিনব মায়াতন্ত্র রচনা করিয়াছে। "পূরবী"তে দেখিতে পাই, শৃঙ্খলহীন যৌবনের দিনগুলিকে জীবনের মধ্যে ফিরিয়া পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা মনে অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু যখন কবিচিত্তে এই কথা জাগিল,—জীবনের সন্ধ্যা আসিয়াছে, ধরণীর প্রাণের খেলা ত এইবার ফুরাইবে, অথচ জানালার ফাঁকে ফাঁকে কাজের কক্ষকোণে অতীত জীবনের নানা বিচিত্র রসমাধুর্যময় দিনগুলি আসিয়া উঁকিঝুঁকি মারিতেছে, তখন যেন মুহূর্তে অন্তর বেদনায় ভরিয়া গেল, সমস্ত চিত্ত ক্রন্দনমুখী হইয়া উঠিল।

কিন্তু, যে-রসমাধুর্যময় অতীত জীবনের জন্য এই সায়াহ্নবেলায় সমস্ত অন্তর কাঁদিয়া উঠিল, সে-দিনগুলি জন্মলাভ করিয়াছিল কোথায়? যে-সখী সকালবেলায়, বটের তলায়, শিশির ভেজা ঘাসের উপর বসিয়া কবিহৃদয় সুরের মাধুর্যে ভরিয়া দিয়াছিল সে-সখী জীবনের কোন্ শুভ-মুহূর্তে আসিয়া ধরা দিয়াছিল?

পরিপূর্ণ প্রেম ও সৌন্দর্যবোধ রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের এক অপূর্ব সম্পদ। এই অপূর্ব সম্পদটি রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তকে নানা ভাবে নানা

রূপে ও রসে, সুরে ও ছন্দে লীলায়িত করিয়াছে, তাঁহাকে হাসি কান্না সুখ দুঃখ, তৃপ্তি অতৃপ্তি, বিরহ মিলনের বিচিত্র দোলায় দোলাইয়াছে। এই প্রেম ও সৌন্দর্যবোধের প্রথম পরিচয় আমরা লাভ করি "ছবি ও গানে"। তারপর "কড়ি ও কোমল" হইতে আরম্ভ করিয়া "মানসী"তে, "চিত্রাঙ্গদা"য় ইহার ব্যগ্র বিকাশ এবং তাহার পর "সোনার তরী" "চিত্রা "ও" চৈতালী"তে সেই ব্যগ্রতা ও চঞ্চলতার সম্পূর্ণ সার্থকতা পাঠককে প্রেম ও সৌন্দর্যের এক মাধুর্যময় জগতে আনিয়া পৌঁছাইয়া দেয়। রবীন্দ্র-কবি-জীবনের এই অধ্যায়টি বাস্তবিকই মাধুর্যরসে কানায় কানায় ভরপুর, এবং আমার মনে হয়, নিছক কাব্য ও শিল্প হিসাবে এমন অপরূপ সৃষ্টি আগেকার জীবনে ত কোথাও নাইই, পরবর্তী কালেও অনেক দিন পর্যন্ত সেই সৃষ্টির বিকাশ কোথাও দেখিতে পাই না। আমার বিশ্বাস, সেই প্রেম ও সৌন্দর্যময় জীবনকে এক সুমহান সাধনা ও তপশ্চর্যার আড়ালে বন্দী রাখিয়া বহুকাল পরে তপস্যার মহিমা ও চিন্তার দীপ্তিদ্বারা শক্তিযুক্ত ও জয়যুক্ত করিয়া "পূরবী"-গ্রন্থে তাহার শৃঙ্খল উন্মোচন করিলেন।

কিন্তু, "নৈবেদ্য-খেয়া" হইতে যে কবি-জীবনের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল তাহার মূলে এই প্রেম-সৌন্দর্যমাধুর্যময় জীবনের কাছে কবিকে বিদায় লইতে হইল।

"সোনার তরী-চিত্রা-চৈতালি"র প্রেম ও বিচিত্র রসানুভূতির কবি রবীন্দ্রনাথ "খেয়া-গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"-র অধ্যাত্ম-লোকের একতম ও গূঢ়তম রসানুভূতির মধ্যেই নিজকে একান্তভাবে সমর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই অধ্যাত্ম-জীবনের শান্ত স্থির বিরামপূর্ণ আনন্দ-রস তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই, তাহা আমরা আগেই দেখিয়াছি। কবি নিরবচ্ছিন্ন অধ্যাত্মময়, শান্ত, পরিতৃপ্ত জীবন হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া অথচ সেই জীবন দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া যৌবন

ও সৌন্দর্যের জীবনে ফিরিয়া আসিতে চাহিলেন, এবং "বলাকা"য় আমরা তাহার প্রথম আভাস লাভ করিলাম। "পূরবী"তে যাহা শক্তিতে, সৌন্দর্যে ও মাধুর্যে দেখা দিবে, "বলাকা"য় তাহার সূচনা দেখা গেল।

১৩২৩ সালের বৈশাখের প্রথম খরদাহে নববর্ষের রুদ্ররূপকে আহ্বান করিয়া কবি "বলাকা" হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাহার পর হইতেই কবি-জীবনে ধীরে ধীরে একটা পরিবর্তনের সূত্রপাত হইল। না জানি কেন মনে হইতে লাগিল—জীবন হইতে একটা জিনিস হারাইয়া গিয়াছে, অথচ তাহাকে ফিরিয়া না পাইলে কিছুই আর ভাল লাগিতেছে না। চারিদিকে যাহারা নিবিড় বন্ধনে জড়াইয়া আছে, এই পৃথিবীর যে সকল বস্তু এই জীবনকে ঘিরিয়া আছে, তাহাদের লইয়া প্রেম ও সৌন্দর্যের অনুভূতি একসময়ে কবির পক্ষে যত সহজ ও স্বাভাবিক ছিল, তাহা যেন দুর্লভ দুরধিগম্য হইয়া উঠিয়াছে; অথচ, এদিকে জীবনের দিনগুলি ফুরাইয়া আসিল। শেষে কি এই দুঃখ থাকিয়া যাইবে, যাহারা আপন হিয়ার পরশ দিয়া কবির হৃদয়ে

" * * সাঁঝ সকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো
* * * এই জীবনের সকল সাদা-কালো
যাদের আলোক-ছায়ার লীলা * * *

সেই যে কবির 'আপন মানুষগুলি' তাহাদের ঘনিষ্ঠ সঙ্গলাভ তাহাদের প্রাণের সাড়া হইতে এই জীবনের অপরাহ্ণ-বেলায় বঞ্চিত থাকিতে হইবে? না, চাই না গূঢ় তত্ত্বের পাকে পাকে আপনাকে জড়াইতে, চাই না জীবনের রহস্য বুঝিতে, অধ্যাত্ম-জীবনের নিগূঢ় ও দুর্লভ আনন্দের মধ্যে নিজকে ডুবাইয়া রাখিতে; ইহার চেয়ে জীবনের শেষ কয়টা "দিনের আলো থাকিতে

থাকিতে' এই হৃদয়ের সুহৃত্তম যাহারা তাহাদের হাতে হাত দিয়া গাহিয়া লই, বলিয়া লই,

> এই যা দেখা, এই যা ছোঁওয়া, এই ভালো এই ভালো।
> এই ভালো আজ এ সংগমে কান্না-হাসির গঙ্গা-যমুনায়
> ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।
> এই ভালোরে প্রাণের রঙ্গে এই আসঙ্গ সকল অঙ্গে মনে
> পুণ্য ধরার ধুলো মাটি ফল হাওয়া জল তৃণ তরুর সনে।

ইহাই "পলাতকা"র শেষ এবং "পূরবী"র প্রথম কবিতা। বাস্তবিকই ত যে ধরার ধুলা মাটি ফল হাওয়া জল তৃণ তরুর মধ্যে এই জীবন গানে গন্ধে রসে রূপে প্রেমে আনন্দে সৌন্দর্যে ভরিয়া উঠিল তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জীবন কতদিন বাঁচে? নীড়-ছাড়া বিহঙ্গ ত আপন মনের আনন্দে মুক্ত বাতাসে উদার আকাশে শুধু ঊর্ধ্বে আরও ঊর্ধ্বে অসীম আলোক বিচ্ছুরিত জ্যোতির মধ্যে কোথায় যে উড়িয়া বেড়ায়, কিন্তু সন্ধ্যার রঙিন আলোয়-আলোয় যখন সকল জগৎ রঙিন হইয়া উঠে তখন সেই সুদূর আকাশের প্রান্ত হইতে নীড়ের পাখি নীড়ের পানেই উন্মুখ হইয়া ফিরিয়া আসে; অনন্ত অসীমের নেশা তাহাকে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। এই ভাবিয়াই কি কবি 'কান্নাহাসির গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে' আবার ফিরিয়া আসিলেন? যেমন করিয়াই হউক, যৌবনের সেই লুপ্ত দিনগুলিকে ফিরিয়া পাইবার আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই তাঁহার প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে লাগিল। সেই আকাঙ্ক্ষার প্রথম স্ফুরণ ত "বলাকা"তেই দেখা গিয়াছে, এবং "বলাকা"র সুর "পূরবী"তে তাহার শেষ চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে 'বিজয়ী' কবিতাটিতে। এই কবিতাটির ভাব ও ছন্দ যেন "বলাকার" সুরেই গাঁথা। তাহার কারণও আছে, "পূরবী"র প্রথম কবিতা দু'টি ১৩২৪ সালে লেখা এবং তখনও কবি "বলাকা"র জীবন-সীমা অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

অন্য কোন গ্রন্থে এ যাবৎ প্রকাশিত হয় নাই বলিয়াই তাহা "পূরবী"তে স্থান লাভ করিয়াছে, নহিলে "পূরবী"র ভাব-ধারার সঙ্গে 'বিজয়ী' কবিতাটির কোন ঐক্য আছে বলিয়া মনে হয় না।

"শিশু ভোলানাথে"র পর হইতে অর্থাৎ ১৩২৬ এবং ১৩২৭, এই পরিপূর্ণ দু'টি বৎসর এবং ১৩২৮ সালেরও দীর্ঘ কতকগুলি মাস বঙ্গবাণীর মুখর কবিটি স্তব্ধ নীরব হইয়া রহিলেন।

মানুষের জীবনের চিন্তাধারা যখন এক রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া অন্য রাজ্যে গমনোদ্যোগ করে, তখন একদিকে বিচ্ছেদের দুর্ভাবনা, অন্যদিকে সম্মুখে ভবিষ্যতের অস্পষ্ট প্রেরণা এই দুইএ মিলিয়া যে সংশয় ও সংঘাতের সৃষ্টি হয় তাহাতে কবিচিত্তের প্রকাশ অপেক্ষাকৃত নীরব হইয়া পড়া কিছুই আশ্চর্য নয়। "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্যে"র নিবিড় অধ্যাত্ম-জগৎ হইতে জীবন ক্রমেই দূরে সরিয়া আসিতেছিল এবং অতীতের সর্বব্যাপী প্রেম ও সৌন্দর্যের এক নূতন রূপ ক্রমেই দৃষ্টির সম্মুখে প্রসারিত হইতেছিল। এই পরিবর্তনের মুখে "বলাকা"য় যাহা লাভ করিয়াছিলেন তাহা যতটা যৌবনের শক্তি এবং জীবন ও সৌন্দর্যের নিগূঢ় জ্ঞান ততটা সহজ উপলব্ধি নয়। কিন্তু জীবনের গতি যাহাকে লক্ষ্য করিয়া মোড় ফিরিয়াছিল "বলাকা"য় তাহার সন্ধান মিলিল না; অতৃপ্তি রহিয়াই গেল। এই অতৃপ্তি ও সংশয় আরও বাড়িয়া উঠিল মহাযুদ্ধের অবসানে রণক্লান্ত পশ্চিমের দুর্দশা স্বচক্ষে দেখিয়া এবং কবিহৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া। এই ক্ষমতামত্ত ঐশ্বর্য গর্বিত পশ্চিম, যন্ত্র-সভ্যতার কেন্দ্রভূমি পশ্চিম, জ্ঞান-বিজ্ঞান-ললিতকলার লীলাভূমি পশ্চিম—এরা ত মানুষের প্রাণকে লইয়া ছিনিমিনি খেলিয়া পৃথিবীর বুকে ধন ও রক্ত ছড়াইয়া যৌবনের তাণ্ডবলীলায় মাতিয়াছিল, শক্তির অদ্ভুত বিকাশ দেখাইয়াছিল, কিন্তু এরা মঙ্গলকে, কল্যাণকে লাভ করিতে পারিল কি? জীবনের নিগূঢ় রহস্যও ত এদের কম জানা ছিল

না, বিশ্বের কল্যাণকামী মহাত্মাদের শান্তি ও প্রীতির বাণীও ত এরা কম শোনে নাই, কিন্তু কিছুই ত এদের রক্ষা করিতে পারিল না। কবি অবশ্য দেশে ফিরিয়া আসিয়া সর্বাগ্রে একথা স্বীকার করিলেন যে প্রাণের লীলার অদ্ভুত বিকাশে কর্ম ও চিন্তার জগতে শক্তির স্ফুরণে 'পশ্চিম জয়ী হইয়াছে' কিন্তু ব্যক্তি-জীবনে কবিচিত্তের মধ্যে তাঁহাকে এ কথাও স্বীকার করিতে হইল, প্রাণের গতি-চাঞ্চল্যে কিংবা শুধু শক্তির স্ফুরণে কল্যাণ নাই, আনন্দ নাই, জীবনের নিগূঢ় তত্ত্বোপলব্ধির মধ্যেও নাই, প্রেম ও শান্তির রহস্য-প্রচারের মধ্যেও নাই। আছে, এই যে জীবনের আশেপাশে চারিদিকে ধূলা মাটি ফল ফুল তৃণ নিজেদের বিলাইয়া দিয়াছে, হাসি-কান্নায় ভরা এই যে মানব-সংসার চিরকাল ধরিয়া গড়াইয়া চলিয়াছে, ইহাদেরই মধ্যে। ব্যক্তিজীবনের শান্তি ও কল্যাণকে লাভ করিতে হইলে এই সংসারের বিচিত্র লীলার মধ্যে, তাহার ঋতু উৎসবের মধ্যে, তাহার সুখ ও দুঃখের মধ্যে, যাহাদের জন্য 'স্বর্গ হইতে বিদায়' লইয়া কবিচিত্ত এই ধরার স্নেহে পুষ্ট সকল প্রাণীর মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছিল তাহাদেরই মধ্যে খুঁজিতে হইবে। মনের মধ্যে এই কথাটি যেখানে জাগিল সেইখানেই "পূরবী"র সৃষ্টি।

"সোনার তরী"র 'দরিদ্র', কিংবা 'স্বর্গ হইতে বিদায়', "চিত্রা-চৈতালি-ক্ষণিকার"র অনেক কবিতাতে দেখা যায় এই ধরিত্রীর প্রতি কবির প্রাণের কি একটা অচ্ছেদ্য ভালবাসার টান, তাহার সঙ্গে প্রেম কি নিবিড়! এই জীবনের এবং পৃথিবীর সকল বস্তুই যেন কবির প্রাণে অপরিসীম বিস্ময়ের উদ্রেক করিতেছে; যাহা কিছু দেখিতেছেন,

> কিছু তুচ্ছ নয়
> সকলি দুর্লভ বলে আজি মনে হয়।

গ্রীষ্মের খরতাপ, বর্ষার মেঘ, শরতের রৌদ্র, সবুজ মাঠ, হরিৎ ক্ষেত্র,

সকলের সঙ্গে কি সুগভীর আত্মীয়তা, প্রকৃতির সঙ্গে কি নিবিড় যোগ! কিন্তু, বলিয়াছি, এই জীবন হইতে তিনি বিদায় লইয়াছিলেন। তারপর কত সুদীর্ঘ কাল কাটিয়া গিয়াছে। ঐ মাধুর্য-সৌন্দর্যময় জীবন-বৈচিত্র্য হইতে বিদায়ের পর জীবনের উপর দিয়া কত ভাব-প্রবাহ চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু এতদিন পর আবার সেই অতীত জীবনের কথা মনে পড়িল কেন? কেন মনে পড়িল।

শালবনের ঐ আঁচল ব্যেপে
যেদিন হাওয়া উঠত খেপে
ফাগুন বেলার বিপুল ব্যাকুলতায়,
যেদিন দিকে দিগন্তরে
লাগতো পুলক কী মন্তরে
কচিপাতায় প্রথম কলকথায়,
সেদিন মনে হতো কেন
ঐ ভাষারি বাণী যেন
লুকিয়ে আছে হৃদয়কুঞ্জছায়ে। ('মাটির ডাক')

কেন মনে হয়, আশ্বিনের ফসল ক্ষেতে, কিংবা 'নীল আকাশের কূলে কূলে সাগর ঢেউয়ের তালে তালে' সবুজের নিমন্ত্রণে কবির প্রাণের দাবি আছে। দাবি যে এক সময় ছিল, একথাও সত্য, কিন্তু কবি নিজেকেই নিজে দোষী করিতেছেন,—

কোন্ ভুলে হায় হারিয়েছিলি চাবি?

যে মাটি-জননীর কোলে তাঁহার জন্ম, সেই কোল হইতে কে তাঁহাকে কাড়িয়া লইয়াছিল? আজ কে যেন কবিকে বলিতেছে,—

বাঁধন-ছেড়া তোর সে নাড়ী
সইবেনা এই ছাড়াছাড়ি
ফিরে ফিরে চাইবে আপন মাকে।
('মাটির ডাক')

কবিও এতদিন 'নানা মতে নানান হাটে' নানান পথে হারানো কোল খুঁজিয়া খুঁজিয়া কেবলি ঘুরিয়া মরিয়াছেন। এতদিন পরে আবার তাহার সন্ধান মিলিল।

আজ ধরণী আপন হাতে
অন্ন দিলেন আমার পাতে,
ফল দিয়েছেন সাজিয়ে পত্রপুটে।
আজকে মাঠের ঘাসে ঘাসে
নিঃশ্বাসে মোর খবর আসে
কোথায় আছে বিশ্বজনের প্রাণ।

('মাটির ডাক')

উপরে "পূরবী"র যে-কবিতাটি উল্লেখ করিয়াছি, তাহারই অনুরূপ ভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে 'লীলা-সঙ্গিনী'তেও। জীবনের যে প্রিয়তমা লীলা-সঙ্গিনী কবিকে একা ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিল, আজ আবার তাহার পুরাতন বন্ধুকে মনে পড়িয়াছে। সেই কবেকার পুরাতন পরিচিত সুরে আবার আসিয়া সে কিঙ্কিণী বাজাইল, সে-শব্দে কবি দুয়ার-বাহিরে আসিয়া যেমনই চাহিলেন অমনি তাহাকে চিনিয়া লইতে পারিলেন। এই লীলা-সঙ্গিনী অতীতের সেই মধুর দিনগুলিতে কতদিন কত লীলার ছলে আসিয়া কবিকে বারবার দেখা দিয়া গিয়াছে, তাহার কঙ্কণ-ঝংকারে কবির বন্ধ দুয়ার কতদিন খুলিয়া গিয়াছে, বাতাসে বাতাসে তাহার ইশারা ভাসিয়া আসিয়াছে 'কখনও আমের নবমুকুলের বেশে,' কখনও 'নবমেঘভারে,' কত বিচিত্র রূপে চঞ্চল চাহনিতে কবিকে সে বার বার ভুলাইয়াছে। এতদিন পরে আজ সকল কথাই কবির মনে পড়িয়া গেল। শুধু কি তাই, কত প্রশ্ন যে বুকের মধ্যে উতলা হইয়া উঠিল,—

এলোচুলে বহে এনেছ কী মোহে
সেদিনের পরিমল ?
বকুল-গন্ধে আনে বসন্ত
কবেকার সম্বল ?

'শেষ অর্ঘ্য' সুন্দর একটি সনেট ; সেখানেও ঐ একই কথা। যে কবিকে প্রত্যুষে 'মাহেন্দ্রক্ষণে প্রথম নিশান্তের বাণী' শুনাইয়াছিল, যে তাঁহাকে এই 'নিখিলের আনন্দ মেলায়' ডাকিয়া আনিয়াছিল, যে

* * * দিল আনি
ইন্দ্রাণীর হাসিখানি দিনের খেলায়
প্রাণের প্রাঙ্গণে ; যে সুন্দরী, যে ক্ষণিকা
নিঃশব্দ চরণে আসি, কম্পিত পরশে
চম্পক-অঙ্গুলি-পাতে তন্দ্রাযবনিকা
সহাস্যে সরায়ে দিল, স্বপ্নের আলসে
ছোঁয়াল পরশমণি জ্যোতির কণিকা ;
অন্তরের কণ্ঠহারে নিবিড় হরষে
প্রথম দুলায়ে দিল রূপের মণিকা—

সে কবির জীবন হইতে কোথায় খসিয়া পড়িল, কোথায় আত্মগোপন করিল ? অথচ আজ তাহাকে না পাইলে ত আর কিছুতেই চলিতেছে না ; জীবন-সন্ধ্যায় একবার তাহার দর্শন, একবার তাহার আলিঙ্গন চাই। তাই সব কিছু তুচ্ছ করিয়া প্রিয়তমের সন্ধান

এ-সন্ধ্যার অন্ধকারে চলিনু খুঁজিতে
সঞ্চিত অশ্রুর অর্ঘ্যে তাহারে পূজিতে।

যাহাদের সঙ্গে কবির অতীত জীবন জড়াইয়া ছিল, তাহাদের কতজন আজ সন্ধ্যা বেলায় 'কাজের কক্ষকোণে' আসিয়া উঁকিঝুঁকি মারিতেছে, হাতছানি দিয়া ইঙ্গিত করিতেছে। চোখের সমুখ দিয়া 'বকুল বনের পাখি' উড়িয়া যাইতেছে ; কবি তাহাকে প্রশ্ন করিতেছেন,

তুমি ত এক সময়ে আমার মনোজগতের মধ্যে উড়িয়া বেড়াইতে,আজ যে আমি তোমাকে ছাড়িয়া দূরে চলিয়া আসিয়াছি, তার বেদনা কি তোমার বুকে বাজে নাই? আমি যে তোমায় ভালবাসিতাম। আষাঢ়ের জলভরা মেঘের খবর কি তুমি বলিতে পার, সে কি আমার আশায় উন্মুখ হইয়া থাকে না? নদীর কলতানে আমার অভাবের বেদনা কি বেসুরে বাজে না? আমি হারাইয়া গিয়াছি বলিয়া আঁখি-জলে কাহারও বুক কি ভাসিয়া যায় নাই?

> শোনো শোনো, ওগো বকুল বনের পাখি,
> সেদিন চিনেছ, আজিও চিনিবে না কি?
> পারঘাটে যদি যেতে হয় এইবার,
> খেয়াল-খেয়ায় পাড়ি দিয়ে হবো পার
> শেষের পেয়ালা ভরে দাও, হে আমার
> সুরার সুরের সাকী।
> ('বকুল বনের পাখি')

একদিকে এই বেদনাময় আকুলতা আর একদিকে বিশ্বাসের দীপ্তি—'আমি ত এই বিশ্বের উচ্ছ্বসিত আনন্দের পরিপূর্ণ অনুভূতির জীবনকেই আবার ফিরিয়া পাইলাম,' নহিলে এই জীবন-সন্ধ্যার 'পঁচিশে বৈশাখ'

> পীত উত্তরীয়তলে লয়ে মোর প্রাণদেবতার
> স্বহস্তে সজ্জিত উপহার—
> নীলকান্ত আকাশের থালা,
> তারি পরে ভুবনের উচ্ছলিত সুধার পেয়ালা

সাজাইয়া আনিবে কেন?

এর পরে আমি যে কবিতাটির উল্লেখ করিতে চাই, কবি তাহার নামকরণ করিয়াছেন, 'তপোভঙ্গ'। এই অপূর্ব কবিতাটিকে ছন্দে

এবং ধ্বনিতে, শব্দসজ্জায় এবং বর্ণনাভঙ্গিতে, ভাবের সূক্ষ্ম প্রকাশ এবং অনুভূতিতে 'উর্বশী'র সহিত একাসনে স্থান দিতে আমার একটুও দ্বিধা নাই। 'উর্বশী'তে কি শক্তিতে অথচ কি সংযত কৌশলে শব্দ দ্বারা ধ্বনিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া, অপূর্ব কল্পনায় ভাবকে রূপদান করিয়া কবি সৌন্দর্যের তীব্র অথচ শান্ত ও নির্মল অনুভূতিকে প্রকাশ করিয়াছেন! 'তপোভঙ্গে'ও প্রকাশ-ভঙ্গি একই কিন্তু অনুভূতি হইতেছে তারুণ্যের সদানন্দ প্রাণশক্তির। কি করিয়া কবি এই অপূর্ব বর্ণনাচাতুর্য ও প্রকাশ-ভঙ্গিমা এতদিন পরে পুনরায় ফিরিয়া পাইলেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। "তপোভঙ্গে" কবি যাহা বলিতে চাহিয়াছেন আমার মনে হয় তাহা এই,—

কালের অধীশ্বর মহেশ্বরের হিসাবের খাতায় ত মানুষের জীবনের প্রত্যেকটি দিনের কথাই লিখা থাকে। তিনি কি কবির 'যৌবন-বেদনা-রসে উচ্ছল দিনগুলির' কথা ভুলিয়া গিয়াছেন? সেদিনগুলি কি অযত্নে ভাসিয়া গিয়াছে, না 'স্বেচ্ছাচারী হাওয়ার খেলায় নির্মম হেলায়' বিস্মৃতির ঘাটে ডুবিয়া গেল? একদিন সেই যৌবনের দিনগুলি প্রাণশক্তিতে কি পরিপূর্ণ ছিল—তাহারা ভোলানাথের রুদ্ররূপকে সৌন্দর্যে সাজাইয়া দিয়াছিল, ডম্বরু-শিঙ্গা কাড়িয়া লইয়া হাতে মন্দিরা বাঁশরি তুলিয়া দিয়াছিল; তাঁহার তপস্যাকে 'গীতরিক্ত হিম মরুদেশে' নির্বাসিত করিয়া সন্ন্যাসের অবসান করিয়া দিয়া বিশ্বের ক্ষুধার জ্যোতির্ময় সুধাপাত্রটি তাঁহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিল। মহেশ্বরের এই নব সৌন্দর্যরূপই কবি-হৃদয়কে প্রেমে ও গানে, রসে ও সৌন্দর্যে ভরিয়া দিয়াছিল। কিন্তু কবির যৌবনের দিনগুলির সঙ্গে সঙ্গে ভোলানাথের এই নবরূপকে কে সংহরণ করিয়া লইয়াছিল। নটরাজের তাণ্ডব নৃত্যে 'অগীত সংগীতে' 'অশ্রুর সঞ্চয়ে' পরিপূর্ণ জ্যোতির্ময় সুধাপাত্রটি কি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল? কবির যৌবনের লুপ্ত দিনগুলি

কি নিঃস্ব কাল-বৈশাখীর নিঃশ্বাসে আকুলিয়া উঠিল? না, সে দিনগুলি লুপ্ত হইয়া যায় নাই; মহেশ্বরের প্রেম ও সৌন্দর্যের চিরন্তন রূপও নিঃশেষিত হয় নাই—

নহে নহে, আছে তারা; নিয়েছো তাদের সংহরিয়া
নিগূঢ় ধ্যানের রাত্রে, নিঃশব্দের মাঝে সম্বরিয়া
রাখো সংগোপনে।

যৌবনের সেই অকারণ আনন্দ-উল্লাস, সৌন্দর্যের সেই উচ্ছ্বসিত আনন্দবেগ 'তপস্যার নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে' শান্ত হইয়া আছে মাত্র। কিন্তু এ তপস্যা কি চিরকাল স্থায়ী হইয়া থাকিবে? যৌবন কি, চিরকাল বন্দী হইয়া থাকিবে; এর কি অবসান হইবে না? হইবেই—

চঞ্চলের নৃত্যস্রোতে আবার উন্মত্ত অবসান
দুরন্ত উল্লাসে।
বন্দী যৌবনের দিন
আবার শৃঙ্খলহীন
বারে বারে বাহিরিবে ব্যগ্র বেগে উচ্চ কলোচ্ছ্বাসে।

কবি এই তপস্যাকে স্থায়ী হইতে দিবেন না; তিনি যে তপোভঙ্গ-দূত, স্বর্গের চক্রান্ত। ভোলানাথের ছলনা তিনি জানেন, সেই শুষ্ক বল্কলধারী বৈরাগী তপস্যার আড়ালে আত্মগোপন করিয়া সুন্দরের সাধক কবির হাতেই ত পরাজয় কামনা করিতেছে। সেইজন্যই

বারে বারে তারি তূণ সম্মোহনে ভরি দিব ব'লে
আমি কবি সংগীতের ইন্দ্রজাল নিয়ে আসি চ'লে
মৃত্তিকার কোলে।

মহেশ্বরের তপস্যা তখন ভাঙিয়া যায়; তার চিতাভস্ম, বিভূতি সমস্তই খসিয়া ঝরিয়া পড়িয়া যায়, পরিবর্তে দেখা দেয় পুষ্পমাল্য।

বহুদিন বিচ্ছেদের পরে কবির প্রসাদে আবার উমার সঙ্গে তার মিলন—সেই মিলনের বিচিত্র ছবি কবির বীণায় আবার সুর জাগায়; আর

> **কৌতুক হাসেন উমা কটাক্ষে লক্ষিয়া কবি পানে;**
> **সে হাস্যে মন্দ্রিল বাঁশি সুন্দরের জয়ধ্বনিগানে**
> **কবির পরানে।**

শুধু অপরূপ কাব্যসৃষ্টির দিক হইতে না দেখিয়া এই কবিতাটিকে যদি রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তের উপর প্রতিফলিত করিয়া এই কথা বলি যে 'তপোভঙ্গ' কবিতায় কবি নিজের তপস্যাও ভঙ্গ করিয়াছেন, তবে খুব ভুল করিব কি? আমার মনে হয় কবিগুরু মহেশ্বরের তপোভঙ্গের আড়ালে নিজের এই "নিত্য নূতনের লীলা চিত্ত ভরিয়া" দেখিবার আকুলতার অস্পষ্ট আবরণটি ছিন্ন করিয়া একেবারে আপন মর্মবাণীটি ব্যক্ত করিলেন।

কবিচিত্তের এই পরিবর্তনকে শুধু তাঁহার কাব্যকথার মধ্যেই খুঁজিলে চলিবে না। ভাব ও কথা যে-রূপ ধরিয়া, যে ছন্দে ও ধ্বনিতে আত্মপ্রকাশ করিল, তাহার মধ্যেও সেটা লক্ষ্য করা যায়। 'তপোভঙ্গ' কবিতা সম্পর্কে আমি তাহা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। শুধু এই কবিতাটিতেই নয়; "পূরবী"র অনেক কবিতাতেই সে-আভাস অতি সুপরিস্ফুট। 'সাবিত্রী', 'আহ্বান', 'সমুদ্র,' 'যাত্রী' প্রভৃতি কবিতা কিছুতেই 'বর্ষশেষ', 'সমুদ্রের প্রতি,' 'রাত্রি,' 'এবার ফিরাও মোরে' প্রভৃতির কথা স্মরণ করাইয়া না দিয়া পারে না। বাস্তবিক "পূরবী" পড়িলে মনে হয় নিজের পুরাতন ছন্দের জগতেও কবি আবার ফিরিয়া আসিলেন। "বলাকা"তে অবশ্য একটা নূতন ছন্দ প্রথম সৃষ্টিলাভ করিল; তাহার মধ্যে একটা বিপুল শক্তি, উদ্দাম গতিবেগ, যাহা আছে যাহা পাইয়াছি সেই জানা সীমার মধ্যে বন্ধনের একটা চঞ্চল অতৃপ্তি, সেই বন্ধন ও অতৃপ্তির হাত হইতে মুক্তি কামনার আবেগ ও উচ্ছ্বাস

সমস্তই প্রকাশ পাইয়াছে, শুধু ছন্দে নয়—ভাবেও। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কিসের যেন একটা অভাবও তাহার মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। "বলাকা"র ছন্দ গতিতে ও শক্তিতে মন ও কল্পনাকে বর্ষার পার্বত্য নদীর মত উদ্দাম বেগে ঠেলিয়া লইয়া যায়, কিন্তু শরতের ভরা নদীর যেমন শান্ত, সংযত গম্ভীর অথচ দ্রুতগতির তরঙ্গায়িত লীলা আছে এবং তাহার চলার মধ্যে যে-মাধুর্য আছে সেই লীলা ও মাধুর্য তাহাতে নাই। ছন্দের এই লীলা ও মাধুর্যের জগৎ "বলাকা"র দানে সমৃদ্ধ হইয়া "পূরবী"র কবিতাগুলিতে পুনরাবিষ্কার লাভ করিল, ইহাই আমার বিশ্বাস।

আমি এতক্ষণ যাহা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি সেই কথাটি নানাস্থানে কবি-হৃদয় হইতে বিচিত্ররূপে আপনি ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। আনন্দে সৌন্দর্যে এক সময় যে জীবন পরিপ্লুত হইয়াছিল, জীবনের সেই আনন্দ ও সৌন্দর্য কোথায় হারাইয়া গিয়াছিল—আজ তাহা জীবন-সন্ধ্যায় অতি ধীরে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আবার আসিয়া গোপনে কবির ভাবের ও রূপের রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। বড় দ্রুত ক্ষণিকার মত সেদিনের সেই ত্রস্ত আঁখি-যুগল সুনিবিড় তিমিরের তলে ডুবিয়া গিয়াছিল—দু'জনের জীবনের চরম অভিপ্রায় সেদিন পূর্ণ হয় নাই; আজ তাই

খোলো খোলো হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা,—
খুঁজে নিতে দাও সেই আনন্দের হারানো কণিকা।
কবে সে যে এসেছিলো আমার হৃদয়ে যুগান্তরে,
গোধূলি-বেলার পান্থ জনশূন্য এ মোর প্রান্তরে
লয়ে তার ভীরু দীপশিখা।
দিগন্তের কোন্ পারে চ'লে গেলো আমার ক্ষণিকা।

* * * *

আজ দেখি সেদিনের সেই ক্ষীণ পদধ্বনি তার
আমার গানের ছন্দ গোপনে করিছে অধিকার।
দেখি তারি অদৃশ্য অঙ্গুলি
স্বপ্নে অশ্রুসরোবরে ক্ষণে ক্ষণে দেয় ঢেউ তুলি। ('ক্ষণিকা')

'খেলা', 'কৃতজ্ঞ' প্রভৃতি কবিতায়ও এই একই কথা। 'কৃতজ্ঞ' কবিতাটি ভারি চমৎকার একটি সরল মাধুর্য এবং করুণ সৌন্দর্যে ভরিয়া উঠিয়াছে; অতীত জীবনের ছোট-খাট স্মৃতিগুলি কবিকে কি রকম বেদনা দিতেছে এই একটি কবিতা পড়িলেই তাহা বুঝা যাইবে।

কোন্ অতীত দিনে কবেকার সেই প্রিয়া কবিকে তার শেষ চুম্বন দিয়া গিয়াছে। কবি এতদিনের বিচ্ছেদে তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। আজ যখন আবার তাহাকে মনে পড়িয়াছে তখন বড় আকুল হৃদয়ে এই বিস্মৃতির জন্য ক্ষমা চাহিতেছেন। সেই শেষ চুম্বনের পরে কত মাধবী-মঞ্জরি থরে থরে শুকাইয়া পড়িয়া গিয়াছে, কত 'কপোতকূজন-মুখরিত মধ্যাহ্ন', কত 'সন্ধ্যা সোনার বিস্মৃতি আঁকিয়া দিয়া', কত 'রাত্রি অস্পষ্ট রেখার জালে আপন লিখন আচ্ছন্ন করিয়া' প্রতি মুহূর্তে 'বিস্মৃতির জাল বুনিয়া' দিয়া কাটিয়া গিয়াছে। দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে কবি যদি তাঁহার প্রিয়াকে ভুলিয়া গিয়াই থাকেন—আজ তাহার জন্য ক্ষমা চাহিতেছেন। তবু একদিন এই প্রিয়া কবিকে আলিঙ্গন করিয়াছিল বলিয়াই গানের ফসলে কবি-জীবন ভরিয়া উঠিয়াছিল—'আজও তার শেষ নাই'; তাহার স্পর্শ আজ আর নাই কিন্তু কি যে 'পরশমণি' কবির অন্তরে সে রাখিয়া গিয়াছে যাহার কল্যাণে

বিশ্বের অমৃত ছবি আজিও তো দেখা দেয় মোরে
ক্ষণে ক্ষণে,—অকারণ আনন্দের সুধাপাত্র ভ'রে
আমারে করায় পান। * * *

আজ তুমি আর নাই, দূর হতে গেছো তুমি দূরে,
বিধুর হয়েছে সন্ধ্যা মুছে যাওয়া তোমার সিন্দূরে।
সঙ্গীহীন এ জীবন শূন্য ঘরে হয়েছে শ্রীহীন,
সব মানি,—সব চেয়ে মানি তুমি ছিলে একদিন।

এই কবিতাটির করুণ মাধুর্যের তুলনা "পূরবী"র আর একটিতেও আছে বলিয়া মনে হয় না।

আগেই বলিয়াছি, "পূরবী"র 'পথিক' অংশে যে-কবিতাগুলি গ্রথিত হইয়াছে তাহা ১৩৩১ সালে য়ুরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণের সময় লেখা; কিন্তু এই কথাটি জানা না থাকিলে কিংবা কবিতার নিচে "আণ্ডেস্ জাহাজ" অথবা "বুয়েনোস্ এয়ারিস্" লেখাটি না দেখিলে কিছুতেই বুঝিবার উপায় নাই, এই সহজ সুন্দর মাধুর্যময় কবিতাগুলি জাহাজের নির্জন কক্ষে কিংবা পশ্চিমের জনসংঘাতের উন্মত্ত কোলাহলের মধ্যে বসিয়া লেখা না বাংলা দেশের খাল, বিল, নদী, বট, শাল, পলাশ, জুঁই, বেলা, করবীর চিরপরিচিত আবেষ্টনের মধ্যে প্রসূত। 'কিশোর প্রেম,' 'অন্তর্হিতা', 'শেষ বসন্ত' প্রভৃতি যে-কোনও কবিতা পড়িলেই একথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। স্থান ও কালের সকল বাধা অতিক্রম করিয়া রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত কি করিয়া সর্বদাই চিরপরিচিত গৃহের সুমধুর আবেষ্টনের মধ্যে বিহার করিয়া ও একই সঙ্গে সমস্ত বিশ্বানুভূতির সঙ্গে যোগরক্ষা করিয়া চলে তাহা বাস্তবিকই বিস্ময় উৎপাদন না করিয়া পারে না। 'চাপাড মালাল' কিংবা 'বুয়েনোস্ এয়ারিসে'ও অতি তুচ্ছ আকন্দ এবং জুঁই যে কবিচিত্তের স্মরণ ও ভালবাসা আকর্ষণ করিয়াছে ইহা বিস্ময়কর নয় কি?

অতীতের সৌন্দর্য ও রসভরা দিনগুলিকে যখনই ফিরিয়া পাইবার ইচ্ছা মনের মধ্যে জাগিয়াছে তখনই তাহার সঙ্গে সঙ্গে শেষের সুরটিও অতি করুণ ঝংকারে হৃদয়তন্ত্রীকে পীড়ন করিয়াছে। এই পীড়া, এই

বেদনা সবচেয়ে তীক্ষ্ণ ও তীব্র হইয়া দেখা দিয়াছে 'লীলাসঙ্গিনী' কবিতাটিতে।

প্রিয়তমা লীলাসঙ্গিনী এই জীবন-সন্ধ্যায় আবার আসিয়া চিত্ত-দুয়ারে হানা দিয়াছে; কিন্তু এতদিন পরে বেলা-শেষে সে যে আসিল তাহাকে আমি বরণ করিয়া ঘরে লইতে পারিব কি? পারিলেও আর কতদিন?

দেখো না কি, হায়, বেলা চলে যায়—
সারা হয়ে এলো দিন।
বাজে পুরবীর ছন্দে রবির
শেষ রাগিণীর বীন।
এতদিন হেথা ছিনু আমি পরবাসী,
হারিয়ে ফেলেছি সেদিনের সেই বাঁশি,
আজ সন্ধ্যায় প্রাণ ওঠে নিঃশ্বাসি
গানহারা উদাসীন।

*　　*　　*

এবার কি তবে শেষ খেলা হবে
নিশীথ অন্ধকারে?
মনে মনে বুঝি হবে খোজাখুঁজি
অমাবস্যার পারে?

আবার, 'বৈতরণী' কবিতায়, কতবার মরণ-সমুদ্রের খেয়ার তরণী

এসেছিল এই ঘাটে আমার এ বিশ্বের আলোতে।
নিয়ে গেল কালহীন তোমার কালোতে
কত মোর উৎসবের বাতি,
আমার প্রাণের আশা, আমার গানের কত সাথি,
দিবসেরে রিক্ত করি, ডিক্ত করি আমার রাত্রিরে।
সেই হতে চিত্ত মোর নিয়েছে আশ্রয় তব তীরে।

কবির হৃদয়ের একদিকে এই সুতীব্র বেদনাবোধ এবং অন্য দিকে ব্যথাজীর্ণ হৃদয় লইয়া শেষ দিনটির জন্য নীরব প্রতীক্ষা, ইহা পাঠকের চিত্তকেও পীড়িত না করিয়া পারে কি? বাংলার যে-কবি অর্ধশতাব্দী ধরিয়া বাংলার, ভারতের ও সমগ্র পৃথিবীর পিপাসু চিত্তকে গানে গন্ধে সৌন্দর্যে মাধুর্যে রসে সৌরভে নন্দিত করিয়াছেন, যিনি অজ্ঞাত মানব এবং অনাগত কালের জন্যও সুধাপাত্র পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি আজ 'পূরবীর ছন্দে শেষ রাগিণীর বীণা" বাজাইতেছেন, ইহার ভাবনা মাত্রই কবির অনুরক্ত পাঠকের মন ব্যথায় ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে। তবু, মনে হয়, জরার পীত উত্তরীয়ের অন্তরালে, বয়সের হিসাবে জীবন-সন্ধ্যার পশ্চাতে যে চির-নূতন চির-অতৃপ্ত প্রাণের পরিচয় আমরা এতকাল তাঁহার জীবনে ও কাব্যে দেখিয়াছি, বারবার যে নব অরুণোদয় প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সেই চির-নূতন প্রাণ, নব অরুণোদয় আবার আমরা কবির জীবনে প্রত্যক্ষ করিব, কবির জীবন-দেবতার নিষ্ঠুর কঠিন কঠোর আহ্বান-বাণী আবার কবির প্রাণে নূতন জীবনের সঞ্চার করিবে।

"পূরবী"র পরবর্তী কাব্য-প্রবাহই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

সাক্ষ্য যে দিতেছে তাহা প্রায় চার বৎসর পরে প্রকাশিত "মহুয়া" গ্রন্থেই প্রমাণিত হইয়া গেল।

কিন্তু "মহুয়া" আলোচনার আগে স্বল্প-পরিচিত একটি গ্রন্থের উল্লেখ করা প্রয়োজন—সেটি "লেখন"। "লেখন" রচনা শেষ হয় ২৬ কার্তিক ১৩৩৩ সালে, কবির নিজের হাতের লেখায় বুডাপেস্টে ছাপা। একে বিদেশে, তার উপর আবার স্বল্প সংখ্যাই ছাপা হইয়াছিল, কাজেই বহু-জনের হাতে তাহা পৌঁছায় নাই। ছোট ছোট, চার-ছয়-আট লাইনের

কবিতা, কতকটা "কণিকা" জাতীয়; বাংলার সঙ্গে সঙ্গে কবিতাগুলির ইংরেজি অনুবাদও কবির নিজের হাতের লেখাতেই ছাপা হইয়াছে। এই স্বল্পায়তন 'কবিতিকা' (কবির দেওয়া নাম) গুলির জন্ম, রূপ-বৈশিষ্ট্য এবং বিষয়-বস্তুর পরিচয় দিতে গিয়া কবি নিজে বলিতেছেন,

"যখন চীনে জাপানে গিয়েছিলুম, প্রায় প্রতিদিনই স্বাক্ষরলিপির দাবি মেটাতে হতো। কাগজে, রেশমের কাপড়ে, পাখায় অনেক লিখতে হয়েছে। ** দু'চারটি বাক্যের মধ্যে এক-একটি ভাবকে নিবিষ্ট করে দিয়ে তা'র যে একটি বাহুল্য-বর্জিত রূপ প্রকাশ পেত তা আমার কাছে বড় লেখার চেয়ে অনেক সময় আরো বেশি আদর পেয়েছে। আমার নিজের বিশ্বাস বড় বড় কবিতা পড়া আমাদের অভ্যাস বলেই কবিতার আয়তন কম হলেই তাকে কবিতা বলে উপলব্ধি করতে আমাদের বাধে। *** জাপানে ছোট কাব্যের অমর্যাদা নেই। ছোটর মধ্যে বড়কে দেখতে পাওয়ার সাধনা তাদের * * * সৌন্দর্যবস্তুকে তারা গজের মাপে বা সেরের ওজনে হিসাব করবার কথা মনেই করতে পারে না। *** এই রকম ছোট ছোট লেখায় আমার কলম যখন রস পেতে লাগল, তখন আমি অনুরোধ নিরপেক্ষ হয়েও খাতা টেনে নিয়ে আপন মনে যা তা লিখেছি, এবং সেই সঙ্গে পাঠকদের মন ঠাণ্ডা করবার জন্য বিনয় করে বলেছি—

> আমার লিখন ফুটে পথ-ধারে
>
> ক্ষণিক কালের ফুলে,
>
> চলিতে চলিতে দেখে যারা তারে
>
> চলিতে চলিতে ভুলে।

কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে এটা ক্ষণিক কালের ফুলের দোষ নয়, চলতে চলতে দেখারই দোষ। যে-জিনিসটা বহরে বড় নয় তাকে আমরা দাঁড়িয়ে দেখিনে—যদি দেখতুম তবে মেঠো ফুল দেখে খুশি হলেও লজ্জার কারণ থাকতোনা। *** ছোট লেখাকে যাঁরা সাহিত্য হিসাবে অনাদর করেন তাঁরা কবির স্বাক্ষর-হিসাবে হয়তো সেগুলোকে গ্রহণ করতেও পারেন। *** ইংরেজি বাংলা এই ছুটকো লেখাগুলি লিপিবদ্ধ করতে বসলুম। ***" ("প্রবাসী", কার্তিক, ১৩৩৫, ৩৮-৪০ পৃঃ)।

"কণিকা"-আলোচনার প্রসঙ্গে ইতিপূর্বেই বলিয়াছি "লেখনে"র কবিতিকাগুলি "কণিকা" জাতীয়; সেখানে একথাও বলিয়াছি, "কণিকা"র কবিতাগুলি তত্ত্বমূলক, উপদেশমূলক এবং সেই হেতু কাব্য হিসাবে "কণিকা" "লেখন" অপেক্ষা বহুলাংশে নিকৃষ্ট। বৃহৎ প্রসারিত এবং সুগভীর ভাব ও অনুভূতিকে ক্ষুদ্র সংযত পরিসরের মধ্যে সমগ্রতায় ভরিয়া বাঁধিয়া তুলিতে অনুভূতির যে গাঢ় দৃঢ়তা এবং চিত্তের যে সংযম প্রয়োজন "লেখনে"র কবিতাগুলিতে তাহা স্বপ্রকাশ। কবিতাগুলি সরল ও নিরাভরণ, এবং তাহাদের পূর্ণ অখণ্ডতা তাহাদের অন্তরের মধ্যে শুভ্র স্বচ্ছতায় বিরাজমান।

নিজের হাতের লেখায় ছাপা এবং বুডাপেস্টেই ছাপা আর একটি গ্রন্থ "লেখনে"র সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশিত হইয়াছিল অত্যন্ত স্বল্পসংখ্যায়। একান্ত বন্ধু ও অন্তরঙ্গ মহল ছাড়া এই বইটি আর কাহারও হাতে বোধ হয় নাই। ইহার নাম "বৈকালী", কিন্তু যেহেতু ইহার প্রায় সব কবিতাই অন্যান্য গ্রন্থে, বিশেষভাবে "মহুয়া"য় ছাপা হইয়াছে সেই হেতু "বৈকালী" সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচনা অবান্তর।

"মহুয়া"র কবিপরিচয় দিতে গিয়া প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মহাশয় লিখিলেন, বইখানির

"অধিকাংশ কবিতা ১৩৩৫ সালের শ্রাবণ হইতে পৌষ মাসের মধ্যে লেখা। সেই সময়ে কথা হয়-যে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-গ্রন্থাবলী হইতে প্রেমের কবিতাগুলি সংগ্রহ করিয়া বিবাহ উপলক্ষে উপহার দেওয়া যায় এরূপ একখানি বই বাহির করা হইবে, এবং কবি এই বইয়ের উপযোগী কয়েকটি নূতন কবিতা লিখিয়া দিবেন। কিন্তু অল্প-দিনের মধ্যে কয়েকটির জায়গায় অনেকগুলি নূতন কবিতা লেখা হইয়া গেল। সেই সব কবিতাই এখন "মহুয়া" নামে বাহির হইতেছে। ইহার কিছু পূর্বে, ১৩৩৫ সালের

আষাঢ় মাসে, 'শেষের কবিতা' নামে উপন্যাসের জন্য কয়েকটি কবিতা লেখা হয়। ভাবের মিল হিসাবে সেই কবিতাগুলিও এই সঙ্গে ছাপা হইল। * * * বইয়ের আরম্ভে বসন্তের আগমনী সম্বন্ধে ৫টি কবিতা, আর বইয়ের শেষে বসন্তের বিদায় সম্বন্ধে ৪টি কবিতা ১৩৩৩-১৩৩৪ সালের লেখা। ঐ সময়ের আর একটি মাত্র কবিতা 'সাগরিকা' এই বইতে স্থান পাইয়াছে।

কিন্তু কাব্যের দিক হইতে অতি অবান্তর একটি ফরমাশ উপলক্ষ করিয়া যে নূতন ঝাঁকের কবিতা উৎসারিত হইল তাহাকে আর বাহিরের প্রয়োজনের তাড়নায় রচিত কাব্য কিছুতেই বলা চলিবে না। কবিচিত্তে নূতন বসন্তের আবির্ভাব "পূরবী"তেই ধরা পড়িয়াছিল; "মহুয়া" আসিল সেই বসন্তেরই অনুচর হইয়া। মহুয়ার রসের মধ্যে যে-উন্মাদনা প্রচ্ছন্ন থাকে, সেই উন্মাদন-গন্ধে "মহুয়া" গ্রন্থের কবিতাগুলি সমৃদ্ধ। বিবাহ উপলক্ষে উপহারের প্রয়োজনের তাড়না ইহাদের মূলে কোথাও যে ছিল তাহা জানিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন পাঠকের নাই, এবং তাহা একেবারে অস্বীকার করিলেও রসোপভোগে বিন্দুমাত্র ত্রুটি ঘটিবে না।

"মহুয়া"র কবিতাগুলির ভাব-প্রসঙ্গের পরিচয় কবি নিজেই রাখিয়া গিয়াছেন; সে-পরিচয় আর কোনও ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

"* * * ফরমাশ ব্যাপারটা মোটর গাড়ির ষ্টার্টার-এর মতো। চালনাটা শুরু করে দেয় কিন্তু তার পরে মোটরটা চলে আপন মোটরিক প্রকৃতির তাপে। প্রথম ধাক্কাটা একেবারেই ভুলে যায়। মহুয়ার কবিতাগুলিও লেখবার বেগে ফরমাশের ধাক্কা নিঃসন্দেহেই সম্পূর্ণ ভুলেছে—কল্পনার আন্তরিক তড়িৎশক্তি আপন চিরন্তনী প্রেরণায় তাদের চালিয়ে নিয়ে গেছে। * * * নতুন লেখার ঝোঁক যখন চিত্তের মধ্যে এসে পড়ে তখন তারা পূর্ব দলের পুরানো পরিত্যক্ত বাসায় আশ্রয় নিতে চায় না, নতুন বাসা না বাঁধতে পারলে তাদের মানায়না, কুলোয়না। ফড়িকার বাসা আর বলাকার বাসা এক নয়।

"আমি নিজে মহুয়ার কবিতার মধ্যে দুটো দল দেখতে পাই। একটি হচ্ছে নিছক গীতি কাব্য, ছন্দ ও ভাষার ভঙ্গিতেই তার লীলা। তাতে প্রণয়ের প্রসাধন কলা

মুখ্য। আর একটিতে ভাবের আবেগ প্রধান স্থান নিয়েছে, তাতে প্রণয়ের সাধনবেগই প্রবল।

"মহুয়ার 'মায়া' নামক কবিতায় প্রণয়ের এই দুই ধারার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। প্রেমের মধ্যে সৃষ্টি শক্তির ক্রিয়া প্রবল। প্রেম সাধারণ মানুষকে অসাধারণ করে রচনা করে—নিজের ভিতরকার বর্ণে রসে রূপে। তার সঙ্গে যোগ দেয় বাইরের প্রকৃতি থেকে নানা গান গন্ধ, নানা আভাস। এমনি করে অন্তরে বাহিরের মিলনে চিত্তের নিভৃত লোকে প্রেমের অপরূপ প্রসাধন নির্মিত হতে থাকে—সেখানে ভাবে ভঙ্গিতে সাজে সজ্জায় নূতন নূতন প্রকাশের জন্য ব্যাকুলতা, সেখানে অনির্বচনীয়ের নানা ছন্দ, নানা ব্যঞ্জনা। একদিকে এই প্রসাধনের বৈচিত্র্য, আর একদিকে এই উপলব্ধির নিবিড়তা ও বিশেষত্ব। মহুয়ার কবিতা চিত্তের সেই মায়ালোকের কাব্য; তার কোন অংশে ছন্দে ভাষায় ভঙ্গিতে এই প্রসাধনের আয়োজন, কোন অংশে উপলব্ধির প্রকাশ।

"এই সুরের মধ্যে নূতনের বাসন্তিক স্পর্শ নিশ্চয় আছে—নইলে লিখতে আমার উৎসাহ থাকতো না। * * * কত অল্প সময়ের মধ্যে এগুলি সমাধা করেছি। তার কারণ প্রবর্তনার বেগ মনে সতেজ ছিল। * * * বারোমাসে পৃথিবীর ছয় ঋতু বাঁধা, তাদের পুনরাবর্তন ঘটে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, একবার আমার মন থেকে যে-ঋতু যায়, সে আর-এক অপরিচিত ঋতুর জন্যে জায়গা করে বিদায় গ্রহণ করে। পূর্বকালের সঙ্গে কিছু মেলে না, এ হতেই পারেনা, কিন্তু সে যেন শরতের সঙ্গে শীতের মিলের মতো। মনের যে ঋতুতে মহুয়া লেখা সে আকস্মিক ঋতুই, করমাশের ধাক্কায় আকস্মিক নয়, স্বভাবতই আকস্মিক। * * * মনের মধ্যে রচনার একটা বিশেষ ঋতুর সমাগম হয়েছে—তাকে পূরবীর ঋতু বা বলাকার ঋতু বললে চলবেনা।

"পূরবী ও মহুয়ার মাঝখানে আর-এক দল কবিতা আছে,—সেগুলি অন্য জাতের তাদের মধ্যে নটরাজ ও ঋতুরঙ্গই প্রধান। নৃত্যাভিনয়ের উপলক্ষ নিয়ে এগুলি রচিত হয়েছিল কিন্তু এরাও স্বভাবতই উপলক্ষকে অতিক্রম করেছে। আর কোনো খানেই শান্তিনিকেতনের মতো ঋতুর লীলারঙ্গ দেখিনি—তারই সঙ্গে মানব-ভাষার উত্তর প্রত্যুত্তর কিছুকাল থেকে আমার চলছে। * * * এই বইয়ের প্রথমে ও সব শেষে যে গুটি কয়েক কবিতা আছে সেগুলি মহুয়া পর্যায়ের নয়। সেগুলি ঋতু উৎসব পর্যায়ের। দোলপূর্ণিমায় আবৃত্তির জন্যেই এদের রচনা করা হয়েছিল। কিন্তু

নববসন্তের আবির্ভাবই মহুয়া কবিতার উপযুক্ত ভূমিকা বলে নকিবের কাজে ওদের এই গ্রন্থে আহ্বান করা হয়েছে।" (মহুয়া গ্রন্থের 'পাঠ পরিচয়ে' উদ্ধৃত কবির পত্র)।

"মহুয়া"-সম্বন্ধে ইহার বাহিরে বলিবার কিছু নাই। দৃষ্টান্তের সাহায্যে কবির বক্তব্য আরও উদ্‌ঘাটিত করা চলে মাত্র। বলা বাহুল্য এই গ্রন্থের প্রধান ও প্রথম বৈশিষ্ট্য ইহার প্রেম ও প্রণয়ের কবিতাগুলি। 'নাম্নী' পর্যায়ের কবিতাগুলিও 'প্রণয়ের প্রসাধন-কলা'রই অন্তর্গত। প্রণয়ের প্রসাধন-পারিপাট্যে নারীর বিচিত্ররূপ প্রত্যক্ষ করাই এই পর্যায়ের কবিতাগুলির লক্ষ্য। কিন্তু যে-কবিতাগুলিতে প্রণয়ের প্রসাধনকলাই মুখ্য বলিয়া কবি বলিয়াছেন, সেগুলিতেও 'প্রণয়ের সাধনবেগ' একেবারে অনুপস্থিত একথা বলা চলে না, প্রণয়োপলব্ধির নিবিড়তা প্রসাধন-পারিপাট্যের পশ্চাতে প্রকাশমান। যেমন 'সন্ধান' কবিতায়

আমার হৃদয়ে যে-কথা লুকানো, তার আভাষণ
 ফেলে কভু ছায়া তোমার হৃদয়তলে ?
দুয়ারে এঁকেছি রক্তরেখায় পদ্ম-আসন,
 সে তোমারে কিছু বলে ?
তব কুঞ্জের পথ দিয়ে যেতে যেতে
বাতাসে বাতাসে ব্যথা দিই মোর পেতে,
বাঁশি কী আশায় ভাষা দেয় আকাশেতে
 সে কি কেহ নাহি বোঝে ?

অথবা, 'শুভযোগ' কবিতায়

যে-বসন্তে উৎকণ্ঠিত দিনে
 সাড়া এলো চঞ্চল দক্ষিণে ;
 পলাশের কুঁড়ি
একরাত্রে বর্ণবহ্নি জ্বালিল সমস্ত বন জুড়ি ;

শিমুল পাগল হয়ে যাতে,
অজস্র ঐশ্বর্যভার ভরে তার দরিদ্র শাখাতে,
পাত্র করি পূরা
আকাশে আকাশে ঢালে রক্ত-ফেন সুরা।
উচ্ছ্বসিত সে-এক নিমেষে
যা-কিছু বলার ছিল বলেছি নিঃশেষে।

ইহাদের মধ্যে প্রসাধন-কলার অস্তিত্ব অনস্বীকার্য, কিন্তু প্রণয়ের সাধন বেগ এবং উপলব্ধির নিবিড়তা নাই এ কথাও বলা চলে না।

প্রণয়ের সাধনবেগ ও উপলব্ধির নিবিড়তা যে-কবিতাগুলির মুখ্য ধর্ম, একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, সে-কবিতায়ও যৌবনে যেমন পরিণত বয়সেও তেমনই, পলাশ-পারুল-শিমুল-কাঞ্চনের যৌবন বাসন্তিক উন্মাদনা এবং বর্ণবহ্নি ও রক্তফেন সুরার উচ্ছ্বসিত স্ফূর্তি সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের প্রণয়-কল্পনা বরাবরই নরনারীর দেহভাবনা বা মিথুনাকর্ষণ বিচ্যুত, কামনা-বাসনা অতিক্রান্ত। কবির একান্ত চিত্তসংযম, দেহাতিরিক্ত মনন-কল্পনা এবং কতকটা বস্তুবিরহিত প্রেম-বাসনা নরনারীর দেহগত প্রণয়-ভাবনাকেও মানবিক কামনার বহির্দেশে স্থাপন করিয়াছে। "মহুয়া"র অনেক কবিতায় এই মানবিক কামনার স্পর্শ অত্যন্ত স্পষ্ট, দেহভাবনার ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন, আভাসে ব্যঞ্জনায় যৌনাবেদন উপস্থিত, কিন্তু তৎসত্ত্বেও কবির শুদ্ধ, সংযত, আচারনিষ্ঠ ভাব-কল্পনা কোথাও তাহাকে দেহকামনার সীমার মধ্যে পদক্ষেপ করিতে দেয় নাই।

এই প্রণয় কবিতাগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। নরনারীর প্রণয়-লীলায় নারীর যে মূর্তি কবির ভাবকল্পনায় রূপ লইয়াছে সে-নারী নর-নির্ভরা অবশ কামনা-কোমলা প্রেমাবলুণ্ঠিতা নারী নয়, সে-প্রণয়ে হীন ভিক্ষাবৃত্তি অথবা দীনাত্মার কাতর আকুলতার স্থান কোথায় নাই। এই প্রণয়-লীলা বলিষ্ঠ সংগ্রাম-তৎপর, সত্য ও সাহস-প্রতিষ্ঠ। 'উজ্জীবন'

নামে গ্রন্থারম্ভেই যে কবিতাটি তাহার পুরাণ-কাহিনীতে কবি যে নূতন অর্থের ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহার অবলম্বনে প্রণয়-লীলার এই বলিষ্ঠ-ভাবকল্পনা সুস্পষ্ট ধরা পড়িয়াছে।

পুষ্পধনু মনসিজ একদা সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসীর ক্রোধপঞ্চশরে ভস্মীভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু সমস্ত সৃষ্টি-প্রেরণার মূলে হইতেছেন মনসিজ; তাঁহার বিনাশের অর্থ সৃষ্টিরই বিনাশ। কাজেই কবি সেই অতনু মনসিজকে আহ্বান করিতেছেন ভস্ম-অপমান ছাড়িয়া উজ্জীবিত হইতে, কিন্তু মনসিজের পুরাতন পৌরাণিক রূপে কবি তাঁহার উজ্জীবন কামনা করেন না। তিনি কামনা করেন, যাহা স্থূল, যাহা মূঢ়, যাহা রূঢ় তাহা ভস্মের মধ্যেই পড়িয়া থাকুক, যাহা অমৃত, যাহা অবিস্মরণীয় তাহাই উজ্জীবিত হউক।

মৃত্যুঞ্জয় তব শিরে মৃত্যু দিলা হানি,
অমৃত সে মৃত্যু হতে দাও তুমি আনি।
সেই দিব্য দীপ্যমান দাহ,
উন্মুক্ত করুক অগ্নি-উৎসের প্রবাহ।
মিলনেরে করুক প্রখর
বিচ্ছেদেরে করে দিক দুঃসহ সুন্দর।
* * * *
দুঃখে সুখে বেদনায় বন্ধুর যে-পথ,
সে দুর্গমে চলুক প্রেমের জয়রথ
তিমির তোরণে রজনীর
মন্দ্রিবে সে রথচক্র নির্ঘোষ গম্ভীর।
উল্লঙ্ঘিয়া তুচ্ছ লজ্জা ত্রাস
উচ্ছলিবে আত্মহারা উদ্বেল উল্লাস।
মৃত্যু হতে ওঠো, পুষ্পধনু
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু·

তারপর এই ধুয়া চলিয়াছে প্রায় প্রত্যেকটি প্রণয় কবিতায়—

আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা
গড়িব না ধরণীতে
মুগ্ধ ললিত অশ্রু-গলিত গীতে।
* * *
উড়াবো উর্ধ্বে প্রেমের নিশান
দুর্গম পথমাঝে
দুর্দম বেগে, দুঃসহতম কাজে। ('নির্ভয়')

যাবোনা বাসর কক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিনী,
আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী।
বীরহস্তে বরমাল্য লবো একদিন
* * *
বিনম্র দীনতা
সম্মানের যোগ্য নহে তার,—
ফেলে দেবো আচ্ছাদন দুর্বল লজ্জার। ('সবলা')

সেবা কক্ষে করিনা আহ্বান ;—
শুনাও তাহারি জয়গান
যে বীর্য বাহিরে ব্যর্থ, যে ঐশ্বর্য ফিরে অবাঞ্ছিত,
চাটুলুব্ধ জনতায় যে-তপস্যা নির্মম লাঞ্ছিত। ('প্রতীক্ষা')

কিন্তু আর দৃষ্টান্ত উল্লেখের প্রয়োজন আছে কি ? প্রণয়-লীলার নানা পরিবেশ নানা অবস্থা নানা অনুভূতির ভিতর কবি এই কথাটাই "মহুয়া"র অধিকাংশ কবিতায় নানাভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

কিন্তু প্রেম-কল্পনার অন্য পরিচয়ও "মহুয়া"র কয়েকটি কবিতায় আছে, যেমন 'বিদায়' বা 'পথের বাঁধন' শীর্ষক কবিতায় এবং আরও কয়েকটি কবিতায়। এই কবিতাগুলির কয়েকটি বিশেষভাবে "শেষের কবিতা" কাব্যোপন্যাসের জন্য লেখা হইয়াছিল। ইহাদের সঙ্গে

"মহুয়া"র অধিকাংশ কবিতার ভাব-প্রসঙ্গের আত্মীয়তা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হয়, অনুভূতির তীব্রতায় ও মাধুর্যে প্রণয়-লীলার সহজ রসে ও রহস্যে এবং বক্তব্যের সজ্ঞানতার অনুপস্থিতিতে এই কবিতাগুলি একটু অন্য গোত্রের, এবং অধিকতর রসদীপ্ত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা চলে, কবির সুবিখ্যাত দু'টি গানের আদি ভাব-রূপ "মহুয়া"র দু'টি কবিতায় পাওয়া যায়। 'বরণডালা' কবিতার 'আজি এ নিরালা কুঞ্জে, আমার অঙ্গমাঝে' এবং 'উদ্‌ঘাত' কবিতার 'অজানা জীবন বাহিনু, রহিনু আপন মনে,' পরে যথাক্রমে 'আমায় ক্ষম হে ক্ষম, নমো হে নমঃ' এবং 'জানি তোমার অজানা নাহিগো, কী আছে আমার মনে' শীর্ষক দুটি সুবিখ্যাত গানে রূপান্তর লাভ করিয়াছে।

"মহুয়া"র ঠিক দুই বৎসর পর ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে "বনবাণী" প্রকাশিত হয়। "বনবাণী" এই নিসর্গবিশ্ব এবং উদ্ভিদ প্রাণীর প্রশস্তি-কাব্য। এই কাব্যে কবির চিরপুরাতন অথচ চিরনবীন ঐতিহ্য-সমৃদ্ধ গভীর নিসর্গবোধ এবং বিশ্বমৈত্রী ও করুণা নানারূপ ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহার বস্তু ও ভাবপ্রসঙ্গ চারিটি ভাগে বিন্যস্ত। প্রথমভাগ 'বনবাণী'তে আরণ্যক পশুপক্ষী ও তরুলতার প্রশস্তি; এই ভাগের সবই কবিতা। দ্বিতীয় ভাগ 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা'য় মুক্তি, যৌবন ও চিরনবীনতার বন্দনা। এক একটি ঋতু বিশ্বের এক এক নূতন রূপ, ঋতুগুলি নটরাজের নৃত্যপীঠ; এই নৃত্যপীঠ চির নূতন, পুরাতনকে কাটিয়া ছিঁড়িয়া উড়াইয়া দেওয়াই তাঁহার ধর্ম। "নটরাজের তাণ্ডবে তাঁর এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হয়ে প্রকাশ পায়, তাঁর অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশের রসলোক উন্মথিত হতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকাশের এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে

যোগ দিতে পারলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে সব বন্ধনমুক্ত হয়।" কবির অতি পুরাতন মর্মবাণী, যে-বাণী আমরা বারবার শুনিয়াছি "বলাকায়" "শারদোৎসবে", "ফাল্গুনী"তে, অসংখ্য কবিতায়, গানে, নিবন্ধে বক্তৃতায়; তবু সেই পুরাতন কথাই কবি বার-বার নূতন রূপে ও রসে, নূতন রহস্যে আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত করেন। "নটরাজ" পালা গান; সুতরাং ইহার অধিকাংশই গান, কয়েকটি রস-সমৃদ্ধ কবিতাও আছে। তৃতীয়ভাগে 'বর্ষামঙ্গল ও বৃক্ষরোপণ উৎসব'; এক্ষেত্রেও বস্তুপ্রসঙ্গ এক। একদিকে বৃক্ষপ্রশস্তি, আর একদিকে ঋতু বন্দনা। চতুর্থ ভাগ 'নবীন' গীতিনাট্যে বসন্তবন্দনা, যাহার অর্থ চির নূতন ও চির যৌবনেরই বন্দনা। এই দুই বিভাগেও অধিকাংশই গান, কয়েকটি কবিতাও আছে।

"বনবাণী" গ্রন্থের ভূমিকায় কবি বলিতেছেন,

"আমার ঘরের আশে পাশে যে-সব আমার বোবা বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌঁছলো। তাদের ভাষা হচ্ছে জীবজগতের আদিভাষা তার ইশারা গিয়ে পৌঁছয় প্রাণের প্রথমতম স্তরে; হাজার হাজার বৎসরের ভুলে যাওয়া ইতিহাসকে নাড়া দেয়; মনের মধ্যে যে-সাড়া ওঠে সেও ঐ গাছের ভাষা,—তার কোন স্পষ্ট মানে নেই, অথচ তার মধ্যে বহু যুগযুগান্তর গুনগুনিয়ে ওঠে। * * * আরণ্যক ঋষি শুনতে পেয়েছিলেন গাছের বাণী—বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবিতিষ্ঠত্যেকঃ। শুনেছিলেন, যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং। তাঁরা গাছে গাছে চিরযুগের এই প্রশ্নটি পেয়েছিলেন, কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ—প্রথম-প্রাণ তার বেগ নিয়ে কোথা থেকে এসেছে এই বিশ্বে? * * * সেই প্রথম প্রাণ-প্রৈতির নবনবোন্মেষশালিনী সৃষ্টির চিরপ্রবাহকে নিজের মধ্যে গভীর ভাবে বিশুদ্ধভাবে অনুভব করার মহাযুক্তি আর কোথায় আছে? * * *"

উদ্ধৃত মন্তব্য হইতেই বুঝা যাইবে কবির দৃষ্টিতে নিসর্গ-ভাবনা কিছুতেই জড় প্রকৃতির ভাবনা মাত্র নয়। বস্তুত কিশোর বয়সেই

রবীন্দ্রকবিমানস প্রকৃতিকে দেখিতে শিখিয়াছিল মানবিক চেতনার দৃষ্টি দিয়া, মানবীয় অনুভূতির ব্যঞ্জনা নিসর্গ দৃশ্যের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া। এ বিষয়ে কবি বিহারীলাল এবং ইংরেজ রোম্যান্টিক কবিগোষ্ঠী তাঁহাকে যে-দৃষ্টি দান করিয়া গিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ উত্তর-কালে কখনও তাহা বিস্মৃত হন নাই। বস্তুত নিসর্গের এই নূতন পরিচয় ক্রমশ গভীরতর হইয়াছে এবং সর্বশেষে এক গভীর আধ্যাত্মিক সত্তার সমন্বয়ের মধ্যে কবি নিসর্গ-বিশ্বের এক নূতন অর্থগভীর পরিচয় লাভ করিয়াছেন। "বনবাণী"র নিসর্গ-বন্দনার কবিতা গুলিতে সেই পরিচয় সুস্পষ্ট। কিশোর কাব্য-প্রচেষ্টার নিসর্গ-বর্ণনা, "সোনার তরী"র নিসর্গ-সম্ভোগ, "চিত্রা"র নিসর্গ-জিজ্ঞাসা ক্রমশ "বলাকা-পূরবী"র গভীর অধ্যাত্ম-ব্যঞ্জনার ভিতর দিয়া নূতন অর্থনির্দেশে সমৃদ্ধ হইয়া "বনবাণী"তে ঔপনিষদিক সমন্বয় লাভ করিয়াছে; তাহার ভিতর জীবেতিহাসের আদিমতম ভাষার, প্রাণের প্রথমতম পরিচয়ের, যুগ যুগান্তরের সুপ্রাচীন ইতিহাসের যে-বিস্ময়, যে-রহস্য সেই বিস্ময় ও রহস্য "বনবাণী"র কয়েকটি সার্থক কবিতায় বাণীরূপ লাভ করিয়াছে। দুর্লভ মুহূর্তেই কেবল মানুষ বৃক্ষ-বন-অরণ্যের লতা-ফুল-ফলের বাণী শুনিতে পায়; এবং ঐতিহ্য-সমৃদ্ধ মনন-কল্পনাতেই শুধু সেই বাণী রূপ লইতে পারে। "বনবাণী"র শুধু হ্রস্ব ও দীর্ঘ কবিতাগুলিতেই যে সেই রূপ বাঁধা পড়িয়াছে এমন নয়, অনেকগুলি সার্থক গানেও।

"বনবাণী"র কবিতাগুলি পড়িতে পড়িতে একটা কথা বারবার মনে জাগে; রবীন্দ্র-কাব্যের অন্যত্রও এ-প্রশ্ন মনকে অধিকার করে, তবু "বনবাণী" যেন এ-প্রশ্নটিকে একেবারে ঠেলিয়া সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করে। রবীন্দ্রনাথের কল্প-দেবতা কি শিব? আমাদের পুরাণ ঐতিহ্যে ধূর্জটি, নটরাজ, মহাকাল, ভৈরব প্রভৃতি বিচিত্র নামে যিনি পরিচিত এবং যাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের ভারতীয় মানসে নাট্য ও নৃত্য,

ঋতু ও কাল, জীবন ও মৃত্যু, ইহকাল ও পরকাল, সৃষ্টি ও প্রলয় প্রভৃতি সম্বন্ধে বিচিত্র প্রত্যয়-ভাবনা আবর্তিত, গঠিত ও সঞ্চিত হইয়া আছে, সেই নটরাজ শিবই কি কবির কল্পদেবতা ? যে শিব রুদ্র, যিনি ভয়াল, যিনি আমাদের জীবনকে নিত্য নূতন বিপদের বিস্ময় অগ্নি-পরীক্ষায় আহ্বান করেন, যিনি সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসী, যিনি দক্ষবিতাড়িত শ্মশানচারী অনার্য তাপস, যিনি একদিকে সতীর প্রেমে উন্মত্ত, অন্যদিকে হিমালয় দুহিতা উমা যাঁহার প্রেমের কাঙাল, যিনি আবার কল্যাণ ও মঙ্গল, গভীর গম্ভীর রস ও সৌন্দর্যের, রূপ ও রহস্যের আধার সেই বেদ-ভারত-পুরাণ কীর্তিত ভোলা মহেশ্বরের সমন্বিত ঐতিহ্য-কল্পনা রবীন্দ্রনাথের মনন-কল্পনাকে কি গভীর ভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ভারতীয় ঐতিহ্যের আর কোনও দেব-দেবী কল্পনাই এমন গভীর ভাবে এমন সর্বতোভদ্র সমন্বতায় রবীন্দ্র-চিত্তকে স্পর্শ করে নাই। বাংলার মাটিতে বাংলার আকাশ-বাতাসের মধ্যে বর্ধিত হইয়া রবীন্দ্রচিত্তে রাধাকৃষ্ণের ঐতিহ্য-কল্পনা মূল প্রসারিত করিতে পারিল না, লক্ষ্মী বা সরস্বতী বিশেষ আমল পাইলেন না, বিষ্ণু ব্রহ্মা অবজ্ঞাতই রহিলেন, এ-তথ্যের বিস্ময় সংস্কৃতির ইতিহাসে অবজ্ঞা করিবার মতন নয়। একথা অবশ্য সত্য যে নটরাজ শিব-মহেশ্বরকে কেন্দ্র করিয়া ভারতীয় ঐতিহ্য-কল্পনার যে-সমৃদ্ধি, আর কোনও দেবদেবী সম্বন্ধেই সে-সমৃদ্ধির কথা বলা যায় না ; ভারতীয় মানস আর কোনও দেব-দেবী অবলম্বন করিয়া কল্পনার এতটা প্রসারতা বা গভীরতা লাভ করে নাই। নরতত্ত্ব এবং জাতি-তত্ত্বের মধ্যে ইহার কারণ অনেকাংশে নিহিত সন্দেহ নাই, কিন্তু এ-প্রসঙ্গে সে-ইতিহাস আলোচনা অবান্তর। জ্ঞাতব্য তথ্য এইটুকু যে রবীন্দ্রচিত্তে এই সমৃদ্ধ ঐতিহ্য-কল্পনার প্রসার সুস্পষ্ট, এবং এই হিসাবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রাচীন যুগের কবিদের এবং মধ্যযুগের বাংলা

লোক-কাব্যের লেখকদের মনন-কল্পনার আত্মীয়তা অনস্বীকার্য। তবে রবীন্দ্রনাথের মনন-কল্পনা আরও গভীর ব্যাপক ও সমৃদ্ধ।

পূর্বোক্ত উক্তি বিস্তৃত ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না; ইহার প্রমাণ রবীন্দ্রকাব্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। এ তথ্য কিছুতেই মনোযোগী পাঠকের দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয় যে, যেখানেই নিসর্গের রুদ্র ভয়ংকর রূপের বা রুক্ষ বৈরাগী নিঃস্ব ধূসর তপস্যার রূপের কল্পনা, যেখানেই কালের আবর্তন বিবর্তন লীলার কল্পনা, ঋতু পরিবর্তনের কল্পনা, যৌবনের রুদ্র বিপ্লবী রূপের কল্পনা, প্রেমের ও সৌন্দর্যের গভীর গম্ভীর লীলা-রহস্যের কল্পনা, সেইখানেই রবীন্দ্রমানস আশ্রয় করিয়াছে শিবের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে। প্রেমসাধনার মধ্যে যে তপস্যার রূপ এবং যে-রূপের প্রতি রবীন্দ্রমানসের অনুরাগ সুস্পষ্ট, তাহাও ত রবীন্দ্রনাথ আত্মস্থ করিয়াছেন—যেমন করিয়াছেন কালিদাস—ভারত-পুরাণ ধৃত মহেশ্বরের ঐতিহ্য হইতে। হিমালয়ের এবং তাহারই পটভূমিকায় শিব ও উমার যে গভীর গম্ভীর কল্পনারূপ রবীন্দ্রকাব্যে থাকিয়া থাকিয়া আভাসে ইঙ্গিতে উপমায় ব্যঞ্জনায় ব্যক্ত হইয়াছে তাহারও মূলে ঐ শিবায়ন। আর, ঋতুরঙ্গশালার যাহা কিছু উৎসব, নৃত্যেগীতে নাট্যভঙ্গিমায় মহাকালের যে ছন্দরূপ তাহা ত একান্তই দক্ষিণ ভারতীয় নটরাজ শিবের কল্পনা ঐতিহ্যগত; চিত্তাকাশই (চিদম্বরম্) ত মহাকালের নৃত্যলীলার যথার্থ পাদপীঠ, এবং এই কল্পনাকে আশ্রয় করিয়াই ত রবীন্দ্র-মনন-কল্পনাও প্রসারিত হইয়াছে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শুধু শিব-ঐতিহ্য আত্মসাৎ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি তাহাকে নিজস্ব মনন-কল্পনায় সমৃদ্ধও করিয়াছেন। "পূরবী"র 'তপোভঙ্গ' কবিতায় অথবা ঋতুরঙ্গশালার গানে ও কবিতায়, "বনবাণী"র এক একটি কবিতায় যে শিব-ঐতিহ্য একটি অখণ্ড সমন্বিত রূপে ধরা পড়িয়াছে তাহার অনেকখানি বেদ-ভারত-পুরাণ বহির্ভূত। অনেক-

ক্ষেত্রেই কবি প্রাচীন ঐতিহ্যকে প্রসারিত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি নূতন অর্থনির্দেশ করিয়াছেন, নূতনতর ব্যঞ্জনায় তাহাকে আরও গভীরতা ও ব্যাপকতা দান করিয়াছেন। এক কথায় বলা চলে, আজিকার দিনে আমরা যে শিব-নটরাজ ঐতিহ্যের অধিকারী হইয়াছি তাহাতে রবীন্দ্রনাথের দান তুচ্ছ করিবার মতন নয়।

(১০)

রবীন্দ্র-প্রতিভা যখন প্রায় মধ্যগগন স্পর্শ করিয়াছে তখন বাংলাদেশে নূতন স্বদেশ ও স্বাজাত্যবোধের প্রথম অরুণোদয়; আর যখন সেই প্রতিভা-সূর্য অস্তমিত হইল তখন সমগ্র পৃথিবী জুড়িয়া ধন ও রাজ্যলোভে বিভ্রান্ত, প্রভুত্বমদে মত্ত নরমাংসলুব্ধ শ্মশান কুক্কুরদের কাড়াকাড়ির উন্মত্ত নৃত্য চলিয়াছে। কাল সমুদ্রের এই দুই বিন্দুর মাঝখানে বিচিত্র ভাব ও আদর্শে বিক্ষুব্ধ, বিচিত্র চিন্তা, স্বপ্ন ও কল্পনায় লীলাচঞ্চলিত বাংলাদেশের একটি সুদীর্ঘ ঘটনাবহুল অধ্যায় বিধৃত হইয়া আছে। যে মৃত্যুঞ্জয়ী প্রতিভার সৃষ্টির মধ্যে এই সুদীর্ঘ অধ্যায়টির সমগ্ররূপ একটি অখণ্ডতায় ধরা পড়িয়াছে সে-প্রতিভার অধিকারী একক রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। বস্তুত, বাংলাদেশের গত পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাস রবীন্দ্র-কবিমানসের প্রকাশ ও পরিণতির ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথ ত একক একজন নহেন, একটি ঐতিহ্যময় প্রতিষ্ঠান বলিলেও তাঁহাকে কম করিয়া বলা হয়; তিনি একাই একটি যুগ, এবং এই যুগটির ধর্ম ও প্রকৃতি, রূপ ও রহস্য সমস্তই রবীন্দ্র-মানস-প্রকাশের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে একটি অখণ্ড সমগ্ররূপে। এই অর্ধ শতাব্দীর একপ্রান্তে গঙ্গা-পদ্মা-মেঘনা-ব্রহ্মপুত্র বিধৌত, সংকীর্ণ স্বল্পপরিসর গ্রাম্যজীবনমুখর, গীতি ও কল্পনাসমৃদ্ধ বাংলার বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্র; ইহার অন্যপ্রান্তে কোলাহল

মুখর, গর্বোদ্ধত, আত্মশক্তিতে দৃঢ় ও সচেতন, সংগ্রাম বিক্ষুব্ধ সুবিস্তৃত সাম্প্রতিক পৃথিবী। অজানিত ভাব ও চিন্তাবৈচিত্র্যে বিপর্যস্ত এই দুস্তর কাল সমুদ্রের খণ্ড খণ্ড রূপ ও অংশকে একটি অখণ্ড সমগ্ররূপে এমন করিয়া সৃষ্টির মালায় গাঁথিয়া তোলার সৌভাগ্যের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে খুব বেশি নাই।

রবীন্দ্রনাথের বাল্য-পরিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল কলিকাতায়, যে-কলিকাতা তখন বিদেশী ধনিক-রাষ্ট্রের প্রভুত্বের আওতায় কেবল বর্তমান রূপ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাঁহার প্রতিভার যৌবনোন্মেষ ঘটিল বাংলার সমতলক্ষেত্রে ক্ষীয়মাণ পল্লীসমাজের ছায়ায়, এবং কতকাংশে নগর-নির্ভর, নূতন ও অগ্রসর মধ্যবিত্ত-সমাজের উজ্জ্বল কিরণপাতে। তারপর, পঞ্চাশোর্ধ্বে তিনি পদক্ষেপ করিলেন বৃহত্তর পৃথিবীর আঙ্গিনায় যেখানে ইতিমধ্যেই উনবিংশ শতকের শেষপাদ এবং বিংশ শতকের প্রথম যুগের বিচিত্র ও গভীর সমাজ-মানসের চঞ্চল জীবন-নাট্যের অভিনয় আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ব্যক্তিগত জীবনের এই ইতিহাসের মধ্যে বাংলাদেশের সমাজ-মানসের ইতিহাসের ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন। এই সুদীর্ঘ ব্যক্তি-ইতিহাসের, আর বাংলার নগর-নির্ভর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ-জীবনের সঙ্গে বৃহত্তর পৃথিবীর প্রবহমাণ জীবনধারার যোগ এবং বাঙালীর সমগ্র জীবনে পরদেশী ধনিকরাষ্ট্র-বাহিত বৃহত্তর পৃথিবীর জীবনধারার অসংখ্য শাখা-প্রশাখার বিস্তার—এ-দু'য়ের মর্মবাণী ও ঐতিহাসিক ইঙ্গিত একই। এই উভয়ই রবীন্দ্র-মানসপ্রকাশের ভিতর একটি অখণ্ড ঐক্যে রূপায়ন লাভ করিয়াছে, এবং এই হিসাবে রবীন্দ্রনাথ যে-ভাবে একটি দেশ ও কালের মানস-প্রতীক, পৃথিবীর সংস্কৃতির ইতিহাসে তাহার তুলনা খুব বেশি নাই। গত পঞ্চাশ বৎসরে বাংলাদেশে ছোটবড় এমন কোন ঘটনা ঘটে নাই, এমন কোন ভাব, কল্পনা বা চিন্তার রশ্মিপাত হয় নাই,

যাহা রবীন্দ্র-চিত্তকে কোন না কোন ভাবে স্পর্শ করে নাই; বস্তুত আমাদের মানসজীবনের সকল দিক ও সকল স্তর তাঁহারই প্রতিভার মায়াস্পর্শে ভাবান্বিত ও রূপান্বিত হইয়াছে, তিনিই আমাদের গভীরতর সমাজ-মানসকে প্রকাশ করিয়াছেন। পদ্মা-ভাগীরথীর পলিমাটি হইতে তিনি গড়িয়া তুলিয়াছেন যাহাকে বলি আমরা বর্তমান বাংলাদেশ। বিগত পঞ্চাশ ষাট বৎসরে বাঙালী সজাগ চিত্তে স্বদেশ ও পৃথিবীর যত তরঙ্গাঘাত লাগিয়াছে রবীন্দ্রনাথের সুবিস্তৃত সাহিত্যে, রবীন্দ্র-মহাভারতে সে আঘাত কোন না কোন চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। সুদীর্ঘ ইতিহাসের একটি স্তর কখন পরবর্তী স্তরে বিবর্তিত হইয়াছে, কখন পরবর্তী স্তর বা স্তরগুলির ভিতর দিয়া দূরতম স্তর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে; কখন অতীত ও বর্তমান একই স্তরে একীভূত হইয়া ভবিষ্যতের সমন্বয়িত রূপের দিকে ইঙ্গিত করিয়াছে, এবং সকল স্তর একত্র গ্রথিত হইয়া একটি অখণ্ড চলমান রূপ রচনা করিয়াছে। বস্তুত রবীন্দ্র-কবিজীবন গতির চাঞ্চল্যে প্রাণবান, তিনি চিরপথিক, অবারণ তাঁহার বিরামহীন গতি; সে-গতি মৃত্যুতে শুধু আসিয়া থামিল। থামিলই বা বলি কেন, রবীন্দ্রনাথ ত বারবার বলিয়াছেন, সৃষ্টির এই গতি মৃত্যুতেও আসিয়া থামে না, মৃত্যুস্নানে শুচি হইয়া জীবন নূতন রূপ পরিগ্রহ করে। আমাদের ঋষিকবি ও কবিঋষিরাও ত এই কথাই না বলিয়াছেন! কিন্তু সে যাহাই হউক, রবীন্দ্র-কবিমানসের এই সচেতন গতিধর্ম, সহজ প্রাণবান প্রাগ্রসরতার ধর্ম, এ-ধর্ম সহজে রবীন্দ্র-সাহিত্যপাঠকের দৃষ্টিগোচর হয় না; বিশেষ করিয়া তাঁহার কাব্য যখন আমরা খণ্ড খণ্ড রূপে পাঠ করি, খণ্ডিত দৃষ্টি ও অনুভূতির রূপে ও রসে যখন ডুবিয়া যাই তখন সেই অখণ্ড সমগ্র রূপ এবং তাহার সচেতন প্রাণবান গতিধর্ম আমাদের দৃষ্টি ও মন এড়াইয়া যায়।

রবীন্দ্র-মানস-প্রকাশের কোন পর্বেই এই সচেতন প্রাণবান গতি-

ধর্ম অনুপস্থিত নয় ; তিনি ত চিরকালই কালের রথের রথী। এই প্রাণ-বান গতিধর্ম কৈশোরের "প্রভাত-সংগীতে"ও যেমন স্বপ্রকাশ, ঠিক তেমনই স্বপ্রকাশ পরিণত বয়সের "বলাকা" ও পূরবী"তে, এমন কি মধুর ও কোমল "মহুয়া"তেও। এই গতিধর্মের রূপ সর্বত্র এক নয়, একথা সত্য, তবে সর্বত্রই ইহার রূপ প্রকাশ পাইয়াছে জীবনের এমন একটা গভীর তরঙ্গাঘাত হইতে যাহা উপরকার লীলাচাঞ্চল্যকে অনেক সময় আবৃত করিয়া রাখে শিল্পের ও সৌন্দর্যেরই প্রয়োজনে। জীবনের এই প্রাণবান গতিধর্ম, গভীরতম স্তরের লীলাচাঞ্চল্যকে কবি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কখনও ভাবমুগ্ধ বিস্ময়ের স্বপ্নবিহ্বলতায়, কখনও আদর্শলোকের ঊর্ধ্বমুখী কল্পনায়, কিন্তু তাঁহার একান্ত গীতধর্মী কবিতা কিংবা সাংকেতিক নাট্যেও তাঁহার বিস্ময়- বিহ্বল দৃষ্টি অথবা আদর্শবাদী কল্পনা তাঁহাকে কখনও মাটির ধরণী এবং ধরণীর মাটি দিয়া গড়া মানুষের বস্তুমূল হইতে একেবারে একান্তভাবে বিচ্ছিন্ন করে নাই। 'জন্ম-রোম্যান্টিক' রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্সের প্রকৃতি সত্যই একটু ভিন্ন ধরনের। বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে এক ধরনের চেতনা তাঁহার বহু-দিনই ছিল, কিন্তু এই বস্তু-প্রকৃতির চেতনায় সচেতন ঐতিহাসিক বোধের স্পর্শ পাইতে এবং ঐতিহাসিক চেতনা দ্বারা তাহাকে সমৃদ্ধ করিতে কবিকে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল পরিণত বয়স পর্যন্ত ; বস্তুত তাঁহার পরিচয় আমরা পাইলাম কবিগুরুর সত্তর বৎসরের পর, শেষের দশ বৎসরের রচনায়। স্বাধীন ও অনেকাংশে সংস্কারমুক্ত অথচ বোধ ও বুদ্ধির গভীর অনুশাসন দ্বারা শাসিত মন রবীন্দ্রনাথের অনেকদিনই ছিল ; কিন্তু যে মুক্ত বিশুদ্ধ মানব পরিস্রুত স্বচ্ছ দৃষ্টিতে সৃষ্টিরহস্য, মানব-প্রগতির রহস্য দেখিতে পায় সে-দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথ অর্জন করিয়াছিলেন জীবনের শেষ দশটি বৎসরে। কবিজীবনের শেষ দশটি বৎসর একটি নূতন অধ্যায়,—নূতন, কিন্তু পুরাতন প্রবহমাণ জীবনধারার প্রাক্তন

অধ্যায়গুলি হইতে বিচ্ছিন্ন বা বিযুক্ত নয়, তাহাদের সঙ্গে ভিতরকার ঐক্যসূত্রে গাঁথা; একটু অন্য ভাবে বলিতে গেলে বলা যায়, নূতন অধ্যায়টি পুরাতন অধ্যায়গুলিরই পূর্ণ প্রস্ফুটিত রূপ, কার্যকারণ সম্বন্ধে গাঁথা জীবনপ্রবাহের পূর্ণ ঐতিহাসিক রূপ।

কয়েকটি তথ্য উল্লেখযোগ্য। ১৯৩০'এ রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েট রাশিয়া ঘুরিয়া আসিলেন, এমন সময়ে যখন সমস্ত পৃথিবী নিদারুণ অর্থ দৈন্যে পীড়িত; ভারতবর্ষও এই পীড়া হইতে বাদ পড়ে নাই। ১৯৩১'এ প্রকাশিত হইল "রাশিয়ার চিঠি" যাহাতে কবিগুরুর মনের ও মননের গতি স্বপ্রকাশ। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এই বৎসরেই আমরা দেখিলাম ভারতবর্ষে দ্বিতীয় অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থ পরিণতি, এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশ জুড়িয়া সাম্রাজ্যবাদের নিষ্করুণ অত্যাচার ও অবিচারের সূত্রপাত, ব্যক্তিস্বাধীনতা বিলোপের বিচিত্র প্রচেষ্টা। সাম্প্রতিক সোভিয়েট রাশিয়ার পটভূমিতে দেশের এই নিঃস্ব ও নিঃসহায় অবস্থা যেন আরও বেশি প্রকট হইয়া উঠিল। তাহা ছাড়া, ইহার সঙ্গে ক্রমবর্ধমান আর্থিক দুর্গতি ত ছিলই। এই দারুণ দুর্গতির মধ্যেও দেশের আনাচ কানাচ হইতে এক নূতন বাণীর, নূতন যুগাদর্শের, মানবতার এক নূতন আদর্শের ক্ষীণ ও অস্পষ্ট আহ্বান মাঝে মাঝে শোনা যাইতেছিল, এমন সময়ে ১৯৩৬ ও আর একবার ১৯৩৭'র লক্ষ্ণৌ ও ফয়জাবাদের সভাপতিমঞ্চ হইতে জবাহরলাল নেহরু সেই ক্ষীণ অস্ফুট আহ্বানকে স্পষ্ট বাণীরূপ দান করিয়া তাহার কর্মরূপের মধ্যে সমস্ত দেশকে আহ্বান করিলেন। কিন্তু দু'দিন যাইতে না যাইতেই সরকারী ও বেসরকারী নিষ্পেষণ যন্ত্র রাজপথে নামিয়া গেল, এবং সকল প্রকার প্রগতিবাদী দল ও আন্দোলনগুলির কণ্ঠ ও হস্তরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। অন্যদিকে বিচ্ছিন্ন ও বিভ্রান্ত এই দল ও আন্দোলনগুলি অযথা চীৎকার ও বাগ্‌বিস্তারে নিজেদের শক্তিও ক্রমশ হারাইয়া

ফেলিতে আরম্ভ করিল। বিদেশে, ১৯৩৬'এ ফ্যাসিস্ট ইতালি অতর্কিতে দুর্বল হাবসীদের গ্রাস করিল, এবং দর্পোদ্ধত জাপান মুক্তিসংগ্রামরত চীনের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে সমগ্র য়ুরোপ জুড়িয়া আর্থিক ও রাষ্ট্রিক মুক্তির নীতি ও আদর্শ একেবারে নিম্নতম-স্তরে নামিয়া গেল, দেখিতে দেখিতে শক্তির নিষ্ঠুর দন্তপংক্তি মানবতার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। কবির একতম ভালবাসার পাত্র প্রিয়তম মানুষের পায়ের শৃঙ্খল আরও কঠিন হইয়া বাঁধা পড়িল; যে-মানবতার বেদী ছিল কবির পূজা-নৈবেদ্যের একতম বেদী সেই বেদী হইল সর্বত্র ধূলিবিলুণ্ঠিত। এবং সর্বশেষে, ১৯৩৯'এ মানুষ এবং মানবতার ভবিষ্যৎ নিক্ষিপ্ত হইল ধ্বংস ও মৃত্যুর ঘূর্ণীচক্রে।

পৃথিবীর এই দৃশ্যপট যখন মনের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল সেই সময়ই অন্যদিকে কবির মনের মধ্যে ছায়াপাত করিতেছে মৃত্যুর অস্পষ্ট অগ্রসরমান মূর্তি; জীবন-মোহনার পার হইতে মৃত্যুদূতের ক্ষীণ পদ-ধ্বনি কানে আসিয়া বাজিতেছে। ১৯৩১'এ তিনি সত্তর অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন, দেশ জুড়িয়া রাজকীয় সমারোহে তাঁহার জয়ন্তী-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। ১৯৩৭'এ কবি হঠাৎ নিদারুণ রোগে আক্রান্ত হইলেন, কিন্তু কঠিন সংগ্রামের পর বাঁচিয়া উঠিলেন এবং সুপক্ক পরিণত জীবনের শক্তি ও দীপ্তি খানিকটা ফিরিয়া পাইলেন। ১৯৪০'এ মৃত্যুর সঙ্গে নিদারুণ সংগ্রাম আবার আরম্ভ হইল, সুদীর্ঘ কয়েক মাস শুধু আত্মার অপরাজেয় শক্তিতে তাহার সঙ্গে যুঝিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হার মানিয়া জয়ী হইয়া আমাদের নিকট হইতে বিদায় লইলেন। কিন্তু এই দশ বৎসর ক্রমশই তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন, মৃত্যু শুধু তাঁহার জীবনেই আসিতেছে না, মৃত্যু তাহার সমস্ত মারণ-যন্ত্র ও দলবল লইয়া অগ্রসর হইতেছে এই ধ্বংসোন্মুখ মানবধর্মবিরোধী সভ্যতা ও সমাজ-ব্যবস্থার অন্তিম শয্যার দিকেও। অথচ এই সভ্যতা ও সমাজ

ব্যবস্থাকেই একদিন তিনি মানিয়া লইয়াছিলেন, স্বীকার একদিন করিয়াছিলেন এই ভাবিয়া যে, ইহারই ভিতর হইতেই একদিন চিরন্তন মানবধর্ম হইবে জয়ী, মানুষ তাহার মুক্তি অর্জন করিবে।

এই ছিল মানুষ ও পৃথিবীর প্রবাহ যাহার তরঙ্গ আসিয়া প্রতি মুহূর্তে আঘাত করিতেছিল কবির চিত্ততটে; ইহার প্রত্যভিঘাত কি ভাবে কবির মন ও কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, কি ভাবে ইহাদের প্রকাশকে বাণীরূপ দান করিয়াছে তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে কবির দশ বৎসরের রচনায়। স্পর্শালু কবিচিত্তের মণিকোঠায় বিশ্ব-জীবনের বিচিত্র তরঙ্গাঘাত কত সূক্ষ্ম-লীলায় কত বিচিত্র রূপান্তর গ্রহণ করে তার বহুল পরিচয় এই রচনাগুলিতে পাঠকের দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়। এই রূপান্তরের ধর্ম ও প্রকৃতি যদিও একান্ত ভাবে অদ্বৈতাচারী, এবং প্রকাশ একান্ত ব্যক্তিগত, তাহা হইলেও ইহার ভিতর গত দশ বৎসরের সমাজ-মানসের সমগ্রতার পরিচয়ও সমান প্রত্যক্ষ।

প্রত্যভিঘাতের রূপগুলিও সহজ ও সুস্পষ্ট। বাংলাদেশের ও পৃথিবীর তিনপুরুষের ইতিহাস তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি সবই দেখিয়াছেন, সবই জানিয়াছেন, দেখিয়াছেন ও জানিয়াছেন কবির দৃষ্টি ও মন দিয়া যে-দৃষ্টি ও মনের কাছে কিছুই তুচ্ছ নয়, কিছুই অধরা নয়। যত কিছু মহৎ আদর্শ ছিল তাঁহার প্রিয়, পরিপূর্ণ মানবতার যে-আদর্শ তিনি গড়িয়া তুলিয়াছেন সমগ্র জীবনের সাধনা দিয়া, পরিণত বয়সে জীবনের সায়াহ্নে তিনি দেখিলেন সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়া মাটির ধূলায় লুটাইতে। বিগত দিনের স্মৃতি শুধু নিদারুণ লজ্জা ও অপমানের স্মৃতি। নিজের দেশেও যে দৃশ্য চিত্তপটে ভাসিয়া উঠিল তাহাতেও গভীর দুঃখ ও নৈরাশ্য ছাড়া অন্তরে আর কোনও অনুভূতি উদ্রিক্ত হইবার কথা নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কি দুঃখে অভিভূত হইলেন, নৈরাশ্যে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইলেন? মানুষের প্রতিবিশ্বাস ও ভালবাসা কি

তাঁহার চলিয়া গেল? মানবের অপরাজেয় বীর্যে বিশ্বাস, তাঁহার ঐতিহাসিক পরিণতিতে অপরিমেয় বিশ্বাস কি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল? না, তাহা হইল না, একেবারেই হইল না। রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই দুঃখবাদী ছিলেন না, অবিশ্বাস তাঁহার কোন দিনই ছিল না। সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, পৃথিবীর সমস্ত রূপরসগন্ধ নিঃশেষে আহরণ করিয়া নিরাসক্ত মন লইয়া, শান্ত পরিণত মানস লইয়া স্বচ্ছ গভীর দৃষ্টি লইয়া মৃত্যুর তোরণে তিনি দাঁড়াইয়া আছেন; এই স্বচ্ছ পরিণত দৃষ্টি সর্ব আবরণ-মুক্ত মানুষকে তাঁহার চিত্তের নিকটতর করিয়াছে, জীবনের বিচিত্র ও গভীর অভিজ্ঞতা জীবনেরই গভীরতর অর্থ ও মহিমা তাঁহাকে জানাইয়াছে। মৃত্যু তাঁহার জীবনে ঘনাইয়া আসিতেছিল, শেষ খেয়ার জন্য তিনি বহুদিনই প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু তিনি পাড়ি দিবার জন্য উন্মুখ ছিলেন না, যে-পৃথিবীকে তিনি ভালবাসিতেন, যে-মানুষের মধ্যে তিনি অন্তরের শান্তির উৎসকে জানিয়াছিলেন তাহাদের ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার এতটুকু ঔৎসুক্যও তাঁহার ছিল না। সেই জন্যই মানুষে গভীর বিশ্বাস কখনও তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই, তাঁহার দেশের ও পৃথিবীর লোকদের উপর বিশ্বাস কখনও তিনি হারান নাই। ধ্বংস ও মৃত্যু শাশ্বত মানুষের পরিণতি হইতে পারে না; যে-মানুষ কর্ম ও সংগ্রামে রত, 'যে-মানুষ মাটির কাছাকাছি,' যে-মানুষ তাহার পরিবেশের সঙ্গে একাত্মায় যুক্ত, সেই সাধারণ মানুষের ধ্বংস নাই। আর যে-মানবতার আদর্শ সমাজ-ইচ্ছার প্রতিরূপ, যে-মানবতা বস্তুকে অনুরূপ ইচ্ছায় রূপান্তরিত করে সেই আদর্শেরও মৃত্যু নাই। রবীন্দ্রনাথ সেই শাশ্বত সাধারণ মানুষের সঙ্গে, সেই বৃহৎ মানবতার আদর্শের সঙ্গে চিত্তের ও কল্পনার সুগভীর আত্মীয়তা স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং তাহারা তাঁহার কাছে বিনিময়ে মন ও হৃদয় উন্মুক্ত করিয়াছিল যাহার

ফলে কবিগুরুর চিত্তে মানুষ ও মানবতার ঐতিহাসিক বোধ জন্মিয়াছিল। কবি যে তাঁহার পরিণত বয়সে বারেবারে মানুষের সাধারণ জীবনের মধ্যে, প্রাত্যহিক জীবনের সহজ সমতল ক্ষুদ্র তুচ্ছ ঘটনার আবর্তের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন, যে সাধারণ মানুষ খেলা করে, ভালবাসে, খাটে ও গান গায়, প্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশের সঙ্গে হাসে ও কাঁদে, তাহাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন, ইহা কিছু অকারণে নয়। ইতিহাসের বড় বড় ঘটনা, রাজ্য ভাঙ্গাগড়া, বড় বড় বীর ও সম্রাটদের, বড় বড় নেতাদের জীবনের মধ্যে যে তাঁহার কল্পনা এই যুগে প্রসারিত হয় নাই, হইয়াছে অত্যন্ত সাধারণ জীবনের মধ্যে, ইহার ইঙ্গিতও নিরর্থক নয়। বস্তুত সাধারণ মানুষের অফুরন্ত শক্তি ও যৌবনেই তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস; সাধারণ মানুষই যৌবন ও প্রগতির একমাত্র উৎস বলিয়া জানিয়াছেন। পৃথিবীর শক্তি ও যৌবন ত এই সাধারণ মানুষের মধ্যেই বিধৃত হইয়া আছে, যে মানুষ মাটি ভাঙিয়া চাষ করে, যে-মানুষ বার মাস খাটে, যে-মানুষ চির-পথিক, যে-মানুষ আপন শক্তি ও বীর্যে বাঁচে অথবা মরে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন হয় অবিশ্বাসী ও রক্ষণশীল; রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে হইয়াছে ঠিক বিপরীত। গভীরতর অর্থে মানুষ ও পৃথিবীকে তিনি ভালবাসিয়াছিলেন বলিয়াই এই অবাঞ্ছিত পরিণাত হইতে নিজেকে বাঁচাইতে পারিয়াছিলেন। পৃথিবীর যে-সভ্যতা ও সংস্কৃতির তরঙ্গ-পর্যায়ের মধ্যে তিনি দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলেন, সে-সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধ্বংস যে আগাইয়া আসিতেছে তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন এবং তাহার সম্পূর্ণ অর্থও ভাল করিয়াই জানিতেন। এই জ্ঞান যে-কোন মানুষের বিশ্বাসের ও ভালবাসার ভিত্তিভূমিকে টলাইয়া দিবার পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু রবীন্দ্র-মানস পরিণত বয়সে এমন একটা ঐতিহাসিক বোধের অধিকারী হইয়াছে যাহার বলে কবি জানিয়াছেন, সভ্যতা ও সংস্কৃতির

কোন একটা বিশেষ পর্যায়ের ধ্বংস শাশ্বত মানবাত্মার যাত্রাপথে একটি ছেদ মাত্র, নূতন সভ্যতার নবজন্মের একটি বেদনাপর্ব মাত্র। ধ্বংস ও মৃত্যু স্বাভাবিক নিয়মেই আসে স্বাভাবিক কারণেই, মানুষই তাহাকে ডাকিয়া আনে; আবার নূতন স্বপ্নাদর্শ, নূতন সভ্যতা সৃষ্টির অধিকার এবং শক্তিও শুধু মানুষেরই আছে। এই যদি হয় ধ্বংস ও সৃষ্টির, মৃত্যু ও জীবনের মর্মবাণী, তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথ মানুষে বিশ্বাস, মানবতার আদর্শে বিশ্বাস হারাইবেন কেন, কেন দুঃখবাদী হইবেন, কেন হইবেন সংশয়বাদী? অথবা প্রগতি-বিরোধী মনই বা কেন হইবে তাঁহার? নির্ভীক, নিরাসক্ত, ভারমুক্ত, সর্বসংস্কারমুক্ত রবীন্দ্রনাথ সর্ববন্ধনমুক্ত মানবাত্মার বেদীতেই চিরকাল অর্ঘ্য বহন করিয়া আনিয়াছেন; মানুষকে পরিপূর্ণভাবে না জানার, না বুঝার জন্যই ত যত সংস্কার ও বন্ধনের সৃষ্টি! সেই মানুষকে একান্ত করিয়া জানা ও বুঝা, ইহাই ত কবির সাধনা। এই সাধনা পূর্ণতা পাইল কবির পরিণত বয়সে যখন তাঁহার সত্যকার ঐতিহাসিক বোধ জন্মাইল, যাহার বলে তিনি স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন নানা চেষ্টা ও সংগ্রামের ভিতর দিয়া, নানা বিচিত্র ভাবাদর্শের বৈপরীত্যের ভিতর দিয়া চিরন্তন মানুষের শেষহীন সীমাহীন অগ্রযাত্রা, নিরবচ্ছিন্ন আত্মানুসন্ধান। জীবনের শেষ দশ বৎসর রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ যেন নূতন করিয়া বিচিত্র সুখদুঃখময় মানব-সংসারের সঙ্গে আপনাকে জড়াইতেছিলেন, প্রতিদিনের মানবসংসার যেন তাঁহার গভীরতর সত্তার মধ্যে নূতন মোহজাল বিস্তার করিতেছিল। একথা নিঃসন্দেহ যে বিশ্ববিধাতার নিগূঢ় অস্তিত্ব তিনি গভীরতর ভাবে ও রূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন; তাহার পরিচয় গত দশ বৎসরের রচনায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও সমান সত্য যে মানুষের নিগূঢ় অস্তিত্ব এবং তাহার ঐতিহাসিক অর্থও গভীরতর ভাবে তাঁহার মনকে অধিকার করিতেছিল এবং বিশ্ববিধাতার সিংহাসনের

পাশেই চিরন্তন মানুষের আসনও প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল, যতই তিনি মৃত্যুর নিকটতর হইতেছিলেন, জীবনরসের পিপাসা যেন তাঁহার ততই বাড়িতেছিল, মানুষকে যেন তিনি আরও ততই বেশি ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, জীবনের সুধাভাণ্ড হইতে ততই আরও বেশি রস আহরণ করিতেছিলেন। তিনি যে তাঁহার দেবতাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যাহারা এই পৃথিবীর বায়ুকে বিষাক্ত করিতেছে, যাহারা দেবতার আলো বারবার নিভাইয়া দিতেছে, যাহারা মানুষকে অপমানে অত্যাচারে জর্জরিত করিতেছে, দেবতা কি তাহাদের ক্ষমা করিয়াছেন, তাহাদের ভালবাসিয়াছেন—এ প্রশ্ন নিরর্থক নয় কিংবা কার্যকারণ-সম্বন্ধ বিচ্যুত নয়। মনের এই যে সমগ্র ভঙ্গি, অনুভূতির এই যে সমগ্র দৃষ্টি, এই ভঙ্গি ও দৃষ্টিই রবীন্দ্র-মানসের শেষ অধ্যায়ের ভূমিকা।

আমি আগেই ইঙ্গিত করিয়াছি, মনের এই দৃষ্টিভঙ্গির, এই ঐতিহাসিক বোধের প্রথম সূচনা যেন ১৯৩০ খ্রীস্ট বৎসর হইতে, সোভিয়েট রাষ্ট্র ভ্রমণের প্রত্যভিঘাত হইতে। "রাশিয়ার চিঠি"তেই তাহার প্রথম প্রমাণ, কিন্তু তখনও এই নবলব্ধ বোধ ও দৃষ্টি বুদ্ধি ও চিন্তার স্তরে, অর্থাৎ সেই স্তরে যখন প্রথম প্রত্যভিঘাত মনকে নাড়া দিয়াছে মাত্র। ভাবানুভূতির প্রথম প্রকাশ একটু দেখা গেল "পরিশেষে" (১৯৩২), কিন্তু "প্রান্তিকে"র (১৯৩৭) আগে এই নূতন বোধ ও দৃষ্টি ভাবসত্তার অঙ্গীভূত হইয়া যায় নাই। যাহাই হউক, এই গভীরতর ঐতিহাসিক বোধ যে-সব কবিতায় স্বপ্রকাশ তাহাদের সম্বন্ধে কিছু বলিবার আগে শেষ-অধ্যায়ের রচনাগুলির বিশিষ্ট প্রকৃতি সম্বন্ধে স্বল্পায়তনের মধ্যে সাধারণ ভাবে দু'একটি কথা বলিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই দু'একটি কথা সাধারণ ধর্ম ও প্রকৃতি সম্বন্ধে হইলেও জীবন ও বস্তুধর্মের গভীরতর বোধ ও জ্ঞানের পরিচয়ও ইহাদের মধ্যে

সুস্পষ্ট ; এই বোধ ও জ্ঞানের অভিজ্ঞতার সুযোগ সুদীর্ঘ কবিজীবনে ইতিপূর্বে আর হয় নাই, এবং ইহার সঙ্গে ঐতিহাসিক বোধের সম্বন্ধ অত্যন্ত নিকট ও গভীর।

প্রথম ও প্রধান কথা হইতেছে শেষ অধ্যায়ের রচনাগুলিতে মৃত্যু-ভাবনার, মৃত্যুকল্পনার পৌনঃপুনিক উপস্থিতি। একথা ত সর্বজনবিদিত যে মৃত্যুভাবনা লইয়া কবি কিশোর বয়স হইতেই এত লীলায় মাতিয়াছেন যে মৃত্যুভীতি বলিয়া কিছু আর তাঁহার ছিল না। কিন্তু যতদিন না মৃত্যু তাঁহার জীবনের নিকটতর হইল, যতদিন না তিনি মৃত্যুর মুখোমুখি আসিয়া দাঁড়াইলেন ততদিন মৃত্যু তাহার সকল রহস্য ও মহিমা, সকল দীপ্তি ও গরিমা কবির সম্মুখে প্রসারিত করে নাই। মৃত্যুর এই ক্রমাগ্রসরমান পদধ্বনি কবির মনন ও কল্পনার কারখানায় এমন সূক্ষ্ম রূপান্তর ঘটাইল যাহার ফলে কবি শুধু যে মৃত্যুর রহস্যই আরও গভীর করিয়া উপলব্ধি করিলেন তাই নয়, জীবনের রহস্য এবং মহিমাও তাঁহার কাছে গভীরতর রূপে উদ্‌ঘাটিত হইল। বারবার অসংখ্য কবিতায় নানা ছলে নানা উপলক্ষে কবি এই মৃত্যুভাবনার মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন ; তারপর ১৯৩৭'র নিদারুণ অসুস্থতা প্রথম তাঁহাকে শুচিস্নানের সুযোগ দিল। ডুব দিয়া যখন তীরে আসিয়া উঠিলেন তখন তিনি শুচিস্নিগ্ধ, স্বচ্ছ, দীপ্তিময়। বস্তুত ভাবকল্পনার বলে মৃত্যুসমুদ্রে এই যে নিরন্তর অবগাহন ইহা যেন কবির পক্ষে হইয়া দাঁড়াইল নিজের আত্মাকে শুচি-স্বচ্ছ করিয়া লইবার একটা উপায়। "প্রান্তিকে"র সুন্দর গভীর গম্ভীর কবিতাগুলি তাহার প্রমাণ। তারপর ১৯৪০'র যে মারাত্মক পীড়া, সেই পীড়াই সর্বশেষে 'দেশহীন কালহীন আদি জ্যোতির' ধ্যানে তাঁহার দৃষ্টি ও মনকে তন্ময় করিয়া দিল। 'দেহ দুঃখ হোমানলে' পুড়িয়া খাঁটি সোনা হইয়া যখন তিনি বাহির হইয়া আসিলেন তখন তিনি পূর্ণতর মানুষ, দৃঢ়তর, সবলতর, আরও নিরাসক্ত,

আরও ভারমুক্ত, আরও স্বচ্ছ, গভীর ; অথচ সহজ মোহমুক্ত তখন তাঁহার দৃষ্টি। ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত কবিতাগুলি হইতে এখানে উদ্ধার করা যাইতে পারে ; "রোগ শয্যায়", "আরোগ্য", "জন্মদিনে" ও "শেষ লেখা" গ্রন্থ চারিটিতে তাহা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। তিনি মৃত্যুর কোমল শীতল ক্রোড়ে শেষ শয্যা বিছাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন, কিন্তু চলিয়া যাইবার ঔৎসুক্য যে তাঁহার মোটেই ছিল না, একথা আগেই বলিয়াছি। যত কিছু কাজ ছিল সব ত শেষ হইয়াছে, ছোটবড় সব কর্তব্যই ত শেষ করা হইয়াছে, মানুষ ও বিশ্বজীবন যাহা কিছু তাঁহার সম্মুখে প্রসারিত করিয়াছে তাহার সমস্তই ত নিঃশেষে আহরণ করা, পরিপূর্ণভাবে ভোগ করা হইয়া গিয়াছে, এবং তাহার প্রত্যভি-ঘাতে ভাবকল্পনায় যত অনুভূতি ধরা দিয়াছে সমস্তই রসে ও সৌন্দর্যে ব্যক্ত করাও হইয়া গিয়াছে,—তিনি এবার যাইবার জন্য প্রস্তুত ; কিন্তু জীবন যে ইতিমধ্যে নূতনতর অর্থে ও স্বপ্নে সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে ; নূতনতর দৃষ্টির আলোকে নূতন রূপ লাভ করিয়াছে। এ-জীবনকে যে পরিপূর্ণ করিয়া এখনও জানা হয় নাই, ভোগ করা হয় নাই, সীমা-হীন জীবন-সমুদ্রের সকল রস ত এখনও আহরণ করা হয় নাই। সেই জন্যই এ-জীবন হইতে বিদায় লইবার ইচ্ছা তাঁহার নাই, সেই জন্যই বারবার তিনি এই মানবসংসারের বহুমুখী জীবনযাত্রার মধ্যেই ফিরিয়া ফিরিয়া আসেন ; এই মানুষই যে জীবনের চিরন্তন উৎস ! এই ভাবানু-ভূতির যত কবিতা সব আছে শেষ অধ্যায়ে, বিশেষ করিয়া ১৯৪০'র সুদীর্ঘ রোগশয্যায় ও তারপর মৃত্যু পর্যন্ত রচনাগুলির প্রায় প্রত্যেকটিতেই একটি গভীর গম্ভীর সুর ধরা পড়ে অতি সহজেই ; জীবন ও মৃত্যুর, ধ্বংস ও সৃষ্টির নূতনতর স্বপ্ন ও অর্থ অনুভূতিশীল পাঠকের দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়। এই প্রকৃতির কবিতাগুলি পড়িলে বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া বলিতে হয়, স্বচ্ছ ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তিময় মানবাত্মার একি অপরূপ প্রকাশ ! এত

সহজ স্বচ্ছ, এত উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট বলিয়াই না প্রকাশের ভঙ্গিও এত সহজ ও সরল, স্পষ্ট ও বাহুল্যবিহীন। মানুষ যখন সত্যকে পায়, অলংকার তখন বাহুল্য মাত্র হইয়া দাঁড়ায়। বলিবার ভঙ্গি অপেক্ষা বক্তব্য বস্তু এই সব কবিতায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, এবং এই বলার মধ্যে কোথাও অস্পষ্টতা নাই; সবল নিরাসক্ত মনের অপরাজিত বীর্যের গভীর স্বচ্ছ দীপ্তি এই কবিতাগুলিকে একটি অপরূপ শক্তি ও দৃঢ় সংহত রূপ দান করিয়াছে। ক্ষীয়মাণ আয়ুর দুর্বলতার এতটুকু চিহ্ন এই কবিতাগুলির কোথাও নাই, না বলার ভঙ্গিতে, না তাহাদের ছন্দে, না বক্তব্যের শিথিলতায়। প্রায় প্রত্যেকটি কবিতাই যেন সুগভীর প্রেম ও বিশ্বাসের দীপ্তিতে জ্বল্‌জ্বল্‌ করিতেছে।

এই স্বচ্ছ সবল গভীর ভাবানুভূতি কবিকে সুগভীর প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে সত্য ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি দান করিয়াছে। এই গভীর প্রজ্ঞাদৃষ্টি একদিকে যেমন তাঁহাকে লইয়া গিয়াছে বিশ্ব-বিধাতার কোলে, তেমনই তাঁহাকে বারবার টানিয়া আনিয়াছে মানুষের বুকে। মানবের প্রবহমাণ জীবনধারা যাহাকে আমরা বলি ইতিহাস তাহার মর্ম কবিচিত্তের নিকটতর করিয়াছে। সৃষ্টির অন্তহীনতায় সবল প্রাণের গভীর বিশ্বাস, মানুষের সেবায় ও ভালবাসায় তৃপ্তি ও বিশ্বাস, মানবচিত্তের সাধনায় যে-সত্য নিহিত তাহাতে বিশ্বাস, জীবনের অন্তর্নিহিত শক্তি ও শান্তিতে বিশ্বাস—এই গভীর পরিব্যাপ্ত বিশ্বাসই শেষ অধ্যায়ের কবিতাগুলিকে তাহাদের কাব্যমূল্য দান করিয়াছে, এবং এই স্থির অকুণ্ঠিত নিঃশঙ্ক বিশ্বাসই রোগাক্রান্ত কয়েকটি বৎসরের কবি-মানসের পরিচয়। বিশেষ করিয়া ১৯৪০'র পরে লেখা "আরোগ্য" "জন্মদিনে" ও "শেষ লেখা" এই তিনটি গ্রন্থে এই পরিব্যাপ্ত বিশ্বাস কী উদাস প্রীতি ও ভালবাসায় নূতনতর মাধুর্যে রূপান্তরিত হইয়াছে তাহার পরিচয় আছে। যে-কবি পরিপূর্ণ শক্তি, ধৈর্য, বীর্য ও বিশ্বাসে মৃত্যুর

মুখোমুখি হইয়া সৃষ্টিরহস্ত উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষেই সম্ভব হইল উদাস প্রীতি ও ভালবাসায় বলা "এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি।" অর্ধ-উদাসীন কল্পনায়, স্বচ্ছ সহজ হৃদয়মুকুরে কবি যে-সব অপরূপ ছবিগুলি একটি একটি করিয়া দেখিয়া গিয়াছেন, কথার মালায় টুক্‌রা টুক্‌রা সে-সব ছবি গাঁথিয়া তুলিয়াছেন। নিরালা অবকাশের মধ্যে কৃতজ্ঞতায় মন ভরিয়া উঠিয়াছে; অতীতের সকরুণ স্মৃতি, দীর্ঘশ্বাস হাওয়ায় ভাসিয়া আসিতেছে, ছোট ছোট তুচ্ছ ঘটনা স্বপ্নময় হইয়া দেখা দিতেছে। জীবনের শেষপ্রান্তে বসিয়া পশ্চাতের দিকে তাকাইয়া সেই সব ছবি দেখিতে ভাল লাগিতেছে। কত যে শান্ত, রঙিন ব্যাপ্ত মুহূর্ত এই কবিতাগুলিতে ধরা পড়িয়াছে, কত যে গভীর ব্যঞ্জনা ছড়াইয়া আছে, তাহার হিসাব নাই। কি অপরূপ ছবিই না আঁকিয়াছেন, এবং সবগুলি ছবিই একটা শান্তসৌন্দর্যে মণ্ডিত। বিক্ষোভ নয়, আলোড়ন নয়, শান্তি, পরমা শান্তি ও স্বচ্ছ সহজ শান্ত মমতাময় বিনয়নম্র দৃষ্টিভঙ্গিই শেষতম অধ্যায়ের কবিতাগুলিকে রূপে রসে ভরিয়া দিয়াছে; পৃথিবীর রূপ ও রস কৃতজ্ঞতায় যেন মনকে বিভোর করিয়া রাখিয়াছে। সুগভীর ভাবানুভবতায় ছবিগুলি যেন আরও সুন্দর, আরও দীপ্ত, আরও গম্ভীর। কিন্তু সব কবিতাই শুধু শান্তছবির মালা মাত্রই নয়, সত্যের অমৃতরূপেও কবিতাগুলি উদ্ভাসিত, জীবনরহস্যের, গভীর ইঙ্গিতে উদ্‌বুদ্ধ, গভীর ধ্যানে তন্ময়, গভীর গম্ভীর আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত এবং পৃথিবীর ও মানুষের প্রতি সুগভীর প্রীতি ও ভালবাসায় উজ্জ্বল। নিখিল বিশ্বের মর্মস্থলে যে-গভীর রহস্ত আবর্তিত হইতেছে তাহার অর্থানুভূতিতে কবিতাগুলি সমৃদ্ধ। সৃষ্টিলীলা, জন্মমৃত্যুর বিচিত্র রহস্ত, পুরাতন আবর্জনার ধ্বংস ও নূতন সৃষ্টির আহ্বান, মৃত্যুর অতীত আত্মার চিরন্তন মহিমা ইত্যাদি সমস্তই কখনও গভীর গম্ভীর সুরে, কখনও গল্পচ্ছলে, কখনও লঘুলাস্তে কবিতাগুলিতে রূপ গ্রহণ

করিয়াছে ; বক্তব্য সর্বত্রই সুস্পষ্ট, আব্ছা অস্পষ্টতার লেশমাত্র কোথাও নাই।

আমি আগেই বলিয়াছি, কবি শেষ-খেয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন, কিন্তু উন্মুখ ছিলেন না ; নিরাসক্ত মন লইয়া তিনি জীবনকে যেন এখন আরও গভীর করিয়া আঁকড়াইয়া রহিলেন। বারবার সেইজন্যই নানা কবিতায়, নানা গল্পচ্ছলে তিনি জীবনের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়াছেন ; জীবন যেখানে উচ্চৈঃস্বরে বৃহৎ আয়োজন ও আড়ম্বরের মধ্যে আপন অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে সেখানে নয়, বরং আপাত-তুচ্ছ ক্ষুদ্র অসংখ্য ঘটনা, অসংখ্য ভাবলীলায় জীবন যেখানে আবর্তিত সেইখানে, জীবন যেখানে ছায়ার আড়ালে গোপন সেইখানে। একান্ত সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক তুচ্ছ জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার অসংখ্য ছবি বারবার ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে—যাহারা ভিড় করিয়া আসিতেছে তাহারা মাঠের চাষী, কলের কুলি, দরিদ্র গৃহস্থ নরনারী, সাধারণ মেয়ে, কলেজের ছেলে, আপিসের কেরানী, রাখাল বালক, সাঁওতাল কুমারী, মংপুর পাহাড়িয়া মেয়ে, বাড়ির পুরানো চাকর, রিক্‌স্ওয়ালা এবং এমনই ধরনের অসংখ্য নরনারী যাহারা বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার ফলে দৈন্যে পীড়িত, সংস্কারে সংকুচিত, মনুষ্যত্বের এবং মানবতার সুবৃহৎ অধিকারে বঞ্চিত। ইহাদের জীবনের মধ্যে ভাবানুভূতির অভিজ্ঞতা কবি পূর্ববর্তী কবিজীবনেও ভোগ করিয়াছেন, যেমন, "পলাতকা"য়, "লিপিকা"য় আরও পূর্ববর্তী অনেক কাব্যে। এই সমস্তই বস্তু-চেতনার পরিচয় সন্দেহ নাই, কিন্তু বিশেষভাবে "নবজাতক" গ্রন্থ হইতে এই বস্তু-চেতনার সঙ্গে ঐতিহাসিক বোধের শুভ পরিণয় লক্ষণীয়। এই সব ঘটনার প্রতিচ্ছবি কখনও আসিয়াছে অতীত স্মৃতি হইতে, কখনও আসিয়াছে চোখের সম্মুখের চলমান ছায়াছবি হইতে ; কিন্তু কবি যেখানে দূর-স্মৃতিতে আবিষ্ট সেইখানেই কবিতাগুলি একটি স্নিগ্ধ অপরূপ মাধুর্যে

সমৃদ্ধ হইয়াছে। যাহাই হউক, উভয় ক্ষেত্রেই কবি যে জীবনের এক নূতন আস্বাদন লাভ করিয়াছেন, দৃঢ়তর সবলতর বিশ্বাসের অধিকারী হইয়াছেন এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও অবকাশ নাই। বস্তু ও জীবনের প্রত্যক্ষবোধ ও অনুভূতির আনন্দে জীবন যেন তাঁহার ভরপুর।

এই প্রত্যক্ষবোধ ও অনুভূতি হইতেই ঐতিহাসিক বোধের জন্ম, এক কথায় বস্তু-ধর্মবোধের জন্ম। বস্তুত প্রত্যক্ষবোধ ও অনুভূতিই যখন মননের সঙ্গে যুক্ত হয় তখনই ঐতিহাসিক বোধের সূচনা দেখা দেয়। আমি বলিয়াছি, এই সূচনা সর্বপ্রথম লক্ষ্য করা যায় "পরিশেষ"-গ্রন্থে (১৯৩২); এই গ্রন্থের কয়েকটি কবিতায়, বিশেষ করিয়া 'আগন্তুক' জাতীয় কবিতায়, এই বোধের পরিচয় অত্যন্ত স্পষ্ট। একবার যখন এই বোধ জাগিল তখন 'প্রশ্নে'র মতন কবিতা তো অনিবার্য হইয়া উঠিল। বস্তুর প্রত্যক্ষবোধ যখন জন্মাইল তখন বস্তু সম্বন্ধে তাহার মর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগিবে, ইহা একান্তই স্বাভাবিক; বস্তুত "পরিশেষ"-গ্রন্থের 'প্রশ্ন' কবিতা বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার আদর্শের একেবারে মূল ধরিয়া টান দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক বোধের পরিপূর্ণ বিকাশের পথ খুলিয়া দিল। কিন্তু এখনও এই নবলব্ধ বোধ একেবারে বুদ্ধির সীমা অতিক্রম করিয়া হৃদয়ের গভীর ভাবানুভূতির অঙ্গীভূত হইয়া যায় নাই। "পরিশেষের"র অল্প পরেই কবি 'পথের রশি' নাম দিয়া ছোট একটি নাটিকা রচনা করেন; এই নাটিকাটিতে নবলব্ধ বোধ সংকেতের আড়ালে একেবারে যেন ফাটিয়া পড়িল; বস্তুত এই নাটিকাটিকে বলা যায় বাংলা দেশের সাধারণ মানুষের দায়, শক্তি ও অধিকারের প্রথম ঘোষণাপত্র। কিন্তু এখনও ঐতিহাসিক বোধ কেবল নিজকে সজোরে ব্যক্ত করিতেছে, হৃদয়কে স্পর্শ করিয়া গভীরতর কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করে নাই। তাহার উপায় হইতেছে জীবনকে আরও ভাল করিয়া গভীর করিয়া জানা, বস্তুর ঐতিহাসিক রূপে জীবনকে

জানা। সেই জানার চেষ্টা "পুনশ্চ" গ্রন্থে স্বপ্রকাশ; তবু এই গ্রন্থে কবিতা আছে যাহাতে এই ঐতিহাসিক বোধ তাহার নিপুণ অস্তিত্ব জানায়। একটি 'মানবপুত্র' যাহাতে 'প্রশ্ন' কবিতার সুরটি আবার গভীর সুরে ধ্বনিত; কিন্তু খুব উঁচুস্তরের, গম্ভীর সুন্দর কবিতা 'শিশুতীর্থ'। শেষোক্ত কবিতাটিতে মানুষের নবজন্মতীর্থে শাশ্বত যাত্রার একটি কম্পন-শিহরিত ইতিহাস সবল কল্পনায় অপরূপ মূর্তি লাভ করিয়াছে। কবিতার ধুয়াটি গভীর অর্থব্যঞ্জক; "জয় হোক্ মানুষের, জয় হোক্ নবজাতকের, জয় হোক্ চিরজীবিতের"। "বিচিত্রিতা" (১৯৩৩) ও "শেষ সপ্তকে"র (১৯৩৫) ভিতর দিয়া জীবনের পাঠ আগাইয়া চলিয়াছে; "শেষ সপ্তকে"র ৪৩নং কবিতাটি ঐতিহাসিক বোধের দিক হইতে খুব সার্থক, এই কবিতাটিতে কবি জন্মদিন উপলক্ষ করিয়া নিজের জীবনের একটা ঐতিহাসিক পরিচয় নিজে গ্রহণ করিলেন, পরকেও দিলেন। ২০, ২১ ও ৩৯নং কবিতা তিনটিও এই দিক হইতে খুব সার্থক। "পত্রপুটে" (১৯৩৬) এই নবলব্ধ বোধ একটা সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণ করিল এবং কয়েকটি কবিতাতেই প্রকাশের তাড়নায় ব্যাকুল এই বোধ উদ্বেলিত তরঙ্গে ভাঙ্গিয়া পড়িল, বিশেষ করিয়া ২০, ২১ ও ৩৯নং কবিতা তিনটিতে। "শ্যামলী"তে এই বিবর্তনই চলিয়াছে; 'চিরযাত্রী', 'মিলভঙ্গ', 'অমৃত', 'শ্যামলী' প্রভৃতি কবিতায় তাহা সুস্পষ্ট।

কবি এখন ভাবানুভূতির এমন একটা স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন যখন একবার স্থির হইয়া এই ঐতিহাসিক বোধের যাহা কিছু অভিজ্ঞতা এ-পর্যন্ত সঞ্চিত হইয়াছে তাহার সবটা জ্ঞান ও বুদ্ধির নিকষে যাচাই করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখার একটা ইচ্ছা মনের মধ্যে জাগিল, এবং সে-ইচ্ছা রূপান্তরিত হইল "কালান্তরে"র সমাজ ও রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় প্রবন্ধ-গুলিতে (১৯৩৭)। ইহার অব্যবহিত পরেই আসিল ১৯৩৭'র নিদারুণ অসুস্থতা, এবং মৃত্যুর সঙ্গে মুখামুখি দেখা ঘটিবার ফলেই গত কয়েক

বৎসরের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা পরিস্রুত পরিশুদ্ধ হইয়া একেবারে কবি-চেতনার অঙ্গীভূত হইয়া গেল! "প্রান্তিকে"র ব্যঞ্জনাময় ক্ষুদ্র ভূমিকাটিতে তিনি বলিলেন :

> অস্তসিন্ধুকূলে এসে রবি
> পূরব দিগন্ত পানে
> পাঠাইল অন্তিম পূরবী।

এই গ্রন্থের আঠারোটি কবিতার প্রথম ষোলটিতে জীবন ও মৃত্যুর রহস্য সম্বন্ধে গম্ভীর সুর আবেগময় ভাষায় ধ্বনিত, কিন্তু শেষের দু'টি কবিতা পড়িলেই পরিষ্কার বুঝা যায় বিশ্বজীবনের সমস্ত কিছুকে ভেদ করিয়া, সমস্ত কিছুকে আবৃত করিয়া একটা গভীরতর জীবনদর্শন, জীবন ও মৃত্যুর, ধ্বংস ও সৃষ্টির ব্যাপকতর একটা রহস্য কবির অনুভূতিকে কবির চেতনাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, এবং এই দর্শন ও রহস্য গভীর ঐতিহাসিক বোধ হইতে জাত। ১৭নং কবিতায় কবি পরিষ্কার বলিয়াছেন, যেদিন তিনি মৃত্যুর দুঃস্বপ্ন হইতে চেতনার মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন সেই দিনই তাঁহার মনে হইল পৃথিবীর বর্তমান সভ্যতার অলন্ত কটাহে প্রতিমুহূর্তে অসংখ্য অসহায় মানুষ নিক্ষিপ্ত হইতেছে, তাহার উত্তপ্ত বিষ-নিশ্বাসে পৃথিবী জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছে। পরবর্তী ১৮নং কবিতাটিতে সুর একেবারে সপ্তমে চড়ান, অথচ সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রতিক পৃথিবীর ঐতিহাসিক বোধের কি অপরূপ কাব্যময় প্রকাশ—

> নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস
> শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—
> বিদায় নেবার আগে তাই
> ডাক দিয়ে যাই
> দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
> প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

একটু ভিন্ন ও চাপা সুরে এই ধুয়াটিই ধরা যায় "সেঁজুতি"তে (১৯৩৮)। জীবনের গভীর অভিনিবিষ্ট পাঠ চলিয়াছে "সেঁজুতি"তেও; এমন কি একটু তরল সুরে গল্পকথায় গাঁথা পরবর্তী কাব্য "আকাশ প্রদীপে"ও (১৯৩৯)। ১৯৪০'র গোড়ায় প্রকাশিত হইল "নবজাতক"; নামটি গভীর অর্থের দ্যোতনায় সার্থক। একটা ঋতু পরিবর্তনের নূতন সুরের সুস্পষ্ট পরিচয় হিসাবেই যে "নবজাতকে"র জন্ম তাহা কবি নিজেই স্বীকার করিলেন গ্রন্থটির ভূমিকায়, এবং এই ঋতু পরিবর্তন বা নূতন সুর আর কিছুই নয়, ঐতিহাসিক চেতনায় কবি-মানসের নবজন্ম, তাহারই জাতকর্মের উৎসবগীতি। কিন্তু শুধু ভূমিকাতেই নয়, এর প্রায় প্রত্যেকটি কবিতায় এমন একটি দৃষ্টি ও মননভঙ্গির পরিচয় আছে যাহার আভাস "পরিশেষ" হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু "নবজাতকে" আসিয়া তাহা পরিপূর্ণ কাব্যময় রূপ ধারণ করিল, এবং এখন আর শুধু দু'চারিটি কবিতায় নয়, অসংখ্য কবিতায় তাহা ফুটিয়া উঠিল। এ-জিনিসটা যেমন লক্ষ্য না করিয়া পারা যায় না, তেমনই লক্ষ্য করিতে হয় বস্তু ও জীবনকে তার ঐতিহাসিক স্বরূপে দেখিবার জন্য চিত্তের একটা সহজ প্রবণতা। "নবজাতক" গ্রন্থের 'প্রায়শ্চিত্ত', 'হিন্দুস্থান,' 'রাজপুতানা', 'ভূমিকম্প', 'পক্ষী-মানব', 'আহ্বান', 'এপারে-ওপারে', 'রোম্যান্টিক', 'রাত্রি', 'রূপ-বিরূপ' প্রভৃতি কবিতা এদিক হইতে খুবই উল্লেখযোগ্য। "সানাই"র (১৯৪০) কবিতাগুলি একটু হালকা ধরনের; কয়েকটি রচনা সত্যই সুন্দর কিন্তু খুব অভিনব হয়ত নয়।

যে ঐতিহাসিক বোধের কথা এতক্ষণ বলিয়াছি তাহা "রোগশয্যায়" (১৯৪০), "আরোগ্য", "জন্মদিনে" (১৯৪১) এবং "শেষ লেখা" (১৯৪২), এই গ্রন্থ চারিটিতে যেন আরও গভীর আরও অন্তরতর স্তরে তার মূল প্রসারিত করিয়াছে, কবি যেন আরও স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়াছেন, বস্তু ও জীবনের প্রত্যক্ষ বোধের আনন্দ যেন আরও গভীর, আরও নিবিড়

হইয়াছে। ১৯৪০'র মারাত্মক ব্যাধি যেন কবিকে আরও দিল শক্তি ও বীর্যের দীপ্তি, আরও গভীর প্রীতি, শান্তি ও ভালবাসা, নূতন চেতনায় আরও গভীর বিশ্বাস। যে-সব কবিতায় জীবন ও মৃত্যু রহস্যের সুর ধ্বনিত, যেখানে তিনি মধুময় দ্যুলোক, মধুময় পৃথিবীর কথা বলিয়াছেন, শুধু যে সেই সব কবিতাতেই এই ধর্ম ও প্রকৃতি স্বপ্রকাশ তাহা নয়, যেখানে তিনি চিরন্তন শাশ্বত জড়জগৎ এবং তাহার ঐতিহাসিক পরিণতির কথা বলিয়াছেন, সেখানেও তাহা সমান দীপ্তিময়। এই দিক হইতে বিশেষ করিয়া সার্থক ও অর্থব্যঞ্জক হইতেছে "আরোগ্য" গ্রন্থের ১, ৩, ৪, ৭, ১০ এবং ১৮ নং কবিতা, এবং "জন্মদিনে" গ্রন্থের ৫, ১০, ১২ ১৭, ১৮ এবং ২১ নং কবিতা।

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্যরচনাগুলির, এমন কি গল্প-কবিতা-গুলিরও এমন একটা দৃঢ় সংহত রূপ আছে, এমন সংযত আবেগ আছে যাহা কবির অপেক্ষাকৃত পুরাতন লেখাগুলিতেও দেখা যায় না। যে প্রবল বাণীস্রোত ও আবেগোচ্ছ্বাস পাঠককে স্রোতের মুখে তৃণের মত ভাসাইয়া লইয়া যায়, সে প্রবল স্রোত ও উচ্ছ্বাস এই পর্বের কবিতা-গুলিতে একেবারে অনুপস্থিত। যেটুকু বক্তব্য সেটুকুই শুধু বলা হইয়াছে সকল প্রকার রূপক অলংকার বর্জন করিয়া, বাহুল্য কল্পনার মায়াজাল হইতে মুক্ত করিয়া, প্রকাশ-ভঙ্গি অপেক্ষা বক্তব্য বস্তুকেই যেন মুখ্যতর করিয়া। তাহার ফলে কবিতাগুলি খুব দৃঢ়, সংযত ও সংহত রূপ লাভ করিয়াছে। অনাবশ্যক কথা, অনাবশ্যক রূপকে ও বর্ণনায় একটি কবিতাও আচ্ছন্ন নয়, বক্তব্যের মধ্যেও অস্পষ্ট কুয়াশা কোথাও নাই। মিলহীন ছন্দ, কিন্তু নিয়মিত তালে লয়ে বাঁধা, এবং ছন্দের গাঁথুনির মধ্যেও একটা সংযত দৃঢ়তা, ধ্বনির আবেগহীন গভীরতা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আঙ্গিকের এই সব গুণ বা ধর্মকে আমি একান্তভাবে ভাবানুভূতি ও মননপ্রকৃতির বহিঃপ্রকাশ বলিয়াই মনে করি, এবং

তাহার সঙ্গে আঙ্গিকের সম্বন্ধ অত্যন্ত নিবিড়। বস্তুত ভাবানুভূতি ও মনন প্রকৃতিকে বাদ দিয়া আঙ্গিকের অস্তিত্ব নিশ্চয়ই আছে, তাহার প্রয়োজনও আছে, কিন্তু তাহাকে সার্থক অস্তিত্ব বলা যায় না বলিয়াই আমার ধারণা। যাহা হউক, একথা কিছুতেই দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয় যে "পরিশেষ" হইতে আরম্ভ করিয়া কবি যতই অগ্রসর হইয়াছেন, এই পর্যায়ের ভাবানুভূতি ও মননক্রিয়া যতই গভীর ও নিবিড় হইয়াছে ততই তার ধর্ম ও প্রকৃতি অনুযায়ী আঙ্গিকের পূর্বোক্ত ধর্ম ও প্রকৃতিও ক্রমশ দৃঢ়, সংহত, সংযত ও গভীর হইয়াছে।

বস্তুচেতনা রবীন্দ্রনাথের বরাবরই ছিল, কাব্যে তা' খুব সুস্পষ্ট হইয়া ধরা পড়িবার কথা নয়, কারণ তাহা পরিস্রুত ও পরিশুদ্ধ হইয়া বোধ ও অনুভূতির যে-স্তরে কবিকল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করে সে-স্তর বস্তু-চেতনার স্তর হইতে অনেক দূরে। কিন্তু গল্পে ও উপন্যাসে এবং নাটকেও তাহা অপেক্ষাকৃত অনেক স্পষ্টতর হইয়া ধরা ছোঁওয়া দেয়; গল্প-উপন্যাস-নাটকের সাহিত্য-প্রকৃতিই তাহার সহায়ক। কিন্তু "শেষের কবিতা", "যোগাযোগ" পর্যন্ত দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ কোনও কোনও ক্ষেত্রে এমন দৃষ্টি ও মননভঙ্গি অবলম্বন করিয়াছেন যাহাতে বস্তু-চেতনার ও সমাজ-মানসের অকুণ্ঠিত শিল্পময় প্রকাশ ব্যাহত হইয়াছে। তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া কঠিন নয়। কিন্তু জীবন যতই পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে, যতই তিনি নিরাসক্ত, ভারমুক্ত, স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়াছেন ততই ক্রমশ তাঁহার বস্তু ও সমাজ-চেতনার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে ঐতিহাসিক বোধ, এবং তাহার ফলে ক্রমশ তাঁহার মন হইতে সমস্ত সংস্কার খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে—মানুষ সংস্কারে জড়িত থাকে মানুষ মানুষকে পরিপূর্ণ করিয়া জানে না বলিয়া—বস্তু ও ঘটনার ঐতিহাসিক অর্থ ততই তিনি গভীর ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, ততই তিনি স্বচ্ছ ও নির্ভীক দৃষ্টি লইয়া বস্তু ও

ঘটনার মুখোমুখী দাঁড়াইয়াছেন। এই যে নূতন দৃষ্টি ও মননভঙ্গি, গল্পে-উপন্যাসে এর প্রথম পরিচয় মেলে "দুই বোন" (১৯৩৩) এবং "মালঞ্চ" (১৯৩৪) গ্রন্থে; "চার অধ্যায়" (১৯৩৪) এইদিক হইতে একটু শিথিল, কিন্তু মনন-কল্পনার বৈপ্লবিক রূপান্তর দেখা গেল আবার "তিন সঙ্গী" গ্রন্থে (১৯৪০)। বস্তুত "তিন সঙ্গী"র আধুনিকতার ধর্মকে লজ্জা দিতে পারেন বাংলা দেশে এমন আধুনিক আজও কেহ জন্মান নাই। মোহ-মুক্ত মানুষের যে-দাবি, সর্ববন্ধনমুক্ত, সর্বসংস্কারমুক্ত শুদ্ধ স্বচ্ছ মানবতার যে-দাবি, পরিণত স্থিতপ্রজ্ঞ জীবনের শেষ অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ একমাত্র সেই দাবি, সেই আদর্শকেই স্বীকার করিয়াছেন আর কোনও আদর্শকেই নয়। সেই সর্ববন্ধন সর্বসংস্কার মুক্ত মানুষ ও মানবতার বেদীমূলেই রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ দশ বৎসরের বহু অভিজ্ঞতা বহু বেদনালব্ধ অর্ঘ্য বহন করিয়া আনিয়াছেন, এবং সর্বশেষে "সভ্যতার সংকটে" একটি গভীর গম্ভীর বজ্রমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সেই অর্ঘ্যটি নিবেদন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

কবিজীবনের শেষ অধ্যায় সম্বন্ধে মোটামুটি ভাবে এই মূল কথাটি স্মরণে রাখিয়া এইবার সংক্ষেপে সাধারণ ভাবে শেষ দশ বৎসরের কবিতাগ্রন্থগুলির আলোচনা করা যাইতে পারে।

(১১)

পরিশেষ (১৩৩৯)
বিচিত্রিতা (১৩৪০)
বীথিকা (১৩৪২)

রবীন্দ্র-কবিজীবনের শেষ-অধ্যায় নানাদিক হইতে বিস্ময়কর। সকলের চেয়ে বিস্ময়কর রচনার প্রাচুর্য, প্রকাশের নূতনত্ব এবং সতেজ ও সাবলীল ভাবস্ফূর্তি। মনে রাখা প্রয়োজন কবি ইতিমধ্যে সত্তর

বৎসর অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহার স্বদেশবাসী মহাসমারোহে তাঁহার সপ্ততিতম জন্ম-জয়ন্তী উৎসব সম্পন্ন করিয়াছে। তখন কি তাঁহারা জানিতেন কবিমানসের আরও এক সমৃদ্ধ অধ্যায় উদ্‌ঘাটিত হইতে বাকি আছে। কবি নিজেই কি তাহা জানিতেন? পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের সাধনায় তিনি চরমতম সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন অনেক সুদুর্গম পথে; সেই মত ও পথ ধরিয়া স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দ বিহার করিয়া গেলেও তাঁহার পূর্বলব্ধ কবিখ্যাতি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইত না। কিন্তু সহজ স্বচ্ছন্দ পথে পদচারণা না করিয়া সপ্তরোত্তীর্ণ কবি বাছিয়া লইলেন দুর্গম সংশয়াকুল পথে নিত্য নূতন অভিজ্ঞতার, নূতন পরীক্ষার, দুঃসাধ্য বরণের দুঃসাহসিক অভিযান। বৃদ্ধ কবির চিত্তের এই সরস নবীনতা, যৌবনসুলভ প্রাণপ্রাচুর্য পাঠকের বিস্ময়, সাহিত্যের বিস্ময়। জীবনের শেষ দশ বৎসরে তিনি যত কবিতা ও গান, যত কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, আর কোনও দশ বৎসরেই কাব্য-রচনার এত প্রাচুর্য দেখা যায় নাই। এই দশ বৎসরে শুধু কাব্যগ্রন্থই রচনা করিয়াছেন বিংশাধিক। উৎকর্ষ অপকর্ষর কথা না তুলিয়াও বলা চলে সপ্তরোত্তীর্ণ কবির এই রচনাপ্রাচুর্য সাহিত্যের ইতিহাসে বোধ হয় অভূতপূর্ব। আর এই রচনা ত শুধু প্রাচুর্যের দিক দিয়াই বিস্ময়কর নয়; আরও বিস্ময় লাগে এই দেখিয়া যে এই প্রাচুর্যের মধ্যেও বার্ধক্যের বলি-রেখার সুস্পষ্ট চিহ্ন খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। ইহাদের দীপ্তি অক্ষুণ্ণ, অম্লান, ইহাদের বৈচিত্র অশেষ, অফুরন্ত। সত্যই মনে হয় একাশি বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু অকালমৃত্যু; হয়ত শেষ-অধ্যায়েরই পর্বমোচন আরও বাকি ছিল। তাঁহার কাব্যে ভাবের স্ফূর্তি, দৃষ্টির প্রসারিত বৈচিত্র্য, রস ও কল্পনার ঐশ্বর্য "শেষ লেখা" পর্যন্তও অম্লান দীপ্তিতে বিরাজমান। প্রাণাধারার সঙ্গে সঙ্গে শেষ দুই বৎসরের বাণীর ধারা ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল সত্য, কিন্তু সে-ধারা তখনও তাহার

অর্থ বা ব্যঞ্জনার, ভাব ও ইঙ্গিতের গভীরতা হারায় নাই। কবি-মানসের এই চির নূতনত্ব, দুঃসাধ্য দুঃসাহসিক পরীক্ষার আনন্দ, নব নব উন্মেষের তৃপ্তিহীন কামনা, নিত্য নূতন প্রভাতে জীবনকে নূতন করিয়া দেখা কাব্য ও কবিজীবনের ইতিহাসেও এত দুর্লভ এত বিরল যে রবীন্দ্র-কবিমানস শুধু এই কারণেই পাঠকের আনন্দিত বিস্ময়ের উদ্রেক না করিয়া পারে না। ইহাই ত রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার অন্যতম সুস্পষ্ট অভিজ্ঞান।

অথচ এক এক জীবন পর্যায়ের শেষে বারবার তিনি মনে করিয়াছেন এই পৃথিবীতে তাঁহার জীবনের দিনগুলি ঘনাইয়া আসিয়াছে, তাঁহার যাহা দিবার, যাহা বলিবার তাহা তিনি নিঃশেষে দিয়াছেন, বলিয়াছেন যে-গান তিনি গাহিতেছেন তাহাই তাঁহার শেষ গান। সে-গানের নাম কখনও "খেয়া", কখনও "পূরবী"। অথচ 'বিচিত্রা'র এমনই লীলা, তিনি শেষের মধ্যেও অশেষকে ধারণ করেন এবং কবিকে দিয়া বারবার নূতন করিয়া নূতন পথে 'পূজার অর্ঘ্য বিরচন' করাইয়া লন, কবি তাহা জানিতেও পারেন না। তিনি ত বারবার মনে করেন,

> রবিপ্রদক্ষিণপথে জন্মদিবসের আবর্তন
> হয়ে আসে সমাপন। ('জন্মদিন')

> যাত্রা হয়ে আসে সারা,—আয়ুর পশ্চিমপথশেষে
> ঘনায় মৃত্যুর ছায়া এসে। ('বর্ষশেষ')

এবং বিস্মিত দৃষ্টিতে 'বিচিত্রা'কে প্রশ্ন করেন

> তবুও কেন এনেছ ডালি দিনের অবসানে;
> নিঃশেষিয়া নিবে কি ভরি নিঃস্ব করা দানে। ('বিচিত্রা')

এই নিঃস্বকরা দানে নিঃশেষিয়া ভরা ডালি'র নাম "পরিশেষ"।

পরিশেষ প্রকাশিত হয় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ভাদ্রমাসে; কবিতাগুলি মোটামুটি তাহার আগের দুই বৎসরের মধ্যে লেখা। এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে 'শ্রীবিজয়লক্ষ্মী', 'সিয়াম' (ইহার যথার্থ উচ্চারণ, 'শ্যাম' উচ্চারণ আত্মাভিমানী সংস্কৃত-করণ), 'বোরোবুদুর' প্রভৃতি দ্বীপময়-ভারত ভ্রমণ উপলক্ষে লিখিত কয়েকটি কবিতা আছে। তাহা ছাড়া মূল গ্রন্থে নানা উপলক্ষে লেখা কয়েকটি কবিতাও আছে—বিবাহ, নামকরণ, সাময়িক ঘটনা প্রভৃতি উপলক্ষে রচনা। 'বক্‌সা দুর্গস্থ রাজবন্দীদের প্রতি', 'প্রশ্ন' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতার সৃষ্টি সমসাময়িক রাষ্ট্রীয় অথবা বৃহত্তর অর্থে সামাজিক ঘটনার প্রত্যভিঘাতে। কতক-গুলি কথিকা এবং গাথা জাতীয় কবিতাও আছে; তাহাদের কয়েকটি ছন্দোবদ্ধ গদ্যে রচিত। এই আঙ্গিকের সূচনা "লিপিকা" গ্রন্থ হইতেই, কিন্তু "পরিশেষ" হইতেই এই আঙ্গিকের বিস্তৃত পরীক্ষা ও ব্যাপকতর প্রয়োগ আরম্ভ হইল। ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এই অধ্যায়ের আলোচনার বাহিরে, তবে এই আঙ্গিক-রূপের সঙ্গে কবি-মানসের যোগ সম্বন্ধে এই নিবন্ধেরই অন্যত্র আমার বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ সন্ধান করিতেই হইবে। যাহাই হউক, পূর্বোক্ত কবিতাগুলির মধ্যে "পরিশেষ"-গ্রন্থের সমগ্র মূল সুরটির সন্ধান মিলিবে না; সংখ্যায়ও ইহারা অনধিক। সে-সুরটি কান পাতিয়া শুনিতে হইলে অধিক সংখ্যক অন্য কবিতাগুলির দ্বারস্থ হইতে হইবে।

"পরিশেষ" আত্মবিশ্লেষণের আত্মপরিচয়ের কাব্য। প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত এই আত্মবিশ্লেষণ চলিয়াছে থাকিয়া থাকিয়া। সত্তর বৎসরের সমগ্র রূপখানি নিজের আঁখির একাগ্র দৃষ্টির সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া আর একবার তিনি জানিয়াছেন যে তিনি কবি, জীবনের রূপরসগন্ধস্বাদ ও আনন্দ নয়ন ভরিয়া দেখা ও দেখার আনন্দ বেদনা গান ও কবিতার ছন্দে বাঁধিয়া যাওয়াই তাঁহার আজন্ম সাধনা।

আমি শুধু বাঁশরিতে ভরিয়াছি প্রাণের নিশ্বাস
বিচিত্রের সুরগুলি গ্রন্থিবারে করেছি প্রয়াস
আপনার বীণার তন্তুতে।

* * *

নিখিলের অনুভূতি
সংগীত সাধনা মাঝে রচিয়াছে অসংখ্য আকৃতি।
এই গীতিপথপ্রান্তে হে মানব, তোমার মন্দিরে
দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দ্যের তীরে
আরতির সান্ধ্যক্ষণে; একের চরণে রাখিলাম
বিচিত্রের নর্মবাঁশি,—এই মোর রহিল প্রণাম। ('প্রণাম')

"বিচিত্রা' কবিতায় তিনি আত্মজীবনধারার প্রকৃতির পরিচয় লইয়াছেন; আজীবন যে-সাধনা তিনি করিয়াছেন, যে দৃষ্টিতে জীবনকে তিনি দেখিয়াছেন তাহারই সুষ্ঠু, অনবদ্য ভাবে ও রূপে গাঁথা আত্মপরিচয়ের ইতিহাস, তাঁহার বিচিত্রা সঙ্গিনী বা জীবনদেবতা কী অভাবিত লীলায় তাঁহাকে বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির ভিতর দিয়া রূপান্তরিত করিয়া লইয়া আসিয়াছেন, কতভাবের দোলায় তাঁহাকে দোলাইয়াছেন, আন্তর জীবনের সেই গভীর মর্মানুভূতির ইতিহাস তিনি সাজাইয়াছেন একটির পর একটি কবিতায়—'বিচিত্রা', 'জন্মদিন', 'পান্থ', 'আমি', 'তুমি', 'আছি', 'বালক', 'বর্ষশেষ', 'আহ্বান', 'দীপিকা', 'অগ্রদূত', 'দিনাবসান', 'ধাবমান', 'বিস্ময়', 'নিরাবৃত', 'মৃত্যুঞ্জয়', 'যাত্রী', 'মিলন', 'আগন্তুক', 'সাক্ষী', 'সান্ত্বনা' প্রভৃতি অসংখ্য কবিতায় আত্মবিশ্লেষণ, আত্মপরিচয় চলিয়াছে নব নবরূপে: কবি হয়ত ভাবিয়াছেন, 'আয়ুর পশ্চিম পথশেষে, ঘনায় মৃত্যুর ছায়া এসে', এইবার হিসাবের খাতা খুলিয়া নিজের সমগ্র পরিচয়টা জানিয়া লই, ইষ্টদেবতার সঙ্গে, নিজের জীবনের দ্বৈতানুভূতির সঙ্গে, নিজের মনের সঙ্গে বুঝাপড়াটা

চুকাইয়া লই, সত্তর বৎসরের জীবনের গভীর সমগ্রতার যাহা কিছু সারাবশেষ তাহা এই জীবনসন্ধ্যায় বিশ্ব ও বিশ্বদেবতার চরণে নিবেদন করিয়া লই। এই বুঝাপড়া ও পরিচয় চলিয়াছে কবিতার পর কবিতায়। রসিক ও কৌতুহলী পাঠক নিজেই তাহা আস্বাদন করিয়া লইতে পারেন।

এই বুঝাপড়া পরিচয়ের মধ্য দিয়া কবিজীবনের একটি অতি পুরাতন রহস্য আবার নূতন করিয়া উদ্‌ঘাটিত হইল। বিশ্বজীবনের প্রতি গভীর প্রীতি ও ভালবাসা আবার নূতন শক্তি ও উদ্দীপনা লাভ করিল, বিশ্ব-সত্তার স্পর্শ আবার নূতন করিয়া দেহেচিত্তেমনে লাগিল, অন্তরের কবিপুরুষ আবার যেন নব বসন্তে সঞ্জীবিত হইল।

বিশ্বের প্রাঙ্গণে আজি ছুটি হোক মোর,
ছিন্ন করে দাও কর্মডোর।
আমি আজ ফিরিব কুড়ায়ে
উচ্ছৃঙ্খল সমীরণ যে-কুসুম এনেছে উড়ায়ে
সহজে ধূলায়,
পাখির কুলায়
দিনে দিনে ভরি উঠে যে-সহস্র গানে,
আলোকের ছোঁওয়া লেগে সবুজের তম্বুরার তানে।
এই বিশ্বসত্তার পরশ
স্থলে জলে তলে তলে এই গূঢ় প্রাণের হরষ
তুলি লব অন্তরে অন্তরে,
সর্বদেহে, রক্তস্রোতে, চোখের দৃষ্টিতে, কণ্ঠস্বরে,
জাগরণে ধেয়ানে, তন্দ্রায়,
বিরামসমুদ্রতটে জীবনের পরমসন্ধ্যায়। ('জন্মদিন')

বিশ্বসত্তার গভীর পরিচয়, গভীরতর স্পর্শের এই আবেগময় প্রকাশ "পরিশেষে"র অনেক কবিতায়; সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজীবনের প্রতি গভীর

ও ভালবাসার। কবি ত এবারও বারবার বলিতেছেন, তাঁহার আয়ুসূর্য পশ্চিম দিগন্তে ঢলিয়া পড়িতেছে, শেষবারের মতন তিনি প্রাণ ভরিয়া এই ধরণীর নিঃশ্বাস টানিয়া লইতেছেন ; কিন্তু প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে তিনি আবার নূতন করিয়া আবিষ্কার করিলেন, যেখানে প্রাণ-মন্ত্রের সাধনা, যেখানে যৌবন প্রাচুর্য, যেখানে সৌন্দর্য, যেখানে জীবনের নবীন বসন্ত সেইখানেই, জীবন-সায়াহ্নেও মন ও চিত্ত সেই-খানেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফেরে—চিরসঙ্গিনীর সঙ্গে তাঁহার জীবনের বিচ্ছেদ এখনও ত ঘটে নাই। এখনও নূতন জীবন, নূতন সম্ভাবনা নূতন করিয়া হাতছানি দিয়া তাঁহাকে ডাকে—"পরিশেষে"র অনেকগুলি কবিতার এই ডাক শুনা যায়। বৃথাই তিনি "পরিশেষ" কল্পনা করিয়াছিলেন ; তাঁহার কবিপুরুষের চরম পরিণাম, পশ্চিম দিগন্তে রবি-প্রদক্ষিণের শেষ তো কোথাও নাই ! সেই অতি পুরাতন কথা—তিনি ত চিরযাত্রী, চিরপথিক, তাঁহার ত কোথাও শেষ নাই, পরিশেষ নাই, সমাপ্তির বিচ্ছেদ রেখা নাই !

হে মহাপথিক,
অবারিত তব দশদিক।
তোমার মন্দির নাই, নাই স্বর্গধাম,
নাইকো চরম পরিণাম ;
তীর্থ তব পদে পদে ;
চলিয়া তোমার সাথে মুক্তি পাই চলার সম্পদে,
চঞ্চলের নৃত্যে আর চঞ্চলের গানে,
চঞ্চলের সর্বভোলা দানে—
আঁধারে আলোকে,
সৃজনের পর্বে পর্বে প্রলয়ের পলকে পলকে। ('পান্থ')

এই চির পথিকের মৃত্যু কোথায়, বিচ্ছেদ কোথায় ? আর থাকিলেই

মৃত্যু তাহাপেক্ষা বড় হইবে কেন? মৃত্যুভয় চিরপথিককে পীড়িত করিবে কেন?

যখন উদ্যত ছিল তোমার অশনি
তোমারে আমার চেয়ে বড় বলে নিয়েছিনু গনি।
তোমার আঘাত-সাথে নেমে এলে তুমি
যেথা মোর আপনার ভূমি।
ছোটো হয়ে গেছ আজ।
আমার টুটিল সব লাজ।
যত বড়ো হও,
তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড়ো নও।
আমি মৃত্যু চেয়ে বড়ো এই শেষ কথা বলে
যাব আমি চলে। ('মৃত্যুঞ্জয়')

কাজেই 'পুনশ্চ' জীবনের যাত্রা শুরু হইল। বিশ্বসত্তার স্পর্শ যাঁহার জীবনে এখনও গভীর, এখনও যিনি মাটির কাছাকাছি থাকিয়া এই ধরণীর সঙ্গে প্রীতিতে ও ভালবাসায় বাঁধা পড়িয়া আছেন, যিনি চির-পথিক, এখনও নূতন জীবন, নূতন সম্ভাবনা রুদ্রের আহ্বানে যাঁহাকে ডাকে, যৌবন ও সৌন্দর্য-প্রাচুর্য যাঁহার চিত্তকে এখনও উদ্বেল করিয়া তোলে, সত্তর বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে বলিয়াই ত তাহার জীবনের চরম পরিণাম, পরিপূর্ণ শেষ দেখা দিতে পারে না! কাজেই "পরিশেষ" রচনা শেষ হইলেও "পুনশ্চ" বলিয়া জীবন আবার আরম্ভ করিতে হয়। কবি-মানসের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এই দু'টি গ্রন্থের নামকরণ এত সার্থক ও অর্থব্যঞ্জক যে মানস-ইতিহাসটুকু না জানিলে, না নাম দু'টির না কবিতাগুলির রহস্য ধরা পড়ে।

"পরিশেষে"র কয়েকটি কবিতার পশ্চাতে সমসাময়িক রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ঘটনার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। বঙ্গাব্দ ১৩৩৮'এ ভারতবর্ষের সামাজিক

ও রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে গুরুতর আবর্তন চলিতেছে; রাষ্ট্রীয় অত্যাচার অবিচারের উপর সাম্প্রদায়িক কোলাহল নরহত্যায় রূপান্তরিত হইয়াছে; কবির মন অত্যন্ত বিচলিত। তাহার উপর প্রাকৃতিক বিপ্লব—বন্যা, প্লাবন, দুর্ভিক্ষ। এই বৎসরেরই মাঝামাঝি (১৬ আশ্বিন) হিজলি জেলে কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দীকে জেল কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত সামান্য কারণে গুলি করিয়া হত্যা করে এবং নিষ্ঠুর প্রহারে জর্জরিত করে। ইহার প্রতিবাদে কলিকাতায় মনুমেণ্টের নিচে যে বিরাট জনসভা আহূত হয় তাহার সভাপতিমঞ্চ হইতে কবি বজ্রনির্ঘোষে উচ্চারণ করিলেন, "ডাক এলো সেই পীড়িতদের কাছ থেকে, রক্ষক নামধারীরা যাদের কণ্ঠস্বরকে নরঘাতন নিষ্ঠুরতার দ্বারা চিরদিনের মতন নীরব করে দিয়েছে।" এই ঘটনার সরকারী রিপোর্ট যথারীতি প্রকাশিত হইবার পর ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্র "স্টেট্‌স্‌ম্যান" খ্রীষ্টানোচিত আদর্শের কথা তুলিয়া নর-ঘাতকদের ক্ষমা করিতে বলেন। তাহার উত্তরে কবি বলিলেন, "হিজলি-কারার যে-রক্ষীরা সেখানকার দুজন রাজবন্দীকে খুন করেছে তাদের প্রতি কোনো একটি এংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র খ্রীষ্টোপদিষ্ট মানব-প্রেমের পুনঃপুন ঘোষণা করেছেন। অপরাধকারীদের প্রতি দরদের কারণ এই যে, লেখকের মতে নানা উৎপাতে তাদের স্নায়ুতন্ত্রের 'পরে এত বেশি অসহ্য চাড় লাগে যে, বিচারবুদ্ধিসংগত স্থৈর্য তাদের কাছে প্রত্যাশাই করা যায় না। এই সব অত্যন্ত চড়া নাড়ীওয়ালা ব্যক্তিরা স্বাধীনতা ও অক্ষুণ্ণ আত্মসম্মান ভোগ করে থাকে, এদের বাসা আরামের, আহার বিহার স্বাস্থ্যকর!—এরাই একদা রাত্রির অন্ধকারে নরঘাতক অভিযানে সকলে মিলে চড়াও হয়ে আক্রমণ করলে সেই সব হতভাগ্য-দের যারা বর্বরতম প্রণালীর বন্ধনদশায় অনির্দিষ্ট কালব্যাপী অনিশ্চিত ভাগ্যের প্রতীক্ষায় নিজেদের স্নায়ুকে প্রতিনিয়ত পীড়ন করছে। * * *" এই সমস্ত ঘটনাই পাঠক সাধারণের স্মৃতির সীমানার মধ্যে। তবু,

উল্লেখ করা প্রয়োজন, ইহার কয়েকমাস পরই লণ্ডনে দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক ভাঙিয়া গেল, দেশের মাটিতে পা দিতে না দিতেই গান্ধীজি ১৯শে পৌষ কারারুদ্ধ হইলেন। একে দেশে নানা অশান্তির ব্যাপারে কবির মন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ভারাক্রান্ত, তাহার উপর গান্ধীজির বন্ধন তাঁহাকে অত্যন্ত বিচলিত করিল। দেখিতে দেখিতে দেশব্যাপী রাষ্ট্রীয় আবর্ত ঘনাইয়া উঠিল, এবং সমস্ত দেশের যৌবন সেই আবর্তে ঝাঁপাইয়া পড়িল। গান্ধীজির বন্ধনের কয়েকদিনের মধ্যেই কবি লিখিলেন 'প্রশ্ন' কবিতা। এই বন্ধন পীড়িত দেশে গান্ধীজির ক্ষমা ও অহিংসার আদর্শ মুক্তি আনিবে কবির মনের একদিকে এই ভরসা, এই বৃহৎ মানবস্বাধীনতার আদর্শের প্রতিই তাঁহার অন্তরের অনুরাগ, অথচ আর একদিকে তিনি দেখিতেছেন আমাদের শাসক ও শোষকবর্গের নির্মম নিষ্করুণ অত্যাচার অবিচার। মনের মধ্যে 'প্রশ্ন' ঘনাইয়া উঠাও একান্তই স্বাভাবিক। এমন কি, যে রবীন্দ্রনাথ ভাগবত ইচ্ছার কল্যাণ-নির্দেশে বিশ্বাসী, মঙ্গলময় মানব-পরিণামে বিশ্বাসী তাঁহার পক্ষেও স্বাভাবিক।

> ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত, পাঠায়েছ বারে বারে
> দয়াহীন সংসারে,
> তারা বলে গেল 'ক্ষমা করো সবে', বলে গেল 'ভালবাসো—
> অন্তর হতে বিদ্বেষবিষ নাশো'।
> বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির-দ্বারে
> আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে।

আমাদের যুগে গান্ধীজি ত সেই দূত, কিন্তু সেই দূতের মহনীয় আদর্শ সত্ত্বেও

> আমি-যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়ে
> হেনেছে নিঃসহায়ে,

আমি-যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি-যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।

পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটা, এই ত ভারতীয় জীবনের দুঃসহ ট্র্যাজেডি! এই ট্র্যাজেডি নিত্য অভিনীত হইতে দেখিয়াছেন কবি চোখের সম্মুখে—হিজলির গভীর মর্মবেদনা কবি তখনও ত ভোলেন নাই। এই কারণেই

কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সংগীতহারা,
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে,
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো!

কী দুঃসহ বেদনায় এ সন্দেহ জাগিয়াছে, সমসাময়িক ঘটনার দিকে তাকাইলে তাহা সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় আইন অমান্য আন্দোলনের সূত্রপাত; সেই যৌবনান্দোলনের প্রেক্ষাপটে 'অবাধ' কবিতাটির মতন রচনার অর্থও সুস্পষ্ট, এবং একই অনুভূতির জারিত নির্যাস তাহার সৌরভ ছড়াইয়াছে আরও কয়েকটি কবিতায় যেখানে রূপরসগন্ধময় জীবন ও যৌবনবন্দনা বিভিন্ন ভাব ও বস্তুর আধারে দেদীপ্যমান।

রূপ ও রীতির দিক হইতে এবং কতকটা ভাবানুষঙ্গের দিক হইতেও "পুনশ্চ-শেষসপ্তক-পত্রপুট-শ্যামলী" কতকটা একগোত্রের; কিছুটা এই কারণে এবং আলোচনার সুবিধার জন্য এই চারিটি গ্রন্থের আলোচনা

পরে করা অন্যায় হইবে না। তাহার আগে ঐতিহাসিক ক্রমের একটু ব্যতিক্রম করা হইলেও "বিচিত্রিতা" সম্বন্ধে দু'চার কথা বলিয়া লওয়া যাইতে পারে।

"বিচিত্রিতা" প্রকাশিত হয় ১৩৪০'র শ্রাবণ মাসে। এই গ্রন্থে ৩১টি নানা ছন্দের সমিল কবিতা এবং ৩১টি বিচিত্র বর্ণের ও রেখার ছবি। ছবিগুলি রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, সুরেন্দ্রনাথ কর, গৌরী দেবী, সুনয়নী দেবী, নিশিকান্ত রায়চৌধুরী, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, প্রতিমা দেবী, মনীষী দে প্রভৃতি বিখ্যাত বাঙালী চিত্রীদের আঁকা। বলাবাহুল্য, গগনেন্দ্র-অবনীন্দ্র ও নন্দলালের ছবিগুলি এই অভিনব কাব্যগ্রন্থটিকে উজ্জ্বলতা দান করিয়াছে। ছবিগুলিকে উপলক্ষ করিয়াই এই রচনাগুলির সৃষ্টি, কিন্তু প্রায় সর্বত্রই রচনাগুলি উপলক্ষকে ছাড়াইয়া গিয়াছে; ছবির সূত্র মাত্র ধরিয়া কবি নিজের মনন-কল্পনাকে প্রসারিত করিয়াছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, সার্থক রবীন্দ্র-প্রতিভাদীপ্ত রচনা এই গ্রন্থটিতে খুব বেশি নাই, এবং মনন-কল্পনার নূতনত্বও প্রায় অনুপস্থিত। 'কুমার', 'শ্যামলা', 'ছায়াসঙ্গিনী', 'ভীরু', 'কালোঘোড়া' প্রভৃতি কয়েকটি সার্থক কবিতার সঙ্গে "মহুয়া-পরিশেষে"র ভাবাত্মীয়তা লক্ষণীয়; ছোটছোট দু'একটি রচনা, যেমন 'কন্যা-বিদায়' এবং 'বিদায়' চিত্রনিরপেক্ষ হইয়াও সার্থক। একথা উল্লেখযোগ্য যে অধিকাংশ সার্থক রচনা গগনেন্দ্রনাথের ছবি উপলক্ষ করিয়া; নিঃসন্দেহে গগনেন্দ্রনাথের সাদায়-কালোয় রূপরহস্যময় ছবিগুলি কবির কল্পনাকে শক্তি ও মুক্তি দিয়াছে সকলের চেয়ে বেশি। বস্তুত, এই কবিতাগুলিতে অলক্ষ্যে গগনেন্দ্রনাথের শিল্পপ্রতিভার প্রতি যে-সম্মান দান করা হইয়াছে বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের শিল্পী ও শিল্পরসিক সমাজ এই প্রতিভাবান শিল্পীকে

সেই সম্মান দান করেন নাই। আমি নিজে সখেদে মনে করি, গগনেন্দ্রনাথের শিল্পপ্রতিভা এখনও অজ্ঞাত এবং অনাদৃত।

"বীথিকা" প্রকাশিত হয় ১৩৪২'র ভাদ্র মাসে। কবির অন্যতম এই সুবৃহৎ কাব্যগ্রন্থটিতে উনসত্তরটি কবিতা আছে, এবং তাহাদের প্রত্যেকটিই সমিল কবিতা। একান্ত আত্মলীন ভাব-গভীরতায়, ব্যক্তি-জীবনের ছায়ায় ভাবনায়, বিশ্বসত্তার সুগভীর স্পর্শানুভূতিতে এবং মনন-কল্পনার স্বকীয়তা ও দ্বিধাহীন বিশ্বস্ততায় প্রায় প্রত্যেকটি কবিতা সমুজ্জ্বল ও সার্থক। জীবনের শেষতম পর্বের অনেক কল্পভাবনার আভাস "বীথিকা"র কবিতাগুলিতে সহজেই ধরা পড়ে। সত্তরোত্তীর্ণ কবির "বীথিকা" তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ একথা বলিতে দ্বিধা হইবার কোনও কারণ নাই। পাঠক সমাজে এই গ্রন্থটি কেন যে এখনও যথাযোগ্য সমাদর লাভ করে নাই জানি না।

"বীথিকা"র কবিমানস অতি গভীরে প্রসারিত, গভীর গম্ভীর জীবন-জিজ্ঞাসায় রূপান্তরিত। কবিতার বিষয়বস্তু যাহাই হউক, প্রায় সর্বত্রই অতীত ও বর্তমান, নিসর্গ ও বিশ্বজীবন বা এককথায় বিশ্বসত্তা, প্রেম ও অনুরাগ, জীবন ও মৃত্যু ব্যক্তিগত জীবনের ছায়া ও স্বপ্ন, মনন ও কল্পনা, সব কিছু জড়াইয়া সব কিছু বিদীর্ণ করিয়া এই আত্মলীন-জীবন-জিজ্ঞাসা একটি পরিব্যাপ্ত সুগভীর বিশ্বাস, একটি শান্ত নিঃস্তব্ধ অনুভব, এবং জীবনের পুরাতন মূলগত দর্শন ও আদর্শগুলির নূতন মূল্য আবিষ্কারকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে বিচিত্র ছন্দে ও বর্ণে, বিচিত্র ভাব ও বস্তু পরিবেশের মধ্যে। এই ভাব ও বস্তু পরিবেশ একান্তই রোম্যাণ্টিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসূত, সন্দেহ নাই; এবং এই দৃষ্টি একেবারে সৃষ্টির ও প্রলয়ের মূল পর্যন্ত প্রসারিত। ইহার দুই প্রান্তে দুই মহাশূন্য এবং তাহাদের মাঝখানে নানা ঐতিহ্যময়, নানা কোলাহলময়, রূপ-রহস্যময়

প্রাণ-মহিমার সীমাহীন বিস্তৃতি। ইহার কিছুই কবির দর্শন ও মনন হইতে বাদ পড়ে নাই। গভীর চিত্র ও কল্পনা-সমৃদ্ধিতেও কবিতাগুলি প্রাণবান। এখানে ওখানে দু'চারিটি কবিতার পরিচয় লইলেই উক্তি-গুলির সার্থকতা ধরা পড়িবে।

প্রথম কবিতাটিতে মহা অতীতের সঙ্গে কবির মিতালি; সেই মহা অতীত 'রূপহীন দেশে দিবালোকে তারালোক জ্বালিয়া' ধ্যানে বসিয়া আছে, সেখানে

রূপময় বিশ্বধারা অবলুপ্তপ্রায়
গোধূলি ধূসর আবরণে,
অতীতের শূন্য তার সৃষ্টি মেলিতেছে মোর মনে।
এ শূন্য তো মরুমাত্র নয়
এ যে চিত্তময়;
* * *
আলোড়িত এই শূন্য যুগে যুগে উঠিয়াছে জ্বলি,
ভরিয়াছে জ্যোতির অঞ্জলি।
বসে আছি নির্নিমেষ চোখে
অতীতের সেই ধ্যানলোকে,—
নিঃশব্দ তিমিরতটে জীবনের বিস্মৃত রাত্রির।
* * *
কল কোলাহলশান্ত জনশূন্য তোমার প্রাঙ্গণে,
যেখানে মিটেছে দ্বন্দ্ব মন্দ ও ভালোয়,
ছায়ার আলোয়
সেখানে তোমার পাশে আমার আসন পাতা,—
কর্মহীন আমি সেথা বন্ধহীন সৃষ্টির বিধাতা। ('অতীতের ছায়া')

একদা যৌবনের দুই দুরু দুরু বক্ষের প্রেমযাত্রা আজ এই জীবন-সায়াহ্নে সুদূর গগনের দিকে শান্ত হইয়া চাহিয়া আছে,

অকথিত কোন্ কথা
কী বারতা
কাঁপাইছে বক্ষের পঞ্জরে।
বিশ্বের বৃহৎ বাণী লেখা আছে যে মায়া-অক্ষরে,
তার মধ্যে কতটুকু শ্লোকে
ওদের মিলন লিপি, চিহ্ন তার পড়েছে কি চোখে। ('দুজন')

কবি আজ কামনা করিতেছেন, রাত্রিরূপিনীর প্রেমে

চিত্তে মোর যাক থেমে
অন্তহীন প্রয়াসের লক্ষ্যহীন চাঞ্চল্যের মোহ,
দুরাশার দুরন্ত বিদ্রোহ।

* * *

অপ্রমত্ত মিলনের মন্ত্র সুগম্ভীর
মন্ত্রিত করুক আজি রজনীর তিমিরমন্দির। ('রাত্রিরূপিণী')

এমন যে কৈশোরের প্রিয়া তাহার সম্বন্ধেও কবির উক্তি

হে কৈশোরের প্রিয়া,
এ জনমে তুমি নব জীবনের দ্বারে
কোন্ পার হতে এনে দিলে মোর পারে
অনাদি যুগের চিরমানবীর হিয়া।
দেশের কালের অতীত যে মহাদূর
তোমার কণ্ঠে শুনেছি তাহারি সুর,—
বাক্য সেথায় নত হয় পরাভবে। ('কৈশোরিকা')

একদিকে এই মহামৌন শূন্যতা যে শূন্যতা গভীর চিত্তময় রূপময়; কবিচিত্তে তাহারই কামনা। আর একদিকে প্রলয়ের অন্ধকার,

তাহাও শূন্য, কিন্তু এই শূন্যতা কবিচিত্ত কামনা করে না। এই শূন্য অন্ধকার, দূরত্ব ও ব্যবধান রচনা করে, চেতনাকে আবিল করে।

সে যে সৃষ্টি করে নিত্য ভয়।
ছায়া দিয়ে রচি তুলে আঁকা বাঁকা দীর্ঘ উপছায়া,
জানারে অজানা করে, ঘেরে তারে অর্থহীন মায়া।
পথ লুপ্ত ক'রে দিয়ে যে পথের করে সে নির্দেশ
নাই তার শেষ।
সে-পথ ভুলায়ে লয় দিনে দিনে দূর হতে দূরে
ধ্রুবতারাহীন অন্ধপুরে।

* * *

দানব বিলুপ্তি আনে, আঁধারের পঙ্কিল বুদ্বুদে
নিখিলের সৃষ্টি দেয় মুদে;
কণ্ঠ দেয় রুদ্ধ করি, বাণী হতে ছিন্ন করে সুর,
ভাষা হতে অর্থ করে দূর;
উদয়দিগন্তমুখে চাপা দেয় ঘন কালো আঁখি,
প্রেমেরে সে ফেলে বাঁধি
সংশয়ের ডোরে;
ভক্তিপাত্র শূন্য ক'রে শ্রদ্ধার অমৃত লয় হ'রে।
বুক অন্ধ মৃত্তিকার স্তর,
জগদ্দল শিলা দিয়ে রচে সেথা মুক্তির কবর। ('প্রলয়')

রূপকামী মুক্তিকামী দীপ্তিকামী কবি এই প্রলয়ের শূন্য অন্ধকারের কারাগার কামনা করিবেন কি করিয়া? একদিকে অস্তিত্বময় গভীর মহামৌন বিশ্বসত্তার শূন্যময় কল্পনা, আর একদিকে রুদ্ধসৃষ্টি অন্ধকারের বন্ধ্যা শূন্যতা, এ দু'য়ের কোথাও কোন মিল নাই; কাজেই কবিচিত্ত প্রাণপ্রাচুর্য ও জীবন-চাঞ্চল্যের বিচিত্র রূপের মধ্যেও কামনা করেন

শান্ত স্তব্ধ মৌন গভীরত, কামনা করেন অন্তরের নিভৃত কুলায়, কামনা করেন তপস্যার গভীর নীরবতা।

প্রাণের প্রথমতম কম্পন
অণুদের মজ্জায় করিতেছে বিচরণ,
তারি সেই ঝংকার ধ্বনিহীন—
আকাশের বক্ষেতে কেঁপে ওঠে নিশিদিন
*   *   *
সেই মহাবাণীময় গহন মৌনতলে
নির্বাক জলে স্থলে
শুনি আদি ওংকার
শুনি মূক গুঞ্জন অগোচর চেতনার।

ধরণীর ধূলি হতে তারার সীমার কাছে
কথাহারা যে ভুবন ব্যাপিয়াছে
তার মাঝে নিই স্থান,
চেয়ে-থাকা দুই চোখে বাজে ধ্বনিহীন গান। ('আদিতম')

বেশ বুঝা যায় চিত্তের আকৃতি প্রসারিত হইয়াছে জীবনের সুগভীর রহস্যময়তার দিকে; এবং এই গভীর রহস্যময়তা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। "বীথিকা"য় প্রেমের কবিতা আছে, সেগুলি প্রায়ই পুরাতন স্মৃতিবহ; কয়েকটি আখ্যানবাহী লীলাচপল কবিতাও আছে। তাহা ছাড়া, আত্মলীন নিসর্গানুভূতি, এবং ব্যক্তিজীবনের পরিচয়বাহী বিভিন্ন বিষয়াশ্রয়ী বিচিত্র অনুভূতির কয়েকটি কবিতাও আছে। কিন্তু প্রায় সর্বত্রই দৃষ্টি প্রসারিত জীবনের শান্ত গভীর রহস্যময়তার অভিমুখে। ক্ষণিক ভাবনা, ক্ষণিক মায়ার ছন্দরূপের মধ্যেও এই স্তব্ধ সুদূর সুবিস্তৃত রহস্যময়তার আভাস।

মাঝখানে দু'একটি কবিতায় (যেমন, 'বিরোধ') এবং শেষের দিকে কয়েকটি কবিতায় একটি নূতন সুর শোনা যায়। সে সুর

ভাঙনের, বিদ্রোহের, নূতন সৃষ্টির, বন্ধন হইতে কলুষ হইতে মুক্তির সুর, সংগ্রামের সুর।

ভাঙনের আক্রমণ
সৃষ্টিকর্তা মানুষেরে আহ্বান করিছে অনুক্ষণ।

*　　　*　　　*

উৎপীড়িত সেই জাগরণে
তন্দ্রাহীন যে-মহিমা যাত্রা করে রাত্রির আঁধারে
নমস্কার জানাই তাঁহারে।
নানা নামে আসিছে সে নানা অস্ত্র হাতে
কণ্টকিত অসম্মান অবাধে দলিয়া পদপাতে—
মরণেরে হানি—
প্রলয়ের পান্থ সেই, রক্তে মোর তাহারে আহ্বানি। ('বিরোধ')

একই সুর শোনা যায় 'কলুষিত' কবিতায়—

মন মোর কেঁদে আজ ওঠে জাগি
প্রলয় মৃত্যুর লাগি।
রুদ্র, জটাবন্ধ হতে করো মুক্ত বিরাট প্লাবন,
নীচতার ক্লেদপঙ্কে করো রক্ষা ভীষণ, পাবন!
তাণ্ডব নৃত্যের ভরে
দুর্বলের যে-গ্লানিরে চূর্ণ করো যুগে যুগান্তরে
কাপুরুষ নির্জীবের সে নির্লজ্জ অপমানগুলি
বিলুপ্ত করিয়া দিক উৎক্ষিপ্ত তোমার পদধূলি।

অথবা, 'অভ্যুদয়' কবিতায়

আকাশে ধ্বনিছে, বারংবার—
"মুখ তোলো,
আবরণ খোলো,
হে বিজয়ী, হে নির্ভীক,

হে মহাপথিক,
তোমার চরণক্ষেপ পথে পথে দিকে দিকে
মুক্তির সংকেতচিহ্ন
যাক লিখে লিখে।"

এই সংগ্রামের সুর আরও দু'একটি কবিতার নূতন ব্যঞ্জনায় অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

একেবারে শেষ দু'টি কবিতায় মৃত্যুর পদচিহ্ন আঁকা। শুধু ক্ষণিক মৃত্যুভাবনার বিলাস নয়, এ যেন মৃত্যু দর্শন ঘটিয়াছে নিজের জীবনে, মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখী পরিচয় হইয়াছে—যে পরিচয় তাহার সমগ্র-নিবিড়তা লইয়া ধরা পড়িয়াছে, কবির শেষতম কয়েকটি কাব্যগ্রন্থে, "রোগশয্যায়-আরোগ্য-জন্মদিন-শেষলেখা"য়। এ-অনুভূতি এই প্রথম এবং একান্তই অভূতপূর্ব্ব। অতীতের সমস্ত গ্লানি ও আবর্জনা, ক্লান্তি ও বেদনা, প্রীতি ও সুখস্মৃতি, সব কিছুর আলিঙ্গন শিথিল করিয়া

এই দেহ যেতেছে সরিয়া
মোর কাছ হতে।
সেই রিক্ত অবকাশ যে-আলোতে
পূর্ণ হয়ে আসে
অনাসক্ত আনন্দ-উদ্ভাসে
নির্মল পরশ তার
খুলি দিল গত রজনীর দ্বার।

নব জীবনের রেখা
আলোরূপে প্রথম দিতেছে দেখা;
* * *
ভাসিতেছে সত্তার প্রবাহে
সৃষ্টির আদিম তারাসম
এ চৈতন্য মম।
* * *

পিছনের ডাক
আসিতেছে শীর্ণ হয়ে ; সম্মুখেতে নিস্তব্ধ নির্বাক
ভবিষ্যৎ জ্যোতির্ময়
অশোক অভয়,
স্বাক্ষর লিখিল তাহে সূর্য অস্তগামী।
যে মন্ত্র উদাত্ত সুরে উঠে শূন্যে সেই মন্ত্র—'আমি'। ('শেষ')

সর্বশেষ কবিতায় কবি বলিতেছেন, দেহে মনে যখন সুপ্তি ভর করে, চৈতন্যলোকে যখন রূপান্তর দেখা দেয় তখন জাগ্রত জগৎ মিথ্যার কোঠায় চলিয়া যায় ; নিদ্রার শূন্যতা ভরিয়া তখন যে স্বপ্নের সৃষ্টি হয় তাহাকেও তখন সত্য বলিয়া মনে হয়। সে-নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যখন চিত্ত নূতন এক পৃথিবীতে জাগিয়া উঠে তখন সেই জাগ্রত জগৎই সত্য বলিয়া মনে হয়, স্বপ্নে দেখা নিশ্চিতরূপ তখন অনিশ্চিতের কোঠায় চলিয়া যায়।

তাই ভাবি মনে,
যদি এ জীবন মোর গাঁথা থাকে মায়ার স্বপনে,
মৃত্যুর আঘাতে জেগে উঠে
আজিকার এ জগৎ অকস্মাৎ যায় টুটে,
সবকিছু অন্য-এক অর্থে দেখি,—
চিত্ত মোর চমকিয়া সত্য বলি তারে জানিবে কি।
সহসা কি উদিবে স্মরণে
ইহাই জাগ্রত সত্য অন্যকালে ছিল তার মনে। ('জাগরণ')

ইহা যেন শুধু প্রশ্ন মাত্র নয়, যেন ইহা প্রত্যক্ষ কল্প-অভিজ্ঞতার বাণীময় রূপ!

(১২)

পুনশ্চ (১৩৩৯)

শেষসপ্তক (১৩৪২)

পত্রপুট (১৩৪৩)

শ্যামলী (১৩৪৩)

"পুনশ্চ" প্রকাশিত হয় ১৩৩৯'র আশ্বিনে, "শেষসপ্তক" ১৩৪২'র বৈশাখে, "পত্রপুট" ঠিক একবৎসর পরে, এবং "শ্যামলী" ১৩৪৩'র ভাদ্রে। 'গদ্য'-কবিতা বলিতে যে-ধরনের কাব্যরচনার দিকে আমরা ইঙ্গিত করি, তাহাদের যথার্থ ও সার্থক প্রকাশ এই গ্রন্থ চারিটিতেই দেখা যায়। বলা বাহুল্য, বাংলা সাহিত্যে কাব্য-রচনার এই বিশিষ্ট রীতির স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ, এবং ইহার সূচনা দেখা গিয়াছিল "লিপিকাতে"ই। কিন্তু "লিপিকার"ও আগে "বলাকা"য়ই কবি এক ধরনের ছন্দ-স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন; গদ্য ও পদ্যের মধ্যে একটা সার্থক সমন্বয় সেই মুক্তক ছন্দের নিয়মিত বৃত্তপ্রবাহ ও অন্তঃমিলের মধ্যেই ধরা পড়িয়াছিল। সুঅভ্যাসগত ছন্দের যত্নবিন্যস্ত অতিপিনদ্ধ নিয়মানুগত্যের মধ্যে, অন্তঃমিলের এবং বৃত্তপ্রবাহের উত্থান পতনের সংগীতাবেশের মধ্যে গদ্যের যুক্তিশৃঙ্খলা, চিন্তাধারার ছন্দানুগামী সরল অথচ শক্তিমান একটা প্রবাহ সঞ্চারের সার্থক চেষ্টা ধরা পড়িল "বলাকা-পলাতকা-মহুয়া"য়; বস্তুত "বলাকা"র ভাবপ্রসঙ্গের এবং সেই হেতু মনন-কল্পনার মৌলিকতাই এই নূতন রীতি প্রবর্তনের হেতু। "বলাকা"র ছন্দ ঐ কাব্যেরই আত্মার নিগূঢ় অপরিহার্য অঙ্গাভরণ, ভাব ও ছন্দ দুইই এক মর্মগত ঐক্যবন্ধনে বাঁধা। কিন্তু "পুনশ্চ-শেষসপ্তক-পত্রপুট-শ্যামলী"তে তিনি যে নূতন ছন্দরীতির প্রবর্তন করিলেন তাহা অন্তঃমিল ও বৃত্তপ্রবাহধৃত মুক্তক ছন্দ নয়, অথচ সেই সার্থক

পরীক্ষারই যুক্তি শৃঙ্খলাময় চরম পরিণতি, একথা বলিলে বোধ হয় খুব অন্যায় বলা হয় না।

এই নূতন ছন্দ-রীতির আঙ্গিক-কৌশল আমার আলোচনার বাইরে; ইহার ব্যাকরণ-রীতিবিশ্লেষণ ছান্দসিকের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু ছন্দ ত শুধু কাব্যের বাহ্যসৌষ্ঠব বা অলংকার মাত্র নয়, তাহা যে কাব্যের সহজাত রূপমূর্তি এবং সেই হেতু কবির মনন-কল্পনার সঙ্গে তাহার যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। "বলাকা"য় যে সার্থক পরীক্ষা তিনি করিয়াছিলেন, বৃত্তপ্রবাহ এবং অন্তঃমিল উপস্থিত থাকার দরুন সেক্ষেত্রেও তাঁহার কবিতা একান্তভাবে সংগীতের আবেশ হইতে মুক্তিলাভ করে নাই, সে-প্রয়াসও হয়ত তিনি করেন নাই। কিন্তু, এবার তিনি প্রয়োজন অনুভব করিলেন, সংগীতের আবেশ হইতে কবিতার পরিপূর্ণ মুক্তির, গদ্যের দৃঢ় কাঠিন্য এবং চিন্তাধারার প্রবাহানুগামী সরল প্রবহমাণ গতির মধ্যে কাব্যের ধ্বনি ও রস সঞ্চারের, এবং বস্তু বা বিষয়-গৌরবের উপরই আপন বক্তব্যের একান্ত প্রতিষ্ঠার। কবিতা সংগীত ও সুরের আবেশ হইতে মুক্ত হইয়া নিজের বক্তব্য বিষয়ের উপর স্থির ও সবল নির্ভরতায় দাঁড়াইতে পারিবে না কেন, ইহাই যেন কবির অন্তরের প্রশ্ন। অন্তঃমিল ও বৃত্তপ্রবাহের সংগীতময়তা নয়, কেবল ভাব-প্রবাহের উত্থান পতনের প্রবহমাণতার উপর, ধ্বনিপ্রবাহের স্রোতাবেগের উপরই এই নূতন গদ্যছন্দের নির্ভর। এই নূতন ছন্দ বাহিরের ছন্দরূপের উপর নির্ভর করেনা, করে অন্তরের ভাবচ্ছন্দের উপর, এবং এই ছন্দের ব্যবহার একান্ত ভাবেই নির্ভর করে গদ্যের স্বাধীন অনিয়মিত প্রবাহের অবাধ আধিপত্যের উপর।

এই নূতন রীতির প্রবর্তন যে কিছু আকস্মিক খেয়াল বশে নয় তাহা "বলাকা-লিপিকা"র রীতি-পরীক্ষাতেই সপ্রমাণ। কিন্তু রীতি-বিকাশের ইতিহাসের দিক ছাড়িয়া দিলেও একটু অনুসন্ধানেই

ধরা পড়ে ইহার পশ্চাতে কবির মনন-কল্পনার ঋতু পরিবর্তনের হেতুটাই প্রবলতর। বস্তুত, ঋতুপরিবর্তন হইয়াছে বলিয়াই রীতি-পরিবর্তন অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। বিষয় বস্তু নির্বাচনে যে অভিনবত্ব "পুনশ্চ" হইতেই দৃষ্টিগোচর, তাহার মধ্যেই ঋতু পরিবর্তনের প্রথম প্রমাণ, কিন্তু সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ দৃষ্টিভঙ্গির নূতনত্ব। এই নবাবিষ্কৃত দৃষ্টিভঙ্গিই নূতন রীতি-প্রবর্তনের হেতু। এই নূতন রীতির গতিপ্রকৃতি ও ব্যবহার সম্বন্ধে কবি বারবার নানাভাবে নানা যুক্তি ও উপমার সাহায্যে নিজের মনন ও আদর্শ, ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন; তাহার ভিতর এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যাও প্রচ্ছন্ন। "পুনশ্চ"-গ্রন্থের ভূমিকায় কবি বলিতেছেন।

"গদ্যকাব্যে অতি-নিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন প্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীনক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে। অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এই আমার বিশ্বাস এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলি লিখেছি। এর মধ্যে কয়েকটি কবিতা আছে তাতে মিল নেই, পদ্যছন্দ আছে, কিন্তু পদ্যের বিশেষ ভাষারীতি ত্যাগ করবার চেষ্টা করেছি। * * *"

"পুনশ্চ"র প্রথম কবিতা 'কোপাই' নদীর ভাষার মধ্যে কবি তাঁহার নূতন রীতির প্রতীক আবিষ্কার করিয়াছেন—

ওর [কোপাই'র] ভাষা গৃহস্থপাড়ার ভাষা,—
তাকে সাধু ভাষা বলে না।
জল স্থল বাঁধা পড়েছে ওর ছন্দে,
রেষারেষি নেই তরলে শ্যামলে।

* * *

কোপাই আজ কবির ছন্দকে আপন সাক্ষী করে নিলে,
সেই ছন্দের আপস হয়ে গেল ভাষার স্থলে জলে,
যেখানে ভাষার গান আর যেখানে ভাষার গৃহস্থালি।
তার ভাঙা তালে হেঁটে চলে যাবে ধনুক হাতে সাঁওতাল ছেলে;
পার হয়ে যাবে গরুর গাড়ি
আঁঠি আঁঠি খড় বোঝাই করে;
হাটে যাবে কুমোর
বাঁকে করে হাঁড়ি নিয়ে;
পিছন পিছন যাবে গাঁয়ের কুকুরটা;
আর মাসিক তিনটাকা মাইনের গুরু
ছেঁড়া ছাতি মাথায়।

এই গ্রন্থেরই দ্বিতীয় কবিতায় একই বিষয়ের ভিন্ন অভিব্যক্তি; নিজের নূতন উদ্ভাবিত রীতির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া এইবার কবি বলিলেন,

গদ্য এলো অনেক পরে।
বাঁধা ছন্দের বাইরে জমালো আসর।
সুশ্রী কুশ্রী ভালোমন্দ তার আঙিনায় এলো
ঠেলাঠেলি করে।
ছেঁড়া কাঁথা আর শাল দোশালা
এলো জড়িয়ে মিশিয়ে,
সুরে বেসুরে ঝনাঝন্ ঝংকার লাগিয়ে দিলো।
গর্জনে ও গানে, তাণ্ডবে ও তরল তালে
আকাশে উঠে পড়লো গদ্যবাণীর মহাদেশ।
কখনো ছাড়লে অগ্নিনিঃশ্বাস,
কখনো ঝরালে জলপ্রপাত।

*　　*　　*

একে অধিকার যে করবে তার চাই রাজপ্রতাপ;
পতন বাঁচিয়ে শিখতে হবে
এর নানা রকম গতি অবগতি।

বাহিরে থেকে এ ভাসিয়ে দেবনা স্রোতের বেগে,
অন্তরে জাগাতে হয় ছন্দ
গুরু লঘু নানা ভঙ্গিতে।

গর্জন ও গান, তাণ্ডব ও তরল, অগ্নিনিঃশ্বাস ও জলপ্রপাত, শ্যামল কঠোর মেশানো এই নূতন কাব্যরূপ, একথা যে কত সত্য তাহা ধরা পড়ে বিশেষভাবে "শেষসপ্তক" ও "পত্রপুটের" সার্থক ও গভীর ভাব-ব্যঞ্জক দীর্ঘ কবিতাগুলিতে। কিন্তু সে যাহাই হউক, এই উদ্ধৃত কবিতা দু'টির ভিতর কবির দৃষ্টিভঙ্গির অভিনবত্ব সুস্পষ্ট। তাঁহার ছন্দরূপই যে শুধু জনগণের সাধারণ জীবন-যাত্রার সাধারণ গৃহস্থপাড়ার ভাষার তাহা নয়, তাঁহার মনন-কল্পনাও আশ্রয় করিতে চলিয়াছে বৃহত্তর জন-মানসকে, নূতন কালের নূতন সমাজ-চেতনাকে, কেবল সাধু ও গুরু মুষ্টিমেয় সমষ্টি-মানসের বুদ্ধি ও চেতনাকে নয়। দৃষ্টিভঙ্গির এই অভিনবত্ব তাহার সুস্পষ্ট উক্তি লাভ করিয়াছে "পুনশ্চ"র তৃতীয় কবিতা 'নূতন কাল'-এ

কাল আপন পায়ের চিহ্ন যায় মুছে মুছে
স্মৃতির বোঝা আমরাই বা জমাই কেন,
একদিনের দায় টানি কেন আর একদিনের 'পরে,
দেনাপাওনা চুকিয়ে দিয়ে হাতে হাতে
ছুটি নিয়ে যাই না কেন চলে সামনের দিকে চেয়ে।

* * *

তাই ফিরে আসতে হোলো আর একবার।
দিনের শেষে নতুন পালা আবার করেছি শুরু
তোমারি মুখ চেয়ে,
ভালবাসার দোহাই মেনে।
আমার বাণীকে দিলেম সাজ পরিয়ে
তোমাদের বাণীর অলংকারে;

তাকে রেখে দিয়ে গেলেম পথের ধারে পান্থশালায়,
পথিক বন্ধু, তোমারি কথা মনে করে।
যেন সময় হলে একদিন বলতে পারো
মিটলো তোমাদেরও প্রয়োজন,
লাগলো তোমাদেরও মনে।
দশজনের খ্যাতির দিকে হাত বাড়াবার দিন নেই আমার।
কিন্তু তুমি আমাকে বিশ্বাস করেছিলে প্রাণের টানে।
সেই বিশ্বাসকে কিছু পাথের দিয়ে যাব
এই ইচ্ছা।

এই একই কথা আরও পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে "শেষসপ্তকে"র তিনটি কবিতায়। বিশ নম্বরে কবি খোলা আকাশের তলে রাঙা-মাটির পথের ধারে সভা করিয়া বসিয়াছেন; এতকাল যত কাব্যরচনা করিয়াছেন সেই রচনা পুঁথিখানা খুলিয়া পড়িতে গিয়াই মনে বড় সংকোচ হইল, এই সব রচনা বড় কোমল, বড় স্পর্শকাতর, ইহাদের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মৃদু ও কুণ্ঠিত। ইহারা অন্তঃপুরিকা, ইহাদের অবগুণ্ঠনের উপর সোনার সুতায় ফুলকাটা পাড়। মাটিতে চলিতে ইহাদের পা' সরে না, ইহারা বহুসম্মানে বন্দিনী, নৈপুণ্যের বন্ধনে ইহারা বাঁধা; এই পথের ধারের সভায় ইহাদের উপস্থিত করা চলে না। এখানে আসিতে পারে তাহারাই যাহাদের সংসার বন্ধন খসিয়াছে, অসংকোচ অক্লান্ত যাহাদের গতি, গায়ের বসন যাহাদের ধূলিধূসর, কাহারও মন জোগাইয়া চলিবার দায় যাহাদের নাই; অজ্ঞাত শৈলগুহায়, জনহীন মাঠে, পথহীন অরণ্যে যাহাদের কণ্ঠ প্রতিধ্বনি জাগায়; তাহাদেরই জন্য কবির নূতন রচনার উদ্যম। কাজেই কবিতা পাঠ হইল না, এই বলিয়া কবি বিদায় লইলেন, "যাব দুর্গমে, কঠোর নির্মমে, নিয়ে আস্‌বো কঠিন চিত্ত উদাসীনের গান।" চব্বিশ নম্বর কবিতায় কবি এই নূতন রীতির রচনা সম্বন্ধে বলিলেন, ইহারা ছুটি পাওয়া নটী, ইহাদের উচ্চহাসি

অসংযত খেলা ধূলা যেমন তেমন, ইহারা খেয়ালি ঝরনার ধারা, কোথাও মোটা, কোথাও সরু, কোথাও গুহায় লুকায়িত, কোথাও মোটা পাথরে ঠেকানো; তাহাদের মুঠার মধ্যে ধরা যায় না, তাহাদের পরিচয় অসাজানো আটপৌরে। পঁচিশ নম্বরেও প্রায় একই কথা। কবির বিগত যুগের রচনাগুলি আভিজাত্যের সুশাসনে বাঁধা, সে-বাগান যেন রাজআদরে অলংকৃত মোগল বাদশাহ্‌র জেনানা। অথচ সেই বাগানের প্রাচীরের বাইরেই যে আগাছা ফুল তাহাদের উপরে অবারিত নীল আকাশ বিস্তীর্ণ। সমুন্নত তাহাদের স্বাধীনতা, স্বকীয় মুক্তিতেই তাহাদের সৌন্দর্যের মর্যাদা। তাহারা ব্রাত্য, সহজ, আচারমুক্ত; বাইরে শৃঙ্খলার বাঁধাবাঁধি নাই, অথচ মজ্জার মধ্যে সংযম। ইহাদের ডালপালা বেড়াভাঙা ছন্দের অরণ্যে যথেচ্ছ ছড়ান।

ঋতু ও রীতি পরিবর্তন সম্বন্ধে কবির যাহা বক্তব্য তাহা সবিস্তারেই উল্লেখ করিলাম। স্পষ্টতই বুঝা যাইতেছে, কবি মনে করিতেছেন, এতদিন তিনি যাহাদের গান গাহিয়াছেন তাহারা বৃহত্তর জনসাধারণের পর্যায়ভুক্ত নয়, যে-রীতি ও ভাষায় গান ও কবিতা রচনা করিয়াছেন সে রীতি এবং ভাষাও জনগণের মুখের ভাষা ও কথার রীতি নয়। অথচ নূতন কাল ত তাহাদেরই। সুতরাং, আজ যদি কাহারও বুকের কথা কবিতায় গাঁথিয়া তুলিতে হয় তাহা হইলে তাহাদের কথাই বলিতে হইবে তাহাদেরই মুখের ভাষায় ও কথার রীতিতে। কাজেই এ-যুগের কবিতা হইবে সমস্ত কারুকৌশল বর্জিত, নিরলংকার, বিরল সৌষ্ঠব, অযত্ন গঠিত, সহজ, সরল, আচারমুক্ত।

"পুনশ্চ-শেষসপ্তক-পত্রপুট-শ্যামলী" এই চারিটি গ্রন্থে রীতির পরিবর্তন যে ঘটিয়াছে, এবং ঋতু পরিবর্তনও যে এই গ্রন্থ ও পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলিতে সুস্পষ্ট সে-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই;

কবির মনন-কল্পনায় তাহার পরিচয় অনস্বীকার্য। কিন্তু যে-ইচ্ছা ও আদর্শের প্রেরণার বশে এই রীতি পরিবর্তন, সেই ইচ্ছা ও আদর্শ চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে কি? অর্থাৎ বৃহত্তর জনমানসের বুকের কথা তাহাদের মুখের ভাষা ও কথার রীতিতে রূপলাভ করিয়াছে কি?

সহসা এ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়া কঠিন। কবি-মনের এই ইচ্ছা ও আদর্শের আন্তরিকতায় এতটুকু অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। তবু যেন মনে হয় তাঁহার ইচ্ছা ও আদর্শ এই নূতন কাব্যরীতির মধ্যে যথাযথ প্রতিফলিত হয় নাই, হওয়ার বাধাও ছিল অনেক। প্রথমত যে-ভাষা ও বাক্‌ভঙ্গি কবি এই চারিটি গ্রন্থে ব্যবহার করিয়াছেন সেই ভাষা ও বাক্‌ভঙ্গি বহু অভ্যাসে, বহু সাধনায় আয়ত্ত এবং মনন-কল্পনার ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ; বহু আয়াস সত্ত্বেও তাহা বিদগ্ধজনেরই ভাষা, সূক্ষ্ম স্পর্শকাতর সাহিত্যিক বোধ ও বুদ্ধিরই অধিগম্য সেই ভাষা ও বাক্‌ভঙ্গি—রবীন্দ্রনাথে তাহার অন্যথাই বা কি করিয়া হইবে? অনেক ক্ষেত্রে ভাব ও অনুভূতির সার্বিকতা অনস্বীকার্য, কিন্তু সেই ভাবানুভূতি যে-ভাষা ও বাক্‌ভঙ্গিতে রূপায়িত তাহা বহু জনের মূঢ় মূক কণ্ঠের ভাষা ও বাক্‌ভঙ্গি নয়, তাহা একটা বিশেষ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে বহুদিনের সাধনার অপেক্ষা রাখে। দ্বিতীয়ত, কবির মনন-কল্পনায় যে যুক্তি ও উপমা, যে চিত্র পরিবেশ, যে স্বপ্ন ও ছায়া, যে গাঢ় ভাব তন্ময় দৃষ্টি অথবা গভীর চিন্তাশীলতা রূপ লইয়াছে তাহা জনমানসের বিচরণক্ষেত্র হইতে অনেক দূরে, সে মানস-ঐতিহ্যে এই ধরনের চিত্র, যুক্তি, উপমা, দৃষ্টি ও চিন্তা আজও স্থান লাভ করে নাই, করিলেও চিত্তের গভীরে তাহাদের মূল প্রসারিত হয় নাই। তৃতীয়ত, বিষয় নির্বাচনে নূতনত্ব সত্ত্বেও তাহাতে এমন কিছু নাই যাহার মধ্যে জনমানসের গভীর পরিচয় সুগভীর অভিজ্ঞতায় বর্ণিত হইয়াছে, অথবা যে-বিষয়বস্তু 'তেঁতুল' অথবা 'শালিখ' সত্ত্বেও রবীন্দ্রকাব্যে এমন

কিছু জনগণমন-পরিচায়ক যাহার সঙ্গে ইতিপূর্বেই আমাদের পরিচয় হয় নাই। সেইজন্যই মনে হয়, যে-আদর্শের প্রেরণার বশে কবি এই নূতন রীতির প্রবর্তন করিয়াছিলেন, সে-আদর্শ এই রীতির মধ্যে চরিতার্থতা লাভ করে নাই। করে যে নাই, কবি হয়ত তাহা অনুভব করিয়াছিলেন, কারণ "শ্যামলী"র পর কবি আর একটি নূতন রীতিতে কাব্য রচনা করেন নাই; তাঁহার পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলিতে অন্তঃমিল ও বৃত্তপ্রবাহধৃত প্রবহমাণ অসম ছন্দেরই প্রাধান্য। "প্রান্তিক" ও শেষতম চারিটি গ্রন্থে—"রোগশয্যায়-আরোগ্য-জন্মদিনে-শেষলেখা"য় অন্তঃমিল বহুক্ষেত্রে অনুপস্থিত, কিন্তু বৃত্তপ্রবাহের নিয়মিত তাল সুস্পষ্ট। যাহা হউক, এই নূতন রীতির মধ্যে তাঁহার ইচ্ছা ও আদর্শ যে সার্থকতা লাভ করে নাই, এমন কি কোনও কাব্যরীতিব মধ্যেই যে তিনি বৃহত্তর জনমানসের বুকের কথা তাহাদের মুখের ভাষা ও কথার রীতিতে রূপায়িত করিতে পারেন নাই, এ বেদনা তাঁহার মনে ছিল; তিনি অবশেষে মৃত্যুর কয়েক মাস আগেই বুঝিয়াছিলেন, এই রূপায়ন সেই ভাবী কবির কবিকর্ম যিনি জন্মলাভ করিবেন সেই বৃহৎ জনগণের রক্ত অস্থি ও মজ্জা মন্থন করিয়া; সেই অজাত কবিকে তিনি পূর্বাহ্নেই অভিনন্দন জানাইয়া গিয়াছেন—

* আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা
আমার সুরের অপূর্ণতা।
আমার কবিতা জানি আমি
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।
কৃষাণের জীবনের শরিক যে-জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে-কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।

এসো কবি, অখ্যাতজনের
নির্বাক মনের।
মর্মের বেদনা যত করিয়ো উদ্ধার
প্রাণহীন এদেশেতে গানহীন যেথা চারিধার
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করি দাও তুমি। ("জন্মদিনে", ১০নং)

কিন্তু কবির অন্তরের ইচ্ছা ও আদর্শ চরিতার্থতা লাভ করে নাই বলিয়াই, এই নূতন রীতির কাব্যমূল্য রসমূল্য কিছু কমিয়া যায় না। কাব্যরীতির ক্ষেত্রে এই 'গদ্য'-কবিতার একটা বিশেষ মূল্য যে আছে, "পুনশ্চ" ও "পত্রপুটে"র অধিকাংশ কবিতাই তাহার প্রমাণ। "পুনশ্চ"র 'শিশুতীর্থ', 'প্রথম পূজা', "পত্রপুটে"র 'আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো, পৃথিবী' (৩নং), 'বসেছি অপরাহ্ণ পারের খেয়া ঘাটে' (১২নং), 'ওর অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত' (১৫নং), প্রভৃতি কবিতা যে আর কোনও রীতিতে লেখা চলিত, একথার কল্পনা আমার কাছে অত্যন্ত কঠিন বলিয়াই মনে হয়। তাহা ছাড়া, এই গ্রন্থচারিটির অনেকগুলি কবিতায় কল্পনার বিশ্বব্যাপী প্রসার, ভাবানুভূতির সুগভীর মহিমা এমন একটা উচ্চ স্তর স্পর্শ করিয়াছে, এমন একটা গভীর ঐক্য ও দৃঢ় সংহতি লাভ করিয়াছে যে, মনে হয় ইহাদের মানসিক ও বাহ্যিক গড়ন একান্ত ভাবেই এই রীতিরই অপেক্ষা রাখে। গদ্যের দৃঢ় কাঠিন্য, উত্থান পতনের অনিয়মিত ধ্বনিতরঙ্গ, শব্দ ও পদের সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট অর্থের ইঙ্গিত ছাড়া এমন কাব্যরূপ কিছুতেই সম্ভব হইত না। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর এই যে, কবি এই দৃঢ় সুকঠিন রীতির মধ্যেও কেবল উচ্চস্তরের মনন-কল্পনার সাহায্যে ছন্দোবদ্ধ কবিতার আবেগ-কম্পিত বিপুল গতিবেগ, ধ্বনিতরঙ্গের অনিবার্য স্রোত আহরণ করিয়া গদ্য-কবিতারও একটি অন্তর্নিহিত গাঢ় অবিচ্ছিন্ন ধ্বনিপ্রবাহ আবিষ্কার

করিয়াছেন। আরও বিস্ময়কর, যে-সব কবিতা বিশ্বপ্রসারী কল্পনা এবং প্রগাঢ় মনন-ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ, ব্যক্তিজীবনের দৃষ্টি-সমগ্রতার স্পর্শ যে-সব কবিতায় লাগিয়াছে, সেই সব কবিতার সহজ অথচ দীপ্তিময় ওজঃ-শক্তি, বীর্যবান প্রবাহ, উপল কঠিন গতিবেগ। "পত্রপুটে" এই ধরনের দৃষ্টান্ত অতি সহজেই মিলিবে; উপরে আমি ঐ গ্রন্থ হইতে যে কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছি তাহাতেই আমার এই উক্তি সমর্থিত হইবে। রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার বলিয়াছেন, তরলে শ্যামলে কোমলে কঠিনে মিলিয়া গদ্যকাব্যে একটা সংযত সুসমঞ্জস রীতি আপনি গড়িয়া উঠে যাহার ভিতর অতিমাধুর্য, অতি-লালিত্যের কোনও অবকাশ থাকে না। এ কথা যে কত সত্য তাহা ধরা পড়ে আখ্যানমূলক বা প্রেমমূলক গদ্য কবিতাগুলিতে। "পুনশ্চ-শেষসপ্তক-শ্যামলী"তে এই ধরনের অনেকগুলি কবিতা আছে। একথা সত্য যে এই কবিতাগুলি আমাদের চিত্তে যে রস সঞ্চার করে তাহা খুব গাঢ় বা আবেশময় নয়; ইহারা ভাব বা সুরের অথবা অনুভূতির একটা গভীর মোহের ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া আমাদের চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয় না। কিন্তু এই অভিযোগ একান্তই অবান্তর, কারণ কবি তাহা কামনাও করেন নাই। এই কবিতাগুলিতে অনেকক্ষেত্রেই অবান্তর ঘটনার বিস্তৃতি আছে, তুচ্ছ বিচ্ছিন্ন অকিঞ্চিতকর চিন্তা ও কল্পনার বিবৃতি আছে, অতিপল্লবিত ভাষণেরও অভাব নাই, কিন্তু বাস্তব জীবনে, দৈনন্দিন সংসারের প্রেম কাহিনী বা অনুরূপ আখ্যানের সঙ্গে এ সমস্ত অনিবার্য ভাবে জড়িত মিশ্রিত, এবং কবির সাময়িক অনুভূতিতে এই সমস্তই একটি ঐক্যের মধ্যে ধরা পড়িয়াছে। বাস্তব জগতের সমস্ত বিক্ষেপে সমস্ত অবান্তর ঘটনার সঙ্গে জড়াইয়া মিলাইয়াই তিনি ইহাদের রস উপভোগ করিয়াছেন, এবং পাঠকচিত্তেও তরলে শ্যামলে কঠিনে কোমলে মিলাইয়াই সেই আখ্যানের বাস্তবানুভূতি সঞ্চার করিতে চেষ্টা

করিয়াছেন। গদ্য কবিতার এই অতি-মাধুর্য, অতি-লালিত্য বিরহিত রীতি ছাড়া তাহা সম্ভব হইত কি? হৃদয়বৃত্তির লীলাগত কবিতায় মাধুর্য ও লালিত্য সঞ্চার ত আমাদের স্বভাবগত, সুঅভ্যাসগত; রবীন্দ্রনাথ পূর্বজীবনে বার বার তাহা করিয়াছেন উচ্ছ্বসিত উদ্দীপনায় পরম মোহাবেশে, চিরাচরিত ছন্দোবন্ধনের সংগীতময়তায়। কিন্তু এই বিষয়গত অন্যতর শিথিল বাস্তববিক্ষেপ-জড়িত অনুভূতিও ত আছে, এবং তাহার যথাযথ প্রকাশের অন্যতর কাব্যরীতির সার্থকতাও স্বীকার করিতেই হয়।

রূপ ও রহস্যময় রসদৃষ্টি অপরূপ কাব্যময় বাক্ ও বর্ণনাভঙ্গি, গাঢ় ও গূঢ় নিসর্গ ও জীবন-সৌন্দর্যবোধ রবীন্দ্র-কবিমানসের অক্ষয় ও চিরন্তন ঐশ্বর্য। তাঁহার রচনা যে-রীতিই আশ্রয় করুক না কেন,—গদ্য হউক, কবিতা হউক, গদ্যকাব্য হউক—সকল রীতিতেই এই রসদৃষ্টি বাক্ ও বর্ণনাভঙ্গি এবং নিগূঢ় সৌন্দর্যবোধ উপস্থিত। বিষয়-বৈচিত্র্য ও দুরবগাহ কল্পনার সর্বেতোভদ্র প্রসারতাও তাঁহার সকলপ্রকার রচনার বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য ও ঐশ্বর্য কবির গদ্য কবিতাগুলিতেও সমান গৌরবে প্রতিষ্ঠিত। গদ্য কাব্য চারিটি বিশ্লেষণ করিলেই তাহা ধরা পড়িবে।

প্রথমেই চোখে পড়ে কতকগুলি আখ্যানমূলক কবিতা; লঘু সুরে অর্ধজাগ্রত কল্পনায় স্তিমিত চেতনায় গল্পবলার ভঙ্গিতে আখ্যান রচনা। "পুনশ্চ"তে 'অপরাধী', 'ছেলেটা' 'সহযাত্রী' 'শেষচিঠি', 'বালক', 'ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি', 'ক্যামেলিয়া', 'সাধারণ মেয়ে', 'প্রথম পূজা'; "শেষ-সপ্তকে"র তিন চারিটি কবিতা (যেমন, ৩২নং ও ৩৩নং) এবং "শ্যামলী"তে 'কণি', 'দুর্বোধ', 'অমৃত' 'বঞ্চিত' প্রভৃতি এই জাতীয়। কতকগুলি কবিতায় চিত্তের একটা ক্ষণিক আবেগ, একটা হঠাৎ খুশি বা হঠাৎ খেয়াল, একটা বিশেষ ভাব-ঝলকিত বা অনুভূতি-স্পৃষ্ট লঘু শিথিল

মুহূর্তকে রূপে রহস্যে ধরিবার চেষ্টা আছে। এই ধরনের কবিতায় আবেগ স্বভাবতই স্তিমিত, ভাবানুভূতির গতি কতকটা আকস্মিক ও অনিয়ন্ত্রিত, দৃষ্টি কতকটা অলস, মন্থর ও উদাসীন। গভীর উদ্দীপনা বা প্রগাঢ় প্রেরণা কিছু ইহাদের মধ্যে নাই। "পুনশ্চ"তে অনেকগুলি কবিতা—'পুকুর ধারে', 'স্মৃতি', 'বাসা', 'সুন্দর', 'দেখা', 'ফাঁক', 'একজন লোক', 'ছুটি', 'গানের বাসা' ও 'পয়লা' আশ্বিন', "শেষসপ্তকের" ২৯ ও ৩০নং—"শ্যামলী"র 'হারানো মন' ও 'বিদায়-বরণ' প্রভৃতি কবিতা এই জাতীয়। এই কবিতাগুলিতে বিশেষ ভাবে "শ্যামলী"র কবিতা ক'টিতে ভাবগত কল্পনার ঐক্য বাক্ ও বর্ণনাভঙ্গির সঙ্গে অপূর্ব সৌহার্দ্যের সূত্রে বাঁধা পড়িয়াছে।

উপরোক্ত আখ্যান ও ক্ষণিক আবেগবাহী কবিতাগুলিতে কোথাও কোথাও প্রেমের স্পর্শ সুস্পষ্ট, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আখ্যান-বিবৃতিই সেখানে কবির উদ্দেশ্য, প্রেমের চিরন্তন রহস্য উদ্‌ঘাটন নয়। তবে আলোচ্য গ্রন্থ চারিটিতে যথার্থ প্রেমের কবিতার কিছু অপ্রাচুর্য নাই। "শ্যামলী"র 'দ্বৈত', 'মিলভাঙ্গা', 'শেষ পহরে' 'সম্ভাষণ', 'বাঁশিওয়ালা', "শেষসপ্তকে"র প্রথম তিনটি, ১৪, ৩২ নং ও আরও দু'একটি কবিতাকে নিছক প্রেমের কবিতা বলিলে কিছু অন্যায় বলা হয় না। কিন্তু এই কবিতাগুলিতে তীব্র হৃদয়াবেগের প্রাধান্য নাই, কল্পনার উদ্দীপনা, কিংবা পঞ্চম রাগের ঝংকারও নাই; দেহচিত্তের উদগ্র কামনার দীপ্তি ত রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতায় বরাবরই অনুপস্থিত। কয়েকটি কবিতায় প্রেমাশ্লিষ্ট চিরন্তন সমস্যার অভিঘাত সুস্পষ্ট। তবু মোটামুটি ভাবে এই কবিতাগুলিতে সহজ, মৃদু ও শান্ত প্রেমের আকস্মিক অথচ অবিনশ্বর পরিচয়ই বিচিত্র রেখায়, চিরন্তন রহস্যের স্তিমিত উজ্জ্বলতায় দীপ্তিলাভ করিয়াছে। উদ্বেলিত উচ্ছ্বসিত আবেগ সর্বত্রই যেন সহজ আয়াসে সংযত। "শ্যামলী"র 'দ্বৈত' এবং "শেষসপ্তকে"র ৩১নং কবিতা দুইটি ভাবসৌন্দর্যে,

অনুভূতির সূক্ষ্মতায়, কল্পনার সহজ রহস্য-ব্যঞ্জনায় এবং প্রেমের গভীর পরিচয়ে সত্যই অনবদ্য। দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই প্রত্যেকটি উক্তিই পরিস্ফুট করিয়া তোলা যায়, কিন্তু রসিক ও অনুসন্ধিৎসু পাঠক নিজেই তাহা করিয়া লইতে পারেন; আমি শুধু ইঙ্গিত রাখিয়া যাইতেছি মাত্র।

গদ্য কবিতাগুলির মধ্যে কতকগুলি ব্যক্তিগত জীবন ও বিশ্বনিসর্গগত গভীর মননশীল মন্তব্য ও পরিচয়ে ঐশ্বর্যবান। এ কবিতাগুলি ব্যাখ্যা ও বর্ণনার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে বেগবান, গভীর দৃষ্টিতে, বক্তব্যের স্পষ্টতায় এবং সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল কাব্যময় বাক্‌ভঙ্গিতে সমৃদ্ধ। "পুনশ্চ"-গ্রন্থের 'পত্র', 'বিচ্ছেদ', 'শেষদান', 'খোয়াই', "শেষসপ্তকে"র ৪, ৬, ৮, ১৫, ১৬, ১৭, ২৩, ২৬, ২৭, ২৯, ৩৮, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৪৫ ও সর্বশেষ ৪৬নং এবং "শ্যামলী"র 'তেঁতুলের ফুল', 'অকাল ঘুম', 'প্রাণের রস', 'শ্যামলী' প্রভৃতি কবিতা এই জাতীয়। "শেষসপ্তকে"র অনেক-গুলি কবিতাই কবির ব্যক্তিজীবনের নিবিড় ও নিগূঢ় পরিচয়ের আলোকে উদ্ভাসিত, বিশেষত শেষদিকের কবিতাগুলি। বস্তুত রবীন্দ্র-জীবনের ও রবীন্দ্র-মানসের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লইতে হইলে তাঁহার শেষ অধ্যায়ের কাব্যগুলির পাঠ একান্ত প্রয়োজন, বিশেষভাবে "শেষ-সপ্তক" ও "পত্রপুট" হইতে আরম্ভ করিয়া "শেষলেখা" পর্যন্ত। জীবনের শেষ পৈঠায় দাঁড়াইয়া কবি বারবার নিজের সমগ্র জীবন ও মনের পরিচয় লইতে চেষ্টা করিয়াছেন, বারবার নানাভাবে নানারূপে নানাদিক হইতে তাহাকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই বিশ্লেষণ সর্বত্রই স্বচ্ছ সুগভীর দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত এবং ঐতিহাসিক পরম্পরায় বিকশিত। জন্মদিনকে কেন্দ্র করিয়া যে কবিতাগুলি তাহাদের মধ্যে এই বিশ্লেষণ ও পরিচয় ত আছেই, "শেষসপ্তকে" তাহা পাওয়া যাইবে ৪৩নং কবিতায়, কিন্তু ইহা ছাড়া অন্যান্য কবিতায়ও নানা উপলক্ষে সেই পরিচয়

পাওয়া যায়। "শেষসপ্তকে"রই সর্বশেষের তিনটি কবিতা, "পত্রপুটে"র ৩নং ও ১২নং কবিতা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে, যদিও শেষোক্ত কবিতাদু'টির দৃষ্টি আরও গভীর, কল্পনা আরও প্রসারিত এবং ভাবগাম্ভীর্য আরও দুরবগাহ। কোনও কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া কবিজীবনের অন্তরঙ্গ এই কবিতাগুলির ইতিহাসের এবং ভাব ও মননগভীর সৌন্দর্যের, ইহাদের অবিচ্ছিন্ন শক্তিমান প্রবাহের কোনও পরিচয় দেওয়া যায় না। "শেষসপ্তকের" ৪৩নং কবিতায় কবি নিজের বিভিন্ন বয়সের—'ছোটো ছোটো জন্মমৃত্যুর সীমানায় নানা রবীন্দ্রনাথের'—সুষ্ঠু, সংক্ষিপ্ত ও সার্থক একটি পরিচয় নিজের ও পাঠকের চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। বাল্য, কৈশোর, তরুণ যৌবন ও যৌবন-মধ্যাহ্নের দীপ্ত পরিচয়ের পর প্রৌঢ়প্রহরের কবি বলিলেন,

এই দুর্গমে, এই বিরোধসংক্ষোভের মধ্যে
পঁচিশে বৈশাখের প্রৌঢ় প্রহরে
তোমরা এসেছ আমার কাছে।
জেনেছ কি—
আমার প্রকাশে
অনেক আছে অসমাপ্ত
অনেক ছিন্ন বিচ্ছিন্ন
অনেক উপেক্ষিত।

* * *

ব্যর্থ চরিতার্থের জটিল সংমিশ্রণের মধ্য থেকে
যে আমার মূর্তি
তোমাদের শ্রদ্ধায়, তোমাদের ভালোবাসায়,
তোমাদের ক্ষমায়
আজ প্রতিফলিত—

আজ যার সামনে এনেছ তোমাদের মালা,
তাকেই আমার পঁচিশে বৈশাখের
শেষ বেলাকার পরিচয় ব'লে
নিলেম স্বীকার ক'রে,
আর রেখে গেলেম তোমাদের জন্তে
আমার আশীর্বাদ।
যাবার সময় এই মানসী মূর্তি
রইল তোমাদের চিত্তে,
কালের হাতে রইল ব'লে
করব না অহংকার।

তারপরে দাও আমাকে ছুটি
জীবনের কালো-সাদা-সূত্রে গাঁথা
সকল পরিচয়ের অন্তরালে,
নির্জন নামহীন নিভৃতে;
নানা সুরের নানা তারের যন্ত্রে
সুর মিলিয়ে নিতে দাও
এক চরম সংগীতের গভীরতায়।

'অনেক অসমাপ্ত, অনেক ছিন্নবিচ্ছিন্ন, অনেক উপেক্ষিতে'র যে বেদনা তাহা জীবনসায়াহ্নে বারবারই কবিকে ব্যথিত করিয়াছে। "পত্রপুটে"র বারো নম্বর কবিতায় অপরাহ্ণে "পারের খেয়াঘাটের শেষ-ধাপের কাছটাতে' বসিয়াও মনে হইয়াছে—

জীবনের পথে মানুষ যাত্রা করে
নিজেকে খুঁজে পাবার জন্তে।
গান যে-মানুষ গায়, দিয়েছে সে ধরা. আমার অন্তরে;
যে-মানুষ দেয় প্রাণ, দেখা মেলেনি তার।

*   *   *

মৃত্যুর গ্রন্থি থেকে ছিনিয়ে ছিনিয়ে
যে উদ্ধার করে জীবনকে
সেই রুদ্র মানবের আত্মপরিচয়ে বঞ্চিত
ক্ষীণ পাণ্ডুর আমি
অপরিস্ফুটতার অসম্মান নিয়ে যাচ্ছি চলে।

*　　　*　　　*

বাজলো ভেরী,
তবু জাগলোনা রণদুর্মদ
এই নিরাপদ নিশ্চেষ্ট জীবনে ;
ব্যূহ ভেদ ক'রে
স্থান নিইনি যুধ্যমান দেবলোকের সংগ্রাম-সহকারিতায়
কেবল স্বপ্নে শুনেছি ডমরুর গুরুগুরু,
কেবল সমরযাত্রীর পদপাতকম্পন
মিলেছে হৃৎস্পন্দনে বাহিরের পথ থেকে।
যুগে যুগে যে-মানুষের সৃষ্টি প্রলয়ের ক্ষেত্রে,
সেই শ্মশানচারী ভৈরবের পরিচয়জ্যোতি
ম্লান হয়ে রইল আমার সত্তায়,
শুধু রেখে গেলেম নতমস্তকের প্রণাম
মানবের হৃদয়াসীন সেই বীরের উদ্দেশে,
মর্ত্যের অমরাবতী যাঁর সৃষ্টি
মৃত্যুর মূল্যে, দুঃখের দীপ্তিতে।

বিশ্বনিসর্গের সঙ্গে রবীন্দ্র-চিত্তের গভীর যোগ বহুপুরাতন। প্রকৃতির বহমান স্রোতের মধ্যে একান্ত ভাবে নিজেকে ডুবাইয়া দিয়া একসঙ্গে আত্মসম্ভোগ ও নিসর্গসম্ভোগ কবি বহুকাল করিয়াছেন ; এই সম্ভোগের ভিতর দিয়াই তরুণ ও মধ্যাহ্ন-যৌবন স্বাদ গন্ধ ও বর্ণের সমারোহ আহরণ করিয়াছে। আজ প্রৌঢ় অপরাহ্ণে বা বার্ধক্য-সায়াহ্নে কবি শুধু নিসর্গের মধ্যে আত্মসম্ভোগ করিয়াই ক্ষান্ত নহেন, তাহার মধ্যেই

তিনি আত্ম-মুক্তির উপায়ও খুঁজিয়া পাইয়াছেন। আয়ুর অপরাহ্ণ আমাদের মানসাকাশকে অস্পষ্ট ও আবিল করিয়া দেয়, মনন ও কল্পনাকে স্থবির করিয়া তোলে; এই আবিলতা ও অলস স্থবিরতা হইতে মুক্তি দিতে পারে একমাত্র বাহিরের বিশ্বনিসর্গ, এই নিসর্গই পারে আমাদিগকে "শুভ্র আলোকের 'প্রাঞ্জলতা"র মধ্যে ডাকিয়া আনিতে। প্রকৃতির মধ্যেই প্রাণেরও অস্তিত্বের সহজ সনাতন প্রবাহ সদা বহমান; সেই প্রবাহের সঙ্গে মানুষ যখন নিজের প্রাণ-প্রবাহ মিশাইয়া দেয় তখনই কেবল মানুষ পারে নিজেকে উপলব্ধি করিতে। জীবনের শেষ অধ্যায়ে কবিও বারবার সেই চেষ্টাই করিয়াছেন। এই নিসর্গ-প্রবাহের মধ্যে তিনি নিজের প্রাণ-প্রবাহ বারবার মিশাইয়া দিয়া তাহাতেই বারবার অবগাহন করিয়াছেন, এবং তাহার ফলে এক পরমা শান্তি এবং ভাগবত দৃষ্টিলাভ তাঁহার আয়ত্ত হইয়াছে। এই নিসর্গ অবগাহন সব-চেয়ে বেশি প্রত্যক্ষ "শেষসপ্তকে", এবং "পত্রপুট" ও "শ্যামলী"র কয়েকটি কবিতায়। বিস্ময়ের বিষয় এই, প্রত্যেকটি কবিতাতেই আকণ্ঠ নিসর্গ অবগাহনের শেষে মনন-কল্পনার পরিণতি সর্বত্রই এক অধ্যাত্ম উপলব্ধিতে। দুই চারিটি দৃষ্টান্ত দিলেই তাহার স্বরূপটি ধরা পড়িবে। "শেষসপ্তকে"র ৪নং কবিতায়—

চারিদিক থেকে অস্তিত্বের এই ধারা
নানা শাখায় বইছে দিনে রাত্রে।
অতি পুরাতন প্রাণের বহুদিনের নানা পণ্য নিয়ে
এই সহজ প্রবাহ—
মানব-ইতিহাসের নূতন নূতন
ভাঙন-গড়নের উপর দিয়ে।
এর নিত্য যাওয়া আসা।

চঞ্চল বসন্তের অবসানে
আজ আমি অলস মনে
আকণ্ঠ ডুব দেব এই ধারার গভীরে ;
এর কলধ্বনি বাজবে আমার বুকের কাছে
আমার রক্তের মৃদু তালের ছন্দে।
এর আলোছায়ার উপর দিয়ে
ভাস্‌তে ভাস্‌তে চলে যাক আমার চেতনা
চিন্তাহীন তর্কহীন শাস্ত্রহীন
মৃত্যুসাগর সংগমে।

৮নং কবিতায়

এই নিত্যবহমান অনিত্যের স্রোতে
আত্মবিস্মৃতি চল্‌তি প্রাণের হিল্লোল ;
তার কাঁপনে আমার মন ঝলমল করছে
কৃষ্ণচূড়ার পাতার মতো।
অঞ্জলি ভরে এই ত পাচ্ছি
সদ্য মুহূর্তের দান,
এর সত্যে নেই কোনো সংশয়, কোনো বিরোধ।

*　　*　　*

সেই অন্ধকারকে সাধনা করি
যার মধ্যে স্তব্ধ বসে আছেন
বিশ্বচিত্তের রূপকার, যিনি নামের অতীত
প্রকাশিত যিনি আনন্দে।

২৩ নম্বরে

আমার নগ্নচিত্ত আজ মগ্ন হয়েছে
সমস্তের মাঝে।
জনশ্রুতির মলিন হাতের দাগ লেগে
যার রূপ হয়েছে অবলুপ্ত,

যা পরেছে তুচ্ছতার মলিন চীর
তার সেই জীর্ণ উত্তরীয় গেল খসে
দেখা দিল সেই অস্তিত্বের পূর্ণ মূল্যে
দেখা দিল সেই অনির্বচনীয়তায়।

* * *

সহমরণের বধূ
বুঝি এমনি করেই দেখতে পায়
মৃত্যুর ছিন্ন পর্দার ভেতর দিয়ে
নূতন চোখে
চিরজীবনের অম্লান স্বরূপ।

২৬ নম্বরে

তাই ওগো বনস্পতি
তোমার সম্মুখে এসে বসি সকালে বিকালে,
শ্যামচ্ছায়ায় সহজ করে নিতে চাই
আমার বাণী

* * *

তোমার নব কিশলয়ের মর্ম এসে মেশে
বিশ্বহৃদয়ের সেই আনন্দ মন্ত্র—
"ভালোবাসি।"

* * *

এই বাণীই দিনে দিনে রচনা করেছে
বর্ণচ্ছটায় মানসী প্রতিমা
আমার বিরহ গগনে
অস্তসাগরের নির্জন ধূসর উপকূলে
আজ দিনান্তের অন্ধকারে।

এ জন্মের যত ভাবনা যত বেদনা
নিবিড় চেতনায় সম্মিলিত হয়ে
সন্ধ্যাবেলার একটি তারার মতো
জীবনের শেষ বাণীতে হোক উদ্ভাসিত—
"ভালোবাসি।"

৪৪নং কবিতাটি স্নিগ্ধ নিসর্গ-সৌন্দর্যে এবং কবির জীবন-সায়াহ্নের শ্যামল কামনায় সুন্দর ও মেদুর। কবিতাটি কবির মাটির ঘর 'শ্যামলী' উপলক্ষ করিয়া লেখা। কবি স্থির করিয়াছেন, তাঁহার শেষবেলাকার ঘরখানি গড়িবেন মাটি দিয়া, তাহার নাম রাখিবেন 'শ্যামলী', যে হেতু বাংলা দেশের মাটির রং শ্যামল, রূপ স্নিগ্ধ, যেহেতু যে বাংলা দেশের মেয়েকে তিনি ভালবাসিয়াছেন তাহার চোখে আছে 'এই মাটির শ্যামল অঞ্জন, কচি ধানের চিকন আভা', যেহেতু চিরদিন মাটি তাঁহাকে ডাকিয়াছে পদ্মার পারে, ধানের ক্ষেতে, সরষে তিসির ক্ষেতে, পুকুর পাড়ে। সেই শ্যামল মাটি,

আজ আমি তোমার ডাকে
ধরা দিয়েছি শেষ বেলায়।
এসেছি তোমার ক্ষমাস্নিগ্ধ বুকের কাছে,
যেখানে একদিন রেখেছিলে অহল্যাকে
নবদূর্বাশ্যামলের
করুণ পদস্পর্শে
চরম মুক্তির জাগরণের প্রতীক্ষায়,
নবজীবনের বিস্মিত প্রভাতে।

এই মাটির ধরণীর প্রতি জীবনের শেষ অধ্যায়ে যে ভালবাসা পুনরুদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল, এই ধূলিধূসর ধরণীর মানুষের প্রতি যে ভালবাসায় এই পৃথিবীকে ছাড়িয়া যাইতে মন বেদনায় বারবার

কাঁদিয়া উঠিয়াছিল তাহার আভাস এই কবিতাটিতে সুস্পষ্ট। এই মাটির ঘর শ্যামলীর উপরই আর একটি কবিতা আছে—"শ্যামলী"-গ্রন্থের শেষ কবিতা। এ-কবিতাটিও সুন্দর ও কোমল, এবং মাটির ক্ষণভঙ্গুরতায় জীবনের আসা যাওয়ার প্রতিচ্ছবিতে সমুজ্জ্বল। এই নিসর্গ-অবগাহন ও তাহার ভিতর দিয়া অধ্যাত্মোপলব্ধির পরিচয় "শ্যামলী"র আরও দুইটি কবিতায় আছে; এই কবিতা দুইটি 'অকাল ঘুম' ও 'প্রাণের রস', কিন্তু তাহা আর উদ্ধৃতির প্রয়োজন নাই। "পটপুটে"র ৪, ৭, ৮, ১০নং প্রভৃতি কবিতাও এই পর্যায়ের, কিন্তু "পত্র-পুটে"র কবিতাগুলি আরও গভীর মননশীলতায় সমৃদ্ধ, উদার ধ্বনি-গাম্ভীর্যে প্রসারিত, এবং সৃষ্টির অন্তর্নিহিত রহস্য-ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করি। একটি বুনো চারাগাছ, পাতার রং তার হলদে সবুজ, ফুলগুলি যেন 'আলো পান করবার পেয়ালা, বেগুনি রঙের'; দেখিতে দেখিতে ফুলগুলি খসিয়া পড়িয়া গেল, 'যে শব্দটুকু হলো, বাতাসে কানে এলোনা'।

> ওর ইতিহাসটুকু অতি ছোটো পাতার কোণে
> বিশ্ব-লিপিকারের অতি ছোটো কলমে লেখা।
>
> তবু তারই সঙ্গে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে বৃহৎ ইতিহাস,
> সৃষ্টি চলে না এক পৃষ্ঠা থেকে অন্য পৃষ্ঠায়।
> শতাব্দীর যে নিরন্তর স্রোত বয়ে চলেছে
> বিলম্বিত তালের তরঙ্গের মতো,
> যে ধারায় উঠলো নামলো কত শৈলশ্রেণী,
> সাগরে মরুতে কত হোলো বেশ পরিবর্তন,
> সেই নিরবধি কালেরই দীর্ঘ প্রবাহে এগিয়ে এসেছে
> এই ছোটো ফুলটির আদিম সংকল্প
> সৃষ্টির ঘাতপ্রতিঘাতে।

লক্ষ লক্ষ বৎসর এই ফুলের ফোটা-ঝরার পথে
সেই পুরাতন সংকল্প রয়েছে নূতন, রয়েছে সজীব সচল,
ওর শেষ সমাপ্ত ছবি আজও দেয়নি দেখা।
এ দেহহীন সংকল্প, সেই রেখাহীন ছবি
নিত্য হয়ে আছে কোন্ অদৃশ্যের ধ্যানে।
যে অদৃশ্যের অন্তহীন কল্পনায় আমি আছি,
যে অদৃশ্যে বিধৃত সকল মানুষের ইতিহাস
অতীতে ভবিষ্যতে।

নিসর্গ-স্নান উপলক্ষ ছাড়াও গভীর গম্ভীর অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা, সৃষ্টি ও মৃত্যুরহস্য সম্বন্ধে সুগভীর চিন্তা ও জিজ্ঞাসা, মানবসত্তা এবং জীবন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা অনেকগুলি গদ্যকবিতার বিষয়বস্তু। এই পর্যায়ের সব কবিতায়ই কবিকল্পনা বিশ্বপ্রসারী এবং চিন্তা অত্যন্ত গভীরে প্রসারিত। যে গভীর মনন সম্পন্ন অধ্যাত্মদৃষ্টি কবিজীবনের শেষ দুই বৎসরের প্রধান সম্পদ তাহার গড়ন এই গদ্য কবিতাগুলির মনন-কল্পনার কারখানায়। কবিত্ব হিসাবে সব কবিতাগুলিই সার্থক একথা বলা কঠিন, তবু কবিমানসের বিকাশের দিক হইতে ইহাদের মূল্য অনস্বীকার্য। "পুনশ্চ"-গ্রন্থের 'কীটের সংসার', 'মৃত্যু', শিশুতীর্থ', "শেষসপ্তকে"র অনেকগুলি কবিতা, বিশেষভাবে ৫, ৯, ১২, ২২, ৩৫, ৩৬, ৩৯ ও ৪০নং কবিতা, "পত্রপুটে"র প্রায় সবগুলি কবিতা, "শ্যামলী"র 'আমি' প্রভৃতি কবিতা এই পর্যায়ের। কবি-কল্পনা কত গভীর কত ঊর্ধ্বমুখীন, কত বিশ্বপ্রসারী হইতে পারে, এপিক কল্পনাকে কি করিয়া গীতি কবিতার খণ্ডিত ধ্বনিপ্রবাহের মধ্যে ধারণ করা যায় তাহার চরমতম পরিচয় মিলিবে 'শিশুতীর্থ' কবিতায়। ইহার মনন-কল্পনা এত বিরাট, ইহার গতি এত দ্রুত প্রবহমাণ, ইহার বিস্মিত উপলব্ধি এত দুরবগাহ, মানবসত্তার চিরন্তন অভিযানের অনুভূতি ইহার মধ্যে এত গূঢ় ও নিবিড়

যে, খণ্ডবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া ইহার রসসমগ্রতা ক্ষুণ্ণ করিতে এতটুকু ইচ্ছা হয় না। "শেষসপ্তকে"র অনেক কবিতাতেই এই গভীর গম্ভীর তত্ত্ব জিজ্ঞাসা অপূর্ব্ব কল্পনাভূতিতে রূপান্তর লাভ করিয়াছে। ২২নং কবিতাটির ভাবানুভূতি পাঠকের কল্পনা ও রস-কৌতূহলকে উদ্রিক্ত না করিয়া পারে না।

শুরু হতেই ও আমার সঙ্গ ধরেছে,
ঐ একটা অনেক কালের বুড়ো,
আমাতে মিশিয়ে আছে এক হয়ে।
আজ আমি ওকে জানাচ্ছি—
পৃথক হবো আমরা।

* * *

ওর জরা দিয়ে আচ্ছন্ন করে আমাকে
যে-আমি জরাহীন।
মুহূর্তে মুহূর্তে ও জিতে নিয়েছে আমার মমতা,
তাই ওকে যখন মরণে ধরে
ভয় লাগে আমার
যে-আমি মৃত্যুহীন।

* * *

আমি দেখবো ওকে জানালায় বসে
ঐ দূর পথের পথিককে

* * *

উপরের তলায় ব'সে দেখবো ওকে
নানা খেয়ালের আবেগে,
আশানৈরাশ্যের ওঠাপড়ায় সুখদুঃখের আলো-আঁধারে।
দেখবো যেমন করে পুতুলনাচ দেখে;
হাসবো মনে মনে।

মুক্ত আমি, স্বচ্ছ আমি, স্বতন্ত্র আমি,
নিত্যকালের আলো আমি,
সৃষ্টি উৎসবের আনন্দধারা আমি।

* * *

এই যে নিজের থেকে নিজের বার্ধক্যকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা, স্বতন্ত্র করিয়া দেখা, এই দেখার মধ্যে এক ধরনের তত্ত্বদৃষ্টি সুস্পষ্ট। ৩৫নং কবিতায় জীবনদর্শনের আর এক রহস্য :

অঙ্গের বাঁধনে বাঁধাপড়া আমার প্রাণ
আকস্মিক চেতনায় নিবিড়তায়
চঞ্চল হয়ে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে
তখন কোন্ কথা জানাতে তার এত অধৈর্য—
যে-কথা দেহের অতীত।

* * *

সামনে তাকিয়ে চোখের দেখা দেখি
এ তো কেবলি দেখার জাল বোনা নয়।

* * *

দীর্ঘ পথ ভালো মন্দে বিকীর্ণ,
রাত্রিদিনের যাত্রা দুঃখ সুখের বন্ধুর পথে।
শুধু কেবল পথ চলাতেই কি এ-পথের লক্ষ্য।

* * *

মাটির তলায় সুপ্ত আছে বীজ ;
তাকে স্পর্শ করে চৈত্রের তাপ,
মাঘের হিম, শ্রাবণের বৃষ্টিধারা।
অন্ধকারে সে দেখছে অভাবিতের স্বপ্ন।
স্বপ্নেই কি তাহার শেষ।
উষার আলোয় তার ফুলের প্রকাশ,
আজ নেই, তাই বলে কি নেই কোনোদিনই।

জীবনসত্তার অস্তিত্বের বোধ দৈনন্দিন কর্মকোলাহলের মধ্যে ধরা পড়ে এক নিমিষের অসামান্যতার স্পর্শে, এই কথাটি কবি ব্যক্ত করিয়াছেন ৩৬নং কবিতায় প্রকৃতির নিবিড় রহস্যময়তার ভিতর দিয়া।

অলস মনের শিয়রে দাঁড়িয়ে
হাসেন অন্তর্যামী,
হঠাৎ দেন ঠেকিয়ে সোনার কাঠি
প্রিয়ার মুগ্ধ চোখের দৃষ্টি দিয়ে
কবির গানের সুর দিয়ে,
তখন যে-আমি ধূলিধূসর
সামান্ত দিনগুলির মধ্যে মিলিয়ে ছিল
সে দেখা দেয় এক নিমেষের অসামান্ত আলোকে।

সে-সব দুর্মূল্য নিমেষ
কোনো রত্ন ভাণ্ডারে থেকে যায় কিনা জানিনে;
এইটুকু জানি—
তারা এসেছে আমার আত্মবিস্মৃতির মধ্যে,
জাগিয়েছে আমার মর্মে
বিশ্বমর্মের নিত্যকালের সেই বাণী
"আমি আছি"।

৩৯ ও ৪০নং কবিতা দু'টিতে মৃত্যু সম্বন্ধে কবির মননকল্পনা গভীর ও নিবিড় রসঘন রূপ লাভ করিয়াছে। মৃত্যুই এই জগতের প্রবহমাণ গতিস্রোতের নিরবচ্ছিন্নতাকে অক্ষুণ্ণ রাখে, মৃত্যুমোহানার ভিতর দিয়াই জীবনের অমৃত দেখা দেয়। ক্ষণস্থায়ী দিনরাত্রি, স্বল্পকালস্থায়ী মানব জীবন ও প্রায় সীমাহীন বিরাট কল্পযুগ এই তিন বর্ধমান পরিধিকে অবলম্বন করিয়া মৃত্যুরহস্ত এক অভিনব রসে দীপ্ত হইয়াছে ৪০নং কবিতায়।

মৃত্যু যে আমার অন্তরঙ্গ,
জড়িয়ে আছে আমার দেহের সকল তন্তু।
তার ছন্দ আমার হৃৎস্পন্দনে,
আমার রক্তে তার আনন্দ প্রবাহ।
বলছে সে,—চলো চলো,
চলো বোঝা ফেলতে ফেলতে,
চলো মরতে মরতে নিমেষে নিমেষে
আমারি টানে, আমারি বেগে।

* * * *

আমি মৃত্যু-রাখাল
সৃষ্টিকে চরিয়ে নিয়ে চলেছি
যুগ হতে যুগান্তরে
নব নব চারণ ক্ষেত্রে।
যখন বইল জীবনের ধারা
আমি এসেছি তার পিছনে পিছনে
দিইনি তাকে কোনো গর্তে আটক থাক্‌তে।
তীরের বাঁধন কাটিয়ে কাটিয়ে
ডাক দিয়ে নিয়ে গেছি মহাসমুদ্রে
সে সমুদ্র আমিই।

* * *

এই অনন্ত অচঞ্চল বর্তমানের হাত থেকে
আমি সৃষ্টিকে পরিত্রাণ করতে এসেছি
অন্তহীন নব নব অনাগতে।

২১নং কবিতায় মৃত্যু মহাকালের আর এক রূপ। মহাকালের প্রেক্ষাপটে দুইটি দৃশ্য, দুইই ক্ষণজীবী, দু'য়েরই প্রতি কবির আকর্ষণ। সৌরজগতে নূতন নূতন গ্রহজ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ও গহন অন্ধকারে তাহাদের

বিলয় সভ্যতার উত্থান-পতনের মতনই ক্ষণজীবী, মহাকালের প্রেক্ষাপটে তাহাদের অস্তিত্বকাল কতটুকু? তাহাদের উত্থান-পতনের পশ্চাতে মহাকাল যে অক্ষুব্ধ শান্তিতে বিরাজমান, কবি সেই পরম শান্তির কামনা করেন। এই মহাকালেরই প্রেক্ষাপটে আবার মানব জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অমৃতময় আনন্দোজ্জ্বল মুহূর্তগুলি আরও কত বেশি ক্ষণস্থায়ী, তবু তাহারা, অমর, অক্ষয়। মানবজীবনের এই ক্ষুদ্র, স্বল্পস্থায়ী, সুখে দুঃখে সরস মুহূর্তগুলির প্রতি কবিচিত্তের আকর্ষণ নিবিড়তর। যুগের জয়স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া পড়ে, ক্ষণে ক্ষণে অমৃতভরা মুহূর্তগুলি বাঁচিয়া থাকে।

আজ রাত্রে আমি সেই নক্ষত্র লোকের
নিমেষহীন আলোর নিচে
আমার লতাবিতানে বসে
নমস্কার করি মহাকালকে।

অমরতার আয়োজন
শিশুর শিথিল মুষ্টিগত
খেলার সামগ্রীর মতো
ধুলায় পড়ে বাতাসে যাক উড়ে।

আমি পেয়েছি ক্ষণে ক্ষণে অমৃতভরা
মুহূর্তগুলিকে,
তার সীমা কে বিচার করবে।
তার অপরিমেয় সত্য
অযুত নিযুত বৎসরের পরিধির মধ্যে
ধরে না,
কল্পান্ত যখন তার সকল প্রদীপ নিবিয়ে
সৃষ্টির রঙ্গমঞ্চ দেবে অন্ধকার করে,
তখনো সে থাকবে প্রলয়ের নেপথ্যে
কল্পান্তরের প্রতীক্ষায়।

"শ্যামলী"র 'আমি' কবিতাতেও কবি ব্যক্তিত্ববিহীন 'অস্তিত্বের গণিততত্ত্বের' বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত অনুভূতির অফুরন্ত রূপগন্ধময় বর্ণস্পর্শময় ঐশ্বর্যকে দাঁড় করাইয়াছেন; এই কবিতাটিও মানবসত্তার দুরবগাহ বিস্মিত উপলব্ধিতে উদ্দীপ্ত।

"শ্যামলী"র অনেকগুলি কবিতাই একটু 'লিরিক'-জাতীয়, এবং সেগুলিতে মানবজীবনের ছোট ছোট ছবি, জীবনের ছিন্নপত্র বিস্মৃতির হাওয়ায় উড়িয়া যাইতে যাইতে যেন কবির কল্পনায় বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে; "পুনশ্চ" এবং "পরিশেষে"ও এই জাতীয় কবিতাই বেশি। এই আখ্যানমূলক লিরিক কবিতাগুলিতে "পলাতকা"র মতন সম্পূর্ণ কোনও আখ্যান নাই, সমগ্র একটি আখ্যানের ক্ষুদ্র একটি অংশ আছে, এবং তাহাকে ঘিরিয়াই উজ্জ্বল একটি ভাবপরিবেশ, এবং তাহার মধ্যেই যেন সমগ্র জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা উন্মোচিত হইয়াছে। "পরিশেষ-পুনশ্চ-শ্যামলী"র অনেক কবিতাই পুরাতন স্মৃতিবহ; এই স্মৃতি রোমন্থনকে আশ্রয় করিয়াই কবিচিত্তে নামিয়াছে একটি অকূল গভীর প্রশান্তি, স্তব্ধ গাম্ভীর্য, নিঃশব্দ গভীর দৃষ্টি, যাহার আভাস "বীথিকা"তেও সুস্পষ্ট, উত্তর জীবনের কাব্য ক'টিতে ত কথাই নাই।

"পত্রপুটে"র কবিতাগুলি একই রীতিতে লেখা হওয়া সত্ত্বেও একেবারে অন্য জাতের। 'লিরিক' কবিতার রহস্যময়, আকস্মিক, অভাবনীয় চকিত আলোর দীপ্তি, গভীর ইঙ্গিতময় ব্যঞ্জনার ঐশ্বর্য এই কবিতাগুলিতে নাই। "পত্রপুটে"র কবিতাগুলি জীবনের অনুভূতির কথা তত বলে না, যতটা বলে অসংখ্য ও বিচিত্র অনুভূতির পশ্চাতে সৃষ্টির যে গভীর নিয়তি-নিয়ম সক্রিয়, যে দুর্নিরীক্ষ্য চিরন্তন সত্যের রহস্য প্রাণবান, যে গহন গম্ভীর চিন্তা অপূর্ব বর্ণচ্ছটায় বিচ্ছুরিত সেই সব নিয়তি-নিয়ম, সেই সব চিন্তা ও রহস্যের কথা। এই কবিতাগুলি যেন বিরাট গম্ভীর

চিন্তারণ্যের মহাটবীগুলির প্রসারিত শাখা-প্রশাখার মর্মরধ্বনি, মানবমনের গভীর দ্বন্দ্বসমস্যার গভীর কলকল্লোল। গভীর মননশীলতার পরিচয় "শেষসপ্তক"কে এবং "বীথিকা"তেও আছে, কিন্তু "পুত্রপুটে" জীবন ও সৃষ্টির মূলসূত্রগুলি সম্বন্ধে মনন-কল্পনার ধ্যান এত গভীরে প্রসারিত, এবং তাহা প্রকাশের ধ্বনি এত গম্ভীর ও বিস্তৃত, গতি এত সবল ও বেগবান, বর্ণ এত গাঢ় ও বিচিত্র এবং ভাষা সমাসে-অনুপ্রাসে এত সংস্কৃত ও অভিজাত যে, সকলে মিলিয়া "পত্রপুটে"র গদ্য কবিতা-গুলিকে এক অভিনব কাব্যরূপ দান করিয়াছে। ইহারা যেন গভীর চিন্তাশীল প্রবন্ধের সংহত সংযত কাব্যরূপ। গভীর প্রসারিত নীলকৃষ্ণ সমুদ্রের উদ্বেলিত গম্ভীর তরঙ্গধ্বনির মত ইহাদের দুর্নিবার ধ্বনিমোহ। একটি মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করি ৩ নং কবিতাটি হইতে; "পত্রপুটে" এই ধরনের দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

> অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী, মেঘলোকে উধাও পৃথিবী,
> গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে ধ্যাননিমগ্না পৃথিবী,
> নীলাম্বুরাশির অতন্দ্রতরঙ্গে কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবী,
> অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা।
> একদিকে আপক্বধান্যভারনম্র তোমার শস্যক্ষেত্র—
> সেখানে প্রসন্ন প্রভাতসূর্য প্রতিদিন মুছে নেয় শিশিরবিন্দু
> কিরণ-উত্তরীয় বুলিয়ে দিয়ে;
> অস্তগামী সূর্য শ্যামশস্যহিল্লোলে রেখে যায় অকথিত এই বাণী
> "আমি আনন্দিত"।
> অন্যদিকে তোমার জলহীন ফলহীন আতঙ্কপাণ্ডুর মরুক্ষেত্রে
> পরিকীর্ণ পশুকঙ্কালের মধ্যে মরীচিকার প্রেতনৃত্য।
> বৈশাখে দেখেছি, বিদ্যুৎচঞ্চুবিদ্ধ দিগন্তকে ছিনিয়ে নিতে এল
> কালো শ্যেন পাখির মতো তোমার ঝড়,
> সমস্ত আকাশটা ডেকে উঠলো যেন কেশর ফোলা সিংহ;

তার ল্যাজের ঝাপটে ডালপালা আলুথালু ক'রে
হতাশ বনস্পতি ধুলায় পড়লো উবুড় হয়ে ;
হাওয়ার মুখে ছুটলো ভাঙা কুঁড়ের চাল
শিকলছেঁড়া কয়েদি-ডাকাতের মতো।

এই অন্তর্নিহিত ধ্বনি ছন্দই গদ্য কবিতার রীতিতে এপিক্ রচনার ছন্দ। নিছক গদ্যে ইহার গভীর তরঙ্গ প্রবাহ, ইহার গম্ভীর ধ্বনিমোহ সৃষ্টি সম্ভব নয়, এমন কি অন্তঃমিল ও বৃত্তপ্রবাহধৃত প্রথাগত কবিতার ছন্দেও নয়। গদ্যছন্দে যে কত গভীর মনন কল্পনা রূপায়িত করা যায়, কত গম্ভীর ধ্বনি ও প্রবাহ, কত বেগ ও শক্তি, কত বর্ণসমারোহ সঞ্চার করা যায়, "পত্রপুটে"র কবিতাগুলি তাহার দৃষ্টান্ত। বস্তুত "বলাকা"র পর সকলদিক হইতে এত বিশিষ্ট ও মহৎ কাব্য রবীন্দ্রনাথ আর রচনা করেন নাই।

(১৩)

প্রান্তিক (১৩৪৪)
সেঁজুতি (১৩৪৫)
প্রহাসিনী (১৩৪৫)
আকাশ-প্রদীপ (১৩৪৬)
নবজাতক (১৩৪৭)
সানাই (১৩৪৭)

"প্রান্তিক" প্রকাশিত হয় ১৩৪৪'র পৌষ মাসে। ঐ বৎসরই ভাদ্র মাস কাটে নিদারুণ রোগে ; এই রোগই কবিকে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করাইয়া দিয়াছিল। আশ্বিনের গোড়ায় কবির চেতনা 'লুপ্তিগুহা' হইতে মুক্তিলাভ করিল। "প্রান্তিকে"র ১৮টি অন্তঃমিলবিহীন অথচ বৃত্ত-

প্রবাহধৃত কবিতা আশ্বিন হইতে পৌষ মাসের মধ্যে লেখা। এই আঠারটির ভিতর ষোলটি কবিতাই মৃত্যু এবং মৃত্যু-উত্তীর্ণ জীবনকে কেন্দ্র করিয়া। শেষ দুইটি কবিতার বিষয়বস্তু অন্যতর।

"প্রান্তিক" নামটি অর্থবহ। কবির জীবনে মৃত্যুদূত একদিন চুপে চুপে আসিয়া দেখা দিল—'বিশ্বের আলোকলুপ্ত তিমিরের অন্তরালে'; কিন্তু শেষ পর্যন্ত মৃত্যু-অন্ধকারকে অতিক্রম করিল আলোকের খরপ্রবাহ; জয় হইল শুভ্র চৈতন্যময় জ্যোতির। চেতন-অচেতনের প্রান্তদেশে এক মুহূর্তের জন্য বিভ্রমের সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু তাহাও অবশেষে ঘুচিয়া গেল,

> নূতন প্রাণের সৃষ্টি হলো অবারিত
> স্বচ্ছ শুভ্র চৈতন্যের প্রথম প্রত্যূষ অভ্যুদয়ে। (১নং)

মৃত্যুর প্রসাদবহ্নি কামনার যত আবর্জনা, জীবনের ক্ষুদ্রতুচ্ছ যত জঞ্জাল সব পুড়িয়া ঝরিয়া পড়ুক, জীবন আলোকের দানে ধন্য হউক, এ মর্ত্যের প্রান্তপথ দীপ্ত হইয়া উঠুক (২নং); শূন্য দিগন্তের ভূমিকায় নূতন জীবনচ্ছবি কবি রচনা করিবেন, ইহাই তাঁহার কামনা (৩নং)। অতীতের যাহা কিছু সহচর, যাহা কিছু বেদনার ধন, কামনার ব্যর্থতা, সব কিছু ত মৃত্যুরই পাওনা, মৃত্যুর হাতেই তাঁহাদের ফিরাইয়া দিয়া আজ কবি মেঘমুক্ত শরতের আকাশের মত ভারমুক্ত হইতে চাহিতেছেন (৫নং)। ইহাই যথার্থ মুক্তি—'সহজে ফিরিয়া আসা সহজের মাঝে'—

> হে সংসার
> আমাকে বারেক ফিরে চাও; পশ্চিমে যাবার মুখে
> বর্জন কোরোনা মোরে উপেক্ষিত ভিক্ষুকের মতো।
> জীবনের শেষপাত্র উচ্ছলিয়া দাও পূর্ণ করি,
>
> * * *
>
> সর্বহর আঁধারের দস্যুবৃত্তি ঘোষণার আগে। (৬নং)

হে জীবন, অস্তিত্বের সারথী আমার
বহু রণক্ষেত্র তুমি করিয়াছ পার, আজি লয়ে যাও
মৃত্যুর সংগ্রামশেষে নবতর বিজয়যাত্রায়। (৭নং)

আট নম্বর হইতে কবির ভাবনা-কল্পনা একটু মোড় ফিরিয়াছে। কবি মনে করিতেছেন, এতকাল যে সাজে সজ্জায় নিজের পরিচয় তিনি রচনা করিয়াছেন, মৃত্যুস্নানের পর আজ তাহা নিরর্থক মনে হইতেছে। আজ বাহিরের যাহা কিছু বর্ণ-প্রসাধন এক মুহূর্তে তাহা ধুইয়া মুছিয়া গেল (৮নং), ধরা পড়িল নিজের মধ্যেই নিজের নিগূঢ় পূর্ণতা। বিশ্ববৈচিত্র্যের উপর এক কৃষ্ণ অরূপতা নামিয়া আসিতেছে, দেহ ছায়া হইয়া বিন্দু হইয়া অন্তহীন তমিস্রায় মিলাইয়া যাইতেছে—অবসন্ন চেতনার গোধূলি বেলায় ইহাই ছিল চিত্তের অনুভূতি (৯নং)। ইহাই ত মৃত্যু, কিন্তু তাহার পশ্চাতে আছে জ্যোতি; নিজের ছায়াই সেই জ্যোতিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। সৃষ্টির সীমান্তে সেই জ্যোতি-লোকের রূপদর্শন, ইহাই কবির চরম আকাঙ্ক্ষা; এতকাল তাঁহার সেই আকাঙ্ক্ষা সার্থক হয় নাই।

লব আমি চরমের কবিত্বমর্যাদা
জীবনের রঙ্গভূমে এরি লাগি সেধেছিনু তান।
বাজিল না রুদ্রবীণা নিঃশব্দ ভৈরব নবরাগে,
জাগিল না মর্মতলে ভীষণের প্রসন্ন মুরতি
তাই ফিরাইয়া দিলে। আসিবে আরেকদিন যবে
তখন কবির বাণী পরিপক্ক ফলের মতন
নিঃশব্দে পড়িবে খসি আনন্দের পূর্ণতার ভারে
অনন্তের অর্ঘ্যডালি 'পরে। চরিতার্থ হবে শেষে
জীবনের শেষমূল্য, শেষযাত্রা, শেষ নিমন্ত্রণ। (১০নং)

স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে, কবিচিত্ত গভীরে নিমগ্ন হইতেছে, ঔপনিষদিক জ্যোতির ধ্যানে দৃষ্টি ক্রমশ এক মহা অনন্তের মধ্যে স্থিত-কেন্দ্র হইতেছে—আত্মার চরম মহামুক্তির আস্বাদনের জন্য কবি উতল্য হইতেছেন। এই পৃথিবীর কলরব মুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণ হইতে (১১নং), লোকমুখবচনের নিঃশ্বাস পতনের আন্দোলন হইতে (১২নং) দূরে সরিয়া যাইতে চাহিতেছেন—'নবজীবনের অরুণের আহ্বান ইঙ্গিত, নব জাগ্রতের ভালে প্রভাতের জ্যোতির তিলক' স্পর্শ করিয়াছে কবির চিত্ত (১২নং)।

তোমার সম্মুখ দিকে
আত্মার যাত্রার পন্থ গেছে চলি অনন্তের পানে
সেথা তুমি একা যাত্রী, অফুরন্ত এ মহাবিস্ময়। (১৩নং)

এ পারের ক্লান্ত যাত্রা গেলে থামি
ক্ষণ তরে পশ্চাতে ফিরিয়া মোর নম্র নমস্কারে
বন্দনা করিয়া যাব এ জন্মের অধিদেবতারে। (১৪নং)

আজি মুক্তিমন্ত্র গায়
আমার বক্ষের মাঝে দূরের পথিকচিত্ত মম,
সংসার যাত্রার প্রান্তে সহমরণের বধূ সম। (১৫নং)

একদিকে মন যখন এইভাবে গভীরে নিমগ্ন, তখন অন্যদিকে সংসারের উপরের স্তরে দারুণ দুর্যোগ কবিচিত্তকে ক্ষণে ক্ষণে আলোড়িত করিতেছে। পৃথিবী জুড়িয়া মানুষের তীব্র অপমান অত্যাচার অবিচার, যুদ্ধ কোলাহলের তপ্তধূমে গর্জিয়া ফুঁসিয়া উঠিতেছে —কবিচিত্তে তাহার বেদনা ক্ষোভে ক্রোধে রূপ লইতেছে। ২৫ ডিসেম্বর, খ্রীষ্ট জন্মদিনের অব্যবহিত পরেই একদিন কবিচিত্তের এই ধূমায়িত ক্ষোভ

বহির রূপ ধারণ করিল, একদিনেই লিখিলেন "প্রান্তিকে"র শেষ দুইটি কবিতা। দুইটিই উদ্ধার যোগ্য, একটি (১৮নং—'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস') আগেই উদ্ধার করিয়াছি; আর একটি এই :

যেদিন চৈতন্য মোর মুক্তি পেল লুপ্তি গুহা হতে
নিয়ে এল দুঃসহ বিস্ময়ঝড়ে দারুণ দুর্যোগে
কোন নরকাগ্নিগিরিগহ্বরের তটে ; তপ্তধূমে
গর্জি উঠি ফুঁসিছে সে মানুষের তীব্র অপমান,
অমঙ্গলধ্বনি তার কম্পান্বিত করে ধরাতল,
কালিমা মাখায় বায়ুস্তরে। দেখিলাম একালের
আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা, দেখিনু সর্বাঙ্গে তার
বিকৃতির কদর্য বিদ্রূপ।

* * * *

মহাকাল-সিংহাসনে
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নরঘাতী
কুৎসিত বীভৎসা পরে ধিক্কার হানিতে পারে যেন
নিত্যকাল রবে যা স্পন্দিত লজ্জাতুর ঐতিহ্যের
হৃৎস্পন্দনে, রুদ্ধকণ্ঠ ভয়ার্ত এ শৃঙ্খলিত যুগ যবে
নিঃশব্দে প্রচ্ছন্ন হবে আপন চিতার ভস্মতলে।

এই যে চিত্তের একদিকে গভীর মহামৌনের প্রশান্তি, স্তব্ধ উদার গাম্ভীর্যের ব্যাপ্তি, আর একদিকে সাম্প্রতিক বিক্ষোভের ক্ষুব্ধ আলোড়ন, উত্তর-জীবনের কাব্যে ইহাদের ইঙ্গিত ব্যর্থ যায় নাই। যে শান্ত গভীর জ্যোতির্ময় জীবনের কামনায় শেষ বৎসরগুলি প্রোজ্জ্বল, সেই ব্যাপ্ত গভীর প্রশান্ত ক্ষণে ক্ষণে ক্ষুব্ধ ও আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে সম-সাময়িক ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে, নবলব্ধ ঐতিহাসিক ও

সামাজিক চেতনার ফলে। আত্মার গভীরতর কামনা, চিত্তের ব্যাপকতর প্রশান্তি বারবার বিদীর্ণ করিয়া মানব-ইতিহাসের বিরোধ ও বেদনা, সাধারণ মানুষের দুঃখ ও লাঞ্ছনা, দেশের ও পৃথিবীর দুর্দশা দুর্যোগ কবির মনন-কল্পনাকে অধিকার করিয়াছে। "প্রান্তিকে"র পর হইতে প্রায় প্রত্যেকটি কাব্যগ্রন্থেই তাহার পরিচয় সুস্পষ্ট।

"আকাশ-প্রদীপ" প্রকাশিত হয় ১৩৪৬'র বৈশাখে। সবগুলি কবিতাই ১৩৪৫'র কার্তিক হইতে চৈত্রমাসের মধ্যে লেখা। গ্রন্থটির উৎসর্গ-পত্র পড়িলেই বুঝা যাইবে, বক্তব্যের মধ্যে কোথাও একটা দ্বিধা আছে। মনের মধ্যে এই শঙ্কা আছে, এই কবিতাগুলির বিষয়ভাবনা এবং দৃষ্টি-ভঙ্গি হয়ত নূতন কালের হৃদয় মন স্পর্শ না-ও করিতে পারে। হয়ত এই দ্বিধার কারণও আছে। তরুণ ও পরিণত যৌবনে, এমন কি প্রৌঢ় অপরাহ্ণেও কবিকল্পনা ছিল আপনাতে আপনি তৃপ্ত, কবিতা ছিল আত্ম-রতি মুখর, বাহিরের দিকে তাকাইবার সময়ও ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না; যাহাদের মধ্যে ছিল তাঁহার স্বেচ্ছা-বিহার তাহারা সকলেই ছিল ঘরের একান্ত পরিচিতের সীমানার মধ্যে। আজ তাহারা কেহ নাই, জীবনদৃশ্য গিয়াছে বদলাইয়া; পরিচিত জগৎ, পরিচিত মানুষ, পরিচিত জীবনদৃশ্য সবই আজ আকাশের স্বপ্ন; আকাশে প্রদীপ জ্বালাইয়া 'সেই স্বপ্নগুলিকেই কবি ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন এই গ্রন্থের কবিতাগুলিতে।

> গোধূলিতে নামল আঁধার,
>   ফুরিয়ে গেল বেলা,
> ঘরের মাঝে সাঙ্গ হোলো
>   চেনা মুখের মেলা।

দূরে তাকায় লক্ষ্যহারা
নয়ন ছলোছলো,
এবার তবে ঘরের প্রদীপ
বাইরে নিয়ে চলো।

*　　*　　*

অকারণে তাই এ প্রদীপ জ্বালাই আকাশ পানে—
যেখান হতে স্বপ্ন নামে প্রাণে। ('আকাশ প্রদীপ')

স্বভাবতই এই আকাশ-প্রদীপ জ্বালান কবিতাগুলি স্বপ্নময় ও স্মৃতিবহ—'চলেছে মন্থরতরী নিরুদ্দেশে স্বপ্নেতে বোঝাই'। এইখানেই কবির মনের দ্বিধা, এবং এই দ্বিধার কৈফিয়ৎ 'সময়হারা' কবিতায় :

পেরিয়ে মেয়াদ বাঁচে তবু যে সব সময়হারা
স্বপ্নে ছাড়া সান্ত্বনা আর কোথায় পাবে তারা।

এই কৈফিয়তের কোনও প্রয়োজন ছিল না। এই আকাশ ত কবির স্মৃতির আকাশ, যে-আকাশে জীবনের সঙ্গী-সঙ্গিনীরা তারকার রূপ ধরিয়া এখনও মিটিমিটি জ্বলিতেছে। স্মৃতির প্রদীপ জ্বালাইয়া আজ এই জীবন-সায়াহ্নে কবি তাহাদের ক্ষণিক সঙ্গ উপভোগ করিতে-ছেন। এই উপভোগ-অভিজ্ঞতার সঙ্গে ত আধুনিক কালের কোনও বিরোধ নাই, ইহাদের সঙ্গে জড়িত মনন-কল্পনার সঙ্গেও নয়। ইহারাও ত জীবনের জীবন্ত পরিচয় বহন করে, এবং মানুষের জীবন্ত হৃদয়ই ত কবির কাম্য লোক ; বরং পৃথিবীকেও আড়াল করিয়া জীবন-সায়াহ্নে কবি ত মানবের প্রেম, মানবের সুখ দুঃখ এবং মানবের বিচিত্র সংসার-বিক্ষেপময় কাহিনীর মধ্যেই বেশি করিয়া বিশেষ করিয়া নিজের চিত্তের আশ্রয় খুঁজিয়াছেন। ইহার মধ্যে অনাধুনিক ত কিছু নাই ; তবু সাম্প্রতিক কালে আধুনিকতার যে অহংকার, যে মিথ্যা কৃত্রিম অনৈতি-হাসিক দৃষ্টি আমাদের জীবনে আজ কলরবমুখর হইয়া উঠিয়াছে, তাহার

সঙ্গে তাল মিলাইয়া চলিবার, তাহার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিবার একটা লোভ কবির অবচেতন চিত্তে সক্রিয় ছিল, এবং ক্ষণে ক্ষণে থাকিয়া থাকিয়া তাহা আত্মপ্রকাশও করিয়াছে শেষ অধ্যায়ের রচনায়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কবি নিজেই জানিতেন যে তিনি 'জন্ম-রোম্যাণ্টিক্'; জীবনের মধ্যে যখন নূতনাকাশের দৃষ্টি প্রসারিত হইয়াছে তখনও তিনি আমাদের স্মরণ করাইয়া দিতে ভুলেন নাই যে

আমারে বলে যে ওরা রোম্যাণ্টিক।
সে কথা মানিয়া লই
রসতীর্থ-পথের পথিক।
মোর উত্তরীয়ে
রং লাগায়েছি প্রিয়ে।

মনে রাখা প্রয়োজন এই কবিতাটি "নব-জাতক" গ্রন্থের। যাহাই হউক, কবি-মানসের এই নিগূঢ় পরিচয় যাঁহাদের জানা আছে আকাশে প্রদীপ জ্বালাইয়া স্মৃতির স্বপ্নে চিত্ত ভরিয়া তোলাতে তাঁহাদের দ্বিধার কোনও হেতু থাকিবার কথা নয়।

আগেই বলিয়াছি, "আকাশ-প্রদীপে"র কবিতাগুলি স্মৃতিবহ; জীবনের বহু পুরাতন দিনগুলি হইতে আহৃত স্মৃতির অনুধ্যানই এই গ্রন্থের অধিকাংশ সার্থক কবিতার বিষয়বস্তু। তাহার আভাস ত "প্রান্তিক" গ্রন্থেই পাওয়া যাইতেছে ৫ ও ৭নং কবিতায়; এবং তাহারও আগে কিছু কিছু "পুনশ্চ-শেষসপ্তক-শ্যামলী"তে।

পশ্চাতের নিত্যসহচর, অকৃতার্থ হে অতীত,
অতৃপ্ত তৃষ্ণার যত ছায়ামূর্তি প্রেতভূমি হতে
নিয়েছ আমার সঙ্গ, পিছু-ডাকা অক্লান্ত আগ্রহে
আবেশ-আবিল সুরে বাজাইছ অস্ফুট সেতার,
বাসাছাড়া মৌমাছির গুন গুন গুঞ্জরণ যেন
পুষ্পরিক্ত মৌনী বনে। (৫নং)

অনভিজ্ঞ নব কৈশোরের
কম্পমান হাত হতে স্খলিত প্রথম বরমালা
কণ্ঠে ওঠে নাই, তাই আজিও অক্লিষ্ট অমলিন
আছে তার অস্ফুট কলিকা। সমস্ত জীবন মোর
তাই দিয়ে পুষ্প-মুকুটিত। পেয়েছি যা অযাচিত
প্রেমের অমৃতরস, পাইনি যা বহু সাধনায়
দুই মিশেছিল মোর পীড়িত যৌবনে। (৭নং)

তবু, "সেঁজুতি" ও "আকাশ-প্রদীপে"ই ব্যক্তিগত জীবনের অতীত-অনুধ্যান সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, এবং পরে "জন্মদিনে" পর্যন্ত এই ধ্যান কবিচিত্ত হইতে কখনও খুব দূরে সরিয়া যায় নাই। বস্তুত এমন অকপট সারল্যে অতীত জীবনের রহস্য এবং তাহার সঙ্গে কত অকথিত কামনা বাসনা, কত অতৃপ্ত অকৃতার্থ তৃষ্ণা, কত বিচিত্র সলজ্জ রহস্যময় স্মৃতি, কত বিচ্ছিন্ন ছবি, বড় কেহ উদ্‌ঘাটিত করেন না, এমন কি কবিরাও নন। অতীত-রোমন্থন জীবন-সায়াহ্নের স্বাভাবিক চিত্ত-প্রকৃতি, কিন্তু যে-রবীন্দ্রনাথ পরিণত যৌবনে "জীবনস্মৃতি" লিখিতে বসিয়া রচনা করিয়াছিলেন অপূর্ব কাব্য, সেই রবীন্দ্রনাথ শুভ্র বার্ধক্যে জীবনস্মৃতি লইয়া কবিতা লিখিতে বসিয়া শুধু কাব্যই রচনা করিলেন না, নিজের জীবনকেও নূতন করিয়া উদ্‌ঘাটন করিলেন তাঁহার অগণিত পাঠকজনের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে। অতীত স্মৃতিকথা বলিতে বসিয়া চিত্ত উদ্দীপিত হইয়াছে নানা বিচিত্র অনুভূতিতে, নানা ভাব-রসে; তখন স্মৃতিকাহিনী হইয়া উঠিয়াছে কাব্য, আর যেটুকু গল্পে, ইতিবোধে কাহিনীমাত্র তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে কিছু "ছেলেবেলায়", কিছু "গল্পসল্পে" আভাসে ইঙ্গিতে, কিছু বর্ণনাত্মক কবিতায়।

"আকাশ-প্রদীপে"ও সার্থক কবিতাগুলি সব এই স্মৃতি-কাহিনী লইয়া। ছেলেবেলার স্মৃতিভাণ্ডার হইতে টুকরা টুকরা কাহিনী

তিনি কি গভীর অনুভবে, কি গভীর আনন্দে আস্বাদন করিয়াছেন তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে 'যাত্রাপথ', 'স্কুল-পালানো', 'ধ্বনি', 'বধূ', 'সময়-হারা', 'শ্যামা', 'কাঁচাআম' প্রভৃতি কবিতায়। এই ছেলেবেলার স্মৃতির মধ্যে ছড়া ও রূপকথার আকাশ সুবিস্তৃত; তাহাদের ধ্বনি ও সুর, তাহাদের পরিমণ্ডল জীবন-সায়াহ্নে চিত্তের মধ্যে আবার বিস্তার লাভ করিতেছে; সে-পরিচয় পাওয়া যাইবে 'বধূ', 'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে' প্রভৃতি কবিতায়, "ছড়ার ছবি" (১৩৪৪), "সে", (১৩৪৪) "গল্পসল্প" (১৩৪৭) ও "ছড়া" (১৩৪৮)-গ্রন্থে। 'বোধের প্রত্যূষে যেথা বুদ্ধির প্রদীপ নাহি জ্বলে' সেই শৈশব ভাবমণ্ডলে এই জাতীয় কবিতা ও গ্রন্থগুলির সৃষ্টি। কিন্তু শিশুচিত্তাশ্রয়ী গ্রন্থগুলিতে যাহাই হউক, "আকাশ-প্রদীপ" কিংবা "সেঁজুতির" কবিতাগুলিতে কবির পরিণত মননশীলতা এবং গভীর রহস্যময় অভিজ্ঞতার পরিচয় সুস্পষ্ট। সেগুলি ছেলেবেলার খেয়ালখুশি কল্পনার সৃষ্টি নয়, বার্ধক্যের পরিণত মানসের সৃষ্টি। "বধূ" কবিতাটিই ধরা যাক্। কবি ছেলেবেলায় ঠাকুরমার মুখে কবে বধূ-আগমন গাঁথা শুনিয়াছিলেন,

> "বউ আসে চতুর্দোলা চ'ড়ে
> আম কাঁঠালের ছায়ে
> গলায় মোতির মালা সোনার চরণচক্র পায়ে।"

সেই গানের ছন্দ বালকের প্রাণে একদিন অর্ধ-জাগ্রত কল্পনার শিহরণ জাগাইয়াছিল। তারপর সেই বালক কাল মিলাইয়া গেল; যৌবনে সেই মায়াময়ী বধূর নূপুর নানাভাবে নানা বিচিত্র উপলক্ষে কবির চিত্তে নানা কল্পনার রাগিণী বাজাইয়াছে, কিন্তু কোনদিনই সে বধূর দেখা পাওয়া যায় নাই।

অকস্মাৎ একদিন কাহার পরশ
রহস্যের তীব্রতায় দেহে মনে জাগাল হরষ,
তাহারে শুধায়েছিনু অভিভূত মুহূর্তে ই,
"তুমিই কি সেই,
আঁধারের কোন্ ঘাট হতে
এসেছ আলোতে।"

উত্তরে সে হেনেছিল চকিত বিদ্যুৎ,
ইঙ্গিতে জানায়েছিল, "আমি তারি দূত,
সে রয়েছে সব প্রত্যক্ষের পিছে,
নিত্যকাল সে শুধু আসিছে।
নক্ষত্র লিপির পত্রে তোমার নামের কাছে
যার নাম লেখা রহিয়াছে
অনাদি অজ্ঞাত যুগে সে চড়েছে তার চতুর্দোলা,
ফিরিছে সে চির পথভোলা
জ্যোতিষ্কের আলো ছায়ে
গলায় মোতির মালা, সোনার চরণচক্র পায়ে।

এই ধরনের মননশীল রহস্যময়তা, চিন্তাময় গভীর দর্শন "আকাশ-প্রদীপে"র 'জল', 'জানা-অজানা', 'আমগাছ', 'যাত্রা', নামকরণ' প্রভৃতি কবিতায়ও লক্ষণীয়।

'শ্যামা' ও 'কাঁচা আম' কবিতা দুইটি কিশোর প্রেম ও প্রথম নারী-চেতনার অপরিণত মানসানুভূতির অপূর্ব কাব্যরূপ। শ্যামা ছিল,

নব কৈশোরের মেয়ে,
ছিল তার কাছাকাছি বয়স আমার।

মুখচোরা বালকের ভীরু সলজ্জ কৌতুক কিশোরীর পদক্ষেপ অনুসরণ করিয়াই তৃপ্ত। তারপর জানাশোনা যখন বাধাহীন হইল, তখন

একদিন নিয়ে তার ডাক নাম
তারে ডাকিলাম।
একদিন ঘুচে গেল ভয়
পরিহাসে পরিহাসে হোলো দোঁহে কথা বিনিময়।

তাহার পর আরম্ভ হইল কিশোরীর সপ্রতিভ প্রণয়-চাঞ্চল্য, ঘনিষ্ঠতর হইল পরিচয়,

তবু ঘুচিলনা
অসম্পূর্ণ চেনার বেদনা।
সুন্দরের দুরত্বের কখনো হয়না ক্ষয়,
কাছে পেয়ে না পাওয়ার দেয় অফুরন্ত পরিচয়।
পুলকে বিষাদে মেশা দিন পরে দিন
পশ্চিম দিগন্তে হয় লীন।

ইহাই ত কিশোর প্রেমের চিরন্তন পরিচয়। গদ্যছন্দে লেখা 'কাঁচা আম' কবিতাটিতে কিশোর প্রেমের কাঁচা অনুভূতির প্রথম উন্মেষ এক অভিনব চাঞ্চল্যলীলায় বিকশিত হইয়াছে। কিশোর বয়সের এই অভিজ্ঞতাও চিরন্তন, এবং ব্যক্তিগত ছায়ার ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত। কিশোর বয়সের অপরিণত প্রেমের সলিল-সমাধি লাভই একমাত্র গতি, চিত্তের প্রথম উন্মেষ ঘটাইয়া দিয়াই তাহার মুক্তি; তাহার অম্লমধুর রস আস্বাদন করা যায় শুধু স্মৃতিতে, সেইখানেই তাহার মূল্য।

বয়স বেড়ে গেল।
একদিন সোনার আংটি পেয়েছিলুম ওর কাছ থেকে,
তাতে স্মরণীয় কিছু লেখাও ছিল।
স্নান করতে সেটা পড়ে গেল গঙ্গার জলে,
খুঁজে পাইনি।
এখনো কাঁচা আম পড়ছে খসে খসে
গাছের তলায়, বছরের পর বছর।
ওকে আর খুঁজে পাবার পথ নেই।

প্রেমতত্ত্বের দিক হইতে মূল্যবান 'তর্ক' কবিতাটি। নারীসম্বন্ধগত প্রেম ও মোহকে পৃথক করিয়া দেখিতে আমরা অভ্যস্ত; বহুদেশের নৈতিক ও সাহিত্য-ঐতিহ্য এই সংস্কার আমাদের চিত্তে সঞ্চারিত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই সংস্কার একাধিক বার স্বীকার করিয়াছেন; বস্তুত রবীন্দ্রনাথের প্রেমকল্পনা এই সংস্কার হইতে একান্ত বিচ্যুত নয়। কিন্তু পরিণত বার্ধক্যে বোধ হয় তাঁহার এই সংস্কারে সাম্প্রতিক মননক্রিয়ার আঘাত লাগিয়াছিল; "দুই বোন" হইতে আরম্ভ করিয়া "তিনসঙ্গী" পর্যন্ত বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসে, "আকাশ-প্রদীপে"র একাধিক কবিতায় ('তর্ক', 'নামকরণ', ময়ূরের দৃষ্টি'), "সানাই" গ্রন্থের কয়েকটি কবিতায় নরনারীর দেহ-আত্মাগত প্রেমের সম্বন্ধ লইয়া বিচিত্র তথ্য ও তত্ত্ববিশ্লেষণ তিনি করিয়াছেন। সার্থক রস-সৃষ্টির চেষ্টা এই সব রচনায় উপস্থিত, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে নিজের প্রাচীন সংস্কার-গ্রন্থিও যেন কবি ধীরে ধীরে উন্মোচন করিয়াছেন। প্রেম ও মোহের সম্বন্ধ লইয়া 'তর্ক', কবিতাটিতে কবি বোধ হয় সর্বপ্রথম প্রেম আর মোহের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্বীকার করিলেন।

> যদি প্রেম হয় অমৃত কলস,
> মোহ তবে রসনার রস।
> সে সুধার পূর্ণ স্বাদ থেকে
> মোহহীন রমণীরে প্রবাঞ্চত বলো করেছে কে।
> আনন্দিত হই দেখে তোমার লাবণ্যভরা কায়া,
> তাহার তো বারো আনা আমারি অন্তরবাসী মায়া।
> প্রেম আর মোহে
> একেবারে বিরুদ্ধ কি দোঁহে।
> আকাশের আলো
> বিপরীতে ভাগ করা সে কি সাদা কালো।

"সেঁজুতি" প্রকাশিত হয় ১৩৪৫'র ভাদ্রমাসে। তেইশটি কবিতা সর্বশুদ্ধ এবং তাহাদের অধিকাংশই নিজের জীবন সন্ধ্যাকে কেন্দ্র করিয়া অদূরাগত মৃত্যুভাবনাকে কেন্দ্র করিয়া। "সেঁজুতি" সার্থকনামা ; সত্যিই ইহার অধিকাংশ কবিতা সাঁজের বাতি। সন্ধ্যা বাতি জ্বালাইয়া জীবন-দিবার হিসাব নিকাশ, মৃত্যুরাত্রির প্রতীক্ষা। কতকগুলি কবিতা ত একান্তভাবে ব্যক্তিগত জীবনকেই আশ্রয় করিয়াছে, আত্মভাবনাই তাহাদের অবলম্বন, যেমন 'জন্মদিন' ('আজ মম জন্মদিন'), 'পত্রোত্তর', 'যাবার মুখে', 'অমর্ত্য', 'জন্মদিন' (দৃষ্টিজালে জড়ায় ওকে), 'নিঃশেষ', 'প্রতীক্ষা', 'পরিচয়'। এই সব কবিতায় ত কবি স্পষ্টতই সাঁজের বাতি জ্বালাইয়া বিগত জীবনের এবং অগ্রসরমান মৃত্যুর পরিচয় লইতেছেন। তাহা ছাড়া 'সন্ধ্যা', 'ভাগীরথী', 'তীর্থযাত্রিণী', 'নতুন কাল', 'পালের নৌকা' প্রভৃতি কবিতায়ও এই দুই ভাব-কল্পনাধৃত ব্যক্তিগত জীবনের ছায়া পড়িয়াছে।

যিনি ১৩৪৪'র নিদারুণ মৃত্যুপরীক্ষার হাত হইতে কবিকে ত্রাণ করিয়াছিলেন গ্রন্থটি সেই "ডাক্তার নীলরতন সরকার বন্ধুবরেষু" উৎসর্গী-কৃত। উৎসর্গ পত্রেই কবি বলিলেন, মৃত্যুর অন্ধকার গহ্বর হইতে ফিরিয়া নিজের সঙ্গে নিজের নূতন করিয়া পরিচয় হইল, 'অরূপলোকের দ্বার' 'অচিহ্নিতের পার' যেন দৃষ্টির সীমানায় ধরা দিল,

> আলো আঁধারের ফাঁকে দেখা যায়
> অজানা তীরের বাসা,
> ঝিমিঝিমি করে শিরায় শিরায়
> দূর নীলিমার ভাষা।

সে-ভাষার চরম অর্থ আজও কবি জানেন নাই, উত্তর জীবনে সে অর্থ ক্রমশ উদ্ঘাটিত হইবে।

ভাবানুভূতির স্বচ্ছ গভীরতায়, পরিচ্ছন্ন জীবন-ব্যাখ্যায়, দৃষ্টি ও

বিশ্বাসের আন্তরিকতায় এবং ছন্দ ও ধ্বনির প্রচ্ছন্ন গরিমায় 'জন্মদিন' কবিতাটি এ-গ্রন্থের গৌরব।

নবসূত্রে পড়ে আজি গাঁথা
নব জন্মদিন। জন্মোৎসবে এই যে আসন পাতা
হেথা আমি যাত্রী শুধু, অপেক্ষা করিব, লব টিকা
মৃত্যুর দক্ষিণ হস্ত হতে নূতন অরুণলিখা
যবে দিবে যাত্রার ইঙ্গিত।

*　　*　　*

হে বসুধা
নিত্য নিত্য বুঝায়ে দিতেছ মোরে—যে-তৃষ্ণা যে-ক্ষুধা
তোমার সংসার-রথে সহস্রের সাথে বাঁধি মোরে
টানায়েছে রাত্রিদিন স্থূল সূক্ষ্ম নানাবিধ ডোরে
নানাদিকে নানা পথে, আজ তার অর্থ গেল কমে
ছুটির গোধূলি বেলা তন্দ্রালু আলোকে। তাই ক্রমে
ফিরায়ে নিতেছ শক্তি, হে কৃপণা, চক্ষুকর্ণ থেকে
আড়াল করিছ স্বচ্ছ আলো; দিনে দিনে টানিছে কে
নিষ্প্রভ নেপথ্য পানে। আমাতে তোমার প্রয়োজন
শিথিল হয়েছে, তাই মূল্য মোর করিছ হরণ,
দিতেছ ললাটপটে বর্জনের ছাপ। কিন্তু জানি
তোমার অবজ্ঞা মোরে পারে না ফেলিতে দূরে টানি।
তব প্রয়োজন হতে অতিরিক্ত যে মানুষ, তারে
দিতে হবে চরম সম্মান তব শেষ নমস্কারে।
যদি মোরে পঙ্গু করো, যদি মোরে করো অন্ধপ্রায়,
যদি বা প্রচ্ছন্ন করো নিঃশক্তির প্রদোষচ্ছায়ায়,
বাঁধো বার্ধক্যের জালে, তবু ভাঙা মন্দিরবেদীতে
প্রতিমা অক্ষুণ্ণ র'বে সগৌরবে, তারে কেড়ে নিতে
শক্তি নাই তব।

*　　*　　*

সে মানুষ, হে ধরণী,
তোমার আশ্রয় ছেড়ে যাবে যবে, নিয়ো তুমি গনি
যা-কিছু দিয়েছ তারে। * *
তবু জেনো অবজ্ঞা করিনি
তোমার মাটির দান, আমি সে মাটির কাছে ঋণী—
জানায়েছি বারংবার, তাহারি বেড়ার প্রান্ত হতে
অমূর্তের পেয়েছি সন্ধান। যবে আলোতে আলোতে
লীন হোত জড় যবনিকা, পুষ্পে পুষ্পে তৃণে তৃণে
রূপে রসে সেই ক্ষণে যে গূঢ় রহস্য দিনে দিনে
হোত নিঃশ্বসিত, আজি মর্ত্যের অপর তীরে বুঝি
চলিতে ফিরানু মুখ তাহারি চরম অর্থ খুঁজি।
* * *
তব দেহলিতে শুনি ঘণ্টা বাজে
শেষ-প্রহরের ঘণ্টা, সেই সঙ্গে ক্লান্ত বক্ষোমাঝে
শুনি বিদায়ের দ্বার খুলিবার শব্দ সে অদূরে
ধ্বনিতেছে সূর্যাস্তের রঙে রাঙা পূরবীর সুরে।
জীবনের স্মৃতিদীপে আজিও দিতেছে যারা জ্যোতি
সেই ক'টি বাতি দিয়ে রচিব তোমার সন্ধ্যারতি
সপ্তর্ষির দৃষ্টির সম্মুখে, দিনান্তের শেষ পলে
রবে মোর মৌন বাণী মুছিয়া তোমার পদতলে।
আর রবে পশ্চাতে আমার, নাগকেশরের চারা
ফুল যার ধরে নাই, আর রবে খেয়াতরীহারা
এপারের ভালবাসা, বিরহস্মৃতির অভিমানে
ক্লান্ত হয়ে, রাত্রিশেষে ফিরিবে সে পশ্চাতের পানে।

জন্মদিনের উপর আর একটি কবিতা আছে; এ'টি একটু হাল্কা অথচ মধুর সুরে রচনা; বিগত জীবনের স্মৃতিদীপেই তাহার জ্যোতি। বিশ্ব-নিসর্গের চিরন্তন বাণী তিনি কি করিয়া আহরণ করিয়াছেন তাহারই ইতিহাসারতি, মাটির কাছে তাঁহার ঋণ স্বীকার। 'পত্রোত্তরে'ও কবি

দেখিয়াছেন আত্মহারা নিখিলের, অন্তবিহীন প্রাণের উৎসব যাত্রা, সেই ধারারই বেগ লাগিয়াছে কবির মনে, সারাজীবন সেই বেগেই ত তিনি পথ চলিয়াছেন, আজ

এ-ধরণী হতে বিদায় নেবার ক্ষণে
নিবায়ে ফেলিব ঘরের কোণের বাতি,
যাব অলক্ষ্যে সূর্যতারার সাথী।

এই সব ভাবনা-কল্পনা—এই মাটির 'পরে অনুরাগ বিশ্বনিসর্গের সুর ও সৌন্দর্যধারায় নিরন্তর অবগাহন এবং তাহার ভিতরই নিজের পরিচয়-সার্থকতা, সকল কিছুর সীমানা ছাড়াইয়া অসীমের অক্লান্ত ইশারা, অজানা সমুদ্রপথে মহৎ অজানার অভিসার গান—এই সব ভাবনা কল্পনাই নানাভাবে নানা ছন্দে ও চিত্রে প্রকাশ পাইয়াছে "সেঁজুতি"র কবিতাগুলিতে। সাঁঝের বাতির স্নিগ্ধ ও কোমল, নম্র ও শীতল মাধুর্য সব কবিতাগুলিতেই ছড়ান ; প্রায় প্রত্যেকটি কবিতাই মৌন স্মৃতির স্নিগ্ধ প্রদীপ। এই স্নিগ্ধ নম্র সুরটির একটু পরিচয় লওয়া যাইতে পারে। 'পরিচয়' কবিতায়, কবির তরীখানা বসন্তের নূতন হাওয়ার বেগে নদীতে এক ঘাটে আসিয়া লাগিয়াছিল, লোকেরা যখন তাহার পরিচয় শুনিতে চাহিল, তিনি বলিতে পারেন নাই। তারপর একদিন

নদীতে লাগিল দোলা, বাঁধনে পড়িল টান
একা বসে গাহিলাম যৌবনের-বেদনার গান।
সেই গান শুনি
কুসুমিত তরুতলে তরুণতরুণী
তুলিল অশোক,
মোর হাতে দিয়ে তা'রা কহিল, এ আমাদেরি লোক।
আর কিছু নয়
সে মোর প্রথম পরিচয়।

তারপর জোয়রের বেলা, তরঙ্গের খেলা শেষ হইয়া গেল; ভাঁটার গভীর টানে নৌকা ভাসিয়া চলিল সমুদ্রের দিকে। দূর হইতে নূতন কালের নূতন যাত্রী যত তরুণ-তরুণী ডাকিয়া প্রশ্ন করিল, ঐ তরণী বাহিয়া চলিয়াছে সন্ধ্যার তারার দিকে, ও কে?

সেতারেতে বাঁধিলাম তার,
গাহিলাম আরবার—
—মোর নাম এই ব'লে খ্যাত হোক্,—
আমি তোমাদেরি লোক।—
আর কিছু নয়—
এই হোক শেষ পরিচয়।

"প্রহাসিনী" একেবারে অন্য জাতের অন্য সুরের কবিতা; হাস্যে পরিহাসে, প্রলাপে কৌতুকে, ব্যঙ্গ কটাক্ষে কবিতাগুলি যেন ধূমকেতুর পুচ্ছ ঝাঁটার এক একটি শলাকা।

আমার জীবন কক্ষে জানিনা কী হেতু
মাঝে মাঝে এসে পড়ে খ্যাপা ধূমকেতু,
তুচ্ছ প্রলাপের পুচ্ছ শূন্যে দেয় মেলি,
ক্ষণতরে কৌতুকের ছেলেখেলা খেলি,
নেড়ে দেয় গম্ভীরের ঝুঁটি।

যে গভীর গাম্ভীর্য নিজের চিত্তের মধ্যে বাসা বাঁধিতেছিল, নূতন কালের সঙ্গে নিজের প্রাণের সুর মিলাইতে গিয়া মননের মধ্যে যে-সব প্রশ্ন, যে-সব সমস্যা জট পাকাইয়া উঠিতেছিল, নিজের চোখের সম্মুখে এবং মনের মধ্যে নূতন কাল যে রূপ লইতেছিল, যে নূতন জীবন ও মৃত্যু-চেতনা চিত্তকে গভীরে টানিয়া লইতেছিল, "প্রহাসিনী" যেন সে সব-কিছুর ঝুঁটি ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া ক্ষণিক কৌতুকের ছেলেখেলায় মাতিয়া ওঠা।

দুই হাতে মুঠা মুঠা কৌতুকের কণা
ছড়ায় হরির লুঠ, নাহি যায় গনা।

"প্রহাসিনী"র প্রকাশ কাল ১৩৪'৫র পৌষমাস। কবিতাগুলি বিষয়ভাবনা বিচিত্র। কবির ঠাট্টা কখনও আধুনিক নারী ও তাহাদে চালচলন লইয়া, কখনও ভোজন ও ভোজনের বিপত্তি লইয়া, কখন নিজেকে লইয়া, কখনও আধুনিক কবিতার ভাষা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে লইয়া কিন্তু যত কৌতুকই করুন না কেন কবি, সকল কৌতুকের পশ্চাতে থাকিয়া থাকিয়া কবির মনের গভীর কথাও ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিয়াছে; সকল পরিহাস-রসিকতার পশ্চাতে একটু ম্লান হাসি, একটু দুঃখের রেশ আবিষ্কার করা কঠিন নয়।

এই হাস্য পরিহাসের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের তীব্রতা সত্ত্বেও 'মাল্যতত্ত্ব' একটি রসসমৃদ্ধ কবিতা। এই ব্যঙ্গবাণের লক্ষ্য আধুনিক কবিতার ভাষা ও দৃষ্টিভঙ্গি। জগামালির গাঁথা কুন্দমালা কবির গলায়, এই জগামালির মালার উপরই আজ কবিকল্পনার বিস্তৃতি, ইহাই খাঁটি এবং ইহাকে লইয়াই আজকে দিনের কবিতা—

"শুক্ল একাদশীর রাতে
কলিকাতার ছাতে
জ্যোৎস্না যেন পারিজাতের পাপড়ি দিয়ে ছোঁওয়া,
গলায় আমার কুন্দমালা গোলাপ জলে ধোওয়া",—
এইটুকু যেই লিখেছি সেই হঠাৎ মনে পোলো
এটা নেহাৎ অসাময়িক হোলো।
হাল ফ্যাশানের বাণীর সঙ্গে নতুন হোলো রফা
একাদশীর চন্দ্র দেবেন কর্মেতে ইস্তফা।

* * *

তা ছাড়া ঐ পারিজাতের ন্যাকামিও ত্যাজ্য,
'মধুর করে বানিয়ে বলা নয় কিছুতেই ভাষা।

বদল করে হোলো শেষে নিম্নরকম ভাষা :—
আকাশ সেদিন ধুলোয় ধোঁয়ায় নিরেট করে ঠাসা,
রাতটা যেন কুলিমাগি কয়লাখনি থেকে
এল কালো রঙের উপর কালীর প্রলেপ মেখে।
তার পরেকার বর্ণনা এই,—তামাক সাজার ধন্দে
জগার থ্যাবড়া আঙুলগুলো দোক্তাপাতার গন্ধে
দিনরাত্রি ল্যাপা।
তাই সে জগা থ্যাপা
যে মালাটাই গাঁথে তাতে ছাপিয়ে ফুলের বাস
তামাকেরই গন্ধের হয় উৎকট প্রকাশ।

* * *

[তা ছাড়া] মালাটাই যে ঘোর সেকেলে, সরস্বতীর গলে
আর কি ওটা চলে।
রিয়ালিস্টিক প্রসাধন বা নব্যশাস্ত্রে পড়ি—
সেটা গলায় দড়ি।

এই ধরনের প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ হাস্য পরিহাস তিনি করিয়াছেন আধুনিকা প্রিয়াদের সঙ্গেও। এবং "সানাই" গ্রন্থের 'অত্যুক্তি' কবিতায়, "প্রহাসিনী"র দু'একটি কবিতায় তাহার পরিচয় সুস্পষ্ট। কবির রোম্যান্টিক্‌ অত্যুক্তির প্রসাধন ও প্রণয়গুঞ্জন সম্বন্ধে একালের আধুনিক প্রিয়ার আপত্তি; কবি তাহার উত্তরে বলেন,

তব অঙ্গে অত্যুক্তি কি করো না বহন
সন্ধ্যায় যখন
দেখা দিতে আসো।
তখন যে হাসি হাসো
সে তো নহে মিতব্যয়ী প্রত্যহের মতো,
অতিরিক্ত মধু কিছু তার মধ্যে থাকে তো সংহত।

* * *

কিন্তু ওই আসমানি শাড়িখানি
ও কি নহে অত্যুক্তির বাণী।
তোমার দেহের সঙ্গে নীল গগনের
ব্যঞ্জনা মিলায়ে দেয়, সে যে কোন্ অসীম মনের
আপন ইঙ্গিত
সে যে অঙ্গের সংগীত। ('অত্যুক্তি')

কিন্তু এ অত্যুক্তি ত আধুনিকার মধ্যে নয়, তাহা কবির চোখের রোম্যান্টিক্ দৃষ্টিতে। যে-আধুনিকার কাছে কবি ঋণী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন "প্রহাসিনী"র 'আধুনিকা'য় সে. আধুনিক রোম্যান্টিক্ কবি-চিত্তের চিরন্তনী আধুনিকা। সেই চিরন্তনী আধুনিকার স্বরূপটি দেখা যাইবে "সানাই"-র 'অনসূয়া' কবিতায় :

নায়িকা আসিল নেমে আকাশ-প্রদীপে আলো পেয়ে।
সেই মেয়ে
নহে বিংশ শতকিয়া
ছন্দোহারা কবিদের ব্যঙ্গ-হাসি-বিহসিত প্রিয়া।
সে নয় ইকনমিক্‌স্-পরীক্ষাবাহিনী।
আতপ্ত বসন্তে আজি নিঃশ্বসিত যাহার কাহিনী।
অনসূয়া নাম তার, প্রাকৃত ভাষায়
কারে সে বিস্মৃত যুগে কাঁদায় হাসায়,
অশ্রুত হাসির ধ্বনি মিলায় সে কলকোলাহলে
শিপ্রাতটতলে
পিনদ্ধ বল্কল-বন্ধে যৌবনের বন্দী দূত দোঁহে
জাগে অঙ্গে উদ্ধত বিদ্রোহে।
অযত্নে এলায়িত রুক্ষ কেশপাশ
বনপথে মেলে চলে মৃদুমন্দ গন্ধের আভাস।" ('অনসূয়া')

এই চিরন্তনী আধুনিকা ও অধুনা-জাত বিংশশতকিয়া আধুনিকার মধ্যে ব্যবধান ত আছেই, এবং এই ব্যবধান দুই দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবধান। তাহা লইয়া দুঃখ করিয়া লাভ নাই।

> অতএব মন, তোর কল্‌সি ও দড়ি আন্‌,
> অতলে মারিস ডুব Mid-Victorian।
> কোনো ফল ফলিবে না আঁখিজল-সিচনে
> শুকনো হাসিটা তবে রেখে যাই পিছনে।
> গদগদ সুর কেন বিদায়ের পাঠটায়,
> শেষ বেলা কেটে যাক ঠাট্টায় ঠাট্টায়। ('আধুনিকা'. "প্রহাসিনী")

কাজেই 'বিংশশতকিয়া আধুনিকা'দের সঙ্গে জীবনের শেষ বেলায় কবি ঠাট্টা পরিহাসই করিয়া গিয়াছেন। চিত্তের গভীরে তাহারা স্থান লাভ করিতে পারে নাই; সেখানে 'মালবিকা'দের একচ্ছত্র রাজত্ব।

"নবজাতক"-গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৩৪৭'র বৈশাখে। গ্রন্থের সূচনায় কবিকে বলিতে শুনিতেছি,.

> "আমার কাব্যের ঋতু পরিবর্তন ঘটেছে বারে বারে। প্রায়ই সেটা ঘটে নিজের অলক্ষ্যে। * * * কাব্যে এই যে হাওয়া বদল থেকে সৃষ্টিবদল এ তো স্বাভাবিক, এমনি স্বাভাবিক যে এর কাজ হোতে থাকে অন্যমনে। কবির এ সম্বন্ধে খেয়াল থাকে না। বাহিরে থেকে সমজদারের কাছে এর প্রবণতা ধরা পড়ে। * * * হয়তো * * * এরা বসন্তের ফুল নয়, এরা হয়তো প্রৌঢ় ঋতুর ফসল, বাইরে থেকে মন ভোলাবার দিকে এদের ঔদাসীন্য। ভিতরের দিকের মননজাত অভিজ্ঞতা এদের পেয়ে বসেছে। তাই যদি না হবে তাহলে তো ব্যর্থ হবে পরিণত বয়সের প্রেরণা। * * *"

কবি-জীবনের শেষ অধ্যায়ে এই ঋতু পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছিল "পুনশ্চ-শেষসপ্তক" হইতেই, একথা আমি আগেই বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। "নবজাতক" নাম দিয়া যে নূতন ঋতুকে বা নূতন আপনাকে কবি চিহ্নিত করিলেন, সেই ঋতুর বা নূতন মানুষের লক্ষণ হইল এক নূতন সমাজ-

চেতনা, বৃহত্তর জন-মানস সম্বন্ধে চেতনা, ইতিহাস-চেতনা এবং এই চেতনার সাহায্যে কাব্যে বস্তুর বাস্তব অনুভূতির সঞ্চার। এই সব লক্ষণের সূচনা "পুনশ্চ" হইতেই ধীরে ধীরে দেখা যাইতেছিল, এবং পদ্যরীতির প্রবর্তনার মধ্যেই তাহা কতকটা ধরা পড়িয়াছিল। অন্তরের মধ্যে তাহাদের বিবর্তনও চলিতেছিল ধীরে ধীরে; ইতিপূর্বেই সে-পরিচয় নানা কবিতায় পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু কবিচিত্তে এই বাস্তব-বোধের প্রকৃতি একটু নূতন রকমের। বাস্তব বলিতে আমরা যাহা বুঝি রবীন্দ্র-কবিচিত্তে বাস্তব সেই সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ অর্থ বহন করে না। সে-বাস্তব কবির নিজের সৃষ্টি; তাহাদের 'অনেকটা মায়া অনেকটা ছায়া,'

আমারে শুধাও যবে এরে কভু বলে বাস্তবিক ?
আমি বলি কখনো না, আমি রোম্যাণ্টিক।
যেথা ঐ বাস্তব জগৎ
সেখানে আনাগোনার পথ
আছে মোর চেনা।
সেথাকার দেনা
শোধ করি, সে নহে কথায় তাহা জানি
তাহার আহ্বান আমি মানি।
দৈন্য সেথা, ব্যাধি সেথা, সেথায় কুশ্রীতা
সেথায় রমণী দস্যুভীতা,
সেথায় উত্তরী ফেলি পরি বর্ম,
সেথায় নির্মম কর্ম,
সেথা ত্যাগ, সেথা দুঃখ, সেথা ভেরি বাজুক 'মাভৈঃ'
শৌখিন বাস্তব যেন সেথা নাহি হই
সেথায় সুন্দর যেন ভৈরবের সাথে
চলে হাতে-হাতে। ('রোম্যাণ্টিক')

সত্যই, যেখানে দুঃখ ও বেদনা, যেখানে অত্যাচার-অবিচার, যেখানে মানবতার অপমান, যেখানে হিংসা ও পরপীড়ন সেখানে কবি কবি-হিসাবে বাস্তবের আহ্বান স্বীকার করিতে এতটুকু দ্বিধা করেন নাই, এবং সেখানে বস্তুর যথার্থ স্বরূপও তিনি নিজস্ব র‍্যোমান্টিক কল্পনায় আচ্ছন্ন করেন নাই, বরং যথার্থ সমাজ ও ইতিহাসগত চেতনায় তাহাকে উদ্‌ঘাটিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। "নবজাতক"-গ্রন্থের অনেকগুলি কবিতায় তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। কিন্তু অনুভূতি যেখানে একান্ত ব্যক্তিগত, বস্তু যেখানে একান্তভাবে ব্যক্তিসত্তার মধ্যেই বাস্তব, ব্যক্তিগত হৃদয় ও কল্পনাবৃত্তির লীলার মধ্যেই যেখানে বস্তুর স্বরূপ একান্ত ভাবে দৃষ্টি ও ভাবগোচর হয়, সেখানে কবি রোম্যান্টিক হইতে এতটুকু দ্বিধা করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের মনন ও কল্পনার প্রকৃতিই এইরূপ। "নব-জাতকে" তাহারও প্রমাণ মিলিবে।

প্রথমেই চোখে পড়ে "নবজাতকে"র কবিতাগুলির নিরলংকার বিরলসৌষ্ঠব স্বল্পভাষিতা। এই স্বল্পভাষিতার সূত্রপাত "পরিশেষ" গ্রন্থ হইতেই, কিন্তু তাহার পরেও কবি মাঝে মাঝে বাণীবন্যার উচ্ছ্বসিত স্রোতে নিজেকে ভাসাইয়া দিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই, প্রমাণ "পত্রপুট"। কিন্তু "নবজাতক" হইতেই সৃষ্টিলাভ করিল সেই নিরংলকার স্বল্পভাষিতা যাহা ক্রমশ সমস্ত রূপকালংকার, বাহুল্য কল্পনার মায়াজাল একে একে মুক্ত করিয়া শুধু বক্তব্য বিষয়ের উপরই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবে; স্বচ্ছ সুস্পষ্ট অর্থই হইবে তাহার ভিত্তি।

দৃষ্টিভঙ্গির যে নূতনত্বের জন্য "নবজাতক" নাম সার্থক, তাহা প্রথমেই ধরা পড়িবে বিষয়বস্তুর মধ্যে। এমন সব বিষয়ের আশ্রয়ে কবি নিজের মনন-কল্পনাকে বিস্তৃত করিয়াছেন যে-বিষয়গুলিই একান্ত ভাবে বর্তমান যুগের—রেলগাড়ি, এরোপ্লেন, রেডিও। শুধু তাহাই নয়, যে সব উপমা কবির কল্পনায় ভিড় করিয়া আসিয়াছে, তাহার মধ্যে

অনেকগুলি একান্তভাবে আধুনিক যুগের, এবং সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি আমাদের অতি পরিচিত দৈনন্দিন জীবনেরও ;

এ প্রাণ, রাতের রেলগাড়ি
দিল পাড়ি,
কামরায় গাড়িভরা ঘুম
রজনী নিঝুম। ('রাতের গাড়ি')

রাত্রির অন্ধকারে দ্রুত ধাবমান রেলগাড়ির উপমাকে আশ্রয় করিয়া ব্যক্তিগত প্রাণের অন্ধযাত্রার কল্পনা প্রসারিত হইয়াছে। অন্যত্র, সংসারের 'চলাফেরার ধারা'র চল্‌তি ছবি দেখার কল্পনা বিস্তৃত হইয়াছে ইস্টেশনে রেলগাড়ির আসা-যাওয়াকে আশ্রয় করিয়া :

সকাল বিকাল ইস্টেশনে আসি,
চেয়ে চেয়ে দেখতে ভালোবাসি।
ব্যস্ত হয়ে ওরা টিকিট কেনে,
ভাঁটির ট্রেনে কেউ বা চড়ে
কেউ বা উজান ট্রেনে। ('ইস্টেশন')

রেলগাড়ির যাত্রা শুরুর ধ্বনি ও ছন্দ রূপটিও ফাঁকে ফাঁকে সুন্দর ধরা পড়িয়াছে এই কবিতাটিতে। এরোপ্লেনের উপর ত কবিতাই আছে, কিন্তু তাহার প্রতি কবির চিত্ত প্রসন্ন নয় ; বিজ্ঞানের এই নবাবিষ্কারের মধ্যে কবি শুধু শক্তির অভিমানই দেখিয়াছেন, অশান্ত স্পর্ধাই দেখিয়াছেন,

ঈর্ষা হিংসা জ্বালি মৃত্যুর শিখা
আকাশে আকাশে বিরাট বিনাশে
জাগাইল বিভীষিকা।

অথচ এই বিভীষিকা যে বর্তমান রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থারই সৃষ্টি, সেকথা কবির মনে পড়ে নাই। তিনি কামনা করিতেছেন, এই এরোপ্লেন যে

কলুষিত ইতিহাসের প্রতীক সে-ইতিহাস বিলুপ্ত হইয়া যাক্, এই আর্ত ধরায় 'শ্যামবন বীথি পাখিদের গীতি' আবার সার্থক হউক। যদিও এ-দৃষ্টি ঠিক আধুনিক নবজাতকের দৃষ্টি নয়, তবু একথা সত্য যে বর্তমান সভ্যতার পাপের ও ধ্বংসের যে রক্তলিপ্ত রূপ তাহার উপর কবির ক্রুদ্ধ অভিশাপ বারেবারে অগ্নিনিঃশ্বাসে উচ্চারিত হইয়াছে। বর্তমান সভ্যতার মূলে যে ঘুণ ধরিয়াছে, এই ধনতান্ত্রিক সভ্যতা যে মানবতাকে প্রতিমূহূর্তে লাঞ্ছিত ও বিপর্যস্ত করিতেছে, এ সম্বন্ধে চেতনা কবিচিত্তে আগেই জাগিয়াছিল, "প্রান্তিকে"ই সে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে—"নবজাতকে" এই ঐতিহাসিক সচেতনতা আরও গভীর হইয়াছে। কবি এই সভ্যতার ধ্বংসই কামনা করেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বিশ্বাস করেন যে সেই ধ্বংসের ভিতর হইতেই 'নূতন আলোক নূতন জীবন' সৃষ্টিলাভ করিবে। বর্তমানের ধ্বংস কামনা ও নূতন সৃষ্টিতে বিশ্বাস কবিতার পর কবিতায় বারবার ধ্বনিত হইয়াছে। এই সভ্যতার প্রকৃতি এবং অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব সম্বন্ধেও তিনি সচেতন।

> ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের
> নিদারুণ সংঘাতে
> ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন,
> সভ্যনামিক পাতালে যেথায়
> জমেছে লুটের ধন।
>
> * * *
>
> প্রতাপের ভোজে আপনারে যারা বলি করেছিল দান
> সে দুর্বলের দলিত পিষ্ট প্রাণ
> নরমাংসাশী করিতেছে কাড়াকাড়ি
> ছিন্ন করিছে নাড়ী।
> তীক্ষ্ণ দশনে টানা ছেঁড়া তারি দিকে দিকে যায় ব্যেপে
> রক্তপঙ্কে ধরার অঙ্ক লেপে।

সেই বিনাশের প্রচণ্ড মহাবেগে
একদিন শেষে বিপুল বীর্য শান্তি উঠিবে জেগে।
মিছে করিস না ভয়,
ক্ষোভ জেগেছিল তাহারে করিব জয়।
জমা হয়েছিল আরামের লোভে
দুর্বলতার রাশি।
লাগুক তাহাতে লাগুক আগুন
ভস্মে ফেলুক গ্রাসি।
* * *
ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত
পূর্ণ করিয়া শেষে
নূতন জীবন নূতন আলোকে
জাগিবে নূতন দেশে। ('প্রায়শ্চিত্ত')

এই সভ্যতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে 'বুদ্ধভক্তি' এবং 'আহ্বান' কবিতায়ও, এবং ভবিষ্যতে বিশ্বাস 'আহ্বান', 'নবজাতক' এবং কতকটা 'জয়ধ্বনি' কবিতায় স্বপ্রকাশ। 'নবজাতক' কবিতায়

নবীন আগন্তুক,
নবযুগ তব যাত্রার পথে
চেয়ে আছে উৎসুক।
* * *
তরুণ বীরের তূণে
কোন্ মহাস্ত্র বেঁধেছ কটির 'পরে
অমঙ্গলের সাথে সংগ্রামের তরে।
রক্তপ্লাবনে পঙ্কিল পথে
বিদ্বেষে বিচ্ছেদে
হয়তো রচিবে মিলন-তীর্থ
শান্তির বাঁধ বেঁধে।
* * *

মানবের শিশু বার বার আনে
চির আশ্বাসবাণী
নূতন প্রভাতে মুক্তির আলো
বুঝিবা দিতেছে আনি।

এই বিশ্বাসই, ভবিষ্যতের এই মুক্তির আলোতে প্রাণের চরিতার্থতায় বিশ্বাসই শেষ অধ্যায়ের কবিচিত্তকে বিক্ষোভ সংগ্রামের মধ্যেও জাগ্রত ও সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিক-চেতনার শ্রেষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়, 'হিন্দুস্থান' ও রাজপুতানা' কবিতা দু'টিতে। কবিত্ব হিসাবে অধিকতর সমৃদ্ধ 'হিন্দুস্থান' কবিতাটি, কিন্তু 'রাজপুতানা'র ইতিহাস-চেতনা সমৃদ্ধতর। রাজপুতানার বর্তমান রূপ ইতিহাসের নাট্যমঞ্চে ব্যঙ্গরূপ; নিরর্থক, অনৈতিহাসিক, অসার্থক রূপ।

তাই ভাবি হে রাজপুতানা
কেন তুমি মানিলেনা যথাকালে প্রলয়ের মানা,
লভিলে না বিনষ্টির শেষ স্বর্গলোক;
জনতার চোখ
দীপ্তিহীন
কৌতুকের দৃষ্টিপাতে পলে পলে করে যে মলিন।
শংকরের তৃতীয় নয়ন হতে
সম্মান নিলে না কেন যুগান্তের বহ্নির আলোতে।

কতগুলি কবিতা ব্যক্তিগত জীবনের বিশ্লেষণ ও হিসাব-নিকাশের ভাবানুভূতিতে দীপ্ত। 'শেষদৃষ্টি', 'ভাগ্যরাজ্য' 'এপারে-ওপারে', 'জবাবদিহি', 'জন্মদিন', 'রোম্যাণ্টিক', 'অবর্জিত', 'শেষ 'হিসাব', 'শেষবেলা', 'রূপ-বিরূপ' এবং 'শেষ কথা' এই পর্যায়ের। কবির অতি পরিচিত অনুভূতিগুলির সঙ্গে সাক্ষাৎ এই কবিতাগুলিতে মি াতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখিতেছি, কবির নিজের জীবনের

অপূর্ণতা বারবার তাহাকে পীড়িত করিতেছে। পূর্বেও "শেষসপ্তকে" ও "পত্রপুটে" তাহা ব্যক্ত হইয়াছে; "নবজাতকে"ও দেখিতেছি একাধিক কবিতায় অসম্পূর্ণতার বেদনায় কবিচিত্ত উৎপীড়িত, কবি নিজেই সেই অসম্পূর্ণতার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিতেছেন। কবি নিজে জানেন, তিনি 'রোম্যাণ্টিক', তাঁহার চিত্তধর্মের প্রকৃতিই এইরূপ যে সে জীবনের তথ্য ফেলিয়া রাখিয়া নিঃসঙ্গ মনে জীবনের তত্ত্ব খুঁজিয়া বেড়ায়।

ভাবি এই কথা—
ওইখানে ঘনীভূত জনতার বিচিত্র ভুচ্ছতা
এলোমেলো আঘাতে সংঘাতে
নানা শব্দ নানা রূপ জাগিয়ে তুলেছি দিনেরাতে।

* * *

তারি ধাক্কা পেয়ে মন
ক্ষণেক্ষণ
ব্যগ্র হয়ে উঠে জাগি
সর্বব্যাপী সামান্যের সচল স্পর্শের লাগি।
আপনার উচ্চতট হতে
নামিতে পারে না সে যে সমস্তের ঘোলা গঙ্গাস্রোতে।

('এপারে-ওপারে')

অথচ তাহার বেদনাও ত এড়াইতে পারেন না। শিশুকাল হইতে আরম্ভ করিয়া পরিণত বার্ধক্য পর্যন্ত অনেক অজ্ঞাত রহস্য অনেক দুর্বোধ্য বাণী

কাব্যের ভাণ্ডারে আনি
স্মৃতিলেখা ছন্দে রাখিয়াছি ঢাকি,
আজ দেখি অনেক রয়েছে বাকি।
সুকুমারী লেখনীর লজ্জা ভয়

যা পরুষ যা নিষ্ঠুর উৎকট যা করেনি সঞ্চয়
আপনার চিত্রশালে
তার সংগীতের তালে
ছন্দোভঙ্গ হলো তাই
সংকোচে সে কেন বোঝে নাই। ('রূপ-বিরূপ')

কবি আজ তাই প্রার্থনা করিতেছেন, বাণীর সম্মোহবন্ধ ছিন্ন হউক,

তাই আজ বেদমন্ত্রে হে বজ্রী, তোমার করি স্তব,
তব মন্ত্ররব
করুক ঐশ্বর্যদান,
রৌদ্রী রাগিণীর দীক্ষা নিয়ে যাক মোর শেষগান,
আকাশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
রূঢ় পৌরুষের ছন্দে
জাগুক হুংকার,
বাণী-বিলাসীর কানে ব্যক্ত হোক ভর্ৎসনা তোমার। ('রূপ-বিরূপ')

অন্য কতকগুলি কবিতায় কালের অতীত জ্ঞানের অতীত যে-রহস্য-লোক,অগ্রসরমান মৃত্যুর যে-কল্পনা, অথবা রূপের যে অলক্ষ্য স্পর্শ বহুকাল কবিচিত্তকে দোলা দিয়াছে, তাহার দীপ্তি সুস্পষ্ট। এ-ধরনের ভাবানুভূতি ও মনন-কল্পনার সঙ্গে আমরা সুপরিচিত বলিয়া সে-কবিতাগুলির আর উল্লেখ করিতেছি না। এই ভাবানুভূতি ও মনন-কল্পনা কোথাও কোথাও ব্যক্তিজীবনের প্রেক্ষাপটে, স্মৃতির ম্লান সৌরভে আরও রস-নিবিড়, জীবনের অসম্পূর্ণতার বেদনায় আরও করুণ হইয়া উঠিয়াছে।

"সানাই" সার্থকতর কাব্য। গীতিকাব্য হিসাবে যে শুধু "নবজাতক" অপেক্ষাই "সানাই" মধুরতর, তাহা নয় ; এই পর্বের সমস্ত কাব্যের মধ্যে বোধ হয় "সানাই"ই শ্রেষ্ঠ—শ্রেষ্ঠ সুরে ও গীতিময়তায়,ভাবমাধুর্যে ও কল্প-মায়ায়, পুরাতন মধুর প্রেমের নূতন আস্বাদনে, নিসর্গের কান্ত মধুর রূপের

সুকুমার সম্ভোগে। "পূরবী"র সেই স্মৃতিময় সুকোমল প্রেমের কিছু সুর কিছু আবেশ বহুদিন পর "সানাই"র অধিকাংশ কবিতায় যেন নূতন করিয়া ধরা পড়িল; অধিকাংশ কবিতাই সেই সুদূরবর্তিনী লীলা-সঙ্গিনীর স্মৃতির আবেশে আবিষ্ট; কৈশোর-যৌবনের প্রেম ও সম্ভোগ স্মৃতির নির্যাসে সুরভিত হইয়া এই কবিতাগুলিতে একটি মৃদু ও সুকুমার তন্দ্রাজড়িত মায়ামোহের সৃষ্টি করিয়াছে। বহুদিন পর যেন এই ধরনের ভাবমণ্ডলের মধ্যে আবার রবীন্দ্রনাথকে দেখিলাম। এ যেন পুরাতন রং আবার নূতন করিয়া লাগিল জীবনে,

এ ধূসর জীবনের গোধূলি
ক্ষীণ তার উদাসীন স্মৃতি
মুছে আসা সেই ম্লান ছবিতে
রং দেয় গুঞ্জন গীতি।

*   *   *

এই ছবি ভৈরবী আলাপে
দোলে মোর কম্পিত বক্ষে,
সেই ছবি সেতারের প্রলাপে
মরীচিকা এনে দেয় চক্ষে;
বুকের লালিম-রঙে রাঙানো
সেই ছবি স্বপ্নের অতিথি। ('নতুন রঙ')

এই নূতন রঙের পরিচয় স্বপ্নের অতিথি সেই সব ছবি "সানাই"র অসংখ্য কবিতায়।

বেলা হয়ে গেল তোমার জানালা 'পরে
রৌদ্র পড়েছে বেঁকে।
এলোমেলো হাওয়া আমলকি ডালে ডালে
দোলা দেয় থেকে থেকে।

*   *   *

যারা আসে যায় তাদের ছায়ায়
প্রবাসের ব্যথা কাঁপে,
আমার চক্ষু তন্দ্রাঅলস
মধ্যদিনের তাপে।
ঘাসের উপরে একা বসে থাকি
দেখি চেয়ে দূর থেকে
শীতের বেলার রৌদ্র তোমার
জানালায় পড়ে বেঁকে ॥
('জানালায়')

অথবা

জেলে দিয়ে যাও সন্ধ্যাপ্রদীপ
বিজন ঘরের কোণে।
নামিল শ্রাবণ, কালো ছায়া তার
ঘনাইল বনে বনে।

* * *

দুয়ার বাহির হতে আজি ক্ষণে ক্ষণে
তব কবরীর করবী মালার বারতা আসুক মনে।
বাতায়ন হতে উৎসুক দুই আঁখি
তব মঞ্জীর-ধ্বনি পথ বেয়ে
তোমারে কি যায় ডাকি।
কম্পিত এই মোর বক্ষের ব্যথা
অলকে তোমার আনে কি চঞ্চলতা
বকুল বনের মুখরিত সমীরণে ॥ ('আহ্বান')

বহুদিন পর যেন রবীন্দ্র-কাব্যে এই ধরনের সুর শুনিলাম। কোথাও কোথাও এই সুরের সঙ্গে মিশিয়াছে 'স্মৃতির রেশ, কোথাও কোথাও জীবনের দিনগুলি যে শেষ হইয়া আসিতেছে তাহারই বেদনা, তাহারই ব্যথিত ঔদাসীন্য। আবার কোথাও কোথাও জীবনের সার্থকতা অসার্থক-

তার আনন্দবেদনার অঞ্জলি। যাহাই হউক "সানাই"র প্রায় সব কবিতাতেই স্বল্পস্তিমিত ভাষণের মধ্য দিয়া উদাস করুণ পূরবীর সুরটি ধরা পড়ে। ঐখানেই ইহাদের মাধুর্য। আখ্যানমূলক দু'তিনটি সার্থক কবিতাও আছে; সেগুলিও কতকটা এই সুরে বাঁধা। "প্রান্তিকে"র প্রত্যক্ষ মৃত্যু-ভাবনা দূরে চলিয়া গিয়াছে; সৃষ্টি ও জীবন, মৃত্যু ও নিয়তির গভীর রহস্য অনুসন্ধানের প্রয়োজন কবি অনুভব করিতেছেন না, ব্যক্তি-গত জীবনের তথ্য ও তত্ত্ব বিশ্লেষণেও মন ও কল্পনা প্রসারিত হইতেছে না; সমাজ এবং ইতিহাসের চেতনাও বোধ-বুদ্ধিতে পীড়িত করিতেছে না; বাহিরের সংস্পর্শে মননজাত অভিজ্ঞতা আবর্তিত হইতেছে না; চিত্ত এখন অতীতের মধুর স্মৃতিতে সঞ্চরমান, একটি ব্যথিত ঔদাসীন্যে ভরপুর। "পরিশেষে" যে মনন-কল্পনার জীবন আরম্ভ হইয়াছিল বহু আবর্তন পরিবর্তনের পর সে-জীবন যেন আবার নিজস্ব ভাবকেন্দ্রে স্থিতিলাভ করিতেছে।

কিন্তু একান্ত ভাবে স্থিতিলাভ করা আর কি সম্ভব; সেই প্রাচীন দিনের পুরাতন ভাবকল্পনা কি আর উদাস করুণ একটি সুরে গাঁথিয়া তোলা সম্ভব। কবির মনন-কল্পনায় যে নূতন দিনের স্পর্শ লাগিয়াছে, নূতন চেতনায় যে কবিচিত্ত ইতিমধ্যেই উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, তাহার সুর ও তাল যে অন্য জগতের। সেই সুর ও তাল পুরাতন সুর ও তালকে যে মাঝে মাঝে বেসুর বেতাল করিয়া দেয়, জীবনবীণা ত একসুরে এক-তালে বাজিবার উপায় আর নাই! সানাইর সুরে যে ডমরুর ধ্বনি বাজিয়া প্রেম ও অতীত-স্মৃতির মাধুর্যকে হঠাৎ বিদীর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়! সূর্যাস্তের পথ হইতে বৈকালের রোদ্র নামিয়া গিয়াছে, বাতাস ঝিমাইয়া পড়িয়াছে; বাংলার সুদূর গ্রামের জনশূন্য মাঠে খিচালি বোঝাই গরুর গাড়ি মন্থর গতিতে চলিয়াছে, পিছনে দড়ি বাঁধা বাছুর। পুকুরের ধারে বনমালি পণ্ডিতের ছেলে সারাদিন ছিপ ফেলিয়া

বসিয়া। শুক্‌নো নদীর চর হইতে বুনো এক ঝাঁক হাঁস মাথার উপর দিয়া কাজলা বিলের দিকে চলিয়া গেল গুগলির সন্ধানে। ছুটিতে দুই বন্ধু গ্রামে আসিয়াছে; কাটা আকের ক্ষেতের পাশ দিয়া, বৃষ্টি ধোওয়া ভিজা ঘাসের উপর দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে দুই বন্ধু প্রেমের গল্পে মশগুল।

নব বিবাহিত একজনা,
শেষ হোতে নাহি চায় ভরা আনন্দের আলোচনা।
আশে পাশে ভাঁটি ফুল ফুটিয়া রয়েছে দলে দলে
বাঁকা চোরা গলির জঙ্গলে,
মৃদুগন্ধে দেয় আনি
চৈত্রের ছড়ানো নেশাখানি।
জারুলের শাখার অদূরে
কোকিল ভাঙিচে গলা একঘেয়ে প্রলাপের সুরে।

টেলিগ্রাম এল সেই ক্ষণে
ফিন্‌ল্যাণ্ড চূর্ণ হোলো সোভিয়েট বোমার বর্ষণে॥ ('অপঘাত')।

এই রবীন্দ্রনাথ নূতন রবীন্দ্রনাথ, শেষ অধ্যায়ের রবীন্দ্রনাথ। এই চেতনা নূতন কালের চেতনা। আমাদের ভাব-কল্পনার স্বপ্ন, ছায়া, মায়া, প্রেমের ও স্মৃতির স্বপ্ন, ছায়া, মায়া আগে ভাঙ্গিত না, এখন বারে বারে ভাঙ্গিয়া টুটিয়া যায়। আগে আমরা আত্মরত আত্মলীন কল্পনায় ডুবিয়া থাকিতাম, বোমার বর্ষণ বজ্রের গর্জন আমাদের দুর্ভেদ্য কল্পনার প্রাচীর ভাঙ্গিতে পারিত না, এখন পারে। ভাল মন্দ'র কথা নয়, যাহা হয় তাহারই উল্লেখ করিতেছি। বস্তু-পৃথিবীর চেতনা আমাদের আত্মরত কল্পনাকে শিথিল করিয়াছে, রবীন্দ্রনাথেরও করিয়াছে; নহিলে সোভিয়েট বোমার বর্ষণে ফিন্‌ল্যাণ্ডের ভস্মভূতি

বাংলা দেশের একপ্রান্তে চৈত্রের ছড়ান নেশাকে এক নিমেষে চূর্ণ করিয়া দিত না।

কিন্তু "সানাই"-গ্রন্থে এই ধরনের ভাবানুভূতি, এই নূতন চেতনার পরিচয় অত্যন্ত কম; সে পরিচয় আছে পূর্বালোচিত গ্রন্থগুলিতে—"নবজাতকে", "পুনশ্চ-শেষসপ্তক-পত্রপুটে", "পরিশেষে"। তবু, এই চেতনাকে বাহিরে রাখিয়া, ইহাকে পাশ কাটাইয়া পূর্বপরিচিত রবীন্দ্রনাথকে, রবীন্দ্রনাথের পুরাতন ভাবকল্পনার প্রকৃতিটিকে যে "সানাই"-গ্রন্থে নূতন করিয়া দেখিলাম, পুরাতন সুরটি শুনিলাম, এবং শেষ বারের জন্য দেখিলাম ও শুনিলাম, পাঠকের এ মহাভাগ্য। জীবন যে ছন্দভাঙ্গা অসংগতিতে পূর্ণ, সুর ও তালের মধ্যে যে অহরহ বেসুর বেতাল বাজিয়া ধ্বনিয়া উঠে, নিকটের, অর্থাৎ চোখের সম্মুখের স্পর্শমান দৃশ্যমান বস্তুজীবনের দুঃখদ্বন্দ্ব ও অপূর্ণতা যে দূরের নিরবধি প্রবহমাণ কালের সমগ্রতার ঐক্য ও সংগতিকে আড়াল করিয়া রাখে, একথা কবি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় জানিয়াছেন; নূতন কাল যে এই রূপ ও বিরূপকে চেতনার মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে তাহাও কবি জানেন, বরং দৃশ্যমান স্পর্শমান বস্তু-পৃথিবীকেই প্রাধান্য দিয়াছে তাহাও জানেন। কিন্তু কবির সমগ্র জীবনের সাধনা ত সুরের, ছন্দের, তালের, ঐক্যের ও সংগতির, পূর্ণতার ও সমগ্রতার। ইহাই রবীন্দ্রনাথের ভাবকল্পনার প্রকৃতি, এবং "সানাই"-গ্রন্থে আর একবার তিনি সেই প্রকৃতিটি উদ্‌ঘাটিত করিলেন। 'সানাই' কবিতাটিই দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখা যাইতে পারে।

> সমস্ত এ ছন্দভাঙা অসংগতি মাঝে
> সানাই লাগায় তার সারঙের তান।
> কী নিবিড় ঐক্যমন্ত্র করিছে সে দান
> কোন্ উদ্‌ভ্রান্তের কাছে,
> বুঝিবার সময় কি আছে।

অরূপের মর্ম হতে সমুচ্ছ্বাসি
উৎসবের মধুচ্ছন্দ বিস্তারিছে বাঁশি।
সন্ধ্যাতারা-জ্বালা অন্ধকারে
অনন্তের বিরাট পরশ যথা অন্তর মাঝারে,
তেমনি সুদূর স্বচ্ছ সুর
গভীর মধুর
অমর্ত্যলোকের কোন বাক্যের অতীত সত্যবাণী
অন্যমনা ধরণীর কানে দেয় আনি

*   *   *

তারি স্পর্শ লেগে
সাহানার রাগিণীতে বৈরাগিণী ওঠে যেন জেগে,
চলে যায় পথহারা অর্থহারা দিগন্তের পানে।

*   *   *

এ রাগিণী সেথা হতে আপন ছন্দের পিছু পিছু
নিয়ে আসে বস্তুর অতীত কিছু
হেন ইন্দ্রজাল
যার সুর যার তাল
রূপে রূপে পূর্ণ হয়ে উঠে।
কালের অঞ্জলিপুটে।
প্রথম যুগের সেই ধ্বনি
শিরায় শিরায় উঠে রণরণি,
মনে ভাবি এই সুর প্রভাতের অবরোধ পরে
যতবার গভীর আঘাত করে
ততবার ধীরে ধীরে কিছু কিছু খুলে দিয়ে যায়
ভাবী যুগ-আরম্ভের অজানা পর্যায়।

নিকটের দুঃখদ্বন্দ্ব, নিকটের অপূর্ণতা তাই
সব ভুলে যাই,
মন যেন ফিরে
সেই অলক্ষ্যের তীরে তীরে
যেথাকার রাত্রিদিন দিনহারা রাতে
পদ্মের কোরক সম প্রচ্ছন্ন রয়েছে আপনাতে ॥

(১৪)

রোগশয্যায় (১৩৪৭)
আরোগ্য (১৩৪৭)
জন্মদিনে (১৩৪৮)
শেষলেখা (১৩৪৮)

"প্রান্তিকে" একবার কবি মৃত্যুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে বাণীরূপ দান করিয়াছেন। সেই মৃত্যুস্নান কবিকে এক নূতন জীবনে জন্মদান করিয়াছিল; নানা অভিজ্ঞতায় জীবন আবার আপনার নূতন সহজ রূপ লাভ করিতেছিল, তিনি যে বার বার নবজাতক, এই কথাই তাঁহার বিচিত্র রচনার মধ্যে ব্যক্ত হইতেছিল। নানা বিচিত্র সাধনায় বার্ধক্যের দিনগুলি কাটিতেছিল, এবং নূতন কাল ও নূতন জীবনকে কবি ক্রমশ পুরাতন জীবনের ভাবকল্পনার মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় করিয়া এক সমগ্রতায় গাঁথিয়া তুলিতেছিলেন। এমন সময় এক বিশ্রামের অবকাশ কবি কাটাইতেছিলেন হিমালয়ের কোলে। মনের মধ্যে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ভিড়; তাহাদেরই সঙ্গে চলিতেছিল গল্প সল্প; একদিন গল্প বলা শেষ হইল;

তারপরে বরাবরকার অভ্যাস মতো শোবার ঘরের কেদারায় গিয়ে বসলুম। বাদলার হাওয়া বইছিল। বৃষ্টি হবে হবে করছে। সুধাকান্ত [কবির পার্শ্বসঙ্গী] দেখতে এলেন দরজা জানালা ঠিকমতো বন্ধ আছে কিনা। এসে দেখলেন

আমি কেদারায় বসে আছি। ডাকলেন, কোনো উত্তর নেই। স্পর্শ করে বললেন ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, চলুন বিছানায়। কোনো সাড়া নেই। তারপর চৌষোট্টি ঘণ্টা কাটলো অচেতনে। ("গল্পসল্প", ৬৭-৬৮ পৃঃ)

সেই অবস্থায় কবিকে নামাইয়া আনা হইল কলিকাতায়; কয়েকটি দিন কাটিল জীবনমরণের সন্ধিস্থলে, মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি হইল পরিচয়, তারপর চেতনা যখন ফিরিয়া আসিল কবি তখন নূতন মানুষ। আর একবার নবজন্মলাভ তাঁহার ঘটিল; 'দেশহীন কালহীন আদি জ্যোতির' ধ্যানে তখন তাঁহার দৃষ্টি হইল তন্ময়। তাহার পর করাঙ্গুলের গণনায় যে ক'টি মাস কবি প্রাণাধিক প্রিয় এই মাটির পৃথিবীতে বাঁচিয়া ছিলেন, সে ক'টি মাস মৃত্যুর সঙ্গে যুঝিয়া, মৃত্যুর দ্রুত অগ্রসরমান পদধ্বনি শুনিয়া শুনিয়া, দেহদুঃখ-হোমানলে পুড়িয়া পুড়িয়াই কাটিয়াছে। মৃত্যুর অস্পষ্ট ছায়া যত নিকটে আসিয়াছে দেহগত দুঃখ-তপস্যা জীবনকে তত বেশি জ্যোতিষ্মান তত বেশি দীপ্তিমান করিয়াছে, ততই কবি প্রাণকে বেশি করিয়া আঁকড়িয়া ধরিয়াছেন এবং প্রাণশিল্পী কবি তপস্যার আনন্দকে মানবের অপরাজেয় শক্তি ও মহিমাকে, জাগ্রত জীবনকে বেশি করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

এই শুভ্র পরিণত বার্ধক্যের মৃত্যুধৃত জীবনের স্বচ্ছ শুভ্র জ্যোতির মধ্যে শেষ কয়েকটি মাসে কবি যে-চারিটি কাব্য রচনা করিয়াছেন, সমস্ত মানবসংসার সেই কাব্যের আশ্রয়, এখানে সকলেরই জায়গা আছে, কাহারও জন্য কোনও বিধিনিষেধ নাই। বৃহৎ মানব ও প্রকৃতির সংসার, বৃহৎ সেই সংসারে চলিয়াছে প্রাণের বিচিত্র লীলা। অতীত ও বর্তমান, কৃষক ও কারখানার শ্রমিক, যুদ্ধের গর্জন ও তপস্যার শান্তি, মানবিক কোলাহল ও অপার্থিব স্তব্ধতা, বৃদ্ধ বনস্পতি ও তুচ্ছ ভুট্টার ক্ষেত, মৃত্যু ও জীবন, অচেতন অত্যাচার ও যন্ত্রণার শক্তি, ভজিয়ার যাঁতা ঘুরান এবং অশ্বত্থ তলায় খেয়াঘাটে লোক পারাপার,

গুড়ের কলসি ও পাটের বস্তা কিছুই এ সংসার হইতে বাদ পড়ে নাই। এই বিচিত্র চলমান প্রাণলীলার মধ্যে বাঁচিয়া আছি, কবির কাছে আজ এই কথাটির মূল্যই সবচেয়ে বেশি। "রোগশয্যায়", "আরোগ্য", "জন্মদিনে" সর্বত্র এই অস্তিত্বের মাধুর্যই স্বচ্ছ দৃষ্টিতে সূক্ষ্মতম ধ্বনিতে ধরা পড়িল। কতবার যে বলিলেন, এই প্রাণ-লীলার মধ্যে বাঁচিয়া থাকিয়াই আমি ধন্য আমি আনন্দিত; এবং এই কথা এক এক সময় মিশিয়া গিয়াছে উপনিষদের ঋষি কবির শ্লোকের সঙ্গে। সত্তার আনন্দময় আকৃতি একেবারে যেন দ্রষ্টা ঋষিদের আনন্দস্তর স্পর্শ করিয়াছে। কিন্তু কবির আনন্দ দেখার আনন্দ, তাঁহার বাণীও দেখারই বাণী। এই দেখাই কবির ধ্যান। এবং সেই ধ্যানের দৃষ্টিই সমগ্র সংসারের সমস্ত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জীবনদৃশ্যের উপর প্রসারিত হইয়া আছে। এই ধ্যানের দৃষ্টি শুভ্র স্বচ্ছ; সেই শুভ্র স্বচ্ছ দৃষ্টির তলে জাগিয়া আছে মানব-সংসার, মাটির ঘর আর সেই মাটির মানুষ। সেই ঘর আর সেই মানুষের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কবির তৃপ্তির শেষ নাই, বিস্ময়ের অবধি নাই, আনন্দ ও বেদনার সীমা নাই। বিরল অলংকারে, স্বল্পতম ভাষণে দেখার একটি সর্বব্যাপী আকাশ যেন এই চারিটি কাব্যের ভিতরে বাহিরে বিস্তৃত হইয়া আছে। শেষ অধ্যায়ের শেষতম এই কাব্যমণ্ডলটি যেন একেবারেই বাক্য ও চিন্তার অতীত, যেন একেবারে অবাঙ্‌মানসগোচর, গোচর শুধু দৃষ্টির।

"রোগশয্যায়" প্রকাশিত হয় ১৩৪৭'র পৌষ মাসে। ৩০ অক্টোবর হইতে আরম্ভ করিয়া ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত জোড়াসাঁকোর বাড়ির রোগ-শয্যায় ১১টি কবিতা রচিত হইল, কোনওটি প্রাতে, কোনওটি দুপুরে কোনওটি রাত দু'টোয়। বাকি সবগুলিই ১৯ নভেম্বর হইতে ৫ ডিসেম্বরের মধ্যে শান্তিনিকেতনে "উদয়ন"-গৃহের রোগশয্যাবেষ্টনের মধ্যে রচিত। "আরোগ্য" প্রকাশিত হয় ১৩৪৭'র ফাল্গুনে। ইহার

সব কবিতাই ১৯৪১'র জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে লেখা। বই দু'টি প্রকৃতপক্ষে একই বই'র দু'টি খণ্ড, প্রায় একই ভাবকল্পনার সৃষ্টি, এবং সেই হেতু এক সঙ্গেই আলোচ্য।

এই দু'টি গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতায় বিশেষভাবে "রোগশয্যায়"-গ্রন্থে একটি অতি গভীর গম্ভীর সুর ধ্বনিত; জীবন ও মৃত্যুর, ধ্বংস ও সৃষ্টির একটি গভীরতর দর্শন যেন কবির দৃষ্টিকে একটি সহজ স্বচ্ছতা দিয়াছে, একটি দৃঢ় বিশ্বাসে রূপান্তরিত করিয়াছে, এবং সে-বিশ্বাস ও গভীরতর দর্শন অনেকগুলি কবিতার বক্তব্যের মধ্যে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। বলিবার ভঙ্গি অপেক্ষাও বক্তব্য বস্তু এই সব কবিতায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, এবং এই বলার মধ্যে কোথাও অস্পষ্টতা নাই। সবল নিরাসক্ত মনের অপরাজিত বীর্যের গভীর স্বচ্ছ দীপ্তি এই কবিতাগুলিকে একটি অপরূপ শক্তি ও দৃঢ় সংহত রূপ দান করিয়াছে।"জন্মদিনে" এবং "শেষলেখায়"ও এই বৈশিষ্ট্য উপস্থিত। বাক্য ও বর্ণ-বিরল এই কবিতাগুলিতে বক্তব্য স্পষ্ট, দৃষ্টি প্রখর ও গভীর, ভঙ্গি দৃঢ় ও সংহত এবং আবেগ সংযত।

রোগশয্যার দারুণ যন্ত্রণার মধ্যে মানুষের চিত্ত স্বভাবতই হয় দুর্বল, সৃষ্টির অন্তর্নিহিত শক্তি ও শান্তিতে স্বভাবতই মানুষ তখন বিশ্বাস হারায় এবং একান্ত ভাবেই নিজেকে, নিজের দেহ এবং দেহাশ্রিত রোগকে লইয়াই বিব্রত হইয়া পড়ে। আশ্চর্য এই, এই দুর্বলতার এতটুকু চিহ্ন এই কবিতাগুলির কোথাও নাই, না বলিবার ভঙ্গিতে, না মনন-কল্পনায় না বক্তব্যের শিথিলতায়। নিজের রোগযন্ত্রণার মধ্যে নিজেই তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, মানুষের ক্ষুদ্র দেহের যন্ত্রণা সহ্য করিবার শক্তি কি দুঃসীম! দেহ-দুঃখ-হোমানলে যে-অর্ঘ্যের আহুতি মানুষ রচনা করে তাহার তুলনা কোথাও নাই,

> এমন অপরাজিত বীর্যের সম্পদ,
> এমন নির্ভীক সহিষ্ণুতা,

এমন উপেক্ষা মরণেরে
হেন জয়যাত্রা—

ইহার তুলনা কোথাও নাই। দেহ-যন্ত্রণা যত বড়ই হোক্, সংসারে তাহাও প্রাণেরই আনুষঙ্গিক। নির্ভীক সহিষ্ণুতার পরীক্ষাও সকলকেই দিতে হয়; তাহার সমস্ত ভার বহন করিতে হয় সমস্ত চেতনা দিয়া।

এই মহাবিশ্বতলে
যন্ত্রণার ঘূর্ণযন্ত্র চলে।

এই যন্ত্রণার বর্ণ ও গন্ধ অনেকগুলি কবিতায় ছড়ান অন্যান্য বর্ণ ও গন্ধের সঙ্গে জড়াইয়া মিশাইয়া। ব্যক্তিগত জীবনের রোগ ও আরোগ্য লইয়াই এই কবিতাগুলি; ইহাদের মধ্যে রোগ-সংক্রান্ত দুঃখ-যন্ত্রণার কথা আছে, কিন্তু তাহার ব্যক্তিগত ইতিহাস গোপন ও প্রচ্ছন্ন; ব্যক্তিগত দুঃখ যন্ত্রণার প্রেক্ষাপটে ধরা পড়িয়াছে সেই 'পীড়নের যন্ত্রশালা' যাহাকে মর্ত্যবাসী মানব বারে বারে অতিক্রম করিয়া যায়,

বহ্নিশয্যা মাড়াইয়া দলে দলে
দুখের সীমান্ত খুঁজিবারে—

তাহাদের এই যাত্রাই সত্তার অপরাজেয় অস্তিত্ব ঘোষণা করে। প্রাণ-শিল্পী কবি এই মহান যাত্রার দৃশ্যই দেখিয়াছেন এবং তাহার আনন্দও বিশ্বাসে ব্যক্তিগত দুঃখ-যন্ত্রণাকে প্রচ্ছন্ন করিয়াছেন। তাই, দীর্ঘ যন্ত্রণার অন্ধকার রাত্রি পার হইলেন যখন অন্ধকারকেই অস্বীকার করিয়া বলিলেন,

প্রভাতের প্রসন্ন আলোকে
দুঃখ-বিজয়ীর মূর্তি দেখি আপনার
জীর্ণদেহ দুর্গের শিখরে,

তখন তাহার কণ্ঠে দেশকালহীন মানুষের দুঃখবিজয়ী প্রাণের জয়গানই শুনিলাম। অস্তিত্বের এই যে যাত্রা প্রাণের মধ্যে ইহার

স্বীকৃতিই মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার পথ ; এই প্রাণ জন্মমৃত্যুর অতীত ; অদর্শনের দুঃখ, বিদায়ের বেদনা সেই প্রাণকে মোহগ্রস্ত করে না।

চলিতেছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি প্রাণী
এই শুধু জানি।
চলিতে চলিতে থামে, পণ্য তার দিয়ে যায় কা'কে,
পশ্চাতে যে রহে নিতে ক্ষণপরে সেও নাহি থাকে।

* * *

চলমান রূপহীন যে বিরাট, সেই
মহাক্ষণে আছে তবু ক্ষণে ক্ষণে নেই।
স্বরূপ যাহার থাকা আর নাই-থাকা,
খোলা আর ঢাকা,
কী নামে ডাকিব তারে অস্তিত্বপ্রবাহে
মোর নাম দেখা দিয়ে মিলে যাবে যাহে।

* * *

অনিঃশেষ প্রাণ
অনিঃশেষ মরণের স্রোতে ভাসমান।

যাহাই হউক, উল্লিখিত দেহদুঃখের মধ্যে, শারীরিক কষ্টের মধ্যেও কবির লেখনীর বিরাম নাই। তিনি মনে করেন তাঁহার বাণী ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, রচনা ক্লিষ্ট হইয়া আসিতেছে,

অসুস্থ শরীরখানা
কোন্ অবরুদ্ধ ভাষা
বাণীর ক্ষীণতা করিছে বহন,
মুহ্যমান আলোকেতে রচিতেছে অস্পষ্টের কায়া।

অন্যত্র,

অসুস্থ দেহের মাঝে ক্লিষ্ট রচনার যে প্রয়াস
তাই হেরিলাম আমি
অনাদি আকাশে।

অন্যত্র, "রোগশয্যায়"-গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রে,

অপটু এ লেখনীর প্রথম শিথিল ছন্দোমালা।

কিন্তু তবু লিখিতে হয়, তবু শিথিল না হইবার প্রাণপণ প্রয়াস, কারণ এক মুহূর্তের তালভঙ্গে ইন্দ্রের সভায় উর্বশীর ক্ষমা নাই। মানুষও ক্ষমা করিবে না কবির ক্ষুদ্রতম ত্রুটি।

তাই মোর কাব্যকলা রয়েছে কুণ্ঠিত
তাপতপ্ত দিনান্তের অবসাদে;
কী জানি শৈথিল্য যদি ঘটে তার পদক্ষেপ-তালে।

তবে, লোকের খ্যাতির প্রতি কোনও মোহও কবির আর নাই, তাঁহার নিরাসক্ত মন আজ পার্থিব খ্যাতিতে মুগ্ধ আর নয়।

খ্যাতিমুক্ত বাণী মোর
মহেন্দ্রের পদতলে করি সমর্পণ
যেন চলে যেতে পারি নিরাসক্ত মনে
বৈরাগী সে সূর্যাস্তের গেরুয়া আলোয়;
নির্মম ভবিষ্য জানি অলক্ষিতে দস্যুবৃত্তি করে
কীর্তির সঞ্চয়ে
আজি তার হয় হোক প্রথম সূচনা।

ব্যক্তিগত দেহদুঃখের প্রসঙ্গ কবিকে নিকটতর করিয়াছে বৃহত্তর জনগণের বিচিত্র দুঃখ ও বেদনার। তাহাদের এই দুঃখ বেদনা নিজের অন্তরের মধ্যে গ্রহণ ও বহন করা আজ সহজ হইল; অসহায় নিঃসম্বলের দৈহিক ও সাংসারিক দুঃখ কষ্ট নিজের ব্যক্তিগত যন্ত্রণার ঊর্ধ্বে মাথা তুলিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল,

অর্ধাশন অনশন দাহ করে নিত্য ক্ষুধানলে,
শুষ্কপ্রায় কলুষিত পিপাসার জল,
দেহে নাই শীতের সম্বল
অবারিত মৃত্যুর দুয়ার,

> নিষ্ঠুর তাহার চেয়ে জীবন্মৃত দেহ চর্চার
> শোষণ করিছে দিনরাত
> রুদ্ধ আরোগ্যের পথে রোগের অবাধ অভিঘাত।

এই দুঃখের দায়িত্বকে কবি স্বীকার করিলেন। মানুষের উপর মানুষের অন্যায় সম্বন্ধে চেতনা সর্বমানবের চেতনায় বিস্তারিত হইতেছে; 'সুতীব্র অক্ষমা' যুগে যুগে মানুষের চিত্তে সঞ্চিত হইতেছে, একদিন প্রলয়ের দূত দেখা দিবে,

> দারুণ তাণ্ডব এ যে পূর্বেরি আদেশে
> কি অপূর্ব সৃষ্টি তার দেখা দিবে শেষে—

সৃষ্টির এই অন্তহীনতায় সবল প্রাণের সুগভীর বিশ্বাস, মানুষের সেবায় ও ভালবাসায় তৃপ্তি ও বিশ্বাস, মানবচিত্তে সাধনায় যে সত্য নিহিত তাহাতে বিশ্বাস, জীবনের অন্তর্নিহিত শক্তি ও শান্তিতে বিশ্বাস— এই গভীর পরিব্যাপ্ত বিশ্বাসই এই দুই গ্রন্থের কবিতাগুলিকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। এই স্থির অকুণ্ঠিত নিঃশঙ্ক বিশ্বাসই কবির শেষ ক'টি মাসের কবি-মানসের পরিচয়। "রোগশয্যায়"-গ্রন্থের দু'টি ছোট কবিতা হইতেই এই পরিচয় পাঠকের বোধ ও বুদ্ধির গোচর করা যাইতে পারে; জীবন ও মৃত্যুর মুখোমুখি রূপ কবির ধ্যান-তন্ময় দৃষ্টিতে কি ভাবে ধরা দিয়াছে তাহাও প্রসঙ্গত বুঝা যাইবে।

> ধূসর গোধূলি লগ্নে সহসা দেখিনু একদিন
> মৃত্যুর দক্ষিণ বাহু জীবনের কণ্ঠে বিজড়িত
> রক্ত সূত্রগাছি দিয়ে বাঁধা,
> চিনিলাম তখনি দোঁহারে।
> দেখিলাম নিতেছে যৌতুক
> বরের চরম দান মরণের বধূ,
> দক্ষিণ বাহুতে বহি চলিয়াছে যুগান্তের পানে।

অন্যত্র,

> তোমারে দেখিনা যবে মনে হয় আর্ত কল্পনায়
> পৃথিবী পায়ের নিচে চুপি চুপি ক'রিছে মন্ত্রণা
> সরে যাবে ব'লে।
> আঁকড়ি ধরিতে চাহি উৎকণ্ঠায় শূন্য আকাশেরে
> দুই বাহু তুলি।
> চমকিয়া স্বপ্ন যায় ভেঙে
> দেখি তুমি নতশিরে বুনিছ পশম
> বসি মোর পাশে
> সৃষ্টির অমোঘ শান্তি সমর্থন করি।

উৎকণ্ঠায় পীড়িত বিক্ষুব্ধ চিত্তের পাশেই এই নতশিরে পশম বুনার ছবি ও তাহার ব্যঞ্জনাটি কি সুন্দর, কত অর্থবহ।

যে-কবি পরিপূর্ণ শক্তি, ধৈর্য, বীর্য ও বিশ্বাসে মৃত্যুর মুখোমুখি হইয়া সৃষ্টি, জীবন ও মৃত্যুর রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিতে পারেন তাঁহার পক্ষেই প্রীতি ও ভালবাসায় বলা সম্ভব হইল,

> এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি,
> অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি,
> এই মহামন্ত্রখানি
> চরিতার্থ জীবনের বাণী।

এই মহামন্ত্র ত বৈদিক ঋষিরাও না উচ্চারণ করিয়াছিলেন—মধুবৎ পার্থিবং রজঃ! সম্মরোগমুক্ত দেহে শীতের স্নিগ্ধ স্পর্শ লাগিতেছে, পৃথিবীর বিচিত্র মায়া ও মাধুর্য শান্ত নির্জন রোগীর ঘরে খোলা দুয়ার ও জানালা দিয়া বিচিত্র ছায়াছবি সৃষ্টি করিতেছে; অর্ধ-উদাসীন কল্পনায় স্বচ্ছ সহজ হৃদয়-মুকুরে কবি সেই সব অপরূপ ছবিগুলি একটি একটি করিয়া দেখিয়া যাইতেছেন, স্মৃতির সরোবরে সঙ্গে সঙ্গে মৃদু দোলা

লাগিতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে কবি কথার মালায় টুক্‌রা টুক্‌রা স্মৃতি-ছবি গাঁথিয়া তুলিতেছেন। নিরালা অবকাশের মধ্যে মানুষ ও পৃথিবীর ঋণ স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতায় চিত্ত ভরিয়া উঠিতেছে, অতীতের সকরুণ স্মৃতি তাহার স্মিত মৃদু হাসি ও দীর্ঘশ্বাস শীতের মধুর হাওয়ায় ভাসাইয়া আনিতেছে, ছোট ছোট তুচ্ছ ঘটনা ও দৃশ্য স্বপ্নময় হইয়া দেখা দিতেছে, মনের পটে আঁকা অসংখ্য ছবি আবার নূতন করিয়া চিত্তে ভাসিয়া উঠিতেছে। জীবনের শেষ প্রান্তে বসিয়া পিছনের দিকে তাকাইয়া সেই সব ছবি নূতন করিয়া দেখিতে ভাল লাগিতেছে। সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় একটি একটি করিয়া ছবি যখন মনের মধ্যে জমাট হইয়া উঠিতেছে, তখন তাহা স্বল্প দুই চারিটি কথায়, স্নিগ্ধ মাধুর্য ও আত্মীয়তায়, বিরল রেখা ও বর্ণে তাহা গাঁথিয়া তুলিতেছেন। কত যে শান্ত, রঙিন ব্যাপ্ত মুহূর্ত এই কবিতাগুলিতে ধরা পড়িয়াছে, কত যে গভীর ব্যঞ্জনা ছড়াইয়া আছে, তাহার হিসাব নাই। কি অপরূপ ছবিই না আঁকিয়াছেন এবং সবগুলি ছবিই একটি শান্ত সৌন্দর্যে মণ্ডিত বিক্ষোভ নয়, আলোড়ন নয়, শান্তি, পরমা শান্তি, স্বচ্ছ সহজ শান্ত গতিভঙ্গিই এই কবিতাগুলিকে গন্ধে রসে ভরিয়া দিয়াছে। মানুষ ও মাটি, আকাশ ও পৃথিবীর গন্ধ, বর্ণ ও রূপ যেন মনকে বিভোর করিয়া রাখিয়াছে। সুগভীর ভাবানুভবতায় ছবিগুলি যেন আরও সুন্দর, আরও গম্ভীর দীপ্তি লাভ করিয়াছে ; এই মধুর ভাবুকতাও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার।

> নির্জন রোগীর ঘর।
> খোলা দ্বার দিয়ে
> বাঁকা ছায়া পড়েছে শয্যায়।
> শীতের মধ্যাহ্ন তাপে তন্দ্রাতুর বেলা
> চলেছে মন্থরগতি
> শৈবালে দুর্বলস্রোত নদীর মতন।

মাঝে মাঝে জাগে যেন দূর অতীতের দীর্ঘশ্বাস
শস্যহীন মাঠে।

মনে পড়ে কতদিন
ভাঙা পাড়িতলে পদ্মা
কর্মহীন প্রৌঢ় প্রভাতের
ছায়াতে আলোতে
আমার উদাস চিন্তা দেয় ভাসাইয়া
ফেনায় ফেনায়।

*   *   *

পুকুরের ধারে ধারে সর্ষেক্ষেতে পূর্ণ হয়ে যায়
ধরণীর প্রতিদান রৌদ্রের দানের,
সূর্যের মন্দিরতলে পুষ্পের নৈবেদ্য থাকে পাতা।

এমন গভীর ভাবুকতায় গন্ধ ও রূপের আকাশ যিনি গড়িয়া তুলিতে পারেন কথার মালায়, তাঁহাকেও আক্ষেপ করিয়া বলিতে হয়—

ভাবা নাই ভাষা নাই;
চেয়ে দূর দিগন্তের পানে
মৌন মোর মেলিয়াছি পাণ্ডুনীল মধ্যাহ্ন-আকাশে।

'জীবন যাত্রার প্রান্তে ছিল যাহা অনতিগোচর' সেই সব একদিন 'উপেক্ষিত ছবি' আজ 'চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে' জাগিয়া উঠিতেছে। কি অপরূপ ব্যঞ্জনাময় সেই সব ছবি!

সেই বহুদিন আগে,
দু'পহর রাত্রি,
নৌকা বাঁধা গঙ্গার কিনারে।
জ্যোৎস্নায় চিক্কণ জল,
ঘনীভূত ছায়ামূর্তি নিষ্কম্প অরণ্য তীরে তীরে,
ক্বচিৎ বনের ফাঁকে দেখা যায় প্রদীপের শিখা।

*   *   *

ছুটি'ছ ভাঁটির স্রোতে ভরা নৌকা তরতর বেগে।
মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল ;
দুই পারে স্তব্ধ বনে জাগিয়া রহিল শিহরণ
চাঁদের মুকুট-পরা অচঞ্চল রাত্রির প্রতিমা
রহিল নির্বাক হয়ে পরাভূত ঘুমের আসনে।

*　　　*　　　*

হেথা হোথা চরে গোরু শস্যশেষ বাজরার ক্ষেতে ;
তরমুজের লতা হতে
ছাগল খেদায়ে রাখে কাঠি হাতে কৃষাণ বালক।
কোথাও বা একা পল্লীনারী
শাকের সন্ধানে ফেরে ঝুড়ি নিয়ে কাঁখে।
কভু বহুদূরে চলে নদীর রেখার পাশে পাশে
নতপৃষ্ঠ ক্লিষ্টগতি গুণটানা মাল্লা এক সারি।

*　　　*　　　*

ইঁদারার টানা জল
নালা বেয়ে সারাদিন কুলু কুলু চলে
ভুট্টার ফসলে দিতে প্রাণ।
ভজিয়া জাঁতায় ভাঙে গম
পিতল-কাঁকন-পরা হাতে।

জীবনের এই সব ছবি, প্রাণের এই সব বিচিত্র লীলা ও রহস্য যাহা নয়ন ভরিয়া চিত্ত ডুবাইয়া কবি এতকাল দেখিয়াছেন, ভোগ করিয়াছেন আজ তাহাদেরই কথা মনে করিয়া চিত্ত গভীর কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিতেছে। প্রত্যেকটি কবিতায় এই গভীর কৃতজ্ঞতার সুর সুস্পষ্ট। কোনও কিছুর জন্যই জীবনে আর কোনও ক্ষোভ নাই ; বৃহৎ শান্তি, অপরিমেয় শক্তি ও সৌন্দর্যের কোলে যেন বসিয়া আছেন এই ধ্যানরত শুভ্র বৃদ্ধ কবি। শুধু এই সব তুচ্ছ ক্ষুদ্র উপেক্ষিত ছবিই ত নয়, প্রবহমাণ ইতিহাসের বিরাট দৃশ্যমালাও একে একে প্রসারিত হইতেছে চোখের

ও চিত্তের সম্মুখে ; অতীত ইতিহাস ও সাম্প্রতিক দৃশ্যাবলীর গভীর চেতনায় কবি তাহাদের মধ্যে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি পাঠ করিতেছেন। পাঠান মোগল সকলের জয়স্তম্ভ ভাঙিয়া পড়িয়াছে, আজ তার কোনও চিহ্ন নাই। তাহার পর আসিয়াছে ইংরাজের পণ্যবাহী সেনা—'লৌহ বাঁধা পথে, অনল-নিঃশ্বাসী রথে' (ইতিহাস-চেতনার কি ব্যঞ্জনাময় প্রকাশ এই দু'টি লাইনে)—তাহাদের চিহ্নও একদিন থাকিবে না ; কিন্তু কল কল রবে নানা পথে নানা দলে দলে যে বিপুল জনতা যুগ যুগান্তর হইতে মানুষের নিত্য প্রয়োজনের দিনযাত্রা মুখর করিয়া তুলিতেছে, যাহারা ইতিহাসে প্রাণধারা সঞ্চারিত করিতেছে প্রতিদিনের তুচ্ছ কাজে, তাহারা কাজ করিয়াই যাইবে, জীবনের নিত্য প্রয়োজনের দাবি মিটাইয়াই যাইবে। সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য ভাঙিয়া পড়ে, কিন্তু সেই সাধারণ মানুষ ও বিপুল জনতার কর্মচক্র, অবিশ্রান্ত ঘূর্ণমান এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের রথচক্র. মানব যাত্রার চিরন্তন প্রবাহ। কবির দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় ; শক্তির অহংকার, প্রতাপের দম্ভ, শাসনের রক্তচক্ষু একদিন নত হয়, তাহার চিহ্নও থাকে না, কিন্তু থাকে ফুল, থাকে প্রেম, থাকে গান, থাকে সূর্যের আলো, থাকে শরতের প্রভাত, হেমন্তের গোধূলি, যে-কথা বলিয়া বলিয়া কবি কখনও ক্লান্ত হন নাই। কিন্তু আজ কবি সে-কথা বলিতেছেন না, আজ বলিতেছেন, থাকে শুধু বিপুল জনতা ; তাহারাই জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি মন্দ্রিত করিয়া তোলে।

মাটির পৃথিবী পানে আঁখি মেলি যবে
দেখি সেথা কলকলরবে
বিপুল জনতা চলে
নানা পথে নানা দলে দলে
যুগ যুগান্তর হতে মানুষের নিত্য প্রয়োজনে
জীবনে মরণে।

ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধ'রে থাকে হাল ;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে ।
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে ।
রাজছত্র ভেঙে পড়ে, রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে,
জয়স্তম্ভ মূঢ় সম অর্থ তার ভোলে,
রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্তআঁখি
শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি ।
ওরা কাজ করে
দেশে দেশান্তরে,
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্র নদীর ঘাটে ঘাটে,
পঞ্জাবে বম্বাই গুজরাটে
গুরু গুরু গর্জন গুণ গুণ স্বর
দিনরাত্রে গাঁথা পড়ি দিনযাত্রা করিছে মুখর ।
দুঃখ সুখ দিবস রজনী
মন্দ্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি ।
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্ন শেষ 'পরে
ওরা কাজ করে ।

কি গভীর আবেগ ও ঐতিহ্য-চেতনায় সমৃদ্ধ এই অপূর্ব কৃষক-শ্রমিক প্রশস্তিটি !

কাহারও দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়, রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের শেষ অধ্যায়ে সমসাময়িক মানুষ কাব্যের প্রসঙ্গ হিসাবে কবির অকুণ্ঠ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। ইতিহাসগত চরিত্র হিসাবে এবং নিসর্গ-প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে যুক্ত মানুষের পরিচয় আমরা রবীন্দ্রকাব্যে বারবার

পাইয়াছি ইতিপূর্বেই। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে সমসাময়িক মানুষের, বিশেষ ভাবে সাধারণ মানুষের যে-পরিচয় সে-পরিচয় পরিণত বয়সে আমরা সর্বপ্রথম কতকটা পাইলাম "পলাতকা"য় এবং "লিপিকা"র দু'একটি কথিকায়। কিন্তু সে-পরিচয় তখনও সমসাময়িক চেতনায় গভীর নয়, এবং মানুষ হিসাবে সমসাময়িক বস্তুঘনিষ্ঠ মানুষের সম্পূর্ণ মূল্য তখনও কবির চেতনায় ধরা পড়ে নাই। তাহার প্রথম সূত্রপাত দেখা গেল "পুনশ্চ"-গ্রন্থ হইতে, 'গদ্য'-কবিতার আঙ্গিক প্রবর্তনের মধ্যেই সে-আদর্শ ও উদ্দেশ্য যে নিহিত ছিল, তাহা ত আগেই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। ঐ সময় হইতেই সমসাময়িক মানুষ ও তাহার দৈনন্দিন জীবন তাহাদের নিরাভরণ বাস্তবরূপে কবির চেতনার মধ্যে ধরা পড়িল। তাঁহার কবিতায় ভিড় করিয়া আসিতে আরম্ভ করিল ছেঁড়া ছাতা মাথায় গ্রামের পাঠশালার বৃদ্ধ গুরুমশায়, পাড়ার দুরন্ত বালক, পূজার বলির পাঁঠা, গ্রাম ও শহরের সাধারণ মেয়ে, কলেজে পড়া মেয়ের ব্যর্থ প্রেমের গল্প, কাঁকনপরা হাতে ভজিয়ার যাঁতায় গমভাঙা, বস্তির উলঙ্গ নোংরা ছবি, কুকুর, চড়ুইপাখি, শাকের চুপড়ি কাঁখে গরিব মেয়ে, সাঁওতাল বালক, অস্পৃশ্য মেয়ে, কবির জাত খোয়ানো প্রিয়া, উড়ে বেহারা, খোট্টা দারোয়ান, ইস্কুল কলেজের ছাত্র, এবং আরও কত কি। সমসাময়িক জীবনের শোভাযাত্রা যেন চলিয়াছে এই শেষ অধ্যায়ের কাব্যগুলিতে।

"আরোগ্য"র শেষ কয়েকটি কবিতা "রোগশয্যায়"-গ্রন্থের কবিতাগুলির সঙ্গে এক সুরে বাঁধা। এগুলি ঠিক উদ্ধৃত কবিতাগুলির মতন শান্ত ছবির মালা নয়; সত্যের অমৃতরূপে এই কবিতাগুলি উদ্ভাসিত, জীবন-রহস্যের গম্ভীর ইঙ্গিতে উদ্‌বুদ্ধ, গভীর ধ্যানে তন্ময়, গভীর গম্ভীর আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত।

আরোগ্যের প্রথম কবিতাটিতে কবি যেখানে বৈদিক ঋষির মন্ত্রে আপন মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন, সেইখানে বলিয়াছেন,

শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর
ব'লে যাব তোমার ধূলির
তিলক পরেছি ভালে,

*　　*　　*

সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মুরতি
এই জেনে এ-ধূলায় রাখিনু প্রণতি।

এবং ইহার পরের কবিতাটিতে,

পাখিদের অকারণ গান
সাধুবাদ দিতে থাকে জীবনলক্ষ্মীরে।
সব কিছু সাথে মিশে মানুষের প্রীতির পরশ
অমৃতের অর্থ দেয় তারে,
মধুময় করে দেয় ধরণীর ধূলি,
সর্বত্র বিছায়ে দেয় চিরমানবের সিংহাসন।

এই মাটির পৃথিবীর মাটির মানুষের প্রীতির দান, আত্মীয়তা ও ভালবাসার অভিষেক চিহ্ন হইতেছে মাটির তিলক, সেই তিলক কপালে পরিয়াছেন কবি। এই ত চরম ও পরম পুরস্কার—তাহার আনন্দময় কৃতজ্ঞতাময় হৃদয়াবেগ বাক্‌ভঙ্গির মধ্যে অন্তর্লীন, দু'টি একটি মাত্র কথার মধ্যে ব্যক্ত। মর্ত্য মানুষের প্রীতির স্পর্শই ত অমৃতত্বের অর্থ বহন করে, ধরণীর ধূলিকে মধুময় করে।

এই মাটির ধরণী ও মাটির মানুষ, ইহাদের ঘিরিয়াই জীবনের ক্ষীয়মাণ বাকি ক'টি দিন কাটিয়াছে। শেষের দিন যত ঘনাইয়া আসিতেছে তত তিনি ইহাদের নিবিড় করিয়া আঁকড়িয়া ধরিতেছেন, অর্ধ উদাসীন ভালবাসায়। ইহাদের প্রতি প্রীতিময় অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতায় অন্তরের একদিক পরিপূর্ণ; আর একদিকে এক মহান জ্যোতির্ময় আদিত্যবর্ণ পুরুষে বিশ্বাস এবং তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া বিচিত্র প্রত্যয়-

ভাবনার রহস্য। এই দু'য়েরই পরিচয় মিলিবে পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ "জন্ম-দিনে" এবং "শেষলেখা"য়।

"জন্মদিনে" প্রকাশিত হয় ১৩৪৮'র ১লা বৈশাখ, এবং "শেষলেখা" মৃত্যুর পর ১৩৪৮'র ভাদ্রে। জন্মদিনের কবিতাগুলি বেশির ভাগ ১৯৪১'র জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে, দু'একটি ১৯৩৯এ এবং কয়েকটি ১৯৪০'র সেপ্টেম্বরের পর লেখা। "শেষ লেখা"র 'সমুখে শান্তি পারাবার' গানটি শান্তিনিকেতনে "ডাকঘর" অভিনয়ের জন্য লিখিত হইয়াছিল। 'ঐ মহামানব আসে' গানটি আশ্রমে ১৩৪৮'র নববর্ষ উৎসবের জন্য লিখিত, এবং ইহাই কবির রচিত শেষ সংগীত। 'দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে' এবং 'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করে' এই দুইটি কবিতা কবি মুখে মুখে রচনা করিয়াছিলেন, লেখনীধারণের ক্ষমতা তখন আর ছিলনা ; কিন্তু প্রথমটি পরে সংশোধন করিবার সুযোগ তাঁহার ঘটিয়াছিল, তাহাও মুখে মুখেই ; দ্বিতীয়টি মৃত্যুর তিনদিন আগে রচিত বলিয়া সে সুযোগ আর কবি পান নাই।

জন্ম-মৃত্যুর মিলন-মোহনায় দাঁড়াইয়া কবি যে-কাব্য রচনা করিলেন, তাহার নাম দিলেন "জন্মদিনে" ; অথচ, ইহার প্রত্যেকটি কবিতার আকাশ মৃত্যুর গম্ভীর সুন্দর প্রসন্ন মেঘে ছাওয়া, তাহাদের স্তবকে স্তবকে মৃত্যুর স্থির পদধ্বনি। মৃত্যুর সেই মহা-আবির্ভাব তিনি প্রতীক্ষা করিতেছেন।

সাবিত্রী পৃথিবী এই, আত্মার এ মর্ত্যনিকেতন,
আপনার চতুর্দিকে আকাশে আলোকে সমীরণে
ভূমিতলে সমুদ্রে পর্বতে
কী গূঢ় সংকল্প বহি করিতেছে সূর্যপ্রদক্ষিণ
সে রহস্যসূত্রে গাঁথা এসেছিনু আশি বর্ষ আগে,
চ'লে যাব কয় বর্ষ পরে।

তখন কি কবি জানিতেন, কয় বর্ষ নয়, কয়েকটি মাস পরই তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হইবে! নিজের জীবনের অবসানের কল্পনাটি কি সুন্দর! মৃত্যুর বিকৃতি মৃত্যুমুহূর্তেও তাঁহাকে স্পর্শ না করুক, অসুন্দর সেই মুহূর্তেও জীবনকে আঘাত না করুক।

জন্মদিনে মৃত্যুদিনে দোঁহে যবে করে মুখোমুখি
দেখি যেন সে মিলনে
পূর্বাচল অস্তাচলে
অবসন্ন দিবসের দৃষ্টি বিনিময়
সমুজ্জ্বল গৌরবের প্রণত অবসান।

কিন্তু জীবন যাঁহাকে বঞ্চনা করে নাই এবং জীবনকেও যিনি বঞ্চনা করেন নাই,

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত ওঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি।

এই ছিল যাঁহার আজীবন সাধনা তিনি ত আজ মৃত্যুকে শূন্য হাতে বরণ করিতে পারেন না। যাঁহারা এতকাল তাঁহাকে নূতন নূতন সাজে সজ্জায় সজ্জিত করিয়াছেন তাঁহাদের তিনি স্মরণ করিয়াছেন, বলিয়াছেন,

আমি কিছু দিতে চাই, তা না হলে জীবনে জীবনে
মিল হবে কী করিয়া, আসি না নিশ্চিত পদক্ষেপে,
ভয় হয় রিক্ত পাত্র বুঝি, বুঝি তার রসস্বাদ
হারায়েছে পূর্বপরিচয়, বুঝি আদানে প্রদানে
রবেনা সম্মান, তাই আশঙ্কার এ দূরত্ব হতে
এ নিষ্ঠুর নিঃসঙ্গতা মাঝে তোমাদের ডেকে বলি,—
যে জীবনলক্ষ্মী মোরে সাজায়েছে নব নব সাজে
তার সাথে বিচ্ছেদের দিনে নিভায়ে উৎসবদীপ

দারিদ্র্যের লাঞ্ছনায় ঘটাবে না কভু অসম্মান,
অলংকার খুলে নেবে, একে একে বর্ণসজ্জাহীন উত্তরীয়ে
ঢেকে দিবে, ললাটে আঁকিবে শুভ্র তিলকের রেখা ;
তোমরাও যোগ দিয়ো জীবনের পূর্ণ ঘট নিয়ে
সে অন্তিম অনুষ্ঠানে, হয়ত শুনিবে দূর হতে
দিগন্তের পরপারে শুভশঙ্খধ্বনি ।

ভাব-গম্ভীর নিখিল বিশ্বের মর্মস্থলে যে গভীর রহস্য নিরন্তর আবর্তিত হইতেছে তাহারই অর্থানুভূতিতে "জন্মদিনে"র অধিকাংশ কবিতা সমৃদ্ধ। কোনও জন্মদিনে "দূরত্বের অনুভব অন্তরে নিবিড় হয়ে এল···আমার দূরত্ব আমি দেখিলাম তেমনি দুর্গমে, অলক্ষ্য পথের যাত্রী, অজানা তাহার পরিণাম" ; কোনও জন্মদিনে মনে হইল, "সম্পূর্ণ যে-আমি রয়েছে গোপনে অগোচর···শুধু করি অনুভব চারদিকে অব্যক্তের বিরাট প্লাবন বেষ্টন করিয়া আছে দিবস রাত্রিরে" ; কখনও মনে হইতেছে পৃথিবীর নাট্যমঞ্চে রহস্য যবনিকা তুলিবার কাজে কবির ডাক ছিল ; সেই কাজে মনে হইয়াছে "সাবিত্রী পৃথিবী, এই আত্মার এ সত্যনিকেতন,···কি গূঢ় সংকল্প বহি করিতেছে সূর্য প্রদক্ষিণ"। সৃষ্টি-লীলা, জন্মমৃত্যুর বিচিত্র রহস্য, পুরাতন আবর্জনার ধ্বংস ও নূতন সৃষ্টির আহ্বান, মৃত্যুর অতীত আত্মার চিরন্তন মহিমা ইত্যাদিই কখনও গভীর গম্ভীর সুরে, কখনও লঘু লাস্যে কবিতাগুলিতে রূপ গ্রহণ করিয়াছে। কোথাও কোথাও বক্তব্য অনুভূতির সূক্ষ্মতম তন্ত্রীতে আঘাত করিয়াছে, এবং কাব্যময় প্রকাশে চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে। ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি কবিতায় কবি-মানসের কাব্যময় প্রকাশ বক্তব্যকে রসোত্তীর্ণ করিয়াছে। 'সেই পুরাতন কালে ইতিহাস যবে', 'পোড়ো বাড়ি, শূন্য দালান' 'বিশ্বধরণীর এই বিপুল কুলায়', 'নদীর পালিত এই জীবন আমার', 'তোমাদের জানি, তবু তোমরা যে দূরের মানুষ', প্রভৃতি

কবিতা শুধুই যে ভাব ও রসগভীর তাহাই নয়, পূর্বোক্ত রহস্যে ও বিশ্বাসে সমৃদ্ধ।

কিন্তু এই সৃষ্টিলীলা, জন্মমৃত্যুর এই রহস্য, ইহার গভীরে যখন চিত্ত মগ্ন তখনও সমসাময়িক মানুষের দুঃখ ও দারিদ্র্য, পৃথিবী জোড়া অত্যাচার অবিচার, রক্তোন্মত্ত ধ্বংসলীলা সম্বন্ধে কবি সচেতন।

মহা ঐশ্বর্যের নিম্নতলে
অর্ধাশন অনশন দাহ করে নিত্য ক্ষুধানলে
শুষ্কপ্রায় কলুষিত পিপাসার জল,
দেহে নাই শীতের সম্বল,
অবারিত মৃত্যুর দুয়ার,

* * *

একপাখা শীর্ণ যে পাখির
ঝড়ের সংকটদিনে রহিবে না স্থির,—
সমুচ্চ আকাশ হতে ধূলায় পড়িবে অঙ্গহীন
আসিবে বিধির কাছে হিসাব চুকিয়ে-দেওয়া দিন।

সেই হিসাব-চুকাইয়া-দিবার-দিন আসে প্রলয়ের রূপ ধরিয়া, এবং সেই পয়োধির মধ্য হইতেই জন্মলাভ করে নূতন সৃষ্টি, নূতন পৃথিবী।

এ কুৎসিত লীলা যবে হবে অবসান
বীভৎস তাণ্ডবে
এ পাপ-যুগের অন্ত হবে,
মানব তপস্বীবেশে
চিতাভস্ম-শয্যাতলে এসে
নবসৃষ্টি ধ্যানের আসনে
স্থান লবে নিরাসক্ত মনে,
আজ সেই সৃষ্টির আহ্বান
ঘোষিছে কামান।

কামানের ঘোষণার মধ্যে নবসৃষ্টির আহ্বানের কল্পনা সাম্প্রতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ, এবং বিশ্বাস হিসাবেও সার্থক।

মানব-তপস্বীর যে ইঙ্গিত পূর্বোক্ত কবিতাটিতে সে-ইঙ্গিত স্পষ্টতর হইয়াছে শেষ অধ্যায়ের কনেকগুলি কবিতায়। কবি বিশ্বাস করেন, নবযুগের নূতন সৃষ্টিকে আবাহন করিয়া আনিবেন এই সব মানব-তপস্বীরা, মহামানবেরা। একদিকে এই অনির্বাণ মানব-মহিমা, আর একদিকে জড়প্রকৃতি এই দু'য়ের উপরই কবির শেষ নির্ভর। এই মানব-মহিমার বন্দনা গাহিতে গিয়া কবি বুদ্ধকে স্মরণ করিয়াছেন; বলিয়াছেন,

ঐ মহামানব আসে;
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্য ধূলির ঘাসে ঘাসে।
সুরলোকে বেজে উঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক
এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয়শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নবজীবনের আশ্বাসে।
জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়,
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে। ("শেষলেখা")

এই মহামানব কোনও ব্যক্তি বিশেষ নয়, মানব-মহিমারই দেশকালধৃত একটি বিশিষ্টরূপ। মৃত্যুকে, মৃত্যু ভয়কে যাঁহারা জয় করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যেই সেই মানব-মহিমা প্রকাশ পাইয়াছে। পৃথিবীর মানুষকে ডাক দিয়া তিনি বলিয়াছেন, সেইসব মৃত্যুঞ্জয় মহাপ্রাণদের পরিচয় লইতে।

মৃত্যুঞ্জয় যাহাদের প্রাণ
সব তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দীপ যারা জ্বালে অনির্বাণ
তাহাদের মাঝে যেন হয়
তোমাদেরি নিত্য পরিচয়

* * *

তাদেরে সম্মানে মান নিয়ো
বিশ্বে যারা চিরস্মরণীয় ॥

এই সব মৃত্যুঞ্জয় মহাপ্রাণদের উদ্দেশ্যেই কবি তাঁহার শেষ প্রণাম রাখিয়া গিয়াছেন।

বার বার মনে মনে বলিতেছি, আমি চলিলাম
যেথা নাই নাম,
যেখানে পেয়েছে লয়
সকল বিশেষ পরিচয়,
নাই আর আছে
এক হয়ে যেথা মিশিয়াছে।

* * *

মন বলে, আমি চলিলাম,
রেখে যাই আমার প্রণাম
তাঁদের উদ্দেশে যাঁরা জীবনের আলো
ফেলেছেন পথে যাহা বারে বারে সংশয় ঘুচালো ॥

১৭ নম্বর কবিতায়ও তাঁহাদের কথাই আরও পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, "আজি এই প্রভাত আলোকে, তাঁহাদের করি নমস্কার।"

জীবনের অসম্পূর্ণতার যে-বেদনার কথা আগে একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছি "জন্মদিনে"র একটি কবিতায় সেই বেদনা এক অপূর্ব অনুভূতির সুগভীর আন্তরিকতায়, মধুর প্রীতিময় সরলতায়, সহজ বিনয়ে ও সততায়, এবং অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। এই বিশিষ্টভাবানু-

ভূতিটির পরিচয় ইহার চেয়ে ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় বুঝি আর কিছুতেই হইতে পারিত না। কাব্য হিসাবে যে কবিতাটি সমৃদ্ধ শুধু তাহাই নয়, কবি-মানসের একটি বিশেষ অনুভূতির বলিষ্ঠ পরিচয় হিসাবেও কবিতাটি স্মরণীয়। অন্যত্রও এই কবিতাটির অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছি; এখানেও আরও বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।
দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী—
মানুষের কত কীর্তি কত নদী গিরি সিন্ধু মরু
কত না অজানা জীব কত না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে।

* * *

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত ওঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি,
এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক,
রয়ে গেছে ফাঁক।

* * *

সবচেয়ে দুর্গম যে-মানুষ আপন অন্তরালে
তার কোনো পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।
সে অন্তরময়
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।
পাইনে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।

* * *

তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা
আমার সুরের অপূর্ণতা।
আমার কবিতা জানি আমি

গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।
কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।

*　　*　　*

এসো কবি, অখ্যাতজনের
নির্বাক মনের।
মর্মের বেদনা যত করিয়ো উদ্ধার
প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারিধার
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।

*　　*　　*

মূক যারা দুঃখে সুখে
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে।
ওগো গুণী,
কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি।

*　　*　　*

আমি বারংবার
তোমারে করিব নমস্কার।

এমনই রসোত্তীর্ণ আর একটি কবিতা

*　　*　　*

করিয়াছি বাণীর সাধনা
দীর্ঘকাল ধরি,
আজ তারে ক্ষণে ক্ষণে উপহাস পরিহাস করি।

*　　*　　*

তবু জানি অজানার পরিচয় আছিল নিহিত
বাক্যে তার বাক্যের অতীত।
সেই অজানার দূত আজি মোরে নিয়ে যায় দূরে,
অকূল সিন্ধুরে
নিবেদন করিতে প্রণাম
মন তাই বলিতেছে, আমি চলিলাম।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, "শেষলেখা" কবির মৃত্যুর পর প্রকাশিত ইহার বিজ্ঞপ্তিতে কবি-পুত্র রথীন্দ্রনাথ বলিতেছেন,

"এই গ্রন্থের নামকরণ পিতৃদেব করিয়া যাইতে পারেন নাই।

"শেষলেখা"র অধিকাংশ কবিতা গত সাত আট মাসের মধ্যে রচিত। ইহার মধ্যে কয়েকটি তাঁহার স্বহস্তলিখিত, অনেকগুলি শয্যাশায়ী অবস্থায় মুখে মুখে রচিত, নিকটে যাঁহারা থাকিতেন তাঁহারা সেগুলি লিখিয়া লইতেন, পরে তিনি সেগুলি সংশোধন করিয়া মুদ্রণের অনুমতি দিতেন।"

রোগশয্যা-বিলগ্ন অশীতিপর রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুঞ্জয় কবি। মৃত্যু তাঁহার জীবনে যে পূর্ণতা আনিয়াছে কবি তাহা ইতিমধ্যেই জানিয়াছেন, জীবনকে যেমন মৃত্যুকেও তিনি তেমনই পরিপূর্ণভাবে ভোগ করিয়াছেন; মৃত্যুর অভিজ্ঞতাই জীবনকে সম্পূর্ণতা দান করিল। এই হিসাবে তিনি মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছেন; এই মৃত্যু-অভিজ্ঞতা-পূর্ণ প্রাণের পরিচয় এই গ্রন্থেও সুস্পষ্ট। মৃত্যুর চেয়েও তাঁহার কবিপুরুষ বড় একথা তিনি আগেই জানিয়াছিলেন। আজ তিনি 'বিচিত্র ছলনা জালে আকীর্ণ সৃষ্টির পথ', 'দুঃখের আঁধার রাত্রি', 'আমৃত্যু দুঃখের তপস্যা' সব কিছু উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়া রক্তের অক্ষরে আঁকা আপনার রূপ দেখিয়া লইয়াছেন, অন্তরে 'মহা অজানার নির্ভয় পরিচয়' লাভ করিয়াছেন, তাঁহার পরম আমিকে জানিয়া শান্তির অক্ষয় অধিকার লাভ করিয়াছেন। মুক্ত স্বচ্ছ দিব্য জ্যোতির্ময় আজ তাঁহার অন্তরের কবিপুরুষের রূপ; বিরলভাষ বিরলা-

লংকার স্বচ্ছ ঋজু বাণীমূর্তিতে সেই জ্যোতিদীপ্ত পুরুষের প্রকাশ। এই পুরুষের অলংকারে কোন্ প্রয়োজন? কাজেই মিল নাই, উপমা নাই, বর্ণনা নাই, ঝংকার নাই, সজ্জা বিন্যাস কিছুই নাই। শুধু দু' একটি কথা, যে কথা ক'টি না বলিলে নয়—স্পষ্ট, সরল, সংহত, কঠিন কয়েকটি কথা; যেন মন্ত্র,যেন চরমতম অভিজ্ঞতার পরমতম বাণী। কাব্য-জিজ্ঞাসার কোনও নিয়মেই এই বাণীরূপের বিচার করা চলে না। উপনিষদের ঋষি কবি যখন বলেন,

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ

তখন আমরা কেউ তাহার কাব্যবিচার করিতে পারিনা। আমরা তখন শুধু সেই ঋষি-কবিদের প্রাণের অনুভবের গন্ধটুকু, স্মৃতিটুকু অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দৃষ্টিকে প্রসারিত করিয়া। "শেষলেখা"র কবিতাগুলি সম্বন্ধে এই একই কথা প্রয়োজ্য। স্বচ্ছ জ্যোতির্ময় আত্মার ইহাই বোধ হয় যথার্থ বাণীদেহ, বাঙ্ময়, বর্ণময় বিচিত্র রূপের ইহাই বোধ হয় রূপাতীত অপরূপ প্রকাশ; প্রত্যয়োপ-লব্ধির চরম বাণীরূপ, সত্য মানবের শেষ বাণীরূপ। পূর্ণ জ্ঞান ও দর্শনের, চরম বৈরাগ্য ও আনন্দের, পরম শক্তি ও বিশ্বাসের এমন রসঘন সরল, কঠিন, স্বচ্ছ অকুণ্ঠিত বাণীরূপ বর্তমান কালে আর কোথায়ই বা আমরা দেখিয়াছি!

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—
কে তুমি,
মেলেনি উত্তর।

বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগরতীরে,
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি,
পেল না উত্তর ॥

অথবা,

রূপ-নারানের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ-জগৎ
স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ,
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায় ;
সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালবাসিলাম,
সে কখনো করে না বঞ্চনা।
আমৃত্যু দুঃখের তপস্যা এ-জীবন,
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ ক'রে দিতে।

আমরা যাহাকে 'কবিতা' বলিয়া জানি ইহা কি সেই কবিতা, না দ্রষ্টা-ঋষির বিস্মিত মন্ত্র ! ইহার বক্তব্য এত স্পষ্ট ও স্বচ্ছ, ইহার অঙ্গরচনা কি কোনও আঙ্গিক-বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে ?

দু'টি প্রত্যয়কে কবি পাইয়াছেন সমস্ত জীবনের দুঃখের তপস্যায়। একটি,

জীবন পবিত্র জানি,
অভাব্য স্বরূপ তার
অজ্ঞেয় রহস্য-উৎস হ'তে
পেয়েছে প্রকাশ
কোন্ অলক্ষিত পথ দিয়ে,
সন্ধান মেলে না তার।

*　　*　　*

স্বর্ণঘটে পূর্ণ করি আলোকের অভিষেক ধারা,
সে-জীবন বাণী দিল দিবসরাত্রিরে,
রচিল অরণ্যফুলে অদৃশ্যের পূজা-আয়োজন,

*　　*　　*

প্রিয়ারে বেসেছি ভালো
বেসেছি ফুলের মঞ্জরীকে ;

*　　*　　*

দিনে দিনে পূর্ণ হয় বাণীতে বাণীতে
আপনার পরিচয় গাঁথা হয়ে চলে
দিনশেষে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে ছবি,
নিজেরে চিনিতে পারে
রূপকার নিজের স্বাক্ষরে।

এ সত্যও কবি জানিয়াছেন যে এ-জগৎ স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, মিথ্যা নয় ; মৃত্যু-রাহুর ক্ষমতা নাই জীবনের স্বর্গীয় অমৃতকে গ্রাস করিবার। এই সত্যটিকে স্থির-নিশ্চয় করিয়া দেখিয়াছেন, জানিয়াছেন বলিয়াই এখনও পাখির গানের দান তিনি হাত পাতিয়া গ্রহণ করেন, প্রিয়হীন ঘরে শূন্য চৌকির করুণ কাতর ভাষা অন্তর শূন্যতার বেদনায় ভরিয়া তোলে,

বিদেশী প্রিয়ার রচিত আসন—'অতীতের পালানো স্বপন'—অফুট গুঞ্জনের নীড় রচনা করে, বৃষ্টিধৌত শ্রাবণের নির্মল আকাশ আজও সার্থক বলিয়া মনে হয়, এবং বন্ধুজনের হাতের স্পর্শ, সত্যের অন্তিম প্রীতিরস জীবনের চরম প্রসাদ বলিয়া মনে করেন।

আর একটি সত্য যাহা তিনি পাইয়াছেন, সেটি

> মৃত্যু দেখা দেয় এসে একান্তই অপরিবর্তনে
> এ-বিশ্বে তাই সে সত্য নহে
> এ-কথা নিশ্চিত মনে জানি।

এবং তাহারই আনুষঙ্গিক

> দুঃখের পরিহাসে ভরা।
> ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি—
> মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে।

যতবার এই ভয়ের সুযোগকে কবি বিশ্বাস করিয়াছেন, ততবারই জীবনে তাঁহার অনর্থ পরাজয় ঘটিয়াছে; এই সব ভয় আর বিভীষিকা ইহারাই অন্ধকারে বিকীর্ণ মৃত্যুর নিপুণ শিল্পকার্য। সৃষ্টির পথ বিচিত্র ছলনাজালে আকীর্ণ, জীবনে মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ নিপুণ হস্তে বিছান; যে অনায়াসে এই ছলনা সহ্য করিতে পারে, মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ এড়াইতে পারে, সেই শুধু পায় অক্ষয় শান্তির অধিকার, পায় সত্যকে 'আপন আলোক ধৌত অন্তরে অন্তরে।'

একদিন, এবং কিছুদিন আগেই কবি নিজের আজীবন বাণী-সাধনাকে ক্ষণে ক্ষণে উপহাস করিয়াছিলেন; আজ বলিতেছেন,

> বাণীর মুরতি গ'ড়ি
> একমনে
> নির্জন প্রাঙ্গণে
> পিণ্ড পিণ্ড মাটি তার

যায় ছড়াছড়ি
অসমাপ্ত মূক
শূন্যে চেয়ে থাকে
নিরুৎসুক।

* * *

বিস্মৃত স্বর্গের কোন্
উর্বশীর ছবি
ধরণীর চিত্তপটে
বাঁধিতে চাহিয়াছিল
কবি
তোমারে বাহন রূপে
ডেকেছিল
চিত্রশালে যত্নে রেখেছিল
কখন সে অন্যমনে গেছে ভুলি
আদিম আত্মীয় তব ধূলি,
অসীম বৈরাগ্যে তার দিক্-বিহীন পথে
তুলি নিল বাণীহীন রথে।
এই ভালো,
বিশ্বব্যাপী ধূসর সম্মানে
আজ পঙ্গু আবর্জনা
নিরত গঞ্জনা
কালের চরণক্ষেপে পদে পদে
বাধা দিতে জানে,
পদাঘাতে পদাঘাতে জীর্ণ অপমানে
শান্তি পায় শেষে
আবার ধূলিতে যবে মেশে।

অবিরাম অপ্রতিহত বাণী-বন্যায়, সমৃদ্ধ বাণী-বিন্যাসে যাঁহার সুদীর্ঘ জীবন কাটিয়াছে আজ এ কি ঔদাসীন্য, এ কি রকম বৈরাগ্য সেই সুদীর্ঘ

জীবনের সাধনাকেই দিতে চাহিল ধরণীর ধূসর ধূলায় মিশাইয়া, তুলিয়া দিতে চাহিল বাণীহীন রথে! যে-বাণীর মূর্তি তিনি গড়িয়াছেন এতকাল ধরিয়া, সেই মূর্তি আজ নিরুৎসুক দৃষ্টিতে শূন্যের দিকে তাকাইয়া! এ কি পরিণাম! অথচ, অস্বীকার করিবার উপায় নাই, রবীন্দ্র-কবি-পুরুষের ইহাই সহজ ও স্বাভাবিক পরিণতি। এই গ্রন্থের প্রথম নিবন্ধেই একথা বলিয়াছিলাম, রবীন্দ্র কবিপুরুষের মর্মবাণী বৈরাগ্যের বাণী, তাহার সুর বিবাগী চিত্তের সুর। এই বিবাগী, বৈরাগী চিত্তই শেষ পর্যন্ত নিজের আজীবন সাধনাকেও কোনও আসক্তি কোনও মোহ বন্ধনে বাঁধিল না, দিল ধরণীর গৈরিক ধূলায় অসীম বৈরাগ্যের দিক্-বিহীন পথে উড়াইয়া, বলিল, বিশ্বব্যাপী এই ধূসর সম্মানের ধূলিতে মিশিয়া যাওয়া, ইহাই পরম পরিণতি! ইহাই না ভারতীয় চিত্তের সংস্কার, dust unto dust!

অথচ, মধুময় এই পৃথিবী, মধুময় এই পৃথিবীর ধূলি, মধুময় এই পৃথিবীর ধূলির গড়া মানুষ। ইহাদের সকলকে আশীর্বাদ না করিয়া, ইহাদের সকলের আশীর্বাদ না লইয়া কি আজ শান্তির অক্ষয় অধিকার পাওয়া যাইবে, মৃত্যুর সঙ্গে মহামিলন কি সার্থক হইবে! তাই, আজ

> আমি চাহি বন্ধুজন যারা
> তাহাদের হাতের পরশে
> মর্ত্যের অন্তিম প্রীতিরসে
> নিয়ে যাব জীবনের চরম প্রসাদ
> নিয়ে যাব মানুষের শেষ আশীর্বাদ।
> শূন্য ঝুলি আজিকে আমার ;—
> দিয়েছি উজাড় করি
> যাহা কিছু আছিল দিবার

প্রতিদানে যদি কিছু পাই
কিছু স্নেহ, কিছু ক্ষমা
তবে তাহা সঙ্গে নিয়ে যাই
পারের খেয়ায় যাব যবে
ভাষাহীন শেষের উৎসবে ॥

প্রথম খণ্ডের

নাম সূচী